ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য



শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৬৭
পুনরমুদ্রণ —বৈশাখ ১৩৮৭
পুনরমুদ্রণ —বৈশাখ ১৩৯২

প্রকাশক । শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

মুদ্রক । শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জী
এস্ অ্যান্টনী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৯১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট । নরেন্দ্রনাথ দত্ত
পরিবেশক । ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

দাম টা. ৩৭.৫০ মাত্র

আচার্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

মানুষ-সামান্যে মানুষের যেমন একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ আছে, তেমনই বিশেষ বিশেষ দেশকালে পরিমিত তাহার জাতীয় জীবনেরও একটা বিশেষ রূপ রহিয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিনিসটা অনেক সময় খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। একজাতীয় লোকের মধ্যে হয়ত এমন একটি ধর্মবিশ্বাস দেখা যায় যেন তাহাদের সমগ্র জীবন সেই বিশ্বাসের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে; আশ্চর্য এই, পাশাপাশি আর একদল লোকের মনে ঐ-জাতীয় একটি বিশ্বাস কিছুতেই তেমন কোন রেখাপাত করে না। ভারতের শক্তিবাদ এইভাবে ভারতের জাতীয় মানসের একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প—সর্বক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব; কিন্তু দেখিয়াছি, ধর্মের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় একটি বিশ্বাস বা ভাবদৃষ্টি অপর কাহার মনই তেমন আকর্ষণ করে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে শক্তিবাদ বেদান্তবাদে পরিবেশিত হইতেছে। মাতৃপূজার প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে নানারূপে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছু কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শক্তিবাদ বা শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠিতে দেখি না। শক্তিবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন করিয়াই ইহার একটি সামগ্রিক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছি, সমস্ত কথা আজ একসঙ্গে করিয়া এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

বিষয়টি দুইটি দিক্ রহিয়াছে; একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্মিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিতে হইবে এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না; আবার ঐতিহাসিক তথ্য সকলই অধ্যাত্মসাধনা বা উপলব্ধির পরিপন্থী এ-কথাকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাঁহারা জোর দিতে চান তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্য-ঘটনাদ্বারা সে জাগাইয়া তোলে ভাব-ব্যঞ্জনা, সেই ভাব-ব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদৃষ্টির রূপলাভ করে। এ-ক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাটাই সত্য—মানুষের চিত্তভূমিতে তাহার

যতরকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা করি এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলিবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মসত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও হয়, তথাপি কালে কালে যেসব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারি না।

এই কারণে আমি এই গ্রন্থের মধ্যে আমার সকল আলোচনায় ইতিহাস ও অধ্যাত্মদৃষ্টি উভয়কেই সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি অতি প্রাচীনকাল হইতে মাতৃপূজা এবং শক্তিবাদ ও শক্তিসাধনা কত ধারায় কিভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনায় অস্থিমজ্জাগত অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া সকল ধারাই কিভাবে কেবলই 'একে'র মধ্যে বিলীন হইয়া 'এক' হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহারও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই 'এক'কে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের শক্তিকে অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনা; সেই অধ্যাত্মসাধনার রূপ কি সে-সম্বন্ধেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসত্যদেব প্রভৃতি শাক্ত সাধকগণের সাধনা অবলম্বন করিয়া একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'; নামটি সম্বন্ধে সামান্য একটু কৈফিয়ৎ দিবার রহিয়াছে। শক্তিপূজার আমি প্রাচীন যে সকল বিভিন্ন ধারার সন্ধান ও বিচার করিয়াছি সে আলোচনা সর্ব-ভারতীয়। দার্শনিক শক্তিবাদ সম্বন্ধে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাও সর্বভারতীয়। শক্তি-অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনার কথা যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের সাধকগণের সাধনা অবলম্বনে বলা হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সেই সব তত্ত্বও ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য বলিয়া মনে করি। শক্তি-অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি সেখানেও ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের কবি স্থান পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবাদ ও শক্তি-সাধনার প্রতিফলনের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে কিছু কিছু পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতে পারি। এ-ক্ষেত্রে আমি বাঙলা সাহিত্য, ওড়িয়া-সাহিত্য, মৈথিলী-সাহিত্য, অসমীয়া-সাহিত্য এবং হিন্দী-সাহিত্য সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্নভাবে শক্তিপূজার প্রচলন আছে, বিশেষভাবে কেরলায় কালীপূজার জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। কেরলায় কালী-দেবীকে অবলম্বন করিয়া মালায়ালাম্ ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্যও আছে। দক্ষিণদেশে সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ কয়েকখানি তন্ত্রও রচিত হইয়াছে। দক্ষিণদেশের এই শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যেরও একটা পরিচয় দিতে পারিলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত।

কিন্তু এ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিলাম, তথ্য যাহা কিছু তাহা সকলই ইংরেজী পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে ধার করিতে হয়। এ-জাতীয় পুস্তিকা-প্রবন্ধ যাহা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও অল্প, তাহা ছাড়া তাহার কতটা কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই। অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় অধিকার থাকিলেও এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম; কিন্তু তাহাও নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য-অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার সংকল্পও পোষণ করিতেছি।

আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাঙলাদেশের শাক্ত ধর্ম এবং শাক্ত সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইয়াছে। এ-কথাও বলা যায় যে, বাঙলার শাক্ত ধর্ম ও শাক্ত সাহিত্যকে মুখ্যভাবে কেন্দ্র করিয়াই সব আলোচনা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বলিয়াছি দুই কারণে; প্রথমতঃ আমার পরিচয় বাঙলার শাক্ত ধর্ম ও শাক্ত সাহিত্যের সহিতই সমধিক; দ্বিতীয়তঃ আমি স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ-বিষয়ে একমত যে, বাঙালী যেমন করিয়া মা ডাকিতে পারিয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। শাক্ত ধর্মমত ও সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই অল্পবিস্তর দেখা যায় বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার অধিগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই সাধনা বাঙলাদেশে যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; এবং প্রকারে ও পরিমাণে বাঙলাদেশে যে শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না।

আরও একটি কথা। গ্রন্থখানি পড়িয়া হয়ত মনে হইতে পারে, শক্তিধর্মের ঐতিহাসিক দিক্ এবং সাধনার দিক্ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে দার্শনিক শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সেভাবে হয় নাই, দার্শনিক দিক্ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ ছিল। এ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই. ইতঃপূর্বে আমি 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি· দার্শনিক শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ধারাবাহিকক্রমেই সেখানে দীর্ঘ আলোচনা রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে এই আলোচনার আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহি নাই, শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে আমার ঐ পূর্ববর্তী গ্রন্থখানিকে খানিকটা পরিমাণে বর্তমান গ্রন্থের অনুপূরকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থ-রচনায় অনেকের কাছে নানাভাবে ঋণী, সব ঋণের উল্লেখ করা সম্ভব নয়; তথাপি দু'একজনের নাম করিতে হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম.এ. সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুত চিন্তাহরণ

চক্রবর্তী, এম.এ. মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনার অংশ দেখিয়া দিয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা, এম. এ. পি. এইড-ডি মহাশয়ের সহিত আলাপ-আলোচনায়ও উপকৃত হইয়াছি। ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর কুঞ্জ-বিহারী দাস, এম.এ. ডি-লিট মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। মৈথিলী সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম.এ. ও অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা অণিমা সিংহ, এম.এ. মহাশয়ার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। হিন্দী-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীযুত কল্যাণমল লোঢ়া, এম.এ. ও অধ্যাপক শ্রীযুত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, এম.এ.। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্র, এম.এ. পি.এইচ-ডি, ডি-লিট মহাশয় তাঁহার কিছু কিছু সংগ্রহ ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়াছেন 'সাহিত্য সংসদে'র কর্ণধার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার উৎসাহ ও কর্মচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থখানি এত শোভনভাবে এত শীঘ্র কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। গ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন পরমপ্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য, এম.এ. ডি.ফিল; তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কোন ধন্যবাদ প্রকাশের অবকাশ নাই।

১০।৩৫বি, চারু এভেনিউ
কলিকাতা ৩৩
আষাঢ়, ১৩৭৭

বিনীত
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

একটি বিশেষ-জাতীয় দৃঢ়বন্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া বহু দিন ধরিয়া একটি জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গড়িয়া উঠিতে থাকে তখন বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, একটি-দুইটি থাকে মুখ্য ধারা,—তাহার সহিত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎস হইতে নানা ধারা আসিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। ধর্মমতের ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চলিতে থাকে সমন্বয় ও স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যখন বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসি, তখন কোন্‌টি যে মূলধারা, আর কোন্‌গুলি যে উপধারা তাহা স্পষ্ট চেনা শক্ত হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আমাদের শাক্তসাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই—তিনিই আবার দশমহাবিদ্যা-রূপে রূপান্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই আমরা কালিকা বা কালী-দেবীকে—শাক্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত অভিন্ন-রূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শাক্ত-ধর্ম ও -সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ সুবিধামতন ইঁহারাও মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও শ্রী- ও সম্পদ্-রূপিণী লক্ষ্মীর কথাও ভুলিলে চলিবে না। জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভৃতি দেবী সহজেই মূলদেবীর রূপভেদ বলিয়া গৃহীতা। সাহিত্যে অনুল্লিখিত বহু দেবীর পূজাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উল্লেখ আর না-ই করিলাম।

এই-সকল দেবীসম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ইঁহারা বহু নহেন, স্থান-কাল-পাত্রানুসারে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বহু হইয়া দেখা দিলেও ইঁহারা মূলতঃ এক; দ্বিতীয়রহিত এই সনাতনী মহাদেবী হইতে

সকল দেবী প্রসূতা,—মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই।[১] এই একের দৃষ্টি মূলতঃ উচ্চকোটির দার্শনিক এবং সাধকগণের দৃষ্টি হইলেও একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে জনসাধারণের মধ্যেও এই ঐক্যবুদ্ধির একটা অস্পষ্ট চেতনা দেখা যায়; ফলে ব্যাবহারিক জীবনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য দেবীগণের রূপ ও মহিমা যতই পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও ঐক্যবাদী; তাঁহাদের মুখেও ঐ এক কথা—একই মায়ের বিচিত্র লীলা!

পূর্বেই বলিলাম, এই একের দৃষ্টি হইল একটি দার্শনিক দৃষ্টি এবং সাধকের দৃষ্টি—অর্থাৎ একটি অনুভববেদ্য অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বদৃষ্টি। দার্শনিক দৃষ্টির ঝোঁক সর্বদা একের দিকে; বহুকে দেখিয়া-শুনিয়া বাছ-বিচার করিয়া মূলতত্ত্বের আবিষ্কার এবং সেই মূল একতত্ত্বের মধ্যেই বহুর সার্থকতা ব্যাখ্যা—ইহাই দার্শনিকের মূল কাজ। সাধক ত আরও অদ্বয়বাদী; সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক সত্য ব্যতীত দুই সত্যকে তিনি ত কখনও বিশ্বাসই করেন না। তাহা ছাড়া তাঁহার উপলব্ধিতে সত্য কালাতীত তত্ত্ব; দেশে কালে তাহার অনন্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশ মাত্র। সুতরাং সাধক বাহিরে দেবীকে যে রূপেই গ্রহণ করুন না কেন, অন্তরে তাঁহার এক অদ্বিতীয়া সনাতনী। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টি আবার একটু অন্য রকম; ইতিহাস একতত্ত্বকে কেবলই দেশ ও কালের বিভিন্ন অবস্থানে ভাঙিয়া ভাঙিয়া দেখিতে বুঝিতে চায়। সাধক তাই যে ক্ষেত্রে এক কি করিয়া বহু হইল এই রহস্যই উপলব্ধি করিতে চান, ঐতিহাসিক সেখানে বহু একত্রিত হইয়া কি করিয়া একের সৃষ্টি করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে চান। ইতিহাস তাই বলিবে ভারতবর্ষের দেবীতন্ত্রের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, সেই এক দেবী হইতেই বহু দেবী, বহু পূজাবিধি ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; বহু স্পষ্ট-অস্পষ্ট উৎসমূল হইতে আবির্ভূতা বহু দেবী, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পূজাবিধি, বহু উপাখ্যান; সেই দেবীগণের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বঙ্কিম গতিতে আসিয়া ঘটিয়াছে এক ধারার সহিত অন্য ধারার মিলন; তাহার সহিত আবার যুক্ত হইয়াছে আমাদের ক্রমবর্ধমান তত্ত্ববুদ্ধি—তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে মিলাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী। এই যে একীকরণের প্রক্রিয়া তাহা

[১] তুলনীয়ঃ

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ-সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

—চণ্ডী, ১ম চঃ ১ম অঃ

সমানভাবে চলিতেছেই; তাই এখনও যদি কোনও স্থানে কোনও বিশেষ-প্রকৃতি-যুক্তা গ্রাম্যদেবীর আবিষ্কার হয় তবে আমাদের তত্ত্ববুদ্ধি অমনই তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে 'মহাদেবী'র অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছে। বৈষ্ণব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শাক্ত-দর্শনকে অবলম্বন করিয়া এক আদিভূতা সনাতনীর ধারণা আমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট এবং দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তত্ত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টির দ্বারা ততই আমরা বিভিন্ন দেবীর ভিতরে যোগসাধনের দ্বারা আমাদের অন্বয়-প্রবণতাকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একান্ন পীঠের একান্ন দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীরূপে একান্ন জনই ছিলেন; বিষ্ণুকর্তৃক মহাদেবী সতীর মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ন খণ্ডে ভাগ করিয়া একান্ন পীঠে ছড়াইয়া দিবার উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া আমরা একান্ন পীঠের একান্ন দেবীকে এক করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই একান্ন দেবীকে যখন একবার একদেবীর অংশ করিয়া লইলাম তখন অনায়াসেই তাঁহারা একের সহিত অভিন্না হইয়া উঠিলেন; কারণ নিত্য এবং পূর্ণের অংশও তো নিত্য এবং পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবী মূলতঃ দশ দেবীই; সতীর পিত্রালয়ে গমনের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দশ দেবী এক মহাদেবীর দশাবস্থা হইয়া উঠিয়াছেন। কালী এবং দক্ষকন্যা সতী বা হিমালয়-কন্যা পার্বতী যে পৃথক্ দেবী—তাঁহাদিগকে এক করিয়া তুলিতে অর্বাচীন পুরাণগুলি যে কত উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা একটু পরেই করিব। তারা দেবী বৌদ্ধ দেবী বলিয়া পরিচিতা। অবশ্য এই বৌদ্ধ পরিচয়টাকে আমরা খুব বড় পরিচয় বলিয়া মনে করি না; কারণ এই বৌদ্ধ দেবী ও হিন্দু দেবী সবই বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় দেবী। দশমহাবিদ্যার কোন কোনও দেবী সম্ভবতঃ আদিম অধিবাসিগণের সামাজিক স্তর অতিক্রম করিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদির মারফতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহাদের স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। আবার আজকারের আমাদের সমাজজীবনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দশমহাবিদ্যার এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লব্ধ সত্যই যে একমাত্র সত্য তাহা বলিতে পারি না। সাধক যখন এই দশমহাবিদ্যাকে এক সত্যেরই বিভিন্ন অধিকারীর নিকটে বিভিন্ন রূপে স্ফুরণ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে সাধনা করেন তখন তাঁহাদের সেই সাধনাকে ভ্রান্ত বলিবার বিন্দুমাত্র ধৃষ্টতা পোষণ করি না।

পুরাণাদি খুলিলে দেখিতে পাইব, দেবী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মূর্তিতে পূজিতা। যেমন 'পদ্মপুরাণে' সৃষ্টিখণ্ডে দেখিতে পাই, বিষ্ণু সাবিত্রী দেবীকে পরম ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

সর্বগা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্বতোঽদ্ভুতা।
সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যং তন্ন বিনা ত্বয়া॥

তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্তব্যা ভূতিকামৈ র্বা তৎ প্রবক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ॥—১৭|১৮২-৮৩

'তুমি সর্বগা, সর্বভূতে দ্রষ্টব্যা, সর্বরকমে অদ্ভুতা; সৎ-অসৎ যাহা কিছু দৃশ্য তোমা বিনা কিছুই নয়। তথাপি যে-সকল স্থানে সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ-কর্তৃক তুমি দ্রষ্টব্য, অথবা ভূতিকামী ব্যক্তিগণ-কর্তৃক স্মরণীয়া সেই-সকল তোমার অগ্রে বলিতেছি।' এই বলিয়া বিষ্ণু দেবীর যে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে দেখি, দেবী পুষ্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা দেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমন্তে গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথবনে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কীর্তিমতী, বিল্বেশ্বরে বিল্বা, কর্ণিকপুরে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থান্বীশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহগিরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরী, শালগ্রাম-ক্ষেত্রে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতা, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণাক্ষে মহোৎপলা, গঙ্গায় মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্যবর্ধনে পাটলা, সুপার্শ্বগিরিতে নারায়ণী, ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মানসাচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী, মাধবীবনে সুগন্ধা, কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাম্বারে হরিপ্রিয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যানিবাসিনী, সহ্য-অদ্রিতে একবীরা, হরিশচন্দ্রে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমা দেবী, বৈদ্যনাথে অরোগা, মহাকালে মহেশ্বরী, পুষ্পতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যাকন্ধরে অমৃতা, মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরপুরে স্বাহা দেবী, বেগলে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতীর উভয় তটে দেবমাতা, মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্তিকেয়ক্ষেত্রে শঙ্করী, উৎপলাবর্তকে লোলা, সিন্ধু-সঙ্গমে সুভদ্রা, সিদ্ধবনে উমা, ভরতাশ্রমে অনঙ্গা লক্ষ্মী, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে তারা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমা দেবী, বস্ত্রেশ্বরে তুষ্টি, কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগায় কালী, অচ্ছোদে সিদ্ধিদায়িনী, বেণায় অমৃতা দেবী, বদরিকাশ্রমে উর্বশী, উত্তরকুরুতে ঔষধী, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা; এই দেবী কুমুদে সত্যবাদিনী, অশ্বত্থে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাস্যে সরস্বতী, সূর্যবিম্বে প্রভা,

মাতৃকাগণমধ্যে বৈষ্ণবী, সতীমধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্তমা, চিত্রে ব্রহ্মকলা ও সর্বশরীরিগণের শক্তি।[২]

একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা সব তালিকাটিই উদ্ধৃত করিলাম। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়, এই-জাতীয় তালিকাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এখানে স্থানের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল বিনা বাধায় উল্লিখিত হইয়াছে; আবার স্থানের তালিকার মধ্যে দেবতার কথা আসিয়াছে; দেবতার মধ্যে আবার বৃক্ষ-গুল্মের কথা আসিয়াছে, মাতৃকাগণ, সতীগণ, রমণীগণ—শেষ অবধি সর্বশরীরীর কথাও আসিয়াছে। ভারতবর্ষের যে-সকল স্থানের কথা এই তালিকায় উল্লিখিত রহিয়াছে তাহার সবগুলির স্পষ্ট নির্দেশ আজিকার দিনে সম্ভব নহে। তথাপি এ-জাতীয় তালিকার যথেষ্ট মূল্য আছে। বিভিন্ন পুরাণেই এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য না থাকিলেও মোটামুটি কতগুলি মিল রহিয়াছে। এই মিলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এ-কথা বলিতে পারি যে এই তালিকাগুলির মধ্যে জনপ্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিতা বহু দেবীর উল্লেখ পাই। এই দেবীগণের মধ্যে অনেক দেবীই মূলে স্বতন্ত্রা ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইঁহাদের উদ্ভবের বা অভিব্যক্তির ইতিহাস, ইঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, ইঁহাদের পূজাবিধি, ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কিংবদন্তী-উপাখ্যান অধিকাংশ স্থলেই পৃথক্; দার্শনিক শক্তিতত্ত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যখন আমরা স্থির বুদ্ধি লাভ করিতে লাগিলাম যে শক্তি কখনও মূলে এক বই দুই হইতে পারে না, তখন শক্তি-প্রতিমূর্তি দেবীরাও সব এক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে আমাদের তত্ত্বদৃষ্টি গড়িয়া উঠিল,—পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে যুগে যে সমাজবিধির ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা অভিব্যক্তি হোক না কেন, তাঁহারা শক্তি-রূপিণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রূপভেদ মাত্র।

পুরাণাদিতে যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিতা এবং পূজিতা দেবীগণের উল্লেখ পাই তেমনই বাঙলা ধর্মমঙ্গলগুলির মধ্যে দেব-বন্দনার ভিতরে আমরা বাঙলাদেশের বিভিন্নাঞ্চলে—বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিতা এবং পূজিতা বহু দেবীরও উল্লেখ পাই। এই তালিকার মধ্যে নানাপ্রকার মিশ্রণ ঘটিলেও ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্যকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি দেবীর প্রতিষ্ঠা ছিল ইহার ভিতর দিয়া তাহার একটা আভাস পাই।

[২] পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড; ১৭।১৮৪-২১১। এইরূপ তালিকা আরও বহু পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কতগুলি স্থান ও সেই স্থানের দেবীর নাম সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা মিল দেখা গেলেও তালিকাগুলি সর্বাংশে এক নহে।

মাণিক গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' উল্লেখ পাই, ফুলায়ে জয়দুর্গা, বৈতালে ঝক্ (ঝক্ বুড়ী), খপুতে খেপাই, আমতায় মেলাই, কালীঘাটে কালী, সোলায় রুক্মিণী, বিক্রমপুরে বিশালা (বিশালাক্ষী), বড়দায় বিশালা, রাজবলহাটে রাজ-বল্লভী, সিয়াখালায় বাসুলী, বেতায় সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা, হিঙ্গুলাতে (হিংলাজ) হিঙ্গুলাটেশ্বরী, কামরূপে কামাখ্যা (তু° কাঙরে কামেশ্বরী), ঢাকায় ঢাকেশ্বরী, আড়ুতে অর্পণা, কিরীটিকোণায় কিরীটীশ্বরী, যাজগ্রামে বিরজা, আশ্বিনকোটরায় অষ্টভুজা, সেনবাহিড়ে (?) সাপরূপা, খাতরে মহাকালী, পড়াশে ঘাঁটু দেবী, নাড়চায় সর্বমঙ্গলা, আনুড়ে বিশালা, মড়াগড়া গ্রামে নানে-শ্বরী, নাও গ্রামে দম্ভেশ্বরী, লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী, বুঞায়ে চণ্ডী, রঙ্গপুরে বিশালাক্ষী, মানপুরে মনসা, ছিরামপুরে ত্রিপুরাসুন্দরী, বেলায় চণ্ডী, ছাতনায় বাসুলী, তমলুকে বর্গভীমা, রায়খায় কালী, শালাঘাটে শুভা দেবী, শাটীনন্দে লক্ষ্মী, পলাশিতে পলাশচণ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ে ভাতারচণ্ডী (ভাণ্ডারচণ্ডী?), সর্মিখীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামে ভগবতী, ময়নাপুরে ষষ্ঠী। অন্য তালিকায়[৩] আরও দেখি, উডল্যায় উমা, জ্বালামুখে জয়কালী, ধলগড়ে ভীমা, সাগরসঙ্গমে উমা, ডিল্লিপে (?) জয়ন্তী, ঘাটশিলায় মহামায়া, বালিডাঙ্গায় বাড়েশ্বরী (?), মগড়ায় চণ্ডিকা, বামুনায় বাসুলী, লালপুরে কালী, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা, বেড়ায় বেড়াইচণ্ডী, মান্দারে বল্লভা, ডিকনিতে জয়দুর্গা, নাঙবাড়ে (নানুরে?) বাশুলি, তারামপুরে (?) জয়দুর্গা, নিমপুরের বনে নাচনচণ্ডী, ময়নায় ভদ্রকালী, ঢেকেরে (ঢেকুরে) শ্যামরূপা, শিমুলায় সর্ব-জয়া, জয়মঙ্গলকোটে জয়মঙ্গলা, আম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, এড়বারে (?) কালিকা, মুণ্ডযোগে মুণ্ডেশ্বরী, চাঁপাইতে বিষহরী, কেজায় ভুজঙ্গজননী কমলা, হাসনহাটিতে মনসা, নারিকেলডাঙ্গায় মনসা, মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌরী। এই তালিকায় উল্লিখিত বাসুলী, নানেশ্বরী, ঝক্‌বুড়ী, খেপাই, মেলাই, ঘাঁটুদেবী প্রভৃতি দেবীগণ যে গ্রাম-দেবী ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। নিমপুরের বনের নাচনচণ্ডী, পলাশির পলাশচণ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ের ভাতারচণ্ডী বা ভাণ্ডারচণ্ডীও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করি। বাঙলা-দেশে ত এইরূপ বিবিধ প্রকারের চণ্ডীর কিছু অভাব ছিল না। ওলাই চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, বসন চণ্ডী—দেশগাঁয়ে ছড়ান কতরকমের চণ্ডী! 'ভীমা' শব্দের দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে বটে[৪], কিন্তু তমলুকের বর্গভীমা কি সেই

[৩] ধর্মের বন্দনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৭০ নং পুঁথি।

[৪] পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥—১১।৫০-৫২

ভীমারই রূপান্তর না তমলুকের স্থানীয় দেবী? দুর্গা ও জয়দুর্গাকে একই দেবতা মনে হয় বটে, কিন্তু জয়দুর্গার একটি বিশেষ রূপ দেখিয়াছি। আমাদের নিজের গ্রামে (পূর্ববঙ্গে) আমরা জয়দুর্গার 'খোলা' (পশ্চিমবঙ্গের 'থান') দেখিয়াছি: গ্রামের প্রান্তে এই খোলা। দেবী অতি ভয়ঙ্করী, গভীর নিশীথে বলিসহ তাঁহার পূজার বিধান। তাঁহার কোন দিন কোনও মূর্তি দেখি নাই, প্রকাণ্ড কোনও বৃক্ষতলে মাটির ঘটে তাঁহার অধিষ্ঠান। 'তন্ত্রসার' প্রভৃতিতে ধৃত জয়দুর্গার ধ্যান ও পূজাবিধি দুর্গার ধ্যান ও পূজাবিধির সহিত এক নহে। দার্শনিকের নিকটে এবং সাধকের নিকটে ইঁহারা সবই আজ এক দেবী; উচ্চকোটির সমাজ-জীবনেও আজ ইঁহারা 'এক' রূপেই গৃহীতা এবং পূজিতা।

ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশের এই-সকল দেবীসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য বক্তব্যটিকে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি যে ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে শক্তি বা দেবীর উল্লেখ পাই তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারা পরমকৌতূহলজনকভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতরকার মুখ্য ধারাগুলিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে না পারিলে ভারতের শক্তিসাধনা ও ভারতের শাক্ত-সাহিত্যকেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যাইবে না; তাই আমরা এই মুখ্য ধারাগুলিকে মোটামুটিভাবে বুঝিয়া লইবার একটা চেষ্টা করিব।

সেই আলোচনারও পূর্বে বাঙলাদেশের শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনা সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙলা-দেশকে আজ আমরা যেমন করিয়া শাক্তধর্মের দেশ বলিয়া জানি, হাজার বৎসর পূর্বেকার বাঙলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শাক্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা বলিতে পারি না; তবে কতকগুলি শাক্ত-প্রবণতা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে আমাদের যে ধর্মের ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি আমরা বিশেষভাবে দুইটি দিক্ হইতে—প্রথমতঃ কতকগুলি দানলিপি এবং প্রশস্তিলিপি হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের মূর্তিশিল্প হইতে। এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহাতে গুপ্ত পাল সেন সাম্রাজ্যে বাঙলাদেশে শাক্তধর্মের অস্তিত্ব নানাদিক্ হইতে লক্ষ্য করিতে পারিলেও কোনো প্রাধান্যের কথা মনে করিতে পারি না। বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইলেও দেবীপূজারূপে শাক্তধর্মকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে একটি গৌণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন করিয়া এবং শক্তিকে অবলম্বন করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের মধ্যেই একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশে দেবীপূজার কাহিনী ও বিধিবিধান-সংবলিত যে কয়েকখানি পুরাণ-নামধেয় উপপুরাণ

পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; কিন্তু মোটামুটি-ভাবে এগুলিকে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লেখাও হইতে পারে।

এই-সকল পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আমরা যে বাঙলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃপূজাবিধি গড়িয়া উঠিতে দেখি, তাহা দ্বাদশ শতকের পূর্বে একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচয় বহন করে না। সংবৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই-সকল পূজা বিধেয়। গুহ্য তন্ত্রসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। শক্তিপূজা নিত্যপূজারূপে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বলিবার মতন আমাদের যথেষ্ট তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীর আবির্ভাব এবং পূজাপ্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রসারের ইতিহাস লক্ষ্য করি সেই-সকল দেবী সম্পূর্ণভাবে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিভূত্ব লইয়াই আসিয়া আবির্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী—অনেকাংশে চন্ডীমঙ্গলের চন্ডীও। প্রতিকূল বিদেশী রাজশক্তির নিষ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের নিম্নভাগ হইতে ইঁহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার যে প্রচন্ড চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে। যে ভক্তগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় দেবীগণের এই 'আপ্রাণ' আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতঃই চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই দেবীগণকে প্রাচীন মহা-দেবীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া ক্রমে তাঁহার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিতে। শাক্তধর্ম বাঙালীর মধ্যে ব্যাপক ধর্মরূপ গ্রহণ করিয়াছে খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে।

কিন্তু ইহার পূর্বেও স্পষ্ট একটা ধর্মমতরূপে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ না করিলেও বহু দিন হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সব অঞ্চলের তুলনায় বাঙলাদেশেই যে শাক্তধর্মের প্রাধান্য একথা অস্বীকার করা চলে না। কেরলা প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে শক্তিপূজার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু শাক্তধর্ম সেখানেও সমগ্র জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এমন করিয়া প্রভাবিত করে নাই। তন্ত্র পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই যে শক্তিসাধনা ও মাতৃ-পূজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীলগণের মন অধিকার করিয়াছে। এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে—সে উত্তর হইল, বাঙলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃ-তান্ত্রিকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক বা আর্যসংস্কৃতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্যেতর আদিম জাতিগণের

মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং আর্যগণের তত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক আর্যগণ সমাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্যেতর সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ-উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক এই তথ্যটিকে আমরা অতি সহজেই এত দিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এইজন্য যে, এই তথ্যটির মধ্যে একটি গূঢ়ার্থ নিহিত আছে। মানুষের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিলে আমরা বহু স্থলে দেখিতে পাই, নানা ব্যাবহারিক কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে যে জিনিসটি একটি বহুমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অর্জন করিয়া বসে। দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মানুষ্ঠানে রূপান্তর। প্রাচীন বৈদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা সত্য যে তাঁহাদের সমাজ-জীবনে অগ্নির প্রয়োজন অতিশয় ছিল, অগ্নি-প্রজ্বালন এবং প্রজ্বালিত অগ্নির সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অগ্নির এই বহু-প্রয়োজন এবং তৎ-হেতু বহুমূল্যই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৈদিক সমাজে অগ্নিকে একটি ধর্মমূল্য দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত অগ্নি এবং অগ্নি-প্রজ্বালনবিধি ও অগ্নিসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক যজ্ঞধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহার পরে ধর্মানুষ্ঠানরূপে তাহার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে নানা সূক্ষ্মগভীর অর্থ সংযোজিত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। আদিম আর্যেতর সমাজগুলির মধ্যে 'মা' কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। সামাজিক দিক্ হইতে আমরা দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল—ফলে সন্তানের পিতৃপরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত, মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়—এবং এই কারণেই মা পরিবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন, আর্যেতর এই জাতিগুলির আর্থিক জীবন নির্ভর-শীল ছিল মুখ্যভাবে কৃষির উপরে। এই কৃষিকর্মে বীজবপন হইতে ফসল-কাটা এবং গৃহে শস্যসংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী—তাহার ফলে আর্থিক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অনুভূত হইত। এইভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভ করিলেন তাহাই

এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল।

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মুখ্যভাবে আর্য-অধ্যুষিত দেশ নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ অধিক নহে—এবং এই কারণেই হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে দেখা দেয় নাই। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু আর্যপ্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ বৈদিক আর্যপ্রভাব বলিতে পারি না—একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দুপ্রভাব। এই হিন্দুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব। পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল—সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু-পুনরুত্থানের আভাস। এ পর্যন্ত শক্তিধর্ম ও মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণরূপে এখানে সেখানে প্রকট—মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর হইতে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল—এবং তাহার ফলেই হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার এত প্রসার।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, উপরি-উক্ত মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বা অনার্য একথা বলিবার যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেছি না। একটু পরেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব, প্রাচীনতম বৈদিক সূক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদিতে বিভিন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতেছি। তাহা ছাড়া আরও একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। যাহা কিছু অবৈদিক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। আর্যগণ সকলেই বৈদিক আর্য ছিলেন একথা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিবার মত তথ্য আছে কি? ইহা ব্যতীত পূর্বালোচিত মতটি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার প্রচলন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আরও বহু স্থানে এই-জাতীয় মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।

সামাজিক মাতৃতান্ত্রিকতা এবং মাতৃপূজার প্রচলন বিষয়ে আধুনিক কয়েক-জন নৃতত্ত্ববিদ্ যে-সকল নূতন তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীন কালে মাতৃদেবী ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রূহী দেবী, এশিয়া

মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্টের ইস্থার, আইসিস্ প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, ভূমধ্য-সাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্বতবাসিনী) দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্য-সাগরীয় এই-সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহু প্রাচীন নারীমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া কোন্ সময়ে এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে আদিম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল—এ-বিষয়েও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা মোটামুটি অনুমান করিয়া লইয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভূমধ্যসাগরীয় এই-সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই আনুমানিক সময়কার আরও কিছু কিছু মূল্যবান্ তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি কবর। এই কবর-খননের দ্বারা তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়িত কতকগুলি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কঙ্কালগুলি পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দুইটি কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল পুরুষের, একটি কঙ্কাল নারীর। আরও পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাশি শায়িত যে কঙ্কাল রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষটির বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে কবরে পাশাপাশি শায়িত এই কঙ্কালদ্বয় স্বামি-স্ত্রীর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে হয়ত সহমরণজাতীয় কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠতা তৎকালীন সমাজ-জীবনে মাতৃতান্ত্রিকতা হইতে পিতৃতান্ত্রিকতার দিকেই অধিকতর ইঙ্গিত দান করে। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যখন মাতৃপূজার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক মাতৃতান্ত্রিকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি এই-সকল তথ্য এবং যুক্তিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারি না।[৫]

আমি আমার পূর্বালোচনায় একথা বলিয়া আসিয়াছি যে, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব

[৫] এ বিষয়ে Gordon Childe-এর *Social Evolution* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাঙলাদেশে এই হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবর্জিতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলি বড় কথা নয়—বড় হইল দেহকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতি। এই সাধনপদ্ধতিগুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদ্ধ-ধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞা-উপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।

অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে এই একটি তান্ত্রিক ধারা প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে—তাহা স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও সুধীগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। আজকাল আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সন্ধান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাঙলাদেশ—হিমালয়-পর্বতসংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয়সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তন্ত্রবর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই-সকল কিংবদন্তীও আমাদের অনুমানেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্গ-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনাস্থান—নেপাল-ভূটান-তিব্বত-অঞ্চলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীতও পার্শ্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে

পারি। তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষট্‌চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্‌চক্র। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন—নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে হইলেন ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, 'ডাক' কথাটি তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। আমাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল 'গুহ্য-জ্ঞানসম্পন্না'; আমাদের বাঙলা 'ডাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; মধ্যযুগের নাথসাহিত্যের রাজা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না এই-জাতীয় 'ডাইনী' ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাকিনী' দেবী কোনো নিগূঢ়জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' নামে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভুটানে 'লাকিনী ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল-ভূটান-অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীরাই কি তন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে আপন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের অতিশয় প্রাধান্য। এই মন্ত্রতত্ত্বের বিভিন্ন দিক্‌ রহিয়াছে। কিন্তু সেই-সকল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না করিয়াও কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্ত্রের মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমরা বীজমন্ত্রের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বীজমন্ত্রগুলি সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব বা 'ওঁ' সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। হ্রীং ক্লীং হৈঁ ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কি-না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। এই বীজমন্ত্র ব্যতীত তন্ত্রের মধ্যে আমরা আর-এক রকমের মন্ত্রমালা পাই, এই মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক—ইহাদের কোনো অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এই অর্থহীনতাই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য। অবশ্য অর্থহীন মন্ত্র অথর্বাদি বেদের মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্ত্রে যে একাক্ষরী বীজমন্ত্রের এবং দ্ব্যক্ষরী মন্ত্রমালার বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত ভ্রমাত্মক হইবে যে, এগুলি আমাদের পূর্বোক্ত তান্ত্রিক অঞ্চলের কোনো প্রাচীন-কালে প্রচলিত ভাষার লুপ্তাবশেষ? আমরা সাধারণভাবে যাহাকে চীনাঞ্চল বা মহাচীনাঞ্চল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষরিত্ব বা দ্ব্যক্ষরিত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বাঙলাদেশের শাক্ত-তন্ত্র সম্বন্ধে এই সাধারণ তথ্যের আলোচনা ছাড়িয়া আমরা বাঙলাদেশে প্রচলিত দেবীপূজা বা মাতৃপূজার যে প্রচলিত বিচিত্র রূপ রহিয়াছে তাহাকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব আমাদের বর্তমান কালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি।

এই মাতৃদেবী বা শক্তিদেবীর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবীর প্রাচীন ধারা মুখ্যভাবে দুইটি : একটি হইল শস্যপ্রজননী এবং ভূতধারিণী পৃথিবী দেবীর ধারা, অপরটি হইল এক পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবীর ধারা, যিনি পরবর্তী কালে পার্বতী, গিরিজা, অদ্রিজা বা অদ্রিকুমারী, শৈল-তনয়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা। এই পার্বতীই হইলেন উমা। দেবীর এই পৃথিবীর ধারা এবং উমার ধারা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবীর বিচিত্র ইতিহাস

(ক) পৃথিবী-দেবী

ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি সেখান হইতেই পৃথিবীকে আমরা দেবীরূপে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত সভ্যতাকে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ পণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাক্-আর্য সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যে আমরা অনেকগুলি পাথরের স্ত্রীমূর্তি পাই। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই স্ত্রীমূর্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি মূর্তি মাতৃদেবী-মূর্তি এবং ইহারাই আমাদের পরবর্তী কালের অনেক মাতৃদেবী-মূর্তির প্রাক্-রূপ। পণ্ডিতগণ আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মূর্তির অনেক মূর্তিই হইল মাতা পৃথিবীর মূর্তি। শস্যোৎপাদিনী পৃথিবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীন কাল হইতে পূজিতা। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়দেশ হইতে একটি বৃক্ষ বাহির হইয়াছে; অন্ততঃ এই মূর্তিটি যে পৃথিবীরই মাতৃমূর্তি সে সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতই নিঃসন্দেহ।

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পৃথিবী-দেবী-মূর্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এই পৃথিবী-দেবী-মূর্তি শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য, একথা বলা যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বহু দেশেই মাতৃদেবীতে বিশ্বাস দেখিতে পাই, আর এই মাতৃদেবী সর্বত্র না হইলেও বহু স্থলেই হইলেন পৃথিবী-দেবী। প্রাচীন মেক্সিকোর যিনি মাতৃদেবী তিনি মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবী, তিনিই আবার পৃথিবী-দেবীও ছিলেন; তাঁহাকে অনেক সময় সম্বোধন করা হইত 'Tlalli Ilalli' বলিয়া,—ইহার অর্থ 'পৃথিবীর মর্ম'। প্রাচীন লেখক ট্যাসিটাস্ বলিয়াছেন, "Nearly all the Germans unite in worshipping Nerthus, that is to say, Mother Earth."[১]—অর্থাৎ প্রাচীন জার্মানগণ নের্থাস্ দেবীর পূজায় সমবেত হইত, এই দেবী ছিলেন মাতা পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীক মাতৃদেবী 'র্হী' (Rhea) পৃথিবী-দেবী ছিলেন; রোম্যান দেবী সিবিলিও (Cybele) মূলতঃ পৃথিবী-

---

[১] Briffault, *The Great Mothers,* Vol. III.

দেবীই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসিগণের পূজিতা বহু দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ইহার অনেক দেবীও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শক্তির প্রতীক মাতা পৃথিবী।

বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর মাতৃদেবীরূপে বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ। অবশ্য একটি জিনিস সেখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি; মাতা পৃথিবী ঋগ্‌বেদে স্বতন্ত্র-ভাবে কদাচিৎ স্তুতা হইয়াছেন, যেখানেই তিনি মাতা-রূপে স্তুতা তাহার প্রায় সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পিতা 'দ্যৌ'র সহিত একসঙ্গে দেখিতে পাই। এই দ্যাবা-পৃথিবীর স্তোত্র ঋগ্‌বেদে বহু স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পিতা 'দ্যৌ'র সহিত একসঙ্গে স্তুতা হইলেও পৃথিবী এই স্তবের মধ্যে তাঁহার মাতৃত্বের এবং দেবীত্বের মহিমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বৈদিক ঋষিগণ প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতা রূপেই পৃথিবীর স্তব করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করিয়াছেন: মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বলিয়াছেন,—'মাতা পৃথিবী মহীয়ং'—বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা (১।১৬৪।৩৩)।

অন্যত্র দেখিতে পাই—

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥
* * * *
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ (১।১৮৫।২, ১০)

পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবি, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।......আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।—রঃ দঃ

অন্যত্র ঋষি বলিয়াছেন, 'মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ', 'মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' বহু সূক্তে দেখিতে পাই, পিতা দ্যৌর সহিত মাতা পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রচুর শস্য দান করেন, প্রচুর অন্ন এবং ধন দান করেন। তাঁহারা যেন আমাদের সকল পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন, আমাদিগকে

যেন সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, শৌর্য-বীর্য, সন্তান এবং দীর্ঘায়ু দান করেন, তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ করিবার সময় এই দ্যাবা-পৃথিবীর নিকট হইতে আশীর্বাণী প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ঋষিকবিগণ যে পৃথিবী-মাতার সন্তান বলিয়া সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন সেই পৃথিবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকারের বাৎসল্য, সুকোমল স্নেহ, চিত্তের ঔদার্য এবং অসীম ক্ষমাগুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বৈদিক কবিগণের নিছক কবি-কল্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বৈদিক কবিগণের একটা ধর্মবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল,—পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রূপবৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রূপ,—সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে লুক্কায়িত অনন্ত প্রাণশক্তি—নিরন্তর অসংখ্যরূপে তাহার প্রকাশ—এই-সকল একত্র হইয়া মুগ্ধ কবিগণের চিত্তে একটা বিস্ময়-জনিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর দেবীমূর্তি। এইজন্যই বেদের ঋষি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নমস্কারই হইল শ্রেষ্ঠ বস্তু, আমি তাই নমস্কার করি এই পিতা দ্যৌ এবং মাতা পৃথিবীকে, এই নমস্কারের দ্বারাই দ্যৌ এবং পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে।—ঋক্, ৬।৫১।৮

বেদে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর মৃতকে এই জননী পৃথিবীকেই আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে; জননী পৃথিবীর নিকটেও প্রার্থনা করা হইয়াছে মাতার ন্যায় সস্নেহে এই মৃতকে সন্তানের ন্যায় রক্ষা করিতে। এ-বিষয়ে দুইটি ঋক্-মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতা-
মুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
* * *
উচ্ছ্বংচম্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ
সুপায়নাস্মৈ ভব সুপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং
ভূম ঊর্ণুহি॥ —১০।১৮।১০-১১

হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর, ইনি সর্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।—রঃ দঃ

ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে দেখিতে পাই, দ্যৌ-রূপ পিতার বর্ষাই হইল

রেতঃ, সেই বর্ষা-সিঞ্চনেই মাতা পৃথিবী তাঁহার গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের শস্য। বহু প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ভিতরেই আমরা দ্যৌ-পিতা এবং পৃথিবী-মাতায় বিশ্বাসের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতার আদিযুগ হইতেই আমরা প্রায় একটি ধর্মবিশ্বাসরূপে এই ধারণা বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই যে, বর্ষার ভিতর দিয়া দ্যৌ-পিতা মাতা পৃথিবীকে গর্ভদান করেন।[২]

আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যে এইরূপ একটি স্বামি-স্ত্রীভাব এ-বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীসদেশেও লক্ষ্য করিতে পারি। ইস্কাইলাসের লেখায় দেখি—

The pure sky yearns with love to wound the Earth,
The loving Earth yearns likewise to be wed,
And from the heavenly bridegroom showers descend
Upon the bride, who brings forth for mankind
The grazing cattle and Demeter's corn,
With precious moisture riping the fruits
To autumn fulness.

Danaides—Aeschylus

ইস্কাইলাস্ যেখানে 'O Zeus, and Earth, O gods who guard the city' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তখনও মনে রাখিতে হইবে এখানে 'Zeus' এবং বেদের 'দ্যুস্' কথা দুইটির উচ্চারণ ও লক্ষ্য উভয়ই এক।

বেদের এই দ্যাবা-পৃথিবী-রূপ পিতা-মাতার পরিকল্পনায় আর-এক দিক্ হইতে আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে পারি। সৃষ্টির ভিতর এই যে একটি সর্বজনীন পিতামাতার পরিকল্পনা দেখিতে পাইলাম, ইহা পরবর্তী কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শক্তির পরিকল্পনাকে জাগাইয়া দিয়াছে। বেদের দ্যাবা-পৃথিবী-রূপ পিতামাতার পরিকল্পনার ভিতরেই শিব-শক্তির দার্শনিক তত্ত্বের আভাস রহিয়াছে এমনতর কথা বলিলে অবশ্য একটু বেশি বলা হইল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটি 'জগতঃ পিতরৌ'র কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, একথা অস্বীকার করিতে পারি না।

জননী পৃথিবীর প্রসঙ্গে আমাদের আর-একজন প্রসিদ্ধা বৈদিক দেবীর কথাও স্মরণ করিতে হইবে, তিনি হইলেন অদিতি। ঋগ্‌বেদে অদিতিকে আমরা আদিত্যগণের[৩] জননী বলিয়া বর্ণিতা এবং স্তুতা হইতে দেখি। পরবর্তী কালে

[২] "....male divinity appears, sometimes descending from the sky. Male divinity is sometimes a sky-power fertilising Mother Earth."—*Encyclopaedia of Religion and Ethics,* by Hastings.

[৩] কোথাও ৬ জন, কোথাও ৭ জন, কোথাও ৮ জন আদিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইনি শুধু আদিত্যমাতা নহেন, ইনি দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্‌বেদের মধ্যেই দেখিতে পাই, এই অদিতিই হইলেন পৃথিবী, 'মহ্য মহদ্‌ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ।' (১।৭২।৯)। ঋগ্‌বেদে যেখানে অদিতি ও দিতি (পুরাণের আদিত্যমাতা ও দৈত্যমাতা এই দুই ভগিনী) উভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে অদিতিকে অখণ্ড বা সীমাহীন বিশ্ব এবং দিতিকে খণ্ড বা সীমাযুক্ত বিশ্বের অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদ (১৩।১।৩৮), তৈত্তিরীয় সংহিতা[৪] প্রভৃতিতেও অদিতিকে পৃথিবীর সহিত এক করিয়া দেখা হইয়াছে, এবং পরবর্তী কালে অদিতির পৃথিবী অর্থই প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে আসলে অদিতি হইলেন দ্যুলোকের জ্যোতিঃ, এইরূপে অদিতি 'দ্যুঃ'-এরই একটি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। 'দ্যুঃ'-এর স্ত্রীরূপ হইতেই অদিতি সম্ভবতঃ পৃথিবীর সহিত অভিন্না হইয়া উঠিয়াছেন। বেদ-পরবর্তী যুগে আমরা অদিতিকে দক্ষজননী—আবার দক্ষকন্যা উভয় রূপেই দেখিতে পাই। এই দক্ষকন্যা রূপেই কি তিনি গিয়া পরবর্তী কালের দক্ষকন্যা সতীর রূপান্তর লাভ করিয়াছিলেন?

ঋগ্‌বেদের ভিতরে পৃথিবীর মাতৃরূপের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে-সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণবিকশিতা মহিমময়ী মূর্তি দেখিতে পাইলাম অথর্ববেদের 'পৃথিবী-সূক্তে'র মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে,—

সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; সেই পৃথিবী যাহা কিছু ভূত—যাহা কিছু ভব্য—সকলের অধীশ্বরী (পত্নী)—সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুক। এই পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা—কত গমনশীলতা—কত সমতল,—নানা বীর্য কত ওষধি (১২।১।২); ইহার ভিতরে আছে সমুদ্র—আছে সিন্ধু—আছে জল—আছে অন্ন—আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচঞ্চল হইয়াছে তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত—যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূর্বকালে নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে, ১২।১।৫); এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, বসুন্ধরা—ইহাই প্রতিষ্ঠাস্থল; ইহা সুবর্ণ-বক্ষা, যাহা কিছু চলমান তাহাদের নিবেশিনী; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে; ইন্দ্র তাহার ঋষভ—এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ্ দান করুক।[৫] এই পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে (যস্যা হৃদয়ং

[৪] Keith. *The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

[৫] বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥—(১২।১।৬)

পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১।৮)। এই পৃথিবীর উপরে জলধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে—এই ভূমি আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১।৯)। এই ভূমি আমাদিগকে সেইভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে পুত্রকে (স নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ)। হে পৃথিবি, যাহা তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে —তাহাতেই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদিগকে পবিত্র কর—হে মাতা ভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান।[৬] বিশ্বের প্রসবিত্রী—ওষধিগণের মাতা ধ্রুবা ভূমি এই পৃথিবী, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী—শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী—এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব। যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি যে গন্ধ বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে,—যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ ভোগ করে,—সেই গন্ধের দ্বারা হে পৃথিবি, তুমি আমাকে সুরভি করিয়া তোল, কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।[৭] তোমার যে গন্ধ পুষ্করে (নীলোৎপলে) প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল—অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছিল), হে পৃথিবি, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরভিত কর, —আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।[৮] এই পৃথিবীতে আছে শিলা, আছে ভূমি, আছে প্রস্তর—আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষা সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার (১২।১।২৬)। হে পৃথিবি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির-বসন্ত—এই তোমার সুনিয়ত ঋতুগুলি—এই তোমার দিন-রাত্রি —ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক। যাহাতে অন্ন—যাহাতে ব্রীহিযব,—যাহার এই পঞ্চমানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষাপুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার (১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা যে সমাবেশ—আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বলিব (১২।১।৪৬), যাহা বলিব তাহা মধুময় বলিব; যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় করিবে; হে মাতা পৃথিবি, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সহিত, হে কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর।

অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃ-

[৬] যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥

[৭] যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥

[৮] যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥

মূর্তির চমৎকার বর্ণনা পাইলাম, পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এই ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতীয় সাহিত্যের ভিতরে আমরা পৃথিবীর যে মাতৃমূর্তি দেখিতে পাই, সেখানে কবি-কল্পনার সহিত একটি দৃঢ়মূল সহজ বিশ্বাস মিলিত হইয়া এই মাতৃমূর্তিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার মানসকন্যা সীতাকে ধরণী-দুহিতা করিয়া পৃথিবীর মৃন্ময়ী মূর্তিকে অপূর্ব চিন্ময়িত্ব দান করিয়াছেন। সীতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একটি আলঙ্কারিক বর্ণনা মাত্র নহে; বাল্মীকির নিকটে ইহা একটি সত্যবিশ্বাস, এবং সেই সত্যবিশ্বাসই ধরণীর মাতৃমূর্তিকে তাঁহার সাহিত্যে বাস্তবতা দান করিয়াছে। সীতা যেদিন ধরণী-মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন দেখিতে পাই—

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ॥

সীতার সর্বদেহে তখনও ক্ষেত্রের ধূলি মাখান ছিল; সে ধূলি কিরূপ? পদ্মরেণুর মত এবং তাহা শুভ। মা যেমন স্নেহের কন্যাকে নিজের নিকট হইতে অন্যত্র পাঠাইবার সময়ে শুভ পদ্মরেণু তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া সাজাইয়া দেন, পৃথিবী মা-ও সীতাকে সেইভাবে ধূলিরেণু-দ্বারা সাজাইয়া মানুষের ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সীতা নিজেও বনের ঋষিপত্নীগণের নিকটে নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী' তাঁহাকে দেখিয়া জনকরাজার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই সীতা আবার যেদিন অসহ শোকে দগ্ধ হইয়া ধরিত্রী মায়ের কাছে আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন,— 'তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি'—সেদিন মাতা ধরিত্রীও ব্যাকুল হইয়া দ্বিধাহত বুকে সীতাকে আবার টানিয়া লইয়াছিলেন। সীতার উপাখ্যান কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তাহা বলিবার কোনও উপায় নাই, কিন্তু বাল্মীকি ধরিত্রীকে মাতৃমূর্তিতে যে মানুষের প্রাণের কাছে একান্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া আনিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতরে মিথ্যা নাই কিছুই—সে জীবন্ত সত্য।

বাল্মীকি মুনির এই বিশ্বাস এবং বিশ্বাসজনিত কবিকৃতির প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই মহাকবি কালিদাসের ভিতরেও। 'রঘুবংশে'র মধ্যে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নির্বাসিত করিবার রাজাজ্ঞা জানাইয়া দিল তখন,—

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥

আকস্মিকভাবে বাতাহত হইয়া পেলবলতা যেমন তাহার সকল কুসুমের আভরণ ছড়াইয়া ফেলিয়া নিজের মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়ে সীতাও তেমনই আকস্মিক দুঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসুমসম অলঙ্কাররাজি চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়িলেন। কন্যার এই গভীর বেদনায় মা ধরিত্রী কিভাবে সাড়া দিলেন?

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব-
মত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥

সহসা ময়ূর নৃত্যত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল পুষ্পত্যাগ করিল, হরিণ অর্ধ-কবলিত কুশঘাস ফেলিয়া দিল; এমনই করিয়া সমস্ত বনভূমিতে সীতার বেদনায় ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবীর এই সজীব মাতৃমূর্তি ভারতীয় কবিমনে আধুনিক যুগেও ম্লান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'মাটির ডাক' এবং 'পত্রপুটে'র পৃথিবী-সম্বন্ধীয় কবিতার সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই একথার সাক্ষ্য দিবেন। শুধু উচ্ছ্বাসে আবেগে নয়, ধীর শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিয়াছে কবিচিত্ত ধরণীর এই মাতৃমূর্তির পদপ্রান্তে,—তাই দেখি, বিদায়ের সুর বাজিয়াছে যখন কবির চিত্তে তখন তিনি বলিতেছেন :

হে উদাসীন পৃথিবি,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

এই ত গেল কাব্যধারার কথা। অন্য দিক্ হইতে যদি বিচার করি তবে দেখিতে পাই, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।৩।৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। কতকগুলি পরবর্তী কালের উপনিষদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীকে শস্য ও সম্পদের দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সহিত এক করিয়া দেখা হইয়াছে। 'নারায়ণোপনিষদে' দেখিতে পাই, এই মৃত্তিকার পৃথিবীকেই দেবী বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রী—শ্রী বা লক্ষ্মী রূপে তিনিই স্তুতা এবং অর্চিতা। এখানে পৃথিবীর স্তবে দেখিতে পাই—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥
ভূমির্ধেনু ধরণী লোকধারিণী।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥

মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা।
মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্নুদ মৃত্তিকে।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্॥

'নারায়ণোপনিষৎ' প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করি না; কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, পৃথিবীর দেবীমূর্তি ক্রমান্বয়ে কি শ্রদ্ধা-ভক্তির আস্পদ হইয়া উঠিতেছিল।

পুরাণাদিতে ধরা লক্ষ্মীরই অপর নাম। বহু স্থানে আবার পৃথিবীকে মহা-শক্তি বা মহাদেবীরই একটি বিশেষ রূপ বলিয়া বর্ণিত দেখি। পৃথিবী আবার ভূ-শক্তি নামে বিষ্ণু-শক্তিরূপে খ্যাতা। আমরা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে যত বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ মূর্তিতেই বিষ্ণুর উভয় পার্শ্বে তাঁহার দুই শক্তির অবস্থান দেখিতে পাই, ইঁহারা হইলেন শ্রী এবং ভূ; কোথাও কোথাও আমরা তিনটি দেবীমূর্তি দেখিতে পাই, ইঁহারা হইলেন শ্রী, ভূ এবং নীলা। বিষ্ণুমূর্তির এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা বৈদিক সূর্যরূপী বিষ্ণুর একটা আভাস পাই, শ্রী এবং ভূ-শক্তি বোধহয় এখানে পৃথিবীরই সম্পদ্-শক্তি এবং প্রজনন-শক্তির পরিচয় বহন করে।

'কালিকা-পুরাণে' দেখিতে পাই পৃথিবী দেবী জগদ্ধাত্রীরূপে জনক রাজার নিকট দেখা দিয়াছিলেন (৩৭।২৫-২৮)। আবার পুত্র নরককেও পৃথিবী বলিয়াছেন,—'পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্' (৩৮।৬৩)। বহু পুরাণেই পৃথিবী-দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সহিতই এক করিয়া দেখা হইয়াছে। আমরা আমাদের মহাদেবী বা মহাশক্তিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর সহিত অভিন্ন করিয়া তাঁহার উৎপত্তি বা বিকাশের নানারূপ ঔপাখ্যানিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি দেবীর পূজাবিধি লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহার পৃথিবী-রূপের অনেক পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর মধ্যেও ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পৃথিবী-রূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মহীস্বরূপেও দেবী নিজেই স্থিতা।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।

এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবীর প্রকাশ ব্যতীত যখন কোথাও আর কিছুই নাই তখন পৃথিবী-স্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রণিধানযোগ্য উল্লেখ রহিয়াছে; দেবী বলিয়াছেন,—

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্পদম্॥

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥

"যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি করিবে তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট (ভ্রমরসদৃশ) রূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে বধ করিব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।" কিন্তু চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নিহিত আছে। পৃথিবীই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতীও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে দেখিতে পাই, মাতা পৃথিবী নানা ভাবে মধুর সহিত যুক্ত; পৃথিবী মধুমতী, মধুব্রতা, মধুদুঘা—তিনি মধুময়ী। এইরূপে মধুর সহিত যোগের ফলে সম্ভবতঃ পৃথিবীকে ভ্রামরী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'সরঘা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; 'সরঘা' শব্দের অর্থ মধুমক্ষিকা। এইভাবেই পৃথিবী ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার পৃথিবীর সহিত অভিন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন।

চণ্ডীতে আবার আমরা দেখিতে পাই,—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি॥

"হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা যত দিন না বৃষ্টি হয় তত দিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিপালন করিব; এইজন্য আমি শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাতি লাভ করিব।" শাক-শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শস্যদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা। এই শাকম্ভরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা'-বা 'অন্নপূর্ণা'-রূপে।

পৃথিবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার উদ্ভব হইয়াছে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এক শস্যদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। দুর্গাপূজা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের পূজা, এবং এই পূজা শারদীয়া পূজা বলিয়া খ্যাত। আমরা শরৎকালে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকর্তৃক দুর্গাপূজার উপাখ্যানের সহিত যুক্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবীর বোধনের সহিত আমাদের দুর্গাপূজাকে যুক্ত করিয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভগিনী অম্বিকার সহিত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা

হইয়াছে,—"তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, ভগিনী অম্বিকার সহিত তাহা সেবন কর! স্বাহা!" "অম্বিকা নামে ইহার ভগিনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইঁহার (রুদ্রের) এই ভাগ।" (৫।৩।৯)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার অম্বিকাকে রুদ্রের পত্নীরূপে দেখিতে পাইতেছি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং কাঠক-সংহিতায় আবার দেখিতে পাই এই অম্বিকাকেই 'শরৎ' বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ অম্বিকা)। এই শরৎ-রূপিণী অম্বিকার পূজাই হইল শারদীয়া পূজা। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শরৎকাল হইতে বাঙলা-দেশের শস্যঋতুর আরম্ভ; দেবীপূজার আরম্ভও তাই শরৎকালে। আমাদের শস্য-ঋতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপূজার কাল; শারদীয়া অম্বিকাপূজা-দ্বারা দেবীপূজার আরম্ভ; তার পরে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজায় বাৎসরিক দেবী-পূজার শেষ।

দুর্গাপূজার ভিতরেও দেখিতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল কি? দেবী সেখানে বিল্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার পরেই দেখি, দেবীর স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং পূজা হইল নবপত্রিকায়। এই নবপত্রিকা কি? একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধিয়া যে শস্য-বধূ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপত্রিকা। এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তী কালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপূজাবিধিতে দেখিতে পাই রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন ব্রাহ্মণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন লক্ষ্মী। নবপত্রিকার শস্যসমূহের দেবীর সহিত যোগের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; দেবী হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া হরিদ্রার দেবীত্ব, তিনি জয়রূপিণী বলিয়া জয়ন্তী, মানদায়িনী বলিয়া মানের সহিত তাঁহার যোগ; বিল্ব শঙ্কর-প্রিয় বলিয়া দেবীর স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছে; দেবী শোকরহিতা বলিয়া অশোকে তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়িনীরূপে দেবী ধান্যরূপা; দেবী অসুর-বিনাশকালে দাড়িম্ববীজের ন্যায় রক্তদন্তবিশিষ্টা হইয়া রক্তদন্তিকা নামে খ্যাতা —এইজন্য দাড়িম্বেও দেবীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥

"যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি করিবে তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট (ভ্রমরসদৃশ) রূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে বধ করিব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।" কিন্তু চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নিহিত আছে। পৃথিবীই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতীও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে দেখিতে পাই, মাতা পৃথিবী নানা ভাবে মধুর সহিত যুক্ত; পৃথিবী মধুমতী, মধুব্রতা, মধুদুঘা—তিনি মধুময়ী। এইরূপে মধুর সহিত যোগের ফলে সম্ভবতঃ পৃথিবীকে ভ্রামরী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'সরঘা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; 'সরঘা' শব্দের অর্থ মধুমক্ষিকা। এইভাবেই পৃথিবী ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার পৃথিবীর সহিত অভিন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন।

চণ্ডীতে আবার আমরা দেখিতে পাই,—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি॥

"হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা যত দিন না বৃষ্টি হয় তত দিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিপালন করিব; এইজন্য আমি শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাতি লাভ করিব।" শাক-শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শস্যদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা। এই শাকম্ভরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা'-বা 'অন্নপূর্ণা'-রূপে।

পৃথিবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার উদ্ভব হইয়াছে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এক শস্যদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। দুর্গাপূজা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের পূজা, এবং এই পূজা শারদীয়া পূজা বলিয়া খ্যাত। আমরা শরৎকালে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকর্তৃক দুর্গাপূজার উপাখ্যানের সহিত যুক্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবীর বোধনের সহিত আমাদের দুর্গাপূজাকে যুক্ত করিয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভগিনী অম্বিকার সহিত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রুদ্র-ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা

হইয়াছে,—"তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, ভগিনী অম্বিকার সহিত তাহা সেবন কর! স্বাহা!" "অম্বিকা নামে ইহার ভগিনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইঁহার (রুদ্রের) এই ভাগ।" (৫।৩।৯)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার অম্বিকাকে রুদ্রের পত্নীরূপে দেখিতে পাইতেছি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং কাঠক-সংহিতায় আবার দেখিতে পাই এই অম্বিকাকেই 'শরৎ' বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ অম্বিকা)। এই শরৎ-রূপিণী অম্বিকার পূজাই হইল শারদীয়া পূজা। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শরৎকাল হইতে বাঙলাদেশের শস্যঋতুর আরম্ভ; দেবীপূজার আরম্ভও তাই শরৎকালে। আমাদের শস্যঋতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপূজার কাল; শারদীয়া অম্বিকাপূজা-দ্বারা দেবীপূজার আরম্ভ; তার পরে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজায় বাৎসরিক দেবীপূজার শেষ।

দুর্গাপূজার ভিতরেও দেখিতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল কি? দেবী সেখানে বিল্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার পরেই দেখি, দেবীর স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং পূজা হইল নবপত্রিকায়। এই নবপত্রিকা কি? একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধিয়া যে শস্য-বধূ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপত্রিকা। এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তী কালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপূজাবিধিতে দেখিতে পাই রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন ব্রাহ্মণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন লক্ষ্মী। নবপত্রিকার শস্যসমূহের দেবীর সহিত যোগের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; দেবী হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া হরিদ্রার দেবীত্ব, তিনি জয়রূপিণী বলিয়া জয়ন্তী, মানদায়িনী বলিয়া মানের সহিত তাঁহার যোগ; বিল্ব শঙ্করপ্রিয় বলিয়া দেবীর স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছে; দেবী শোকরহিতা বলিয়া অশোকে তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়িনীরূপে দেবী ধান্যরূপা; দেবী অসুরবিনাশকালে দাড়িম্ববীজের ন্যায় রক্তদন্তবিশিষ্টা হইয়া রক্তদন্তিকা নামে খ্যাতা —এইজন্য দাড়িম্বেও দেবীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং

আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদি-মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিলিয়া আছে।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, পৃথিবীতে দেবী-বুদ্ধি কেবল আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসেই একটা সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে নাই, আমাদের ভারতীয় সাহিত্যবোধকেও তাহা বিভিন্ন যুগে প্রভাবিত করিয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই ভাবটি আমাদের জাতীয় মানসে পরিপালিত ও পরিশোধিত হইয়া ইহা আমাদের ঐতিহ্যেরই একটি বড় উপাদানরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের উনবিংশ শতকের স্বাদেশিকতা-বোধের জাগরণের মধ্যেও এই ঐতিহ্যের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি; শক্তিবাদ-প্রভাবিত আমাদের উনবিংশ শতকের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া পরে আমরা যখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব তখনই এ-সকল বিষয় আমরা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

(খ) পার্বতী উমা

পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া দেবীর ক্রমবিকাশের ধারাটি আলোচনার পরে আমরা পার্বতী উমার ধারাটির আলোচনা করিতে চাই। উমা আমাদের চিত্তে সত্য সত্যই বহুশোভমানা। কখনও তিনি তাঁহার অতসীকুসুমবর্ণাভা দীপ্তিতে মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকান্তিতে আমাদের মাটির ঘরের স্নেহের দুলালী—আদরিণী কন্যা। এই শৈলসুতা পার্বতী হিমালয়ের কোন্ বিদূর প্রান্তভূমিতে নবজলদশব্দে ঈষদুদ্ভিন্ন রক্ত-কান্তি শস্যাঙ্কুররূপে প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, তখনকার দিক্‌সমূহের প্রসন্নতায় ধূলিহীন বায়ুপ্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি এবং শঙ্খনাদের দ্বারা এই দেবীর আবির্ভাব স্বাগত করিয়াছিলেন, কেহই সেকথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভূমিতে আজ আর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, আজ শুধু দূর হইতে বুদ্ধির সাহায্যে সম্ভাবনা-বিচার।

এ-বিষয়ে প্রথমেই একটি সংশয় উপস্থিত করিতেছি। উমা শব্দটি কি সংস্কৃত শব্দ? ইহার অর্থ কি? অভিধানে ইহার স্পষ্ট কোনও প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করা হয় নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশই মনগড়া। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আর 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা। আবার 'মা' শব্দের অর্থ 'মননকারী'ও করা হইয়াছে; যিনি শিবকে (পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা। 'মা' শব্দের 'পরিমাণ করা' অর্থও লওয়া যাইতে পারে; শিবের যিনি পরিমাপক অর্থাৎ যাঁহার ভিতর দিয়া অপরিমেয় শিব সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রূপে পরিমিত হন সেই

শক্তিরূপিণীই হইলেন উমা। আমাদের কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' উমা অর্থে শিবের শ্রীই গ্রহণ করিয়াছেন।—

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার॥

শিবায়নকার রামকৃষ্ণ আবার আরও মজার ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কালে।
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে॥

কবি কালিদাস কিন্তু অন্য কথা বলিয়াছেন। মদনভস্মের পরে শিবকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পার্বতী হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গে গমন করিয়া একাকিনী কৃচ্ছ্র-তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন; স্নেহের দুলালী কন্যার নবযৌবনে এই তপঃ-কৃচ্ছ্রতা মায়ের অন্তরে আঘাত করিল; তিনি কন্যাকে বলিলেন, 'উ মা'—'ওহে, তোমাকে দেখিলে আমার কষ্ট হয়—তুমি আর এই তপস্যা করিও না।'—

তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না
বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥

বন্ধুজনেরা স্বজনপ্রিয়া তাহাকে তাহার কুলোপাধি অনুসারে পার্বতী বলিয়া ডাকিতেন, পরে 'উ—ওহে, মা—তপস্যা করিও না'—এই বাক্য দ্বারা সে মাতা-কর্তৃক তপস্যা হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সেই সুমুখী উমা আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

এখানে একটি তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে: উমা নামটি হিমালয়-দুহিতার মূল নাম নহে, মূলে তিনি পার্বতী, গিরিজা প্রভৃতি নামেই খ্যাতা ছিলেন; যেমন করিয়া হোক, উমা নামটি তাঁহার সম্বন্ধে পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্য-চমৎকৃতি বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু উমা শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'কালিকা-পুরাণে' 'কুমার-সম্ভবে' প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি মাত্র দেখিতে পাই।—

যতো হি তপসে পুত্রি বনং গন্তুং চ মেনকা।
উ মেতি তেন্ সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী॥

পুরাণাদিতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে-সব ব্যাখ্যায় তত্ত্ব-গভীরতা যাহাই থাকুক, ব্যুৎপত্তিগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না। 'বরাহ-পুরাণে' বলা হইয়াছে,—পূর্বে নারায়ণ একা ছিলেন, এই হরির পরে আর কিছুই ছিল না। তিনি একা একা কখনই রতি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এইরূপ দ্বিতীয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধ্যাত্মিকা চিন্তা হইল; এই চিন্তা অভাব-সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সন্নিভা। তিনি তখন দ্বিধাভূত

হইলেন—এই দ্বিধাভূত রূপই হইল উ-মা রূপ ; এই উ-মাই একাক্ষরীভূত হইয়া উমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং এই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

পূর্বং নারায়ণস্ত্বেকো নাসীৎ কিঞ্চিদ্ধরে পরম্।
সৈক (?) এব রতিং লেভে নৈব [illegible]ৎ॥
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্চিন্তা বুদ্ধ্যাত্মিকা বভৌ।
অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণভাস্কর-সন্নিভা॥
তস্য অপি দ্বিধা-ভূতা চিন্তাভূদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
উমেতি সংজ্ঞয়া যত্তৎ সদা মধ্যে ব্যবস্থিতা॥
উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসর্জেমাং মহীন্তদা।

ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্রুতি—'স একাকী নৈব রেমে' প্রভৃতির সহিত শিব-শক্তি-তত্ত্বকে মিলাইয়া দিয়া একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র। উমা কথাটিকে অনেকে 'অ-উ-ম'-জাত ওঁ বা প্রণবেরই রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রণবই গায়ত্রীর বাচক, আর গায়ত্রীই ভর্গরূপিণী আদিশক্তি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন—

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, "উমার স্বরূপ—ওঁ মা।" স্বমত পরিপোষণের জন্য উমা শব্দের যিনিই যে ব্যাখ্যা দিন না কেন, কোনও ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে ; উমা শব্দের ব্যাখ্যার এত বৈচিত্র্যই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়।

এই প্রসঙ্গে পার্বতী নামটিকেও একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। পার্বতী শব্দটিকে আমরা পর্বততনয়া এই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ করিয়া থাকি। মূলে শব্দটির এই অর্থ ছিল না। পর্বত-সম্বন্ধীয়া এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার বেদে পাওয়া যায়। 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' পর্বত-স্বরূপা এই অর্থে পার্বতী ও পর্বতপুত্রী এই অর্থে পার্বতেয়ী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই (১।৫।১৫, ১৭)। সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণে পর্বত-পুত্র এই অর্থে দক্ষকেই 'পার্বতি' বলা হইয়াছে (৪।৪)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পর্বতে আছে বা পর্বত-সম্বন্ধীয় এই অর্থ হইতেই পরে পর্বত-পুত্র বা পর্বত-কন্যা এই অর্থের বহুল প্রচার দেখা দিয়াছে। আমরা পরে দেখিতে পাইব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যেখানে চণ্ডীকে পার্বতী বলা হইয়াছে সেখানে পার্বতী পর্বত-কন্যা নহেন, পর্বতস্থিতা বা পর্বতবাসিনী। এ-তথ্য-গুলির উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, আমাদের দেবী পার্বতীও হয়ত মূলে পর্বত-কন্যা পার্বতী নহেন, তিনি পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা পর্বতবাসিনী দেবী বলিয়া পার্বতী। পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে পুরাকালে আমরা বহু দেশেই এইরূপ পার্বতী-দেবীর (Mountain-goddess) উল্লেখ পাই।

এই পার্বতী উমাকে আমরা দেবীরূপে প্রথম কখন কিভাবে পাইয়াছি তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে দেবীকেই আমরা প্রথম কিভাবে কোথায় পাইয়াছি সেই কথাটির একটু আলোচনা করিতে হয়। সাধারণতঃ বর্তমান কালের দেবীপূজা-বিধানে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তকেই দেবীর প্রাচীনতম মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই দেবীসূক্ত হইল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫শ সূক্ত। সূক্তটির মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কোনও মাতৃ-দেবীর উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করি না; বিশেষ একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারাই সূক্তটিকে পরবর্তী কালের শক্তিদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দেবীসূক্তটি হইল অম্ভৃণ ঋষির বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তি। স্বরূপ-প্রতিষ্ঠার ফলে তিনি ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছেন; সেই ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য লাভের ক্ষণে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বিশ্বভুবন চরাচরের যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম—অতএব সবই তিনি। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন,—"আমি রুদ্র বসু আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-অগ্নি এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা, এবং ভগ নামক দেবতাগণকে ধারণ করি; যজ্ঞাদির জন্য হবিষ্মান্ যজমানকে আমিই যজ্ঞফলরূপ ধন বিধান করিয়া থাকি। আমিই জগতের একমাত্র অধীশ্বরী, আমি ধনসমূহের দাত্রী; আমি যজ্ঞাঙ্গের প্রথমা—জ্ঞানরূপা; বহুভাবে অবস্থিতা, বহুভাবে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, এ-সকল আমাকর্তৃকই সাধিত হইতেছে; এইরূপে যে আমাকে বুঝিতে না পারে সে-ই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমিই স্বয়ং এই সব বলি (উপদেশ করি), দেবতা এবং মানবগণ-কর্তৃক ইহাই সেবিত হয়; যাহাকে যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে উন্নত (উগ্র) করিয়া তুলি,—তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা করি। ব্রহ্মদ্বেষী হননযোগ্যের হননের নিমিত্ত আমিই রুদ্রের জন্য ধনুতে জ্যা আরোপণ করি; আমিই জনগণের জন্য সংগ্রাম করি; আমিই দ্যুলোক এবং ভূলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। এই সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমিই প্রসব করি; ইহার উপরে আমার যোনি—জলে—অন্তঃসমুদ্রে (সায়নমতে সমুদ্র এখানে পরমাত্মা, জল ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি)। এইজন্যই বিশ্বভুবনকে আমি বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি; ঐ দ্যুলোককেও আমিই দেহদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। আরভমান বিশ্বভুবনকে আমিই বায়ুর ন্যায় প্রবর্তিত করি, আমি দ্যুলোকেরও পর, আমি পৃথিবীরও পর—ইহাই আমার মহিমা।"[১]

পরবর্তী কালের শক্তিতত্ত্বের সহিত এই সূক্তটির চমৎকার মিল বলিয়াই

[১] অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি ইত্যাদি, (১০।১২৫।১-৮)।

সম্ভবতঃ এই সূক্তটি শক্তিপূজা এবং শাক্ত-সাধনার ক্ষেত্রে এমন বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। সূক্তটিতে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমাই খ্যাপিত হইয়াছে, তদিচ্ছায় এবং তচ্ছক্তিতেই সব কিছু সৃষ্ট ও সাধিত হইতেছে। সূক্তটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি, শক্তি ও শক্তিমান্ অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবর্তী দেবী বা শক্তির ইহাই বীজরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী কালে বিকশিত শক্তিতত্ত্বের দৃষ্টিতে সূক্তটির চমৎকার ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও ইহার ভিতরে শক্তি-আরাধনা বা দেবী-আরাধনার কোনও কথা নাই।

বৈদিক আর একটি সূক্তের সহিতও পরবর্তী দেবীকে যুক্ত করা হয়, তাহা হইল ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত (১০।১০।১২৭)। সূক্তটি এই,—'আগমনকারিণী দেবী রাত্রী বহুদেশে প্রকাশমানা হইয়া (সর্বকিছু) বিশেষরূপে দেখিলেন; সকল শ্রী ধারণ করিলেন। অমর্ত্যা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত করিলেন—নীচু এবং উঁচু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ করিলেন। আগমনকারিণী দেবী ভগিনী উষাকে নিরস্কৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রাত্রী আজ আমাদের (প্রতি প্রসন্না হউন)—যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান করি—যেমন বৃক্ষে পক্ষিগণ বসতি করে। গ্রামগুলি সুখে শয়ন করে, পদযুক্ত (প্রাণিসমূহ) সুখে শয়ন করে, পক্ষিগণ শয়ন করে; অর্থিগণ এবং শ্যেনসকলও সুখে শয়ন করে। হে রাত্রি, বৃষী ও বৃককে দূর কর, তস্কর দূর কর; তাহার পরে আমাদের নিকট 'সুতরা' (সুখে ত্রাণ করে যে) হও। সর্ববস্তুতে কৃষ্ণবর্ণে ব্যক্ত তম আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হে উষা, যা কিছু ঋণের ন্যায় তাহা দূর কর। হে দ্যুলোক-দুহিতা, তোমাকে (দুগ্ধবতী) গাভীর ন্যায় কাছে গিয়া প্রসন্না করিতেছি; আমরা জয় করিব; হে রাত্রি, আমাদের স্তব গ্রহণ কর।'[২]

ঋগ্বেদের এই রাত্রি-সূক্তটি কি করিয়া পরবর্তী কালে মাতৃপূজার দেবীর সঙ্গে মিলিয়া গেল তাহার ইতিহাসও এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি না। ঋগ্বেদে রাত্রির স্তব আরও আছে।[৩] শুক্লযজুর্বেদে দ্যুলোক-ভূলোক অন্ধকারে ভরিয়া দেয় যে রাত্রি তাহার স্তুতি করা হইয়াছে (৩৪।৩২)। অথর্ববেদে একাধিক স্থলে রাত্রির স্তব দেখিতে পাই। একাষ্টকা (মাঘকৃষ্ণাষ্টমী) রাত্রির নিকটে প্রার্থনা দেখি।

যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী॥—(৩।১০।২)

অথর্ববেদের ১৯।৪৭।১-২, ১৯।৪৯।১, ৪, ৮ প্রভৃতি সূক্তে আমরা বিভিন্নভাবে রাত্রির স্তব দেখিতে পাই। আবার পক্ষের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের রাত্রি

[২] রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেবাক্ষভিঃ
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত॥ ইত্যাদি।

[৩] হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং, ইত্যাদি (১।৩৫।১)

যথা, সিনীবালী (দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), কুহূ (নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), রাকা প্রভৃতির স্তব ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে ঋগ্‌বেদোক্ত প্রসিদ্ধ রাত্রি-সূক্তটি দেবীর সহিত যুক্ত হইয়া গেল কেন? পরবর্তী কালে অবশ্য দেবীর সহিত যুক্ত করিয়া রাত্রি-সূক্তের নানা গভীরার্থক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাইতেছি; এ-ব্যাখ্যাগুলি দেবীর সহিত রাত্রি-সূক্তের রাত্রির যুক্ত হইয়া যাইবার ফল মনে করি। রাত্রি-সূক্তের মধ্যে অবশ্য একটি জিনিস লক্ষ্য করি; প্রথম তিনটি সূক্তের মধ্যেই রাত্রিকে 'দেবী' রূপে বর্ণিত দেখি। বেদের মধ্যে যাহাই দ্যোতনশীল তাহাই 'দেব', যাহা দ্যোতনশীলা তাহাই 'দেবী'। রাত্রিও সেই অর্থেই বেদে দেবী। কিন্তু এই 'দেবী'র সূত্র ধরিয়াই কি রাত্রি দেবী মাতৃদেবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন? 'সাম-বিধান-ব্রাহ্মণে' অবশ্য রাত্রিকে একেবারে কন্যারূপিণী, শিখণ্ডিনী (ময়ূরপুচ্ছভূষণা), পাশহস্তা যুবতী কুমারী রূপেই দেখিতে পাই (৩।৮।২)।[৪] 'সাম-বিধান-ব্রাহ্মণ' খুব প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ নহে। পুরাণে ও তন্ত্রে এই রাত্রি-দেবীর নানা প্রকার তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। 'দেবী-পুরাণে' আছে—

ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা॥[৫]

এখানে রাত্রির প্রধান দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি; প্রথমতঃ রাত্রি 'ব্রহ্মমায়াত্মিকা', দ্বিতীয়তঃ রাত্রি 'পরমেশলয়াত্মিকা'। এই রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন 'ভুবনেশ্বরী'। তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাই শিব-শক্তি-তত্ত্বকে স্থানে স্থানে দিবা-রাত্রি-তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেখানে লয়াত্মিকা রাত্রিই শক্তি। 'দেবী-পুরাণে' আছে—

দিবসোঽহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে।
দিবসোঽহং মুহূর্তশ্চ ত্বং সন্ধ্যাকাল এব চ॥—১২৭।১৮৩

আবার দেবীর বিভিন্ন নামের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দেবী

সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতী তথা।—১২৭।১৭২

তন্ত্রমতে 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৮৭ সংখ্যক মন্ত্রকে রাত্রিসূক্ত বলা হয়; ইহার মধ্যেই দেখিতে পাই দেবীকে 'কালরাত্রির্মহারাত্রি-র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে 'কালরাত্রি' হইতেই পরবর্তী কালে কালীর উদ্ভব হইয়াছে।

বেদের মধ্যেই দেবীর সন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আসলে দেবী হইলেন বৈদিক যজ্ঞাগ্নি। অগ্নিই সকল শক্তির উৎস—এইজন্য অগ্নি শক্তি-

[৪] রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্, ইত্যাদি।

[৫] স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ৪২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত।

রূপিণী দেবী। ঋগ্‌বেদের—

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো
বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি
স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ॥—৩।১৫।১

হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্ এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকিব।—রঃ দঃ

এই মন্ত্রটি সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন,—'ঋগ্বেদে অগ্নিরূপিণী দুর্গাদেবীকে শত্রুবধকারিণী ও রাক্ষসহন্ত্রী বা অসুরনাশিনী বলা হইয়াছে।' ইহার সহিত অনেকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'নারায়ণীয় উপনিষদে'র 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং' প্রভৃতি শ্লোকটিরও উল্লেখ করিয়া দুর্গাই যে যজ্ঞাগ্নি এ-কথা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মুণ্ডক-উপনিষদে'র যজ্ঞাগ্নির সপ্ত-শিখাকেই কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি সপ্তনাম দানের কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, "এই-সকল সূক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম সংক্ষেপে দেবী-সূক্তেও হইয়াছে, পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তারে হইয়াছে। অতএব দুর্গাতে যে শক্তি অগ্নিতেও সেই শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। অগ্নি তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন।"[৬] দেবীর বিল্বশাখায় বোধন-বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, "অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি; এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নি-স্বরূপা। অগ্নি সকল শক্তির প্রতিনিধি। অরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।"[৭]

যেটুকু তথ্য (এবং অধিকাংশই ব্যাখ্যা) অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাগ্নিকে দুর্গা বলা হয় সে সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে খুব প্রমাণসহ মনে হয় না; অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাগ্নি হইতেই পৌরাণিক দুর্গা দেবীর উৎপত্তি এমন কথা বলিবার যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক মহা-দেবীর মধ্যে বহুযুগের বহুধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে, এই বহুধারার মধ্যে দেবীর যজ্ঞাগ্নিরূপের একটি অস্পষ্ট ধারাও আসিয়া দেবীকে পুষ্ট করিয়াছে। আমরা 'দেবী-পুরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাই, বহ্নিস্থা দেবীকেই দেবতাগণের মধ্যে

[৬] পূজা-পার্বণ, ৯২ পৃঃ।
[৭] ঐ, ১২৯ পৃঃ।

সর্বোত্তমা বলা হইয়াছে, এবং কুণ্ডস্থা দেবীই মানুষকে বিজয়, ভূমিলাভ, প্রিয়ত্ব, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পুত্রাদি দান করিয়া থাকেন।

সর্বেষামেব দেবানাং কথিতা দেবী চোত্তমা।
বিশেষেণ তু বহ্নিস্থা আয়ুরারোগ্যদা মতা॥
বিজয়ং ভূমিলাভন্তু প্রিয়ত্বং সর্বমানবান্।
বিদ্যা-সৌভাগ্য-পুত্রাদি কুণ্ডস্থা সংপ্রযচ্ছতি॥[৮]

এই কুণ্ডস্থা বহ্নিরূপিণী দেবীতেই ঘৃতধারা দিয়া বা গৃহগাত্রে ঘৃতধারা দিয়া 'বসুধারা'র ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দেবী-পুরাণ'-নামক উপপুরাণের রচনাকালেও বহ্নিরূপিণী দেবীর ধারণা ছিল। প্রচলিত দুর্গা-পূজা-বিধিতেও যজ্ঞ একটি প্রধান অনুষ্ঠেয় অঙ্গ বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। বিদ্যাপতি-সঙ্কলিত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'[৯]-নামক দুর্গাপূজা-বিধিতে যজ্ঞ-বিষয়ক আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীপূজার বিভিন্ন অঙ্গ বর্ণনার পরেই দেখিতে পাই ইহার কোন্ অঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা কোন্ যজ্ঞের ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা। সমস্ত গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয় তান্ত্রিক দুর্গা-পূজা-বিধি যেন বৈদিক বিবিধ যাগ-যজ্ঞেরই পরিবর্তে অনুষ্ঠেয় ধর্মকার্য। কিন্তু এই-সব সত্ত্বেও প্রচলিত দুর্গাপূজা বৈদিক 'শরৎকালীন যজ্ঞ' মাত্র, একথা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বা যজ্ঞাগ্নির বর্ণনা মধ্যেই আমরা দেবীকে খুঁজিয়া পাই এমন কথা স্বীকার করিব না।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৈদিক সাবিত্রী দেবীর কথাও উল্লেখ করিতে পারি। বেদে অবশ্য সাবিত্রী দেবী বলিয়া কোনও দেবী পাই না—সাবিত্রী দেবীকে বেদ-অবলম্বনে পরবর্তী কালে গড়িয়া লইয়াছি। এই সাবিত্রীকে বৈদিক সরস্বতী এবং গায়ত্রী এই উভয় দেবীর মিশ্রণজাত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক সরস্বতী মূলতঃ নদী—পরে সরস্বতী-নদী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী—পরে তিনি বাগ্দেবী। এক সময়ে দেবগণের হাত এড়াইবার জন্য তিনি সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি সিংহবাহনা। সিংহবাহনা সরস্বতীমূর্তি বহু পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন সরস্বতীর সিংহবাহনকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের পরবর্তী কালের মহাদেবীও সিংহবাহনা হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা হোক, বাগ্দেবী সরস্বতীই পরবর্তী কালে বেদমাতা-রূপে কীর্তিতা হইলেন। জ্ঞানরূপা জ্যোতির্ময়ী বাগ্দেবী সরস্বতীই আবার গায়ত্রীর সহিত মিশিয়া গেলেন। গায়ত্রী মূলে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

[৮] বঙ্গবাসী সং, ২৫।৪, ৫
[৯] ঈশানচন্দ্র শর্মা অনূদিত ও সম্পাদিত।

মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে লিখিত, তাই ইহা গায়ত্রী মন্ত্র। মন্ত্রের অর্থ হইল—'সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের (জ্যোতির) ধ্যান করি, তাহা আমাদের ধীকে প্রচোদিত অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করুক।' এই ভর্গ বা জ্যোতিঃকেই ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে গায়ত্রী তাই জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে দেখা দিলেন। সরস্বতীকেও জ্যোতির্ময়ী দেবী বলিয়াই গ্রহণ করা হইল; কারণ, ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন সরস্-শব্দের মূল অর্থই জ্যোতিঃ, সুতরাং যিনি জ্যোতির্ময়ী শক্তি তিনিই ত সরস্বতী—তিনিই আবার গায়ত্রী। এইভাবে সরস্বতী ও গায়ত্রী মিলিয়া গেলেন; দেখা দিলেন পরম সত্যরূপ সবিতার এক পরমজ্যোতির্ময়ী শক্তি—তিনিই আমাদের সাবিত্রী।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহা সবই পরবর্তী কালের মিশ্রণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার। ইহার ভিতর হইতে কোনও ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া শক্ত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট করিয়া উমার উল্লেখ পাই প্রথমে 'কেন'-উপনিষদের মধ্যে। এই স্থানে আমরা উমার আবির্ভাবের সহিত ইন্দ্রের একটা যোগ দেখিতে পাই, ইন্দ্রই এই দেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভাব প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কেন-উপনিষদের এই দেবীর সহিত আমরা ইন্দ্রের সহিত যুক্ত দেবীর স্পষ্টতম উল্লেখ লক্ষ্য করিতে পারি অথর্ববেদের মধ্যে। আমার মনে হয় দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই-ই প্রথম। এখানে দেবী সম্বন্ধে একটি সূক্তে চারিটি পদ দেখিতে পাই।—

সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকৌ
ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান
সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা॥
যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে
ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী ... ...॥
রথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে
বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে।
ইন্দ্রং যা দেবী ... ...॥
রাজন্যে দুন্দুভাবায়তায়া-
মশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ।
ইন্দ্রং যা দেবী ... ...॥

যিনি সিংহে ব্যাঘ্রে এবং সর্পের ভিতরে—দীপ্ত যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন যে সুভগা দেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আসুন। যিনি হস্তীতে দ্বীপীতে, যিনি হিরণ্যে—দীপ্ত যিনি জলরাশিতে,

গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন ... ...। যিনি রথসমূহে, অক্ষসমূহে, ঋষভের শক্তিতে; যিনি বায়ুতে, পর্জন্যে—বরুণের শক্তিতে; ইন্দ্রকে ...। যিনি রাজন্যে, দুন্দুভিতে—অশ্বের গতিতে, পুরুষের গর্জনে; ইন্দ্রকে ...।[১০]

দেবী এখানে ইন্দ্রের জন্মদাত্রী। 'কেন'-উপনিষদে দেখি ইন্দ্রের সম্মুখেই দেবী প্রথমে বহুশোভমানা হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা। উভয়-ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের সহিত দেবীর যোগের জন্য একের সহিত অপরের যোগের প্রশ্ন মনে আসে। অর্থাৎ অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শক্তিময়ী ও দীপ্তিময়ী রূপে দেখিলাম, তাঁহারই পরবর্তী রূপান্তর 'কেন'-উপনিষদে।

'কেন'-উপনিষদে কি অবস্থার ভিতরে দেবী ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানটির আলোচনা করা দরকার। দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে পর ব্রহ্মই দেবতাগণের জন্য বিজয় লাভ করিলেন; দেবতাগণ এই বিজয়ের ভিতর দিয়া সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তাঁহারা 'আমাদেরই এই বিজয়' বলিয়া নিজদিগকেই মহিমান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা বুঝিতে পারিলেন না কে এই পূজনীয় পুরুষ। দেবতারা প্রথমে অগ্নিকে পাঠাইলেন এই পুরুষকে জানিতে। অগ্নি সম্মুখস্থ হইলে এই পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কে, তোমাতে কি শক্তি আছে?' অগ্নি উত্তর করিলেন,—'আমি হইতেছি জাতবেদা, সব কিছু পোড়াইয়া ফেলিতে পারি।' তখন তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তিনি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ করিতে পারিলেন না। বায়ুরও ঠিক একই দশা হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই মূর্তি সহসা তিরোহিত হইল; ইন্দ্র তখন 'তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্'।—ঠিক সেই আকাশেই একটি স্ত্রীমূর্তি দেখিতে পাইলেন (প্রাপ্ত হইলেন), তিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। সেই উমা দেবীই ইন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা করিয়া প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন।[১১]

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই উমাকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী; তিনিই দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন; এই ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী আদিশক্তি—প্রথম জ্যোতীরূপা বলিয়া তিনি সুবর্ণকান্তি—তিনি হৈমবতী। শক্তিরূপিণী উমাই প্রথমে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন—ইহাই

[১০] ৬।৩৮।১-৪

[১১] 'শ্রীদেব্যথর্বশীর্ষ' নামে অথর্ববেদের উপনিষদ্ বলিয়া কথিত একখানি উপনিষদ্ পাওয়া যায়; গ্রন্থখানি অনেক পরবর্তী কালে রচিত বলিয়া মনে করি। এখানেও আরম্ভেই দেখিতে পাই,—'ওঁ সর্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবীতি। সাব্রবীৎ—অহং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ। শূন্যং চাশূন্যং চ।' ইত্যাদি

সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। এই দার্শনিক দৃষ্টি অস্বীকার না করিয়া একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও আমরা উপাখ্যানটিকে বিচার করিতে পারি। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রথমেই বড় করিয়া চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গটিতে উমা কথাটির ব্যবহার। উমা এখানে বিশেষ কোনও ব্যুৎপত্তিগত দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; উমা এখানে নানাভরণ-অলঙ্কৃতা শোভমানা নারীরূপে বিরাজিতা—ইহা স্পষ্টতঃ দেবীর নামরূপে ব্যবহৃত। এই নামটি এখানে কোনও প্রকার ভূমিকা বা ভণিতাবর্জিত ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, মনে হয়, এই উপনিষৎকারের নিকট এই নামটি একটি বিশিষ্ট দেবীর নামরূপে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই 'কেন'-উপনিষদের পূর্বে কোনও গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটির উল্লেখ পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গে 'হৈমবতী' শব্দটির ব্যবহারও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। হেমকান্তি জ্ঞানের সহিত যুক্ত বলিয়াও কেমন দেবী হৈমবতী হইতে পারেন, আবার হিমবৎ পর্বতের কন্যা বলিয়াও তিনি হৈমবতী হইতে পারেন। উমা শব্দে এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন হৈমবতী শব্দের দ্বারা এখানে হিমালয়-পর্বতের সহিত উমার যোগের ইঙ্গিত বোঝানই স্বাভাবিক। তাহা হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পারি যে, 'কেন'-উপনিষৎকার যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন হিমবৎ-পর্বতের কন্যা উমার একটি বিশিষ্টা দেবীরূপে প্রসিদ্ধি ছিল।

আমরা ইহা ছাড়া আর কোনও আরণ্যকে বা উপনিষদে উমার আর কোনও স্পষ্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক সময় আরণ্যকগুলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 'উময়া সহ বর্ত্তমানঃ', এবং উমা শব্দটিকে তিনি এখানে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহীধর এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র 'সোম' কথাটিকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার একস্থানে 'অম্বিকা-পতয়ে' শব্দটি আছে: এই গ্রন্থের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে 'অম্বিকা-পতয়ে'-এর স্থানে পাঠ 'উমা-পতয়ে'।

আরণ্যক উপনিষদের যুগের পরে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখি, ধাতু সকলের আকর পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবানের দুইটি কন্যা; মেরুদুহিতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা পত্নী, এই মেনাই উক্ত কন্যাদ্বয়ের মাতা। এই দুই কন্যার মধ্যে গঙ্গা হইলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা, আর দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা। সুরগণ দেবতাগণের কার্যের নিমিত্ত শৈলেন্দ্র হিমালয়ের নিকট এই ত্রিপথগা নদী গঙ্গাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, শৈলেন্দ্রও এই লোকপাবনী তনয়াকে ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য দান

করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তিনি সুব্রত অবলম্বন করিয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই উগ্র-তপস্যা-যুক্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার অনুরূপ দেবতা লোকপূজ্য রুদ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন।—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥
যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥
তস্যাং গাঙ্গেয়মভূজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব॥
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥

… … …

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥

আমরা মহাভারতের মধ্যে উমার যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল আনুশাসনিক পর্বের ১৪০শ হইতে ১৪৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত উমা-মহেশ্বর-সংবাদ'বা হর-পার্বতী-সংবাদ। এখানে দেখিতে পাই, ভগবান্ ভূতনাথ জটাজূটধারী মহাদেব ব্যাঘ্রচর্মের পরিধেয়, সিংহচর্মের উত্তরীয় ও সর্পের উপবীত ধারণ করিয়া বিচিত্রধাতুশোভিত হিমগিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। "কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক সমুদায় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদী-সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতলদ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্কার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড-মার্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে সমুদায় অন্ধকার বিনাশপূর্বক হিমালয় পর্বত দগ্ধ করিতে

লাগিল।"[১২] পার্বতীর প্রার্থনা ও অনুনয়ে মহাদেব প্রীতিপূর্ণ-লোচনে আবার হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় হিমালয় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। পার্বতী তখন শিবকে প্রশ্ন করিলেন, কেন শিবের ললাটে এই তৃতীয় নয়ন, কেন পঞ্চানন শিবের দক্ষিণ দিক্‌স্থ আনন এমন ভীষণ, কেন তিনি বৃষভবাহন, শ্মশানচারী? প্রেয়সী পার্বতী উমা এইভাবে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, প্রসন্নমুখ মহাদেব একটি একটি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। এইভাবে আসিতে লাগিল অনেক প্রশ্ন, ধর্ম কি—তাহা অনুষ্ঠানের উপায় কি, চতুর্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ আচরণীয় ধর্ম কি, সমুদায় বর্ণের ধর্ম কি, গার্হস্থ্য ধর্ম ও ঋষিধর্ম কি, মনুষ্যগণের বন্ধন-বিমুক্তির উপায় কি—এইভাবে সকল ধর্মরহস্য তপস্যারহস্য মোক্ষরহস্য—সব আলোচনাই উঠিতে লাগিল, জ্ঞান-পুরুষ যোগেশ্বর মহাদেব একটি একটি করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিতগণ অনেকেই এই 'উমা-মহেশ্বর-সংবাদে'র অধ্যায় কয়টিকে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলে কোন্ সময়কার প্রক্ষেপ জানিবার কোনও উপায় নাই। মহাভারতের এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদ একান্ত অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ না হইলে একদিক্ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরবর্তী কালে আগম-গ্রন্থগুলির এইখানেই আমরা মূল দেখিতে পাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধ সকল প্রসিদ্ধ তন্ত্রেই দেখিতে পাই, দেবী (তিনি যে রূপেই হোন) জিজ্ঞাসু এবং ভগবান্ নিজে বক্তা। জীবহিত-কামনায় দেবী সকল প্রকার তত্ত্ব এবং সাধন-রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকেন, দেবীকে প্রীত করিবার ছলে ভগবান্ সকল তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন। মহাভারতের এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যেই এই জাতীয় সকল আগমের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, অবশ্য যদি, সব অংশটিই অর্বাচীন কালের প্রক্ষেপ না হইয়া থাকে।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই, মহাদেব নিজে আবার প্রশ্ন করিয়া পার্বতী উমার নিকট হইতে নারীধর্ম জানিয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব পার্বতীর যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয়।—"প্রিয়ে তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্যদক্ষা, দম ও শান্তি-গুণযুক্তা, মমতা-পরিশূন্যা এবং ধর্মানুষ্ঠাননিরতা।...কি ধর্ম, কি শীলতা, কি ব্রত; কি সারাংশ, কি বীর্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি কঠোর তপঃ-অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ [illegible]গত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্ধশরীর দ্বারা আমার অর্ধশরীর নির্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক।"[১৩]

[১২] ১৪০ অধ্যায়; কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।
[১৩] কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

পূর্বে বলিয়াছি, মহাভারতে এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু যে-সব স্থলে সংশয়ের অবকাশ নাই সেরূপ কিছু কিছু স্থলেও আমরা পার্বতীকে মহাভারতে শিবপত্নী-রূপে দেখিতে পাই।

ইহার পরে উমা সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা দেখিতে পাই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে। কালিদাসের মতে দক্ষসুতা সাধ্বী সতীই পিতৃকৃত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া যোগবলে তনুত্যাগপূর্বক জন্মলাভ-কামনায় শৈলবধূ মেনকার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে সতী যেমন দেহত্যাগ করিলেন, মহাদেবও সেই দিন হইতে সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবদারুবৃক্ষ-পরিবৃত হিমালয়ের এক সানুপ্রদেশে গিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ইহার পর উমাকর্তৃক যোগেশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ এবং উমা-মহেশ্বরের পরিণয় এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকের জন্ম প্রভৃতি উপাখ্যান সর্বজনবিদিত। ইহার পরে পুরাণাদিতে এই কাহিনীই নানাভাবে পল্লবিত রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

আমরা উমা-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতরে কয়েকটি তথ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, উমা শৈলসুতা: তাঁহার অপর নাম পার্বতী বা গিরিজা তাঁহাকে মুখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুক্ত করিতেছে। আরও দেখিতে পাই, এই দেবী হয় কৈলাসবাসিনী, না হয় মন্দরবাসিনী, না হয় বিন্ধ্যবাসিনী। সর্বক্ষেত্রেই পর্বতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই উমা বা পার্বতী দেবী সিংহবাহনা। পার্বত্য দেবীর সিংহকে বাহন-রূপে গ্রহণ করার ভিতরেও বেশ একটা সঙ্গতি রহিয়াছে। এই সিংহবাহিনী শৈলসুতা উমা দেবী বা পার্বতীই ভারতবর্ষের শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ বলিয়া মনে হয়; এই দেবীর সহিতই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবীগণ একত্র হইয়া একটি সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সিংহবাহনা শৈলসুতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ এবং আলোচনা করিতে পারি। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চলে অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে একটি মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবীও পার্বত্য দেবী এবং সিংহের সহিত ইহার যোগ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ক্রীট দ্বীপের ক্লোস্‌সোস্‌-এ প্রাপ্ত একটি মুদ্রাঙ্কিত আংটি (signet-ring); ইহাতে একটি দেবীর মূর্তি পাওয়া যাইতেছে, তিনি একটি পর্বতের শিখরদেশে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার দুই পার্শ্বের দুইটি সিংহদ্বারা তিনি

পরিরক্ষিতা।[১৪] গ্রীক মাতৃদেবীও পার্বত্য দেবী। তাঁহার যে মূর্তি পাওয়া যায় সেখানে দেখি, তিনি সুশোভিত আঁচল পরিহিতা, হাতে তাঁহার রাজদণ্ড বা বর্শা; তিনিও পর্বতশিখরে দণ্ডায়মানা এবং সিংহকর্তৃক পরিরক্ষিতা। ক্রীটের মাতৃদেবীই এশিয়ার প্রসিদ্ধ মাতৃদেবী সির্বিলির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার এই সির্বিলি দেবীকে অনেক স্থলে আসনারূঢ়া দেখা যায়, এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতকগুলি সিংহকে নত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সহিত সিংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং অন্যান্য নানাবিধ পশু সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সির্বিলি মিসিয়া (Mysia), লিডিয়া (Lydia), ফ্রিগিয়া (Phrygia) প্রভৃতি স্থানের পর্বতে পূজিতা হইতেন।

প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিয়া একথা মনে করিলে কি খুব ভুল হইবে যে, পৃথিবীর অন্যত্র যে সিংহযুক্তা পর্বতবাসিনীর উল্লেখ পাই, আমাদের সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই ভারতীয় রূপ? একথা কি মনে করা যাইতে পারে যে, একটি সাধারণ দেবীমূর্তির পরিকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, উমা কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একটি সংস্কৃত শব্দ নহে; অন্ততঃ কথাটির যে-সকল ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যাবিলনীয় প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্মু' বা 'উম্ম'; শব্দটির এক্কাডীয় (Accadian) প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্মি'; দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্ম'; এই শব্দগুলি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারতীয় 'উমা' শব্দটির সহিত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে।[১৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হরবিষ্কের একটি মুদ্রাতে যে দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে

---

[১৪] ক্রীট দ্বীপের মাতৃ-উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'Of the religions of the Cretans we know little, but we have evidence that as early as Early Minoan I they worshipped the Great Mother, their chief deity of later times. This goddess seems to have been a concept very similar to that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. Figures of this goddess were not often made, though representations of her occur on seals." *Priests And Kings* by Harold Peake and Herbert John Fleure, pp. 109-10.

[১৫] "The Babylonian word for 'Mother' is Ummu or Umma, the Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other, and with Uma, the mother-goddess."—*Mother Goddess* by S. K. Diksit.

তাহারও নাম 'ওম্মো'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী পার্বতী বা উমা দেবীর সহিত অন্যান্য দেশে প্রচলিত মাতৃদেবীর সাদৃশ্য শুধু আকৃতি-প্রকৃতিতে নহে, নামেও।

কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননী-রূপে সৌন্দর্যে মাধুর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পুরাণগুলির ভিতর দিয়া এই প্রাচীন পার্বতী দেবী যখন দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার উমা-মূর্তিটি আস্তে আস্তে একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উমার ঔজ্জ্বল্য রক্ষিত হইয়াছে সাহিত্য-ধারায়, এ-বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। মধ্যযুগের ভাস্কর্যে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তি অনেক পাওয়া যায়, সেখানে শিবও পরমকল্যাণময় সুন্দর-মূর্তি, উমাও প্রেম ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভিতরে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। অর্গলাস্তবের মধ্যে হিমাচল-সুতা বলিয়া অভিহিতা হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপুত্রী (শেলরাজার পুত্রী?) বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু আসল চণ্ডী-গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা-পরিচয় কোথাও পাইতেছি না। 'চণ্ডী'-মধ্যে দু-এক স্থানে দেবীকে পার্বতী বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবীকে সিংহ-বাহন দান করিয়াছেন, দেবীকে হিমালয়-শিখরে সিংহবাহনারূপেও দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু দেবীর উৎপত্তি হিমালয়ের ঔরসে এবং মেনকার গর্ভে নহে, দেবীর উৎপত্তির যে বিবরণ পাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এ-বিষয়েও আমরা পরে চণ্ডিকা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

উমা জগজ্জননী বটেন, এবং শিবপত্নীও বটেন, কিন্তু তাঁহার ভিতর দিয়া দেবীর একটা কন্যারূপ আমাদের চিত্তে একটি কোমল রেখা টানিয়া দিয়াছে। ভারতীয় দেবীপূজার ইতিহাসে দেবীর এই কন্যারূপকে অবলম্বন করিয়া একটি স্নিগ্ধ ধারাও বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। দেবী শুধু গিরিরাজ-দুহিতা-রূপেই দেখা দেন নাই, তিনি কাত্যায়ন মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা,[১৬] জহ্নু মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া পতিত-পাবনী মা গঙ্গা জাহ্নবী নাম ধারণ করিয়াছেন। নন্দগোপের গৃহে মা মহামায়া যশোদানন্দিনী-রূপে দেখা দিয়া কংসকে ছলনা করিয়া কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ-কর্তৃক প্রথমে কুমারী রূপে পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী দেখা যায়। দু' শতাব্দী পূর্বে দেবী সাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ একটি কিংবদন্তী

[১৬] আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাতির দেবী বলিয়া দেবী কাত্যায়নী, যেমন কুশিক জাতির দেবী হইলেন কৌশিকী।

মাতৃপূজারী বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি, বৈদিক দেবী অদিতিকে অনেক স্থলে দক্ষ-তনয়া-রূপে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ এই বৈদিক বর্ণনার পরিণতিতেই দেবীকে দক্ষ-তনয়া সতীরূপে দেখিতে পাই। দক্ষ-তনয়া সতীই আবার হিমালয়-দুহিতা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অন্তরীপ কুমারিকা নিত্য-স্নানপূতা চিরকুমারী-ব্রতধারিণী হইয়া দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। কন্যা-কুমারী দেবী দুর্গারই একটি নাম। এই কন্যাকুমারিকার দেবীত্বের ধারণা একটি অতি প্রাচীন ধারণা। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা কোন কবিকর্তৃক রচিত *'Periplus of the Erythrean Sea'* গ্রন্থখানিতে আমরা ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত স্থানটির 'কোমার' (Comara) নামে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই 'কোমার'-এর দেবী হইলেন একটি কুমারী দেবী—যিনি উপকূলবর্তী সমুদ্রে নিত্য স্নান করেন। এই কন্যাকুমারিকার প্রসিদ্ধি হইতেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষকেই অনেক সময় 'কুমারী দ্বীপ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাদেবীও বহু সময়ে শুধু 'কুমারী' নামেই খ্যাতা। তান্ত্রিক মতে 'কুমারী' দেবীরই প্রতীক, এইজন্য তান্ত্রিক পূজায় কুমারী-পূজার এত প্রাধান্য। দেবীপীঠ কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরে এখনও কুমারী-পূজার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। অন্যান্য দেবীতীর্থেও এই প্রথার প্রচলন আছে। শুধু তান্ত্রিক মতে নহে, কুমারীর দেবীত্বে এই বিশ্বাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে এতই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, আমরা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে সমাজ-জীবনেই 'গৌরী' বলিয়া জানিতাম—এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের 'গৌরীদানে'র সামাজিক প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বৈদিকযুগের শেষভাগে আমরা ভদ্রকালী, ভবানী, দুর্গা প্রভৃতি দেকীর নাম পাই; ইঁহারা এই যুগের অপ্রধানা দেবী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পার্বতী উমার ধারাটির প্রাধান্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকা, ভবানী, ভদ্রকালী প্রভৃতি সব দেবী এক মহাদেবী পার্বতীর ভিতরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। উমাই গৌরবর্ণা বলিয়া গৌরীরূপেও অভিহিতা। পরবর্তী কালে এই গৌরী নামেরই সমধিক প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' উমার গৌরী নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) দক্ষ-তনয়া সতী

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা পার্বতী উমার ধারাকে দেবী-পূজার ইতিহাসে প্রাচীন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু দক্ষ-কন্যা সতী

ত উমারও পূর্ববর্তিনী। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যেই দেখিতে পাই—

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি দক্ষ-যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে সতীর যোগদ্বারা দেহত্যাগ এবং সেই দক্ষ-কন্যা সতীরই পুনরায় মেনকাগর্ভে হিমালয়-দুহিতা উমারূপে জন্মগ্রহণের উপাখ্যান কালিদাসের সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই দক্ষ-যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের উপাখ্যান মুখ্যতঃ পুরাণমূলক বলিয়া মনে হয়; কারণ কোনও বৈদিক বা বেদমূলক সাহিত্যে ত নয়ই, রামায়ণ-মহাভারতেও এই জাতীয় কোনও উপাখ্যানের আভাস নাই। যজ্ঞফলভাক্ বৈদিক রুদ্র এবং যজ্ঞ-ফলাধিকারে বঞ্চিত—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মে অস্বীকৃত ভূত-প্রেত-সহচর শিবের মিলন ঘটাইতে গিয়া দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যানের উৎপত্তি। বৈদিক সাহিত্যে এবং পুরাণাদিতে দক্ষ নামটি আমরা বহুভাবে পাইয়া থাকি। এই দক্ষের যজ্ঞকর্তা-রূপে বহুধা প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই। এই প্রসিদ্ধি যে শুধু পুরাণেই দেখি তাহা নহে, বৈদিক সাহিত্যেও। সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণে (৪।৪) দেখিতে পাই, 'দক্ষো হ বৈ পার্বতিরেতেন যজ্ঞেনেষ্ট্বা সর্বান্ কামানাপতঃ'। এখানে দক্ষকেই পর্বতপুত্র এই অর্থে 'পার্বতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১]

বৈদিক সাহিত্যে দক্ষের উল্লেখের ভিতরে দুইটি লক্ষণীয় তথ্যের কথা বলিতেছি। তথ্যটি হইল এই যে, বৈদিক দেবমাতা অদিতি-দেবীকে আমরা বেদে দক্ষ-কন্যা-রূপে পাইয়া থাকি। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি,[২] এই অদিতি দেবীই পৃথিবী দেবী হইয়া আমাদের পরবর্তী কালের 'মহাদেবী'র মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় তথ্য হইল এই যে, দক্ষকে আমরা বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞকর্তারূপেও পাই; 'পার্বতী-দক্ষ'-যজ্ঞের বেদীর নাম 'দক্ষ-তনয়া'; আবার এই 'দক্ষ-তনয়া' বেদীর উপরে প্রজ্বালিত অগ্নির এক নাম 'মহাদেব'। এইখান হইতেই হয়ত সূত্র ধরিয়া দক্ষযজ্ঞের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। 'দক্ষ-তনয়া' সতী নাম কখন গ্রহণ করিলেন তাহা বলা শক্ত। মহাভারতের একাধিক স্থলে আমরা দক্ষ-যজ্ঞের উল্লেখ পাই; কিন্তু এ-সকল স্থলে সতী-কাহিনীর কোনও আভাস মাত্র নাই। দ্রোণপর্বে ও সৌপ্তিক পর্বে যে বর্ণনা পাই তাহাতে দেখি, দক্ষপ্রজাপতি শিবকে যজ্ঞ-ভাগ না দিয়া যজ্ঞ-আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়া শিব দক্ষপ্রজাপতি-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ নাশ করেন। আনুশাসনিক পর্বে যে শিব-

---

১ এই তথ্যটি অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি।
২ এই গ্রন্থের ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কর্তৃক যজ্ঞ-নাশের কথা দেখিতে পাই সে যজ্ঞের ব্যবস্থাপক দক্ষ নহেন, দেবগণ। যজ্ঞের শিব-ভয়ে ভীত হইয়া বরাহরূপ ধারণ করিয়া পলায়নের কথা এবং ধনুর্বাণ-হস্তে শিবের যজ্ঞ-বরাহের পশ্চাদ্ধাবনের কথাও আমরা মহা-ভারতেই দেখিতে পাই। কিন্তু মহাভারতের শিবকর্তৃক যজ্ঞ-নাশের কোনও কাহিনীতেই এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহা হইতে এই সতী-কাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে। এ-কাহিনী পুরাণগুলিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পুরাণে আমরা বহু দক্ষ-কন্যা পাই; দক্ষ-কন্যার সংখ্যাও বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রূপে পাই; কোথাও চতুর্বিংশতি, কোথাও ষোড়শ—কোথাও পঞ্চাশৎ। বিভিন্ন মতে দক্ষ-কন্যাগণের যে তালিকা পাই তাহার মধ্যে সতী নামটি পাইতেছি। কিন্তু 'বিষ্ণু-পুরাণ', 'পদ্ম-পুরাণ', 'গরুড়-পুরাণা'দির মতে দেখিতে পাই দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন; বাকি খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে ভৃগু ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ বহ্নি ও পিতৃগণ বিবাহ করেন। এই-সকল তালিকার মধ্যে যে সতীর উল্লেখ তিনি কোনও প্রসিদ্ধা দেবী বলিয়া মনে হয় না; সতী-স্বামী 'ভব'ও এখানে ঋষিগণের মধ্যে একজন। মনে হয় বৈদিকরূপকাশ্রয়ে এই 'দক্ষ-তনয়া'র একটি অত্যন্ত ক্ষীণধারা দক্ষ-যজ্ঞকে অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিবর্তনে বৈদিক-অবৈদিক ধর্ম-বিশ্বাসের এবং ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ-, সংঘাত- ও সমন্বয়-জাত ক্রমপ্রসারের ইতিহাসে দক্ষযজ্ঞের মূল্য খুব বেশি; ঐতিহাসিক-ইঙ্গিতবহনকারী সেই বহুমূল্য পৌরাণিক উপাখ্যানই শিব-পত্নী সতীকে মহাদেবীরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করিল।

কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীপূজার ইতিহাসে দেখিতে পাই, সতীরূপে দেবীর পূজার প্রচলন কোনও যুগেই প্রসিদ্ধ নহে; তিনি বিশিষ্ট কোনও সাধক-সম্প্রদায়ের আরাধ্যাও নহেন; তিনি পূজা ও আরাধনা গ্রহণ করিতেছেন বহু দেবীর সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে যুক্ত করিয়া,—প্রথমে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ প্রসিদ্ধ একান্ন পীঠের দেবীগণের মাধ্যমে, আর তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ পার্বতী উমার প্রধান ধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া। সতীর দেহত্যাগের পরে পার্বতী-রূপে তাঁহার পুনর্জন্ম এক শিবকে অবলম্বন করিয়া দক্ষ-তনয়ার ধারা এবং পার্বতী উমার ধারাকে মিলিত করিয়া দিবারই পৌরাণিক প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। দেবীরূপে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সতী ব্যাপকভাবে পূজার অধিকারীণী হইয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের

কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে প্রচুর কাব্য-প্রেরণা দান করিয়াছে।

একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে পুরাণগুলির বর্ণনার মধ্যে একরূপতা নাই। তাহাতে মনে হয় পুরাণকারগণ দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রাচীন কোনও সুস্পষ্ট উপাখ্যান পান নাই; কতকগুলি অস্পষ্ট প্রবাদ-কিংবদন্তীকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্নভাবে এই কাহিনীকে গড়িয়া লইয়াছে। সতীর যে দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ, সতীর মৃতদেহ বিষ্ণুকর্তৃক কর্তিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া একান্ন পীঠের উৎপত্তি প্রভৃতি কাহিনী প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোনও পুরাণেই নাই। মহাবিদ্যাগণের সংখ্যা এবং রূপবর্ণনা বিষয়েও পুরাণ-তন্ত্রগুলির মধ্যে ঐকমত্য নাই। বরাহ-পুরাণে দক্ষযজ্ঞের যে বিবরণ পাই[৩] তাহাতে দেখি দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন; সমস্ত দেবতাগণ সেই যজ্ঞের যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। শিব তখন জলমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। শিব দক্ষযজ্ঞের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রুদ্ধ শিবের ভৈরব নাদ হইতে বেতাল ও প্রেতসমূহের সৃষ্টি হইল। শিব সেই সৈন্যগণ লইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য গমন করিলেন এবং দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞভাগ আদায় করিলেন। প্রজাপতির আদেশে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার দেহসম্ভবা গৌরীকে দান করিয়া শিবকে তুষ্ট করিলেন।

'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে' আবার দেখি,[৪] দক্ষের অষ্টকন্যার মধ্যে প্রধানা হইলেন সতী। একসময়ে দক্ষ কন্যাগণকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহ হইতে নিজের গৃহে আনয়ন করেন এবং প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেন এবং কিছুদিনের জন্য নিজের গৃহেই রাখেন। সতী লক্ষ্য করিলেন, জ্যেষ্ঠকন্যা-রূপে পিতার নিকট যেরূপ সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহা তিনি পাইতেছিলেন না; কারণ-স্বরূপে জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী মহাদেব জামাতা হইয়াও শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই, তাই অনাদর। পিতার নিকট পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারিয়া মহাদেব দক্ষকে অভিশাপ দিলেন, সেই শাপে চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দক্ষ প্রচেতাঃ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এই কাহিনীর মধ্যে শুধু দশমহাবিদ্যা, একান্ন পীঠাদির কথাই যে পাইতেছি না তাহা নহে—দক্ষের যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞভঙ্গেরও কোনও কাহিনী ইহার সহিত মিশ্রিত নাই। 'ব্রহ্ম-পুরাণে'র মধ্যে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী এবং সেই যজ্ঞে শিব-নিন্দার জন্য দেবীর যোগানলে দক্ষজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভব-গৃহিণী হইবার জন্য নূতন দেহলাভের (হিমালয়-দুহিতা উমারূপে) কথা দেখিতে পাই।[৫] কিন্তু এখানেও সতীর দশমহাবিদ্যা রূপধারণের কাহিনী বা বিষ্ণুচক্রে

[৩] ২১ অধ্যায়। [৪] ৩১ অধ্যায়। [৫] আনন্দাশ্রম সং, ৩৪ ও ১০৯ অধ্যায়।

খণ্ডিত হইয়া একান্ন অংশে দেবী-অঙ্গের পতন ও তাহা লইয়া একান্ন পীঠের উৎপত্তি প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাই না। সতীকে অবলম্বন করিয়া যে দশ-মহাবিদ্যার কাহিনী এবং সতী-অঙ্গে একান্ন পীঠের উৎপত্তি, এই-সকলই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত 'কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী' প্রভৃতি বলিয়া যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা 'চামুণ্ডা-তন্ত্রের। সতীর দশমহাবিদ্যা-রূপে শিবকে ভয় দেখাইবার কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ 'মহাভাগবতপুরাণ'-নামক উপপুরাণে পাওয়া যায়। 'কুব্জিকা-তন্ত্রে'ও সাধারণভাবে দশমহাবিদ্যার বর্ণনা আছে, বিশদ বর্ণনা আছে প্রচলিত 'নারদপঞ্চরাত্রে'। 'তোড়ল-তন্ত্রে' দশমহাবিদ্যার দশ ভৈরবের বর্ণনা আছে।[৬] 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে' অদ্বিতীয়ারূপে দেবীর মহিমা-খ্যাপনপ্রসঙ্গে দশমহাবিদ্যার উল্লেখ দেখি।[৭] 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে'ও শিবকে বিমূঢ় করিবার মানসে দেবীর দশ দিকে দশমূর্তি ধারণের কথা দেখিতে পাই।[৮] 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' বিষ্ণুকর্তৃক খণ্ডিত দেবী-অঙ্গ পতনের দ্বারা পীঠ-সমূহের উৎপত্তির কথাও দেখি। 'তন্ত্র-চূড়ামণি'তে ও 'কালী-পুরাণে' এই পীঠসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(ঘ) দুর্গা

পার্বতী উমা দেবী পরবর্তী কালে দুর্গা নামে সুপ্রসিদ্ধা। এই দুর্গা দেবীর প্রথম উল্লেখ পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে; সেখানে যে দুর্গা-গায়ত্রী আছে তাহা এই, 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' 'দুর্গি' এখানে 'দুর্গা'রই সমার্থক বলিয়া গৃহীত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ-উপনিষদে পাই—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

সাধারণতঃ দুর্গতিনাশিনী বলিয়াই দেবীকে আমরা 'দুর্গা' বলিয়া জানি। পরবর্তী কালে অবশ্য দুর্গ কথার অনেক অর্থ দেখিতে পাই, এবং সেই-সকল অর্থের সাহায্যেই পুরাণাদিতে 'দুর্গা'র ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শব্দকল্পদ্রুমে দুর্গা শব্দের যে অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥

---

৬ দ্রষ্টব্য বিশ্বকোষ, দশ-মহাবিদ্যা। ৭ বঙ্গবাসী সং, ৪।১৩-১৪। ৮ বঙ্গবাসী সং, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥

দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ; আ-শব্দ হইল হন্তৃবাচক। এই-সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা। এই জাতীয় ব্যাখ্যাকে ঠিক মনগড়া বলিব না; দুর্গাকে যে-সকল আপদ্‌বিপদে জনসাধারণ সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিয়া এখানে দুর্গার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা শব্দকল্পদ্রুমেই আরও কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] এই জাতীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে কতকগুলি প্রচলিত বিশ্বাসের কথাই জানা যায় ইহার ভিতর দিয়া ঐতিহাসিক তথ্য বেশি কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই একবার বলা হইয়াছে, দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর-নৌ-রসঙ্গা (৪।১১), অর্থাৎ অসঙ্গা তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকা-স্বরূপ বলিয়া দুর্গা। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ (৫।১২); এখানেও দুর্গম ভবসাগর পার করিবার জন্যই দুর্গা। কিন্তু অন্যত্র আবার দেখি—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ (১১।৪৯-৫০)

অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিবেন বলিয়া দেবী দুর্গা দেবী নামে খ্যাত হইবেন।

দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং সেই প্রসঙ্গে দুর্গা দেবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও কোনও পণ্ডিত একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মতটিকে প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহারা মনে করেন, দুর্গ-রক্ষাকারিণী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন দুর্গা। শুধু ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে এই ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক বলিয়াই এই ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য বলিতেছি না; এই ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি পরবর্তী কালের পুরাণাদিতে কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে

[১] দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥
... ...
দুর্গেতি দৈত্যবচনো ঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।
বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্তিতা॥

বলিয়াও ইহাকে প্রণিধানযোগ্য মনে করি। দেবী-পুরাণে দুর্গার স্তবে দেখিতে পাই—

ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে।
সকলো নিষ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোঽস্তুতে॥
যোগাধিপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ।
রমসে দেবি দুর্গেষু দুর্গেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥
—৮৩।৬২-৬৩ (বঙ্গবাসী সং)

দেবী-ভাগবতেও দেখি—

নগরে ঽত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা॥
রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্যা সর্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ॥
—৩।২৪।৫-৬ (বঙ্গবাসী সং)

খিল হরিবংশের মধ্যেও দেখিতে পাই—

এবং স্তুতা মহাদেবী দুর্গা দুর্গপরাক্রমা।
সান্নিধ্যং কল্পয়ামাস অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে॥—১২০।৩৫

এখানে এই 'দুর্গপরাক্রমা' কথাটির তাৎপর্য কি? এখানেও আমরা দেবীকে 'দুর্গে'র সহিত যুক্ত করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি।

দুর্গা কি প্রাথমিক রূপে নগরপালিকা দুর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন? দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেই কি তিনি সর্বশক্তিময়ী দেবীরূপে পূজিতা হইলেন? শক্তিময়ীর মহাদেবীত্ব লাভ অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল।

মহাদেবীরূপে পূজালাভের বেলায় পার্বতী উমা খানিকটা পিছাইয়া পড়িলেন, সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গারূপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের একটি ধর্মসম্প্রদায়-রূপে দেবীপূজা বা মাতৃপূজা কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। পরবর্তী কালের প্রবাদ-কিংবদন্তী-রূপে একথা প্রচারিত হইয়াছে বটে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে—দেবীর বোধন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন: কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে একথার আভাস-মাত্রও নাই। শিব-পার্বতী সম্বন্ধে অনেক কথাই পরবর্তী রামায়ণগুলিতে, এবং ততোধিক অর্বাচীন কালের রাম-কাহিনীগুলিতে, রাম-রাবণের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণে উমার উল্লেখ আছে, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; তাহা ব্যতীত রামায়ণে বিষ্ণুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কোনও দেবী বা দেবীপূজার উল্লেখ বাল্মীকির রামায়ণে নাই। প্রচলিত মহাভারতে অবশ্য আমরা একাধিক স্থলে দেবীস্তব দেখিতে পাই। মহাভারতে, এই জাতীয় দেবীগণের উল্লেখ ও স্তবস্তুতির মধ্যে

সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল দুইটি দুর্গাস্তব, একটি বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির-কর্তৃক দুর্গাস্তব, অপরটি হইল ভীষ্মপর্বে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন-কর্তৃক দুর্গাস্তব। যুধিষ্ঠিরের স্তবের মধ্যে দেখিতে পাই, দুর্গা যশোদাগর্ভ-সম্ভূতা এবং নন্দগোপকুলে জাতা; কংস-কর্তৃক শিলাতলে নিক্ষিপ্তা হইয়া তিনি আকাশদেশে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। তিনি দিব্যমাল্যবিভূষিতা, দিব্যাম্বরধরা ও খড়্গখেটকধারিণী। তিনি বালার্কবর্ণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, চতুর্ভুজা ও চতুর্বক্ত্রা। দেবী আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণা এবং অষ্টভুজা-রূপেও পূজিতা। তিনি দিব্যকুণ্ডলধারিণী, কেশবন্ধে দিব্যমুকুটধারিণী। তিনি মহিষমর্দিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী। অর্জুন-কর্তৃক দেবীর স্তবে দেখিতে পাই, দেবী ভগবতী যোগিগণের পরমসিদ্ধিদাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, জরামৃত্যুহীনা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কল্যাণপ্রসূ, মুক্তিস্বরূপা, সাবিত্রী, কালরূপিণী, মোহিনী, কান্তিমতী, পরমা সম্পৎ, শ্রী, হ্রী ও জননী।

দেবীপূজার ইতিহাসে মহাভারতের এই দুইটি দুর্গাস্তবের উপর এত দিন আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতাম। কিন্তু মহাভারত-সম্বন্ধে নূতন যে-সকল অধ্যয়ন ও গবেষণা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই স্তবগুলি খাঁটি নয়—প্রক্ষিপ্ত। পুণা হইতে মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে এই-সকল স্তবস্তুতির অংশ পরবর্তী কালের যোজনা বলিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে পার্বতী উমাকেও স্বতন্ত্রা স্বপ্রধানা দেবী রূপে পাই না, শিবপত্নী-রূপেই সেখানে তাঁহার পরিচয়। মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত 'খিল হরিবংশে' যে দেবী দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তখন পর্যন্ত মদ্যমাংসবলিপ্রিয়া দেবী শবর, পুলিন্দ এবং বর্বরগণ-কর্তৃকই পূজিতা। পার্বতী উমার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্যধর্মে তাঁহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ বলিয়া মনে হয়। পৌরাণিক যুগেই এই মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

একটি তথ্য এইখানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। দুর্গা দুর্গতি-নাশিনীই হোন, দুর্গাসুর-নাশিনীই হোন বা দুর্গরক্ষিণীই হোন, তিনি শস্ত্র-ধারিণী এবং অরিমর্দিনী; কিন্তু পার্বতী উমার কোনও প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই আমরা এই শস্ত্রধারিণী অরিমর্দিনী রূপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে পাইলাম কন্যারূপে—বহুশোভমানা হৈমবতী-রূপে; তাহার পরে পাইলাম শিবপ্রিয়া-রূপে—তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রূপে। তাহার পরে যখন লক্ষ্মী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই পার্বতী উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অনন্ত-

স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সহিত প্রণয়-কলহ বা গৃহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রূকুটিকুটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা যায় নাই—অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ত দূরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী—রণোন্মাদিনী—অসুরনাশিনী—তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই অসুরনাশিনী মূর্তির সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রূপ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা মায়ের পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্ ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা নির্বিশেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

(৬) চণ্ডী-দেবী বা চণ্ডিকা

চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা মার্কেণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য-নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রসিদ্ধ 'চণ্ডী'-গ্রন্থ। বর্তমানকালে এই গ্রন্থখানিকেই শাক্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ—অন্তত শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই 'চণ্ডী'-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবী অধিকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী'-রূপেই খ্যাত; কোথাও তিনি ভগবতী, পরমেশ্বরী। তাঁহার মুখ্য পরিচয় চণ্ডিকা; তাঁহার প্রসিদ্ধ অন্যান্য নামগুলির মধ্যে অম্বিকা নামটি খুব বেশি ব্যবহৃত হইতে দেখি; দুর্গা নামও কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌরবর্ণা বলিয়া এক স্থলে তিনি 'গৌরদেহা' বলিয়া আখ্যাতা; 'গৌরী' সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত তিনি কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাদি। এই-জাতীয় নামগুলি তিনি কখন কেন গ্রহণ করিয়াছেন গ্রন্থমধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাঁহা হইতেই কৌশিকী, কালী বা চামুণ্ডা প্রসূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক হইল যে তথ্যটি তাহা এই যে, এই দেবী কোথাওই হিমাচল-দুহিতা উমা নহেন। সমস্ত 'চণ্ডী'র মধ্যে দেবীর উমা নামটির উল্লেখ একবারের জন্যও নাই। পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মাত্র পার্বতী বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতীরূপে নহে—পর্বতবাসিনী পার্বতী-রূপে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যে কথাটি তাই অত্যন্ত বড় করিয়া মনে হয় তাহা হইল এই যে, দেবীরূপে চণ্ডীর ধারা ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা।

'চণ্ডী'-গ্রন্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবীর মহিমা প্রচারিত হইয়াছে—প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ দৈত্যাসুরদ্বয় বিনাশে; দ্বিতীয়ে স্বয়ং দেবী কর্তৃক মহিষাসুর নিধনে; তৃতীয়ে

দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধে। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-উপলক্ষে অবশ্য দেবীকে চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর বধ করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেত্রে দেবীর হিমালয়-পর্বতের সহিত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দেখিতে পাই, দেবগণের তেজের ঘনীভূত রূপে দেবীর আবির্ভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের নিজের অস্ত্র দান করিলেন, সেই প্রসঙ্গে দেখি—

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥

হিমবান্ দিলেন বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন-সকল, আর ধনাধিপ কুবের দেবীকে দিলেন সর্বদা সুরাদ্বারা পরিপূর্ণ একটি পানপাত্র। তৃতীয় ঘটনা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের প্রসঙ্গেই শুধু দেখিতে পাইলাম,—শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুর-নিধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ করাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া নগেশ্বর হিমবানে গমন করিলেন এবং দেবীকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন। দেবী তখন জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে যাইতেছিলেন; সেই অবস্থায়ই তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ডও গিয়া শুম্ভের নিকট বলিয়াছিল, 'কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্।' শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানায়ক ধূম্রলোচনও দেবীকে দেখিয়াছিল—'তুহিনাচলসংস্থিতাম্'। দেবীকে এখানে হিমালয়বাসিনী বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখিলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সহিত দেবীর এইটুকুই সম্বন্ধ। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি সমগ্র চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে উমা পরিচয়েরই অভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা গিরিজা রূপটিও একান্ত গৌণ।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র 'চণ্ডী'-গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শিব-শক্তি নন; শিবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ—প্রায় নাই বলিলেই চলে। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের ভিতরকার সম্পর্ককে বাক্য ও অর্থের নিত্য-সম্পর্কের ন্যায় অবিনাভাবের সম্পর্ক-বলিয়াছেন: কিন্তু চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর সহিত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রথমে মধুকৈটভ-বধের সময় স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপতির যোগনিদ্রা—তিনি হইলেন হরির মহামায়া—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥—চণ্ডী, ১।৫৪

দেবী জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা শব্দের অর্থ স্তৈমিত্য-রূপা নিত্যা সমবায়িনী শক্তি। এই শক্তি যে পর্যন্ত স্তৈমিত্যরূপা হইয়া 'হরিনেত্রকৃতালয়া' (চ, ১।৭০) হইয়া থাকেন সে পর্যন্ত ত বিষ্ণুর কোনও সঙ্কল্প-বিকল্প এবং সঙ্কল্প-

বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদির সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আদিদেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই নিস্তরঙ্গা দেবীকে জাগ্রত করিলেন; সমবায়িনী শক্তির জাগরণের ফলেই বিষ্ণুর অসুর-হননাদি ক্রিয়া সম্ভব হইল। এই স্তবের মধ্যেও স্পষ্ট দেখিলাম, এই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী ভগবতী হইলেন বিষ্ণুর নিদ্রা-শক্তি —অর্থাৎ স্তৈমিত্যরূপিণী নিষ্ক্রিয়া সমবায়িনী শক্তি (চ, ১।৭১)। শক্তি একদিক্ হইতে শক্তিমান্ অপেক্ষাও প্রধান, কারণ শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের শক্তিমত্তাই ত সিদ্ধ হয় না। তাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপরেও পরমেশ্বরী বিষ্ণু-শক্তিরই অখণ্ড অধিকার। সেইজন্যই বলা হইয়াছে—

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥—(চ, ১।৮৩)

যিনি জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা—এবং যিনি জগৎ-গ্রাসকারী—তিনিও তোমাদ্বারা নিদ্রাবশে নীত হন, সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ?

সুতরাং শক্তির বোধনের দ্বারা শক্তিকে তরঙ্গময়ী করিয়া তুলিতে পারিলেই জগৎ-স্বামী বিষ্ণুর প্রবোধ হইবে—শক্তির জাগরণই বিষ্ণুকে ক্রিয়া-প্রবৃত্তি দান করিবে। ব্রহ্মার তাই বিষ্ণুশক্তি যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা—

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥

ব্রহ্মার স্তবে দেবী বিষ্ণুদেহ হইতেই জাগ্রতা—সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিষ্ণুকে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দান করিলেন, অসুরগণকে মহামায়া-দ্বারা বিমোহিত করিলেন, ফলে অসুরবধ হইল। দেখিলাম, এই অসুরনাশিনী দেবীর সহিত শিবের কোনই সম্পর্ক নাই। দেবী বিষ্ণুশক্তিরূপেই যজ্ঞের সহিত সম্পৃক্তা—তিনি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কাররূপিণী, তিনি প্রণবরূপা, সাবিত্রী, দেবজননী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাদেবী, মহাসুরী; তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সর্বসংহরণকারিণী দারুণা কালরাত্রি (ব্রহ্মার লয়কারিণী) মহারাত্রি (জগৎ লয়কারিণী) এবং মোহরাত্রি (যাহাতে জীবের লয়); তিনি শ্রী; হ্রী, বুদ্ধিরূপিণী, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি; কিন্তু তিনিই আবার—"

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥

বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনাদ্বারাই বিষ্ণুশক্তিকে অস্ত্রশস্ত্রধারিণী অসুর-নাশিনী দেবীর সহিত যুক্ত করা হইতেছে।

দেবীর দ্বিতীয়বার আবির্ভাবকালে দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে মহিষাসুর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং বিষ্ণুর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা

করিয়া নিবেদন করিলেন,—'শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্'—'আমরা সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম,—আপনি সেই অসুরের বধের কথা ভাবুন'। দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ভ্রূকুটি-কুটিলানন হইয়া ক্ষোপ করিলেন এবং প্রথমে অতিকোপ-পরিপূর্ণ চক্রধারী বিষ্ণুর এবং তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ নির্গত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণের দেহ হইতেও এইরূপে সুবিপুল তেজরাশি নির্গত হইল—পরে এই-সমস্ত তেজ ঐক্য লাভ করিল। তখন সেখানে দেবগণ 'জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তর' অতিশয় জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। দেবগণের দেহ হইতে বিনির্গত সেই তেজ একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব নারী-মূর্তি পরিগ্রহ করিল—সে মূর্তির দীপ্তিচ্ছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন তেজের দ্বারা এই জ্যোতির্ময়ী নারীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া উঠিল, শাম্ভব তেজে তাঁহার মুখসৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক দেবতা তখন এই তেজোময়ী নারীকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র দান করিলেন, 'পিনাকধৃক্' তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন তাঁহার শূল। এই জ্যোতির্ময়ী নারীই হইলেন মহিষাসুর-মর্দিনী মহাদেবী। দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপই অতি প্রাচীন এবং প্রধান। পরবর্তী কালের শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তিতে এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপই গৃহীত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমরা দেবীর প্রস্তর-নির্মিত মহিষমর্দিনী রূপের সন্ধান পাই। ভাস্কর্যে ও চিত্রেও দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপেরই প্রাধান্য। মনে হয়, দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য অসুরবিনাশের কাহিনী কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই মহিষমর্দিনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্য-ভারতের উদয়গিরিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে নির্মিত প্রস্তরমূর্তিতে। এই মূর্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের। মূর্তিখানি দ্বাদশভূজা, দ্বাদশভুজে বিবিধ প্রহরণ। গুপ্তযুগের আরও অনেক ছোট ছোট প্রস্তরমূর্তির কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন; মূর্তিগুলি দ্বিভুজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামনিরতা।

মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হয়। 'মহিষ' কথাটি বেদে মহিষ পশু এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন কোন স্থলে (ঋগ্‌বেদ ৮।১২।৮) 'মহিষ' শব্দটি মহান্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; সেক্ষেত্রে মহিষাসুর কথার অর্থ মহান্ অসুর। দেবী হয়ত মূলে মহান্ অসুর মর্দন করিয়াই মহিষাসুরমর্দিনী; মহান্ অসুরই পরবর্তী কালে পশু মহিষের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। আমরা 'চণ্ডী'কে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যগুলিতে যত কাব্য দেখিতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মহিষাসুরকেই প্রধান করিয়া দেখিতে পাই। আর পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবীর যত অসুর-

নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায় তাহা সর্বত্রই মহিষাসুরনাশিনী বা মহিষমর্দিনী রূপ।

মহিষমর্দিনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের ব্যাইর্গো (Virgo) দেবী—ইনি সমরপ্রিয়া দেবী। এই ভূমধ্যসাগরাঞ্চলবাসিগণ কর্তৃক মনু-খেন্নর জাতির বিজয়ই মহিষ-মর্দিনী দেবীর মূর্তির মূল কথা। মনু-খেন্নরগণ একটি মিশ্র নৃজাতি, খানিকটা ক্যাস্পিয়ান্, খানিকটা অস্ট্রেলোইড্, কিছুটা অ্যালপাইন্। ইহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যেরূপ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মনু-খেন্নরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মনু-খেন্নর মর্দনই হইল মহিষমর্দন; ভূমধ্যসাগরীয়-গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইর্গো বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মনু-খেন্নর-বিজয়ই রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তিতে।[১]

এই যে 'নিঃশেষদেবগণসমূহমূর্তি' দেবীর আবির্ভাব ইহা এক অভিনব আবির্ভাব; ইহা যেমন ভাবভূয়িষ্ঠ, তেমনই তত্ত্বগূঢ়; কিন্তু লক্ষ্য করিতে পারিতেছি যে, এই দেবীর সহিতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক নাই; ইঁহার আবির্ভাবের সহিত পিনাকধৃক শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও অত্যন্তভাবেই গৌণ। শম্ভু এখানে অসুরলাঞ্ছিত অন্যান্য দেবগণের মধ্যেই একজন মাত্র—ইহার অধিক আর কিছুই নন।

তৃতীয়বারে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পরিচয় পাইলাম না; এখানে তিনি পুরাতনী; তিনি দেবগণকে বর দিয়াছিলেন,—যখনই তাঁহারা কোনও আপদে পড়িবেন তখনই যদি দেবীর স্মরণ করেন তবে দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ্ নাশ করিবেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই দেবগণ হিমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবীও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের আপদ্ নাশ করিলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, দেবগণ 'দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ'; যে দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তবদ্বারা তুষ্ট করিলেন, সে দেবী বিষ্ণুমায়া, তিনি শিবমায়া নন।

যখন দেবী শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানরূপে মহাদেব শিবকে আমরা একবার দেখিতে পাইলাম। 'দেবীর সাহায্যের জন্য ব্রহ্মা, শিব, কার্তিক, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের শক্তিসমূহ নির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবীগণের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী—অক্ষমালা ও কমণ্ডলু-হস্তে হংসযুক্ত বিমানে; মহেশ্বরের শক্তি আসিলেন মাহেশ্বরী—তিনি ত্রিশূলবরধারিণী, মহাসর্পবলয়ধারিণী, চন্দ্ররেখা-

[১] হিন্দুস্থান্ স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় (২৫।১০।৫৯) 'দুর্গাপূজা'-শীর্ষক শ্রীযুত দুর্গাদাস পাত্র-লিখিত পত্রখানি দ্রষ্টব্য।

বিভূষণা বৃষারূঢ়া;[২] কুমার কার্তিকের শক্তি আসিলেন কৌমারী—তিনি শক্তিহস্তা ও ময়ূরবাহনা; বিষ্ণুশক্তি আসিলেন বৈষ্ণবী—শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনু-খড়্গ-ধারিণী—গরুড়বাহনা; বিষ্ণু-অবতার বরাহের শক্তি আসিলেন বারাহী, নরসিংহের শক্তি নারসিংহী, ইন্দ্রশক্তি গজারূঢ়া ঐন্দ্রী। এই-সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঈশান (শিব) চণ্ডিকাকে বলিলেন, 'আমার প্রতি প্রীতি-বশতঃ (মম প্রীত্যা) এই-সকল দেবীগণকে লইয়া সত্বর অসুর বিনাশ করুন।' দেবী ঈশানকে দূতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাইতে বলিলেন, শিবও দেবীর দূতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়াছিলেন। যে-হেতু দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এই কারণে দেবী জগতে 'শিবদূতী' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[৩]

এখানেও যে শিব বা ঈশানকে পাইলাম, তিনিও দেবগণের মধ্যে একজন হইয়া গৌণভাবে দেখা দিলেন, তিনি আমাদের চিরপরিচিত 'মহেশ্বর' নন। অসুরগণের নিকটে দেবীর দূতরূপে তাঁহার গৌণত্ব আরও প্রকটিত হয় বলিয়া মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক স্থানে 'শিবা'-রূপে আখ্যাত হইতে দেখি; কিন্তু প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারি, এই শিবা শিব-গৃহিণী বা শিব-শক্তি নহেন, 'শিবা' শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মঙ্গলময়ী এই অর্থে ব্যবহৃত। 'গৌরী' কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে গৌরবর্ণা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে, 'গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা'—'তুমিই গৌরী—শশিমৌলী অর্থাৎ চন্দ্রশেখর শিবে তোমার প্রতিষ্ঠা'; কিন্তু ঠিক এই শ্লোকেরই পূর্বচরণে দেখি—'শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা' —'তুমিই শ্রী—কৈটভের অরি বিষ্ণুর হৃদয়েই যাঁহার বাস'। সুতরাং দেখিতেছি, এই শ্লোকে দেবী 'বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা' মেধা, 'দুর্গভবসাগরনৌ' অসঙ্গা দুর্গা, আবার বিষ্ণুবক্ষোবিলাসিনী শ্রী—শশিশেখরাশ্রিতা গৌরী। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও 'শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা' রূপটি দেবীর একমাত্র বা প্রধান রূপ নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, দেবীর অম্বিকা নামটি বহুবার চণ্ডীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকাকে রুদ্রভগিনী-রূপেও দেখি, রুদ্রপত্নী-রূপেও দেখি। কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডীতে দেবীর অম্বিকা নামের ব্যবহারের দ্বারা শিবের সহিত দেবীর অচ্ছেদ্য যোগের কথা স্থাপিত করা যায় বলিয়া মনে হয় না। 'অম্বিকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একটি নামরূপে গৃহীত হইয়াছে।

---

[২] তুলনীয়—
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।
মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥—চ, ১১।১৪

[৩] যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥—৮।২৮

সংস্কারবিহীনভাবে চণ্ডী পাঠ করিলে দেবীর দুইটি রূপ প্রধানভাবে মনে ভাসিয়া ওঠে,—একটি হইল দেবীর 'বিষ্ণুশক্তি' রূপ, অপরটি হইল দেবীর পরম 'স্বতন্ত্রা' রূপ। প্রথমে দেবীর এই 'স্বতন্ত্রা' রূপের কথাই আলোচনা করিতেছি; দেবীর বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়া রূপের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-দর্শনকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেবীর মুখ্য তিনটি রূপ লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবী শিবাশ্রয়া; পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ত্ব—দেবী সেই পরমতত্ত্ব মহেশ্বরের পত্নী বা শক্তিরূপে গৃহীতা। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এখানে ধর্মে ও সাহিত্যে শিবেরই পরমশক্তিমান্ রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি। দ্বিতীয় মতে দেখিতে পাই শিব এবং দেবী বা শক্তির সমপ্রাধান্য; তন্ত্রের মধ্যে আমরা এই তত্ত্বকেই প্রধানভাবে লাভ করি। শিব ও শক্তি অন্যোন্যাশ্রয়ে উভয়ই উভয়ের সম্পর্কে পরতন্ত্র; কেহই একক সত্য বা পূর্ণ সত্য নহেন; উভয়ের 'যামল'ই হইল পরমতত্ত্ব। তৃতীয় আর-একটি মতবাদে দেখিতে পাই, দেবী 'স্বতন্ত্রা'—তিনিই পরমতত্ত্ব। দেবী হইলেন ত্রিভুবনব্যাপিনী এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি—সেই মহাশক্তি হইতেই সব কিছু প্রসূত—সেই দেবীর উপরে আর কিছুই নাই। অন্যান্য দেবগণের বিভিন্ন এবং বিচিত্রভাবে এই অদ্বিতীয়া মহাশক্তির আধার-স্বরূপত্বেই যাহা-কিছু মহিমা।

উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়—তিনিই পরাৎপর—তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই দেবগণ পশ্চাৎ প্রকাশ পান (অনুভাতি)। শাক্ত-ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ব্রহ্মস্বরূপিণী—তিনিই পরাৎপরা; তিনি শুধু জগতের অধীশ্বরী নন—জীবগণেরই অধীশ্বরী নন—তিনি সমস্ত দেব-দেবীগণেরও অধীশ্বরী; তিনিই দ্বয়-রহিতা পরমেশ্বরী। অবশ্য গভীর দার্শনিক দৃষ্টিতে শক্তিকে সর্বত্রই দ্বয়-রহিতা বলিয়া কীর্তন করা যাইতে পারে, কারণ পরমা শক্তিরূপে তাঁহার নিত্যই দ্বয়াভাব, শক্তিমানের সঙ্গেও যে তাঁহার নিত্য-অদ্বয়ত্ব। এইজন্য পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বহুশঃই শিবাশ্রিতা শক্তি বা বিষ্ণু-আশ্রিতা শক্তিও এইরূপ নিত্যা অদ্বয়া এবং পরমেশ্বরীরূপে কীর্তিতা। কিন্তু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দেখিলে মনে হয়, দেবী বা শক্তির প্রসঙ্গে শক্তিমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শক্তি স্বাশ্রয়া স্বতন্ত্রা। চণ্ডীর ভিতরেও আমরা দেবীর এই স্বাশ্রয়া স্বতন্ত্রা রূপের কথাই বহু স্থানে বেশ বড় করিয়া দেখিতে পাই। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, 'সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী' (১।৫৮); দেবী 'পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী' (১।৮২); 'সা ভগবতী পরমা হি' (৪।৯)। নিশুম্ভের মৃত্যুর পরে শুম্ভ যখন দেবীকে বলিয়াছিল—'অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী'—'যে অতিমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের

বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ।' উত্তরে দেবী দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

জগতে আমি একাই; আমার পরে কে আর দ্বিতীয়া আছে? এই সব (দেবীগণ) আমারই বিভূতিমাত্র—হে দুষ্ট, দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।' এই বলিয়া দেবী সমস্ত দেবীরূপ তদ্বিভূতিসমূহ নিজের মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ করিয়া রণক্ষেত্রে একাকিনী বিরাজ করিতে রহিলেন। এই পৃথক্ পৃথক্ শক্তি কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দেব-শক্তি; সুতরাং দেখিতেছি, ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতার যে শক্তি মূলে তাহা সব এক মহাদেবী হইতেই প্রসৃত—তাঁহা কর্তৃকই বিধৃত—আবার তাঁহাতেই সংহত। এই দেবীর স্তবে দেবগণ বলিয়াছেন—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবী শুধু বিশ্বেশ্বরী নন, তিনি বিশ্বেশবন্দ্যা। অবশ্য শৈব-দর্শনের মধ্যে দেখিতে পাই, শিব-তত্ত্বের অনেক স্তরভেদ রহিয়াছে—পরতত্ত্বরূপে মহেশ্বরের যে বৈন্দব-স্থিতি তাহার মধ্যে সমস্ত শক্তিতত্ত্বও আবার সংহত হইয়া আছে। কিন্তু তন্ত্রের বা শৈব-দর্শনের সেই বৈন্দব পরমেশ্বর-তত্ত্বের আভাস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে আমরা পাই না, এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে আমরা যে শিব বা ঈশানের বা পিনাকধৃকের সাক্ষাৎ পাই তিনি দেবতাগণের মধ্যে একজন দেবতামাত্র। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে পরমেশ্বরী রূপের বর্ণনা পাইতেছি তাহাকে যে শিবাশ্রিতা বা বিষ্ণু-আশ্রিতা দেবী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না—তাহা নহে, বস্তুতঃ বহু স্থানে বিষ্ণু-আশ্রিতা দেবীসম্বন্ধেই এইসব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বক্তব্য এই, গ্রন্থমধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী বারবার পরমেশ্বরীরূপে যে-ভাবে বন্দিতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতন্ত্ররূপই প্রধান হইয়া জাগিয়া ওঠে।

'চণ্ডী'র মধ্যে দেবীর যে স্বতন্ত্র রূপ দেখিতে পাই তাহারই বিস্তার দেখিতে পাই পরবর্তী কালে রচিত 'দেবী-ভাগবতে'র মধ্যে। 'দেবী-ভাগবতে' দেবী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

সৃষ্টবাখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি॥—১।২।৫

এখানকার এই 'রমতে তথৈকা' কথাটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। অন্যত্রও দেখি, 'কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা' (১।৭।৪৫)। এই এক এবং অদ্বিতীয়া দেবীরই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই ত্রিদেবীর উদ্ভব। ত্রিদেবী আসলে একই দেবীর ত্রিতত্ত্ব। এই মহাদেবী 'সর্বকারণকারণম্' এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীম্' (১।১৫।৩৪)। বেদের 'নাসদীয়' সূক্তের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনিরূপে 'দেবী-ভাগবতে' দেখিতে পাই—

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম॥
জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্।
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী
তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম্॥—২।৭।৬১-৬২

বেদে যেরূপ পুরুষ-সূক্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'—সেইরূপ এখানেও দেবীর বর্ণনায় দেখি—

সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্॥—৩।৩।৪৮

এক স্থলে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব কি দেবীই পরতত্ত্ব এই সংশয় তোলা হইয়াছে; সেখানে ব্রহ্মা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।
সা কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয়॥—৩।৫।৪৩

বেদ-সকল যে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলেন, তুমিই বা কি এবং সেই ব্রহ্মই বা কি—এই সন্দেহ দূর কর।'

উত্তরে দেবী বলিলেন—

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥—৩।৬।২

'আমার এবং উহার (ব্রহ্মের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে ঐ (ব্রহ্ম) সে-ই আমি; যে আমি সে-ই ঐ (ব্রহ্ম); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মতি-বিভ্রমহেতু।'

অবশ্য অতিসূক্ষ্ম ভেদের কথা দেবী উল্লেখ করিয়াছেন—সে ভেদ হইল শক্তি-শক্তিমানের ভেদ; সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে-সৃষ্টির ক্ষেত্রে—নতুবা শক্তি-শক্তিমানের মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্ত্বকে শক্তিরূপে বা

শক্তিমান্ রূপে—যে-কোনও রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে দেবীর 'পরতন্ত্রা' রূপের বর্ণনাও আছে—সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বিষ্ণুশক্তি।

'চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর পরতন্ত্রা রূপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য করি সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তি—শিবমায়া বা শিবশক্তি নহেন। আমরা পূর্বে দেবীর যে পরিচয় বিবৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এই বিষ্ণুমায়া পরিচয় বহু-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবী-স্তুতিতেও বলা হইয়াছে, 'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা'; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই দেবীসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 'বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া'। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, পঁয়ষট্টিটি শ্লোকে 'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' বলিয়া দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। দেবীর এই নমস্কার-শ্লোকগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ; এই শ্লোকগুলির মধ্যে দেবীর সর্বপ্রথম পরিচয়েই দেখিতে পাই—

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আবার দেখিতে পাই একাদশ অধ্যায়ের আট হইতে তেইশ পর্যন্ত শ্লোকে দেবীর যে প্রসিদ্ধ নমস্কার-শ্লোকগুলি রহিয়াছে তাহার সর্বত্র দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে 'নারায়ণি নমোঽস্তু তে' বলিয়া। দেবীকে 'ত্র্যম্বকে গৌরি' সম্বোধন করা হইয়াছে, অথচ নমস্কারের বেলায় 'নারায়ণি নমোঽস্তু তে'। তেমনই দেখি, 'মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে', 'কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে', 'বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে', 'ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে', 'চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে'।

এ-প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবী চণ্ডিকা এমন করিয়া নারায়ণীরূপে নমস্যা কেন। জিনিসটি আমাদের নিকট অত্যন্ত গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শনিক শক্তিবাদ মূলতঃ শিবকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে একটা দৃঢ়সংস্কার রহিয়াছে; কিন্তু এই দার্শনিক শক্তিবাদের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব আমাদের এই সংস্কারটি সর্বাংশে সত্য নহে। ইতিহাস-লব্ধ তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, দার্শনিক শক্তিবাদ বেশি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়া। দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ উপনিষদাদিতেই নানাভাবে ছড়াইয়া আছে; কিন্তু শক্তিবাদ-সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট এবং সুষ্ঠু আলোচনা প্রথম দেখিতে পাই পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলির মধ্যে। বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাই তৎপূর্বে এরূপ আলোচনা কোনও শৈব বা শাক্ত গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থখানিতে এই পঞ্চরাত্র-বর্ণিত শক্তিতত্ত্বের মোটামুটি একটি পরিচয় দিয়াছি বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আর পুনরুল্লেখ

করিলাম না। এই সংহিতাগুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের লোকগণ এগুলিকে যত প্রাচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন পণ্ডিতগণ এগুলিকে তত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার না করিলেও এগুলিকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে শক্তিবাদ-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক আলোচনা দেখিতে পাই কাশ্মীরের শৈব-দর্শনে। এই শৈব-দর্শনগুলি মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরে শৈব-দর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের কেরলাদি অঞ্চলে যে-সকল শাক্ত-তন্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে দার্শনিক শক্তিবাদ নানাভাবে ছড়ান আছে, কিন্তু কোনও এক গ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পষ্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও দাক্ষিণাত্য-অঞ্চলে রচিত বা প্রচলিত এই তন্ত্রাদিগ্রন্থের কোনও গ্রন্থই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত বলিয়া মনে করি না।

দার্শনিক শক্তিবাদের পরিচয় তন্ত্রাদি হইতে প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে বেশি পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে যে শক্তিবাদের আলোচনা পাই তাহা অধিকাংশ স্থলেই মূলতঃ বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়াকে লইয়া। এই বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়ার সহিত অবশ্য একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়-পদ্ধতিতে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, তন্ত্রের শিব-শক্তি প্রভৃতি মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত দেবী-মাহাত্ম্যে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব বিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত এবং পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলিতে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অবশ্য 'চণ্ডী-সপ্তশতী' মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ কিনা এ-বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূর্যের ঔরসজাত এবং সূর্যস্ত্রী সবর্ণার গর্ভজাত সাবর্ণি অষ্টম মনুকে অবলম্বন করিয়া এই দেবীমাহাত্ম্যের সাত শত শ্লোক মার্কণ্ডেয় পুরাণে পরবর্তী কোনও কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া 'চণ্ডী-সপ্তশতী'কে মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার রচনাকাল খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তৎকালে বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের প্রসার দেখিতে পাই; মনে হয়, এই কারণেই 'চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিষ্ণুমায়া-রূপই এমন প্রধানভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। 'চণ্ডী'র মধ্যে মুখ্যতঃ দুইটি অংশ দেখিতে পাই: একটি হইল দেবীর সহায়তায় বা দেবী কর্তৃক বহুবিধ অসুর-নিধনের কাহিনী; এই কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। অপর অংশ হইল দেবীর তত্ত্ব; এই তত্ত্বরূপ মুখ্যতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবীর

কয়েকটি স্তুতিতে। এই স্তুতিগুলির মধ্যেই দেবীর বিষ্ণুমায়া-রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে বর্ণিত বিষ্ণুমায়ার সহিত অসুরবিনাশের কোনও তত্ত্ব বা কাহিনী যুক্ত নাই; এই স্তুতিগুলির ভিতর দিয়াই অসুর-বিনাশের কাহিনীর সহিত বিষ্ণুমায়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

মাতৃপূজার ধর্ম এবং শক্তিবাদের দার্শনিক তত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া শক্তির এই অসুরবধের কাহিনী কোন্ সময়ে কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এখন বলা শক্ত। 'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে অসুরনিধনের কাহিনী বেশ বিস্তৃতভাবেই পাইলাম; ইহার প্রাক্‌রূপ কোথায়? সাধকগণ সমস্ত অসুরনিধন-কাহিনীকেই অধ্যাত্মতত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসত্যদেব এই অসুরনিধন-কাহিনীকে 'সাধন-সমর'-রূপে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু সে ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই।

মহাভারতে মহিষাসুর ও তারকাসুর-বধের কথা জানিতে পারি; ইন্দ্র কার্তিকেয় স্কন্দের সহায়তায় এই অসুরদ্বয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। মহিষাসুর এবং তারকাসুর স্কন্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিবের ঔরসে উমা পার্বতীর গর্ভে স্কন্দের জন্ম, একস্থলে এইরূপ আভাসমাত্র আছে। এই আভাস গ্রহণ করিয়াই সম্ভবতঃ কালিদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ 'কুমারসম্ভব'-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাইতেছি, তারকাসুর কর্তৃক নির্যাতিত এবং বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে অধিনায়ক করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেখানে সকলে পরামর্শ করিয়া শিববীর্যে কিরূপে কুমারের জন্ম সম্ভব করা যায় তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কালিদাসের সময়ে অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না, থাকিলে তারকাসুরের বধের জন্য কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগণ ত দেবীর শরণ গ্রহণ করিলেই পারিতেন। সমগ্র 'কুমারসম্ভব'-কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, কিন্তু দেবীর অসুরনাশিনী রূপের বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও নাই। হর-পার্বতীর কথা তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কোথাও দেবীর অসুরনাশিনী রূপের কোনও রূপ উল্লেখ নাই। কালিদাস মধুর রসের কবি বলিয়াই কি অসুরনাশিনী উগ্র মূর্তিকে একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন, না কালিদাসের সময়ে এই অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রসিদ্ধিই ছিল না? সতী-কাহিনী কালিদাসের জানা ছিল, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী-প্রবাদের সহিত কালিদাসের ভাল পরিচয় ছিল, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর একটি শ্লোকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।[৪]

[৪] কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥—১ম অঙ্ক

'চণ্ডী-কাহিনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাহিনী ছিল কি না, থাকিলে তাহা কি ছিল, তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবর্তী কালে যে এই চণ্ডী-কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া নানা প্রকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার নমুনা পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যসমূহে দেখিতে পাই। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রত্যেক সাহিত্যেই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী' অবলম্বনে কাব্য রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত 'চণ্ডী-চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি।

পাঞ্জাবীতে এবং হিন্দীতে লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডী-চরিত্র' দেখিতে পাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ হইলেও চণ্ডী-ভক্ত ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্যের উপাসক অর্থাৎ শক্তির উপাসক। খড়্গকে তিনি 'ভগৌতী' (ভগবতী) আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রচলিত মতে আমরা দেখি, চণ্ডী-কাহিনীর উৎপত্তি-স্থলের সম্ভাবনা দুইটি অঞ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জয়িনী অঞ্চলে, অপর বাঙলাদেশে।[৫] গুরু গোবিন্দ সিংহের চণ্ডী-গীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে এই রাজকন্যাই রাজ্য-পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডীই রাজার একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শৌর্য-বীর্যের খুব খ্যাতি ছিল। একদিন রাজকুমারী চণ্ডী নদীতীরে তর্পণাদির জন্য যাইতেছিলেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সদয়া হইয়া ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে[৬] আরোহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং অসুরগণকে নিধন করিলেন।

উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহিনী কি করিয়া গড়িয়া উঠিল? 'চণ্ডী-সপ্তশতী'কে অবলম্বন করিয়া কবি-কল্পনায় কি এই লৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল? 'চণ্ডী'র কাহিনীর পশ্চাতেও কি বহু প্রাচীন কালের এইরূপ কোনও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল?

দেবীপূজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারা এবং অসুরনাশিনী চণ্ডিকার ধারা যে দুইটি পৃথক্ ধারা বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করিবার জন্যই আমরা মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত চণ্ডী বা চণ্ডিকাকে নানা দিক্ হইতে একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। পরবর্তী

---

[৫] স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচণ্ডী, ভূমিকা।

[৬] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরের দেবী হইলেন ব্যাঘ্র-বাহনা। গুজরাটের জুনাগড়ের দেবীও হইলেন 'বাঘেশ্বরী'।

কালে এই পার্বতী এবং চণ্ডিকার মিশ্রণ ঘটিল বটে, কিন্তু সেই মিশ্রণের ফলে উভয় ধারা মিলিয়া-মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গেল এমন কথা মনে হয় না। পুরাণ, উপ-পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আমরা এই মিশ্র রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; কিন্তু কবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পার্বতী উমা বা গৌরীরই প্রায় একাধিপত্য দেখিতে পাই। মধুর-রসাশ্রিত কাব্য-কবিতায় অবশ্য অসুরনাশিনী দেবীর আসিবার কথা নহে, কিন্তু নমস্কারাদির শ্লোকে অসুরনাশিনী দেবীকে কিছু কিছু পাইতে পারিতাম; তাহাও তেমন লক্ষ্য করি না। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এ-কথাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। বাঙলা সাহিত্যে দেবীর কথা যেখানে আলোচনা করিব সেখানে দেখিব, মঙ্গলকাব্যগুলিতে শুধু পার্বতী ও চণ্ডিকার নয়—সমস্ত পৌরাণিক ও লৌকিক দেবীগণেরই মিশ্রণ ঘটিয়াছে; কিন্তু এই মিশ্রণের মধ্যেও পার্বতী উমার ধারাটিকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের পাঁচালী, আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের ভিতরেও আমরা এই ধারাটিকে চিনিয়া লইতে পারি। এই-সকল বিষয়েই পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(চ) কালী-দেবী ও কালীপূজার ইতিহাস

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর-একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলাদেশের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাঙলাদেশের শক্তি-সাধনা এবং শাক্ত-সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেইজন্য এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়া গেলেন তাহার ইতিহাস বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার আমাদের প্রবণতা। বেদের রাত্রিসূক্তকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে এক রাত্রিদেবীর ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে, কাঁহারও কাঁহারও বিশ্বাস সেই রাত্রিদেবীই পরবর্তী কালে কালিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী দেবীর প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী নির্ঋতি দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।[১] 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া

[১] স্যার জন উড্রফ-কৃত *Shakti and Shakta* গ্রন্থের ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়-লিখিত দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেবীকে কৃষ্ণা (কৃষ্ণ হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতিঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্ঋতিঃ, ৭।২।১১) বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪।১৭) নির্ঋতি দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে এবং নির্ঋতি দেবীর হস্তস্থিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই নির্ঋতি দেবীর পরবর্তী কালে আর কোনও ইতিহাস দেখি না। সুতরাং বর্ণনার সামান্য একটু কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, অন্ধকাররূপিণী রাত্রিদেবীকেও কালীর সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে কবি ভাসোকের নামে ধৃত একটি শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'ক্ষুৎক্ষামহকাণ্ডচণ্ডী চিরমবতুতরাং ভৈরবী কালরাত্রিঃ॥'

বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই 'মুণ্ডক উপনিষদে'; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥

এখানে 'কালী' আহুতি-গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্রই; মাতৃদেবীত্বের এখানে কোনও আভাসই নাই। শুধু বিশ্বরুচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই। 'মহাভারতে'ও যজ্ঞাগ্নির এই সপ্তজিহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শনিক মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নির সপ্তজিহ্বা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পৌরাণিক কালী-দেবীর সহিত মহাভারতের এই-সকল স্থলে বর্ণিত কালী-দেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর পরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করিতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্করী কালী-দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কালী-দেবী রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক: কালরাত্রি-রূপিণী এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার।

মহাভারতে কালী-দেবীর এই উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা হইতে পারে। পরবর্তী কালের যোজনা না হইলেও এই-সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীত্বের আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্করী ছায়ামূর্তি দর্শনের ন্যায়। কবি কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বলিয়া

গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঙ্গে বর-যাত্রার বর্ণনায় দেখিতে পাই, কৈলাস-পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযাত্রায় মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন; আর—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী
দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব॥—৭।৩৯

কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে বিদ্যুৎপ্রসারকারিণী বলাকাসমন্বিতা নীলমেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। মাতৃকাগণের পশ্চাদ্‌গামিনী এই কালী-দেবী কালিদাসের যুগেও একজন অপ্রধানা দেবী বলিয়া মনে হয়। 'রঘুবংশের' মধ্যে একটি উপমাতেও এই কালী বা কালিকা-দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণের জ্যা-নিঃস্বন শুনিয়া ভয়ংকরী তাড়কা রাক্ষসী যখন আত্মপ্রকাশ করিল তখন সেই ঘনকৃষ্ণ রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতেছিল চঞ্চলকপালকুণ্ডলা বলাকাযুক্তা কালিকার মত।

জ্যানিনাদমথ গৃহ্ণতী তয়োঃ
প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥—১১।১৫

মল্লিনাথ 'কালিকা' শব্দের অর্থ কালিকা-দেবী করেন নাই, 'কালিকা' শব্দের এক অর্থ 'ঘনাবলী', সেই অর্থ ধরিয়া এবং 'বলাকিনী' কথার সহিত যুক্ত করিয়া 'ঘনাবলী' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'চলকপালকুণ্ডলা' কথাটি তাড়কাসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহা কালিকা-দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবি কালিদাসের 'কালিদাস' নামটির ব্যুৎপত্তি কি? 'কালীর দাস' এই অর্থে কি কালিদাস? কালিদাসের লেখার মধ্যে কালী তেমন কোনও প্রসিদ্ধ দেবীত্ব লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু কালিদাস নামের ব্যুৎপত্তিতে মনে হয়, কালীর দেবীত্ব তখন যত সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক রক্তলোলুপা ভয়ংকরী দেবীর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই-সকল দেবী তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। আমরা 'খিল হরিবংশে' মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিত হইবার কথা পাইয়াছি। সুবন্ধুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'য় আমরা কুসুমপুরের গঙ্গাতীরে ভগবতী বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে

পারি। এই দেবী 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহাবন-দাবজ্বালা', 'মহিষমহাসুর-গিরিবজ্রসার-ধারা' এবং 'প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজূট-স্খলিত-জাহ্নবী-জলধারাশ্বেতপাদপদ্মা' বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা'। এই 'বেতালা' অভিধানটিই এখানে তালভঙ্গ করে। বাণভট্ট-রচিত (সপ্তম শতক?) 'কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে যে-ভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া 'চণ্ডী'র পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী-পূজক বৃদ্ধ শবরের যে জুগুপ্সিত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবর-পূজিতা রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চণ্ডী-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধারই দ্যোতনা করে। বাক্‌পতিরাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার 'গউড়বহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপূজিতা 'পর্ণ-' বা পত্রপরিহিতা 'পর্ণশবরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির রচিত (সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংস-বলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা; বনপ্রদেশ-সন্নিহিত শ্মশানঘাটের নিকটে ইঁহার মন্দির। ইনি কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা দেবী।

কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা-দেবীকে আমরা কালী বা কালিকা-দেবীর সহিত পরবর্তী কালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয়, ইঁহারা মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে ইঁহারা পরবর্তী কালে এক হইয়া গিয়াছেন।

এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডা-দেবী এক পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কেণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাদির সাহায্যেই পুরাণকারেরা এই-জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর-এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই দেবী 'কৌশিকী' নামে লোকে পরিগীতা হইলেন।[২] কৌশিকী-দেবী এইরূপে

[২] এই কৌশিকী-দেবী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার রূপেই শুম্ভ-নিশুম্ভ মুগ্ধ হইয়াছিল। এই 'কৌশিকী'-দেবী মূলে (ডক্টর ভাণ্ডারকারের মতে) কুশিক জাতির (tribe) দেবী ছিলেন। দেখিতেছি, এই কৌশিকীরূপেই দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। কুশিক-জাতির এই কৌশিকী-দেবীই কি শুম্ভ-নিশুম্ভ-অসুর-নিধনের উপাখ্যানাদি লইয়া হিমালয়বাসিনী পার্বতীর মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া হিমালয়বাসিনী দেবীকেই শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন? শিব-পুরাণ-সংহিতায় কৌশিকীর শুম্ভ-নিশুম্ভ হননের বিশেষ কারণ দেওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাইতেছি, দেবীর দেহ হইতে গৌরবর্ণা অনিন্দ্যসুন্দরী যে দেবী বাহির হইলেন তিনিই কৌশিকী; কিন্তু পদ্মপুরাণে অন্য কথা দেখিতে পাই, দেবীর দেহ হইতে কৃষ্ণবর্ণা যে রাত্রি-দেবী বাহির হইয়া আসিলেন তিনিই কৌশিকী—এই কৌশিকী-দেবীকে ব্রহ্মা বিন্ধ্যাচলে প্রতিষ্ঠিতা হইতে বলিলেন। কালিকা-পুরাণেও দেখি, কৌশিকী-রূপে পার্বতীর দেহ হইতে নিঃসৃতা দেবীই কৃষ্ণবর্ণ

দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, এইজন্য তিনি হিমাচলবাসিনী 'কালিকা'-নামে সমাখ্যাতা হইলেন।[৩] মনে হয় এই যুগে কালিকা-দেবী কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও খানিকটা গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য হিমাচলবাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দেখিতে পাই। শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হইলে—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্‌দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥—৭।৫-৬

তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিলেন; তখন কোপের দ্বারা তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রূকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন।

এই কালী-দেবী—

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥—৭।৭-৮

বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্কমাংসা (মাংসহীন অস্থিচর্মময় দেহ), অতিভৈরবা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্বা-হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্টা,—তাঁহার নাদে দিঙ্‌মুখ আপূরিত।

দেবী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেই কালী-দেবী বেগে দেবশত্রু অসুরগণের সৈন্যমধ্যে অভিপতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দেবী পৃষ্ঠ-রক্ষক, অঙ্কুশ-গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদিসহ হস্তীগুলিকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস করিতে লাগিলেন। শুধু হস্তীগুলিকে নয়, ঘোড়ার সহিত যোদ্ধাকে, সারথির সহিত রথকে মুখে ফেলিয়া দিয়া দন্তদ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্বণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও চুলে ধরিলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধরিলেন; কাহাকেও পায়ের

ধারণ করিয়া কালিকা রূপ গ্রহণ করিলেন। সেই দেবীই কালরাত্রি (৫।২৩।২-৩)। পরস্পর-বিরোধী উপাখ্যানগুলি দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, কৌশিকী নামে যে পৃথক্ দেবী ছিলেন তাঁহাকে মহাদেবীর সহিত মিশাইয়া লইবার এই-সব পৌরাণিক চেষ্টা।

[৩] তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥—৫।৮৮

দ্বারা আক্রমণ করিয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মর্দিত করিলেন। সেই অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রগুলিকে এবং মহাস্ত্রগুলিকে তিনি মুখে গ্রহণ করিলেন এবং রোষে দন্তদ্বারাই মথিত (চূর্ণ) করিলেন। অসুরদলের কতকগুলিকে তিনি মর্দন করিলেন, কতকগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতকগুলিকে বিতাড়িত করিলেন। অসুরগণ কেহ কেহ অসিদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাড়িত হইল কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অসুরসৈন্য নিপাতিত দেখিয়া চণ্ড সেই অতিভীষণা কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই মহাসুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণ-নয়নাকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদয়ে যেমন অসংখ্য সূর্যবিম্ব শোভা পায় সেইরূপ চক্রসমূহ তাঁহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর ভৈরবনাদিনী কালী অতিরোষে ভীষণভাবে অট্টহাস্য করিলেন—তাঁহার করাল বক্ত্রের অন্তঃপাতী ভীষণদর্শন দশনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পরে মহাখড়্গ উত্তোলনপূর্বক দেবী হুঙ্কারনাদে (হং শব্দে) চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তাহার চুলে ধরিয়া সেই খড়্গের দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গের দ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। হতশেষ অসুরসৈন্য চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালী চণ্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অট্টহাস্যের সঙ্গে বলিলেন,—'এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুণ্ড দুই মহাপশু তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শুম্ভ-নিশুম্ভকে হনন করিবে।' দেবী চণ্ডিকা তখন কালীকে বলিলেন,—

যস্মাৎ চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥—৭।২৭

'যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে (তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আসিয়াছ, সেই কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে।'

চণ্ড-শব্দ হইতে বা মুণ্ড-শব্দ হইতে চামুণ্ডা-শব্দ হয় না; চণ্ডের চ ও মুণ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে 'চ'কে দীর্ঘ করিয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'-প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ব্যুৎপত্তিগুলি প্রায়ই গোঁজামিলের জন্য পুরাণকারগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার তৎকালের প্রচলিত কালী-দেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুণ্ডা-দেবীকে মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবীকে 'কালী' করিয়া এবং চণ্ড-মুণ্ড-হন্ত্রী চামুণ্ডা করিয়া সেই কার্য সাধন করিলেন।

রক্তবীজ-বধের সময়ও, কালী দেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তধারা ভূমিতে পড়িবামাত্রই সেই

রক্ত হইতে রক্তবীজের ন্যায় অসংখ্য অসুর যোদ্ধা উত্থিত হইতেছিল; তখন দেবী চণ্ডিকা—

উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥

দেবী কালীকে বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রক্তবিন্দুসকল মুখব্যাদানের দ্বারা গ্রহণ করিতে বলিলেন—এবং সেই রক্তনির্গত অসুরগণকেও ভক্ষণ করিতে বলিলেন। দেবী এই বলিয়া শূলের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাঁহার রক্ত লেহন করিলেন। সেই কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে যত অসুর সমুদ্গত হইয়াছিল তাহাদিগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ করিলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত পানের ফলে রক্তবীজ নিরক্ত হইয়া গেল, দেবী তখন সহজেই তাহাকে হনন করিলেন। কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপত্ব এইভাবে 'চণ্ডী'তে প্রকাশ পাইল।

রক্তলোলুপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী রূপ দেখিতে পাইলাম অন্যান্য পুরাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দেখিতে পাই। উপপুরাণগুলিতে ইহার আর কিছু কিছু বিস্তারও দেখিতে পাই। পরবর্তী কালের পুরাণতন্ত্রাদিতে আমরা কালী ও চামুণ্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক্ করিয়াও পাই। উভয় দেবীর ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা; আলুলায়িত-কুন্তলা নন, 'পিঙ্গলমূর্দ্ধজা' (জটাধারিণী?); উলঙ্গিনী নন, শার্দূলচর্মাবৃতা; (কোন কোন পুরাণে গজচর্মাম্বরা); সর্বস্থলের বর্ণনাতেই দেখি, চামুণ্ডা-দেবী নির্মাংসা এবং কৃশোদরী, তাঁহার চক্ষু কোটরাগত। কোন স্থলেই কালিকার এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত সঙ্কলন-গ্রন্থগুলিতে কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে কালিকা অজিনাবৃতা।[৪] 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত উমাপতি ধরের একটি শ্লোকেও কালীকে অজিনাবৃতাই দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তী কালের মিশ্রণের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। চামুণ্ডার বর্ণনায় একটা জিনিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করি, চামুণ্ডা অতি ক্ষুধায় কৃশোদরী। কবিগণ কর্তৃক কালীর বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালীকে ক্ষুধার্তারূপে দেখি। ভাসোক কবি কালীকে 'ক্ষুৎক্ষামা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে কালীর বর্ণনায় দেখি—

দীপ্তক্ষুদ্বেগযোগাদ্বদনলহলহল্লম্বজিহ্বাগ্রলীঢ়-
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোদ্রবিন্দুপ্রবলতরভবজ্জাঠরাগ্নিস্ফুলিঙ্গাম্।
কালীং কঙ্কালশেষামতুলগলচলন্মুণ্ডমালাকরালী-
গুঞ্জাসংবাদিনেত্রামজিননিবসনাং নৌমি পাশাহিহস্তাম্॥[৫]

[৪] সদুক্তিকর্ণামৃত।

[৫] কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই ক্ষুধার্ত কালীমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া একটি অপূর্ব আধুনিক কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহার "ত্রিযামা" কাব্যগ্রন্থের 'ভিখারিণী' কবিতায়।

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিতে চাহি না। এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। শিব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।[৬] কিন্তু কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারূঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা। দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই—

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্।

. . . . . .

মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥

পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তায় শক্তি-বিহনে শিবেরই শবতা-প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তী কালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন--শবারূঢ়া দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের শবারূঢ়া বলিয়াই যে দেবী শিবারূঢ়া বলিয়া কীর্তিতা বাঙলাদেশের শাক্ত পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত একটি গান দেখিতে পাই--

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে॥[৭]

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা-প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তি-তত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রচিত মৈথিল কৃষ্ণসিংহ ঠাকুরের দেবীবর্ণনাতেও

[৬] বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা—'শিবের বুকে শ্যামা কেন?' দ্রষ্টব্য।
[৭] ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৯৮।

দেখি—'শিবশবরূপ-উরসি তুঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে।'[৮] তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে।—

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে॥

বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রাদির ভিতরে 'কালীতন্ত্র'-ধৃত কালীর বর্ণনাই কালীর ধ্যানরূপে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এই রূপই এখন সাধারণভাবে বাঙলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামহস্ত-যুগলের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির, আর ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালী-দেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা-দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী—শ্মশানগৃহবাসিনী। বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র; তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ-ব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা; তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীতরতাতুরা', সুখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরুহা'।[৯]

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' অজ্ঞাতনামা কবির একটি চমৎকার কালীবর্ণনা পাওয়া যায়।—

শিখণ্ডে খণ্ডেন্দুঃ শশিদিনকরৌ কর্ণযুগলে
গলে তারাহারস্তরলমুডুচক্রং চ কুচয়োঃ।
তড়িৎ কাঞ্চী সন্ধ্যা সিচয়রচিতা কালি তদয়ং
তবাকল্পঃ কল্পব্যুপরমবিধেয়ো বিজয়তে॥

[৮] শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কলিত গীতিমালা—৯৪। ৩১-৩২।
[৯] করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।—ইত্যাদি।

শিখণ্ডিনী দেবীর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াতেই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণযুগলে দুই কুণ্ডল হইল চন্দ্র সূর্য; গলায় তারার হার, কুচযুগলে উড়ুচক্র (তারকাচক্র): তড়িৎই কাঞ্চী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন।

'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি পার্বতী-দেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, মহদ্‌যোনি-স্বরূপা আদিশক্তিস্বরূপিণী মহাদ্যুতি-সম্পন্না সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা যিনি মহাকালী তাঁহার আবার শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব বলিতেছেন,—'হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেতপীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই যোগিগণের হিতের জন্য সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃতত্বের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্যয়া কল্যাণরূপিণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি-সূর্য-অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক্ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ্ হইতে জীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত। রজোগুণজনিত বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন; এইজন্যই, হে ভদ্রে, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী দেবী কালসম্ভূত ক্রীড়ামগ্ন সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতের জন্য গুণানুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।'[১]

'ব্রহ্মযামলে' আদ্যাস্তোত্রে যেখানে আদ্যা দেবী কোন্ দেশে কি মূর্তিতে পূজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই, 'কালিকা বঙ্গদেশে চ', বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপে পূজিতা। উক্তিটিকে আমি ইতিহাসের দিক্ হইতে গভীরার্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করি। দেশ-হিসাবে বাঙলা-দেশই শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক্ হইতে বিচার করিলে বাঙলা-দেশে কালীপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন পর্যন্তও দুর্গাপূজারই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁকজমক। কিন্তু বাঙালী যে বিশেষ করিয়া শাক্ত তাহা ত শুধু তাহার ধর্মোৎসব-রূপে শক্তি-পূজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য; সেই সাধনার দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখিব, খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল

[১] বঙ্গবাসী সং, ১৩।২-১৩।

পর্যন্ত শক্তিসাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালীস্থানীয়া করিয়াই লইয়াছি; দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচলিত সে-কথা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত কতকগুলি দুর্গাপূজাবিধান পাইতেছি। এই বিধানগুলি মুখ্যতঃ দেবী-পুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ জাতীয় কয়েকখানি উপপুরাণ হইতে সঙ্কলিত।

বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে দেখিতে পাই, 'কালীবিলাসতন্ত্রে' কার্তিক-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণাদির মধ্যে অগ্নিপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গৌরীপূজার বিধান আছে। ঐ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমা-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয়। গরুড়-পুরাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবীপূজা-বিধানকারগণের পরিচয় অনেকেই দিয়াছেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ভূমিকায় ইঁহাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ (ষোড়শ?) শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব'-নামক একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'-নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চনকৌমুদী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫—১৪৮০) তাঁহার 'ক্রিয়াচিন্তামণি' এবং 'বাসন্তীপূজাপ্রকরণ' গ্রন্থ-দ্বয়ে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫—১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে (১৪৭৯ খৃীঃ) মৃন্ময়ী দেবীর পূজা-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসববিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তী-বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূত-বাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলার এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতি-

নিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাঙলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী।"

উপরি-উক্ত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। পূজাবিধি রচিত হইবার পূর্বে হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে। কিছুদিন পূজা প্রচলিত থাকিলেই পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়—ধর্মের ইতিহাসে এইরূপই সাধারণতঃ দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি যে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ মিথিলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরবিজয়ী ধীরসিংহের আদেশে (মতান্তরে ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের আদেশে)[১১]; আদেশ পাইয়াই বিদ্যাপতি পূজাবিধি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিরূপে? 'দৃষ্টবা নিবন্ধস্থিতিং' —এ বিষয়ে পূর্ববর্তী যে নিবন্ধ-সকল ছিল তাহা দেখিয়া। প্রথমে হয়ত পূজাবিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; রাজা ও তৎস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূজায় উৎসব-অনুষ্ঠান জাঁকজমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, পূজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বর্ধিত-কলেবর হইতে লাগিল।

বর্তমানে আমরা বাঙলাদেশে যেভাবে দুর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবত ষোড়শ শতকে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। কথিত হয়, কুল্লুক ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ শাস্ত্রী তাঁহাকে দুর্গাপূজা করিবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ।

বাঙলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলাদেশে 'কালী' নানা প্রকারের আছেন; 'তন্ত্রসারে' আমরা বিবিধ প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করিয়া ষোড়শ শতকের লোক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের

[১১] ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনূদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে,—ধীরসিংহদেবপাদানাং সমরবিজয়িনাং, কৃতৌ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পরিপূর্ণা।

'তন্ত্রসার'-নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন-গ্রন্থকে পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'তন্ত্রসারে'র মধ্যে কালী- বা শ্যামা-পূজার বিধি ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধন বিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়াকলাপবিধি সম্বন্ধে গ্রন্থরচয়িতৃরূপে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক।[১২] ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী'তে শাক্তদিগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত 'শ্যামারহস্যে' কালীর উপাসকের আচার-অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অপর একজন গ্রন্থকার (সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌড়ীয় শঙ্কর' নামে অভিহিত হন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'তারারহস্যবৃত্তিকা'-গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমান কালে যে-সব স্থানে নিত্য কালীপূজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে 'মানসিক'-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবৎসরিক কালীপূজার বিধি হইল দীপালি-উৎসবের দিনে। দীপালি-উৎসবের দিনে এই কালীপূজা বা শ্যামাপূজার বিধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে।[১৩] কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যেভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে সুগৃহীত ছিল না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বৎসর দশ সহস্র করিয়া কালীমূর্তি পূজিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র সহস্র খণ্ড বস্ত্র এবং সমপরিমাণ অন্যান্য উপচারে কালী-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রটন্তী চতুর্দশীর রাত্রিতে (মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা 'স্মৃতিসমুচ্চয়'-গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

[১২] এ-বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-লিখিত *The Cultural Heritage of India,* চতুর্থ খণ্ডে 'Sakta Worship and the Sakta saints' প্রবন্ধ ও তদ্‌রচিত 'তন্ত্রকথা' (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

[১৩] অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'Sakta Festivals of Bengal and their Antiquity' (*Indian Historical Quarterly,* September, 1951) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বৃহস্পতি, রায়মুকুট এবং কাশীনাথ তর্কলঙ্কার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪]

এই দেবী-পূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে, এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান রচয়িতৃরূপে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহারা সাধকও ছিলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি শবরূপী ভৃত্য পূর্ণানন্দের দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তান্ত্রিক সাধকগণ 'সর্ববিদ্যা'র বংশ বলিয়া খ্যাত। তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকালী'রও প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তী পাণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেব-নামক সাধকের গৃহে ইনি কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। তাঁহার নাম ছিল জয়দুর্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরী বলিয়া প্রবাদ। তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছিল।[১৫] গোঁসাই ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্নগর্ভ-নামক সাধক ঢাকা জেলার মায়ৈসারের দিগম্বরী-তলায় বীরাচারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত হয়, ইনি প্রসিদ্ধ 'বারভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামা-ক্ষেপার জন্ম হয়; তারাপীঠ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির স্থান।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শক্তিসাধকরূপে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শাক্ত-পদাবলীর তিনিই প্রবর্তক। তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাক্ত গান রচনা করিয়াছেন।[১৬] দক্ষিণেশ্বরের মা 'ভবতারিণী'র মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙলার এই শক্তি-সাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শক্তি-সাধনার অন্তর্গূঢ় রহস্যকে

[১৪] পূর্বোক্ত 'Sakta Festivals of Bengal' ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[১৫] তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

[১৬] অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম.এ.-রচিত 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা' গ্রন্থখানির কবিপ্রসঙ্গ-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সহিত যুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক দার্শনিক রূপ দান করিয়াছেন।

আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে বাঙলাদেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূজাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মোৎসবের ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবধি বাঙালীর সর্বপ্রধান পূজা। এখনও আমরা সাধারণভাবে 'পূজা' বলিতে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই মনে করি; 'পূজা আসিতেছে, এবারে পূজা কোন্ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'পূজা' কথার লক্ষ্য কি, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু 'দুর্গাপূজা' আমাদের সাংবৎসরিক উৎসব-বিশেষ মাত্র। সাংবৎসরিক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপূজার প্রচলন তেমন কোন অঞ্চলে দেখিতে পাই না।[১৭] রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে সঙ্কল্পপূর্বক চণ্ডীপাঠ বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অঙ্গরূপে দেখা যায়। কিন্তু এই-সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও প্রাধান্য দেখিতে পাই না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানারূপে পূজা করিয়া থাকি। লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা—সর্বশেষে বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পূজা—ইহার মধ্যে এক কালীপূজা ব্যতীত আর সবই সাংবৎসরিক পূজা। শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন সাধারণভাবে কালী—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিদ্যার অন্য কোনও রূপ।

বাঙলাদেশের শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে কালী-দেবীরই যে প্রাধান্য দেখিতে পাই ইহার কারণ কি? দুর্গাকে পিছনে ফেলিয়া তিনি এইরূপে কখন্ কিভাবে সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন? এই প্রশ্নটির উত্তরের কথা আমাদিগকে নানা দিক্ হইতে ভাবিতে হইবে। এ-বিষয়ে সর্বপ্রথমেই একটি তথ্য অতিশয় প্রধান এবং স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। শারদীয়া দুর্গাপূজায় পূজা অপেক্ষা উৎসব-আনন্দের দিক্‌টাকেই আমরা বড় করিয়া পাইয়াছি। এই উৎসব-আনন্দের রূপটা যে ভক্তিহীন জাঁকজমক-প্রধান বিংশ শতাব্দীতেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, শারদীয়া পূজার প্রথমাবধিই এই জিনিসটি আমরা লক্ষ্য করি। দুর্গাপূজাকে আমরা শস্য-সম্পদ্-শক্তি-রূপিণী মায়ের আগমনী-উৎসব বলিয়া জানি, অথবা তাহাকে বিজয়োৎসবের সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছি। 'বিজয়া' বা

[১৭] কোনও কোনও মন্দিরে অবশ্য হরগৌরী বা হরপার্বতীর নিত্যপূজা প্রচলিত আছে। দুই-একটি মন্দিরে ধাতুনির্মিতা দুর্গা-দেবীর নিত্যপূজাও প্রচলিত আছে।

'দশহরা' (দশেরা)[১৮] আমাদের দুর্গাপূজারই অঙ্গ। এই বিজয়-উৎসব কিসের বিজয় তাহা আজ আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না, কেহ বলি রাম কর্তৃক রাবণ-বধের পর বিজয়োৎসব, কেহ বলি প্রাচীনকালে বর্ষার অত্যয়ে শরৎকালে রাজা-মহারাজাদিগের দিগ্বিজয়-যাত্রায় দেবীপূজার উৎসব; মূল বিজয়োৎসব যাহাই হোক না কেন, আজ পর্যন্ত মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে 'দশেরা' বা বিজয়া-উৎসবের দিনে দলবদ্ধভাবে বিজয়-অভিযানের অনুকরণ করা হয় এবং বিজয়ের সাফল্য-চিহ্নস্বরূপ লোকগণ শমীশাখা অথবা শমীশাখার অভাবে অন্য কোনও বৃক্ষশাখা ভাঙিয়া হাতে করিয়া বিজয়োল্লাসে বাড়িতে ফিরিয়া আসে।

দুর্গাপূজার প্রথমাবধি সবই উৎসব; সে উৎসব একজনের নয়, যাঁহারা বাড়িতে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন শুধু তাঁহাদের উৎসব নয়, যাঁহারা পূজা করেন এবং যাঁহারা না করেন সকলেরই উৎসব—ইহা বাঙলার শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্য-নির্বিশেষে—এমন কি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে—আমাদের জাতীয় উৎসব। বাড়িতে পূজা করি আর না করি, নব-বস্ত্র এবং নব পোশাক-পরিচ্ছদ সকলকেই পরিতে হইবে, পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজন আড়শী-পড়শী লইয়া আনন্দ-কোলাহল এবং খানিকটা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত। তাহার পরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ প্রণাম-আশীর্বাদ—ইহা ত ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেরই অবশ্যকরণীয়।

এইসব বহিরঙ্গ উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিয়া পূজানুষ্ঠানের কথাই যদি আলোচনা করি তবেও দেখি, আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ভক্তি-উপচারে হইবার জিনিস নয়, যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতি-সম্পন্ন না হইলে কেহ দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন না। প্রথমতঃ বহির্বাটিতে একখানি 'মণ্ডপ' গৃহ চাই; প্রতিমা-নির্মাণে ব্যয় আছে; তিন দিবসব্যাপী পূজার উপচার যথেষ্ট প্রয়োজন; তদুপরি ছাগ-মহিষাদির বলিবিধি আছে। এক মহাষ্টমীর দিনে দেবীকে স্নান করাইবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে বিধিপূর্বক তাহা করিতে গেলে যথেষ্ট সঙ্গতি, উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বাদ্য-বাজনার প্রাচুর্যও এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বাঞ্ছনীয়। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, দুর্গাপূজা শুধু পুরোহিতের দ্বারা হইবার নহে; এখানে পুরোহিতের সহিত, কুমার, নট্ট, মালাকর, ভূঁইমালী—এমন কি ধোপা-নাপিত প্রভৃতি সকলের প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, দশহরার পরদিন প্রত্যূষে যে পর্যন্ত নাপিত আসিয়া কাংসনির্মিত দর্পণে মুখ দর্শন করাইয়া না গিয়াছে

[১৮] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে দশেরা—দশ-রা, দশ রাত্রি; নবরাত্র-ব্রতের পরে দশ-রা উৎসব।

সে পর্যন্ত আমাদের বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার বিধি ছিল না; বোধনের পূর্বে ভূঁইমালী আসিয়া বিল্বশাখা প্রতিষ্ঠার 'খোলা' পরিষ্কার না করিয়া দিলে পূজানুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইল বলিয়া আমাদের সংস্কার ছিল; মালাকর আসিয়া নববস্ত্রে অবগুণ্ঠনবতী নবপত্রিকার নাকের জন্য শোলানির্মিত খাঁচার আকৃতি একটি নোলক যথাসময়ে জোগান না দিলে প্রতিমাকে আমরা অপূর্ণ মনে করিতাম।

বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করিলে বোঝা যাইবে, এই ব্যাপক সাংবৎসরিক উৎসবের সহিত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত্র এবং পরবর্তী কালের জমিদারী-তালুকদারী-তন্ত্রের যোগ রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ধনী জমিদারগৃহের দুর্গাপূজার উৎসবের প্রসিদ্ধি ছিল। গ্রামাঞ্চলেও মহাসমারোহে বাৎসরিক দুর্গাপূজা জমিদার-তালুকদারগণের মর্যাদারই একটা প্রধান চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। দোল-দুর্গোৎসব ক্রিয়ান্বিত বনিয়াদী পরিবারের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান ছিল।

দুর্গাপূজার এই উৎসব-প্রধান রূপটি যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগে (অর্থাৎ দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতকে) এবং আধুনিক যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নয়; এই পূজার আদিতেই ইহার উৎসব-রূপ ছিল। দেবীপূজার সহিত শস্যোৎসবের যোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; বিজয়া-উৎসবের যোগের কথাও কিছু পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন, শারদীয়া পূজার মূলে সবটাই উৎসব,—শরৎ-কালীন নববর্ষের উৎসব। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পূজা-পার্বণ গ্রন্থখানিতে লিখিয়াছেন,—

"তবে কাহার আহ্বানে ঘরদ্বার ভূষিত হইয়াছে, আত্মীয়স্বজন মিলিত হইয়াছে? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে? সে জানে না, শরৎঋতুর; জানে না নববর্ষের আহ্বান অন্তরে অনুভব করে।

"ইহার উৎপত্তি চিন্তা করিতেছি। ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত ঋতুতে আরম্ভ এই কারণে তাঁহারা 'হিম' শব্দে বৎসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বুঝাইত। খৃষ্টান জাতি শীত ঋতু হইতে বৎসর আরম্ভ করে। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানুআরি আরম্ভ করে। এইরূপ, ঋগ্বেদের ঋষিগণও হিম ঋতু হইতে বৎসর গণিতেন। কতকাল পরে কে জানে, তাঁহারা শরৎ ঋতু হইতেও আর এক বৎসর গণিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরের নাম শরৎ। 'শতং শরদঃ জীবতু,' শত শরৎ বাঁচিয়া থাক, এইরূপ আশীর্বচন ছিল। ইহা অদ্যাপি শুনিতে পাই। আমরা সে দুই বৎসরই গণিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানি না। আমরা ১লা বৈশাখ বৎসর ধরিতেছি, কিন্তু এই

রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২১ বৎসর পূর্বে ২৪১ শকে, ইং ৩১১ সালে ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়।

"বৈদিক যজ্ঞের দিন নির্ণয়ের নিমিত্ত কয়েকটি সূত্র প্রণীত হইয়াছিল। সে সকল সূত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দে এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল। তাহাতে আছে, পৌষ অমাবস্যার উত্তরায়ণ। অতএব তদবধি আট মাস আট তিথি গতে আশ্বিন শুক্লাষ্টমী গতে নবমীতে শরৎ প্রবেশ হইত। বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণেই দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণ। এই কারণেই দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য। কিন্তু এই গণনা স্থূল; সূক্ষ্ম গণনায় আমাদের বর্তমান পাঁজিতে নবমীতে নয়, দশমীতে শরৎ প্রবেশ হয় এবং সেই বিধি অনুসারে দশমীতে বিজয়া হয়। সেদিন বিজয়োৎসব। সেই উৎসবের জন্যই, নব বৎসরের নবসূর্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই আমরা গৃহদ্বার মার্জিত ও সজ্জিত করি; নিজ দেহ নববস্ত্রে শোভিত করি। . . . .

"বঙ্গদেশ, আসাম ও বিহারের কিয়দংশে দুর্গাপূজা হয়। ভারতের অন্যত্র লোকে নবরাত্র ব্রত করে। আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নবরাত্র, নয় দিনের ব্রত। পরদিন দশরাত্রি, সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোকে 'দশরা' পরব বলে (দশহরা নয়)। 'দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রবির উদয় হইবে। এই জন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ।

"শরদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শরদোৎসব; শরৎ ঋতু প্রবেশ জনিত উৎসব।"

আচার্য রায় মহাশয়ের এই মত সর্বাংশে গ্রহণীয় না-ও হইতে পারে; কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজা যে শুধু দুর্গাপূজা নয়—মূলেও যে ইহার একটি উৎসব-প্রকৃতি ছিল এবং পরবর্তী কালেও যে নানা উৎসব ইহার সহিত নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে সেই কথাটাই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দুর্গাপূজায় এই উৎসব-প্রাধান্যের জন্যই মনে হয় সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গা প্রাধান্য-লাভ করিলেন না, করিলেন কালী এবং দশমহাবিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ।

শুধু এইটুকুই নয়, ইহার মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। বাঙলা শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে কালী-প্রাধান্যের ভিতরে আরও অনেক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন পুরাণ এবং উপপুরাণের মধ্যে কালীর কথা যেভাবে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, প্রথমতঃ এই উপপুরাণকারগণ নানাভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কালী এবং পার্বতী-দেবী (তাঁহার উমা, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী সর্ব-রূপে) অভিন্না এবং এই করিয়া কালী-দেবীকে প্রথমে মহাদেবীরূপে স্বীকৃতা এবং প্রতিষ্ঠিতা করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহার পরে দ্বিতীয় রকমের চেষ্টা

দেখিতে পাই, কালীই যে মূল দেবী এবং পার্বতী দেবী তাঁহার উমা, গৌরী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি সর্বরূপেই এই সর্বমূলা কালী-দেবী হইতেই প্রসৃতা, সেই মূলা দেবীরই রূপভেদ-মাত্র। এইভাবেই কালিকা বা কালী-দেবীকে প্রধানা করিয়া উমা, গৌরী, দুর্গা, চণ্ডী রূপধারিণী দেবীকে মূল হইতে প্রসৃতা দেবী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। খিল হরিবংশে দেখি, বাণপুরে ঊষাসহ অনিরুদ্ধ বাণরাজা কর্তৃক বন্দী হইয়া 'কোটবী' দেবীর স্তব করেন। এই স্তবের মধ্যে দেবী একদিকে যেমন চণ্ডী, কাত্যায়নী, বিষ্ণুভগিনী, 'গোকুলসম্ভূতাং নন্দগোপস্য নন্দিনীং', প্রজ্ঞা, দক্ষা, শিবা, সৌম্যা—আবার অন্যদিকে দেবীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশিনীম্' (১২০ অধ্যায়)। 'দেবীপুরাণে'র মধ্যে কালিকা বা কালীকে বহুস্থানেই মূল-দেবীর সহিত অভিন্না-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক স্থলে দেখিতে পাই, পূর্বকালে নন্দী মহৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা জগদ্গুরু দেবদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন; আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবেশ্বর শম্ভু নন্দীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন; নন্দী উমাদেহার্ধধারী শিবের নিকট 'পদমালা মহাবিদ্যা' প্রার্থনা করিলেন; তখন সেই উমাদেহার্ধধারী মহাদেব যে 'পদমালা বিদ্যা' বর্ণনা করিলেন তাহার আরম্ভেই দেখি,—"ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি খট্বাঙ্গ-কপাল-হস্তে মহাপ্রেত-সমারূঢ়ে"[১৯]—ইত্যাদি। এ-জাতীয় মন্ত্র দেখিলেই বেশ বোঝা যায় এই যুগে চামুণ্ডা কালী মহাদেবীর সঙ্গে অতি সহজেই অভিন্নতা লাভ করিয়া আছেন। দেবীর কালী নামটি অন্যান্য নামের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গৃহীত দেখি।

গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী।
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ॥[২০]

বিশেষরূপে লক্ষণীয় কালী বা কালিকার মূল পার্বতী দেবীরূপে বর্ণনা এবং গৌরীর তজ্জাতত্ব। এই কাহিনীর মতে দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দার জন্য দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় শিব-লাভের জন্য পার্বতী কালীরূপে হিমালয়ের কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার বর্ণনা দেখি শ্যামজলদাভা, কোথায়ও দেখি নীলোৎপলদলচ্ছবি। এই হিমাচল-সুতা কালীর সহিতই মহাদেবের পরিণয় হয়; কঠোর তপস্যাদ্বারাই এক সময়ে কালী তপ্ত-কাঞ্চনাভ গৌরীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। সৌর-পুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। মৎস্য-পুরাণ এবং শিব-পুরাণেও এই কাহিনী দেখিতে পাই।

[১৯] ৯ম অধ্যায়। এই মন্ত্র গড়ুর-পুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়েও ধৃত দেখিতে পাই।
[২০] দেবী-পুরাণ ৬০ অধ্যায়। এই শ্লোক এবং এ-জাতীয় শ্লোক অন্য পুরাণেও দেখা যায়।

এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তার কালিকা-পুরাণে। সৌর-পুরাণে দেখি,[২১] ঋষিগণ সূতের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

ব্রূহি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেষ্ঠিনঃ।
কালী হৈমবতী গৌরী পুনর্জাতা কথং বিভো॥

উত্তরে সূত বলিয়াছিলেন—

যা সা দক্ষসুতা দেবী সতী ত্রৈলোক্যপূজিতা।
ত্যক্ত্বা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভুবাচলকন্যকা॥
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী।
জগচ্চৈতন্যরূপা চ জগচ্চৈতন্যবোধিনী॥

তাহার পরে সেই হিমাচল-কন্যা পার্বতী কালী হিমালয়েরই এক পুণ্যস্থানে শিবলাভ কামনায় তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তারকাসুরের উৎপাত আরম্ভ হইল; তখন ইন্দ্রের অনুরোধে অকালবসন্ত-সহায়ে রতিসহ মদন এই কালী-দেবীকে লইয়া যোগমগ্ন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গেলেন—পরে 'কুমার-সম্ভবে' বর্ণিত সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে যে বর্ণনা পাই তাহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে দেখিতে পাই দক্ষ-সুতা সতী হিমাচল-সুতা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যখন মাতা মেনকার জঠরে ছিলেন তখন ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে বলিলেন যে, পার্বতী জন্মমাত্রই 'হরসঙ্গমলালসা' হইবেন; কিন্তু দেবীর যদি কঠোর তপস্যার পরে পুত্র না হয় তবে সে পুত্র তারকাসুর-বধের অধিকারী হইবে না; সুতরাং হর-পার্বতীর মধ্যে কিঞ্চিৎ বিবাদের কারণ ঘটান প্রয়োজন। এই বিবাদের নিমিত্ত-স্বরূপই ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে অনুরোধ করিলেন তাঁহার অমোঘ মায়ায় মাতৃকুক্ষিতেই দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করিয়া দিবার জন্য; রাত্রিদেবীও তাহাই করিলেন[২২]। তাহার পরে কুমারসম্ভবের অনুরূপভাবে পার্বতী এবং মহাদেবের বিবাহ হইল। রম্য মন্দিরমধ্যে শঙ্কর-পার্বতী যখন শয়ন করিয়া ছিলেন তখন শশিমৌলী শুভ্রদ্যুতি মহাদেবের দেহলগ্না নীলোৎপলদলচ্ছবি অসিতাপাঙ্গী পার্বতীকে বিভাবরী-দেবীর সংযোগে অতিতমোময়ী দেখাইতে-ছিল—

গিরিজাপ্যসিতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
বিভাবর্যা চ সংপৃক্তা বভুবাতিতমোময়ী॥[২৩]

শঙ্কর তখন উপহাস করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ॥[২৪]

---

[২১] ৫৩—৬০ অধ্যায়।
[২২] ৪৩ অধ্যায়।
[২৩] ৪৩।৫১৬।
[২৪] ৪৪।১।

হে তনুদোহি, আমার শুভ্র শরীরে কৃষ্ণবর্ণা তুমি শোভা পাইতেছ—ঠিক যেন শুভ্র চন্দনতরুর দেহে একটি কালভুজঙ্গিনী।

এমন উপহাসে দেবী অত্যন্ত কুপিতা হইলেন এবং পিনাকীর কণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃত্তা হইলেন। দেবী যেমন অতি তীক্ষ্ম ভাষায় শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। দেবীকে তিনি যে বক্রোক্তি করিলেন তাহা অতি প্রাসঙ্গিক না হইলেও উদ্ধারযোগ্য। শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন,—সত্য সত্য সর্ব-অবয়বের দ্বারাই তুমি পিতৃসদৃশ—

হিমাচলস্য শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ।
তথা দুরবগাহ্যেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ॥
কাঠিন্যমশ্মসারেভ্যো বনেভ্যো বহুলাঙ্গতা।
কুটিলত্বং নিম্নগাভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদপি॥[২৫]

হিমালয়ের শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুল তোমার মন, তাহার দুরবগাহ্যত্ব হইতে তোমার গহন হৃদয়, প্রস্তরসমূহ হইতে তোমার কাঠিন্য, বনসমূহ হইতে তোমার বহুলাঙ্গতা, নিম্নগা (স্রোতস্বিনী)-সমূহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম হইতে তোমার দুঃসেব্যত্ব।

এইরূপে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবী যখন বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন পুত্র বীরক আসিয়া পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আমাদের ফেলিয়া মা তুমি কোথায় যাইতেছ?' দেবী উত্তর করিলেন—

'আমি দুষ্কর তপস্যাদ্বারা শঙ্করকে পতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে আমাকে নিভৃতে বহুবার শ্যামলবর্ণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; তাই আমি কাঞ্চনাভবর্ণা এবং সেইরূপে নাম সংযুক্তা হইয়া ভূতপতি ভর্তার অঙ্গসঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।'[২৬] দেবীর এই কথা শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—'তাই হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচারিণী হও।' তখন দেবী ফুল্লনীলোৎপলবর্ণ দেহের কৃষ্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিলেন; দেবী কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই ত্বক্ই দীপ্তা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা নানাভরণযুক্তা পীতকৌশেয়ধারিণী এক দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করিল। সেই নীলমেঘবর্ণা দেবীকে ব্রহ্মা বলিলেন,—'হে রাত্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা তুমি "একানংসা" দেবীরূপে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্রোধসমুদ্ভূত সিংহ তোমার বাহন হইবে—তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর।'[২৭] পদ্ম-পুরাণ-মতে এই কৃষ্ণবর্ণা

[২৫] ৪৪। ১৮-২০।
[২৬] তপসা দুষ্করেণাপ্তঃ পতির্বৈ শঙ্করো ময়া।
স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্ রহঃ॥
তস্মাদহং কাঞ্চনাভবর্ণা তন্নামসংযুতা।
ভর্তুর্ভূতপতেরঙ্গমেকতো নির্বিশেহঙ্কবৎ॥—৪৪। ৮৫-৮৬
[২৭] ৪৪। ৮৭-৯৪।

দেবীই কৌশিকী। কৃষ্ণত্বক্ ত্যাগ করিবার পর হইতেই দেবী গৌরী হইলেন। স্কন্দ-পুরাণেও রাত্রিদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করিয়া দিবার উপাখ্যান দেখা যায়।

কালিকা-পুরাণে কালীরই মূল দেবীত্বের কথা অতিশয় 'ফলাও'ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে দেখি বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী দেবী দক্ষসুতারূপে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি তখনও 'সিংহস্থা কালিকা কৃষ্ণা'।[২৮] তিনি তনু ত্যাগ করিয়া হিমালয়গৃহেও 'নীলোৎপলদলানুগা' হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলেন[২৯] এবং সেই গিরিনন্দিনী 'কালী' নামেই খ্যাতা হইয়াছিলেন। পার্বতী কালী বয়স্কা হইলে দেবর্ষি নারদ আসিয়া হিমালয়ের নিকটে শিবের সহিত গিরিজার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—তপস্যাদ্বারা হর তোষিত হইলে আপনার এই কালী কন্যা সুবর্ণাভা হইয়া স্বর্ণগৌরী—বিদ্যুদ্‌গৌরী হইয়া উঠিবে এবং শেষে ইহার গৌরী নামেই খ্যাতি হইবে।[৩০]

এই কালী পার্বতীর মদন-সহায়ে হর-তপস্যা-ভঙ্গাদির যে বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে পাই তাহা কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যকে বহুস্থানেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কালিকা-পুরাণের এই-সব বর্ণনা যেন কুমারসম্ভব-কাব্যকে একেবারে সামনে রাখিয়াই লিখিত। ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা--

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকলিকোপমম্।
সোঽন্তঃ পশ্যতি সর্বত্র ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে॥

ইহা কালিদাসের দুইটি শ্লোক ভাঙিয়া করা হইয়াছে।

প্রথমটি—

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

দ্বিতীয়টি—

মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্ত-
মাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥

নারদের মুখে বিবাহ-সম্বন্ধের কথা শুনিয়া—

ততঃ কালী কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মুখাত্তদা।
লজ্জয়াধোমুখী ভূত্বা স্মিতবিস্তারিতাননা॥

[২৮] ৮।১-১০।
[২৯] ৪১ অধ্যায়।
[৩০] স্বর্ণগৌরী সুবর্ণাভা তপসা তোষিতে হরে।
বিদ্যুদ্‌গৌরী স্বয়ং কালী তব পুত্রী ভবিষ্যতি॥
গৌরীতি নাম্না পশ্চাত্তু খ্যাতিমেষা গমিষ্যতি॥—৪১।৬৭।

প্রভৃতি—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

প্রভৃতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

মহাদেবের ধ্যানের অন্যান্য বর্ণনাও কালিদাসের শ্লোক ভাঙিয়া ভাঙিয়া করা হইয়াছে। এমন কি কালিদাসের প্রসিদ্ধ উক্তি—বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥—শ্লোকটির তরলীকৃত রূপ দেখি—

সবিঘ্নো বিঘ্নহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ততে।
তন্মহত্ত্বঞ্চ তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাম্॥[৩১]

এখানে সংক্ষেপে অকাল-বসন্তের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাও কালিদাস হইতে গৃহীত।

ভ্রমন্তি স্ম তদা তত্র ভ্রমরাঃ কুসুমোদ্ভবম্।
পিবন্তো বহুশশ্চূতং গুঞ্জন্তঃ সহ জায়য়া॥

ইহা—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।

প্রভৃতিরই ছায়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাহার পরে কুমারসম্ভবের 'উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি'র ছায়াতে দেখিতে পাই 'শঙ্করো বদনং কাল্যাঃ সাকূতং সংব্যলোকয়ৎ।'

কুমারসম্ভবে যেমন দেখিতে পাই, মদনভস্মের পরে রুদ্র-কোপভয়ে নিমীলিতাক্ষী অনুকম্পাযোগ্যা উমাকে পিতা বাহু প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কালিকাপুরাণেও দেখি হিমালয়—

আসাদ্য পাণিনা তস্যা মার্জয়ন্নয়নদ্বয়ম্।
মা ভৈষীঃ কালি মা রোদীরিত্যুক্ত্বা তাং তদাগ্রহীৎ॥
ক্রোড়ীকৃত্য সুতাং তাস্তু হিমবানচলেশ্বরঃ।
স্বমালয়মথানিন্যে সান্ত্বয়ামাস চার্দিতাম্॥

কালীর উমা নাম হইবার কারণটিও হুবহু কালিদাস হইতে গ্রহণ করা—

যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী॥[৩২]

এইরূপ 'অপর্ণা' নামের ব্যাখ্যাও হুবহু কালিদাস হইতে গৃহীত—

আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা।
তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে॥[৩৩]

[৩১] ৪২।৩৯। [৩২] তুলনীয় কু. স. ১।২৬। [৩৩] তুলনীয় কু. স. ৫।২৮।

শিবের বটুব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামগ্না পার্বতী কালীর সহিত যে কথাবার্তা তাহাও এইরূপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত। এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়াইয়া লাভ নাই।

আমরা কুমারসম্ভবের সহিত কালিকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপূর্বকই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদ্বারা আমাদের বক্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীরূপের এই কাহিনীটি পুরাণ-উপপুরাণগুলিতে একটি বিশেষ অভিপ্রায় লইয়া রচিত হইয়াছে; সেই অভিপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গুছানোর চেষ্টা ছিল কুমারসম্ভবের পার্বতী-উমার কাহিনীর সঙ্গে কালিকা-পুরাণের এই পার্বতী কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবীত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিয়াছিল।

এই পুরাণে কালীর গৌরীত্ব লাভের দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। কৈলাস-পর্বতে একদিন কালীকে লইয়া মহাদেব বিহার করিতেছিলেন; সেখানে উর্বশী প্রভৃতি গৌরাঙ্গী অপ্সরাগণের সম্মুখে মহাদেব কালীকে 'কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কালী ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে করিয়া অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণগৌরাভা লাভ করিতে না পারেন, সে পর্যন্ত আর মহাদেবের সহিত বাস করিবেন না বলিয়া কঠোর তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষী-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ষ ধরিয়া বৃষভধ্বজের আরাধনা করিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধ্বজ কালীকে তাঁহার মূলশক্তিরূপিণী প্রকৃতির পরিচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরূপও বুঝিলেন, জগন্ময় শম্ভুর স্বরূপও বুঝিতে পারিলেন। মহাদেব তখন আকাশগঙ্গার জলে দেবীকে স্নান করাইলে দেবী কালো রূপ পরিত্যাগ করিয়া 'শারদাভ্রে তড়িদ্ যথা' এইরূপ বিদ্যুদ্‌গৌরী রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর শিবের সহিত সর্বদা এক হইয়া অবস্থান করিবার জন্য গৌরী মহাদেবেরই বামার্ধভূতা হইয়া হরগৌরী অর্ধনারীশ্বর-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দেবীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই যে, দেবীর দেহ হইতে কৌশিকী দেবী নির্গতা হইলে দেবী কৃষ্ণরূপা হইয়া কালিকারূপে খ্যাতা হইলেন, এই কালিকা মসীবর্ণা, মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বর্ধিনী—সেই কালিকাই কালরাত্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে কালীসম্বন্ধে অন্য যে কথা দেখিতে পাই, তাহার একান্ত অভিনবত্ব একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে—

সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ॥

কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী।
সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ॥

দেবী কৃষ্ণভক্তা এবং কৃষ্ণতুল্যা; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষ্ণবর্ণা। দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রচিত ভাগবত; ইহা দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অঞ্চলে রচিত বলিয়া গৃহীত।[৩৪] উদ্ধৃত অংশ আরও অর্বাচীন কালের রচনা বলিয়া মনে করি।

বাঙলাদেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলির মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত্র হইল 'মহা-নির্বাণতন্ত্র'। এই তন্ত্রখানির মধ্যেও দেবীর কালীরূপের প্রাধান্য অতিশয় লক্ষণীয় বলিয়া মনে করি। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীরূপে কালিকার যে শতনাম স্তুতি রহিয়াছে তাহাতে বিশটি শ্লোক দেখিতে পাই, যাহার প্রত্যেকটি শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর ক-কার।[৩৫] দেবদেবীর এই-জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

আমরা যে প্রসঙ্গে বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণে বর্ণিত কালী-উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা এই যে, সপ্তদশ শতকের পর হইতেই যে বাঙলাদেশে কালী-প্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহু পূর্ব হইতেই পুরাণ-উপপুরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। কালিকা-পুরাণের মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাতিশয্য দেখিতে পাই। কালিকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে লিখিত উপপুরাণ বলিয়া মনে করি। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে কামরূপের মহিমা ও কামাখ্যার মহিমা খ্যাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ অঞ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা। কালীকে লইয়া পরবর্তী কালে আরও অনেক পুরাণ-তন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তারিত আলোচনায় আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।

কালিকাই যে হিমাচলসুতা বাঙলা সাহিত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকারূপেই দেখিতে পাই। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শাক্ত-পদাবলী দেখিতে পাই তাহাতেও এই সত্যের প্রমাণ মেলে। কালি মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) রচিত পার্বতীর বাল্যলীলার একটি চমৎকার পদে দেখিতে পাই—

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥

[৩৪] ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার *The journal of Oriental Research, Madras* পত্রিকার 'The Devi-Bhagavata' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
[৩৫] বঙ্গবাসী সং, ৭।১২-৩১।

শিবের বটুব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামগ্না পার্বতী কালীর সহিত যে কথাবার্তা তাহাও এইরূপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত। এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়াইয়া লাভ নাই।

আমরা কুমারসম্ভবের সহিত কালিকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপূর্বকই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদ্বারা আমাদের বক্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীরূপের এই কাহিনীটি পুরাণ-উপপুরাণগুলিতে একটি বিশেষ অভিপ্রায় লইয়া রচিত হইয়াছে; সেই অভিপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গুছানোর চেষ্টা ছিল কুমারসম্ভবের পার্বতী-উমার কাহিনীর সঙ্গে কালিকা-পুরাণের এই পার্বতী কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবীত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলিয়াছিল।

এই পুরাণে কালীর গৌরীত্ব লাভের দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। কৈলাস-পর্বতে একদিন কালীকে লইয়া মহাদেব বিহার করিতেছিলেন; সেখানে উর্বশী প্রভৃতি গৌরাঙ্গী অপ্সরাগণের সম্মুখে মহাদেব কালীকে 'কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কালী ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে করিয়া অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণগৌরাভা লাভ করিতে না পারেন, সে পর্যন্ত আর মহাদেবের সহিত বাস করিবেন না বলিয়া কঠোর তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষী-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ষ ধরিয়া বৃষভধ্বজের আরাধনা করিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধ্বজ কালীকে তাঁহার মূলশক্তিরূপিণী প্রকৃতির পরিচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরূপও বুঝিলেন, জগন্ময় শম্ভুর স্বরূপও বুঝিতে পারিলেন। মহাদেব তখন আকাশগঙ্গার জলে দেবীকে স্নান করাইলে দেবী কালো রূপ পরিত্যাগ করিয়া 'শারদভ্রে তড়িদ্ যথা' এইরূপ বিদ্যুদ্‌গৌরী রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর শিবের সহিত সর্বদা এক হইয়া অবস্থান করিবার জন্য গৌরী মহাদেবেরই বামার্ধভূতা হইয়া হরগৌরী অর্ধনারীশ্বর-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দেবীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই যে, দেবীর দেহ হইতে কৌশিকী দেবী নির্গতা হইলে দেবী কৃষ্ণরূপা হইয়া কালিকারূপে খ্যাতা হইলেন, এই কালিকা মসীবর্ণা, মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বর্ধিনী—সেই কালিকাই কালরাত্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে কালীসম্বন্ধে অন্য যে কথা দেখিতে পাই, তাহার একান্ত অভিনবত্ব একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে—

সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ॥

কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী।
সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ॥

দেবী কৃষ্ণভক্তা এবং কৃষ্ণতুল্যা; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষ্ণবর্ণা। দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রচিত ভাগবত; ইহা দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অঞ্চলে রচিত বলিয়া গৃহীত।[৩৪] উদ্ধৃত অংশ আরও অর্বাচীন কালের রচনা বলিয়া মনে করি।

বাঙলাদেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলির মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত্র হইল 'মহানির্বাণতন্ত্র'। এই তন্ত্রখানির মধ্যেও দেবীর কালীরূপের প্রাধান্য অতিশয় লক্ষণীয় বলিয়া মনে করি। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীরূপে কালিকার যে শতনাম স্তুতি রহিয়াছে তাহাতে বিশটি শ্লোক দেখিতে পাই, যাহার প্রত্যেকটি শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর ক-কার।[৩৫] দেবদেবীর এই-জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

আমরা যে প্রসঙ্গে বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণে বর্ণিত কালী-উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা এই যে, সপ্তদশ শতকের পর হইতেই যে বাঙলাদেশে কালী-প্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহু পূর্ব হইতেই পুরাণ-উপপুরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। কালিকা-পুরাণের মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাতিশয্য দেখিতে পাই। কালিকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে লিখিত উপপুরাণ বলিয়া মনে করি। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে কামরূপের মহিমা ও কামাখ্যার মহিমা খ্যাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ অঞ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা। কালীকে লইয়া পরবর্তী কালে আরও অনেক পুরাণ-তন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তারিত আলোচনায় আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।

কালিকাই যে হিমাচলসুতা বাঙলা সাহিত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকারূপেই দেখিতে পাই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শাক্ত-পদাবলী দেখিতে পাই তাহাতেও এই সত্যের প্রমাণ মেলে। কালি মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) রচিত পার্বতীর বাল্যলীলার একটি চমৎকার পদে দেখিতে পাই—

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥

[৩৪] ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার *The journal of Oriental Research, Madras* পত্রিকার 'The Devi-Bhagavata' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[৩৫] বঙ্গবাসী সং, ৭।১২-৩১।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিরিবালিকে হয়েছেন আপনি॥

—শাক্ত পদাবলী, ক. বি.

আর একটি পদে দেখি পার্বতী স্বামিগৃহ কৈলাস হইতে গিরিপুরে আসিলে অভিমানিনী মা মেনকা মেয়েকে বলিতেছেন—

কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা,
ভুলে থাক মায়।
মা বলে করিস না মনেতে, এ ছল বলি গো
মা কায়॥
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অঙ্গনে।
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তিতত্ত্বে ঈশানী।[৩৬]

দাশরথি রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্বতীর জন্মের পরে প্রতিবেশিনী রমণীগণ ধাত্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখিতে চাহিলেন তখন—

স্বার মুক্ত করে ধাত্রী কালিকা বালিকা মূর্তি
নয়নে নিরখে নারীগণ।

মৈথিল কবি ঈশনাথের কঙ্কালী দেবীর বর্ণনায়ও দেখি—

কালিকে গিরিবালিকে জয়,
পালিকে কঙ্কালিকে।[৩৭]

আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে প্রচলিত মাতৃপূজার মধ্যে প্রধান কয়েকটি ধারার ইতিহাস অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রধান ধারাগুলির সহিত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মিলিয়া মিশিয়া মূল ধারাকেই সুবিচিত্র এবং পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 'দেবী-ভাগবতে' এ বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। মহাদেবীর সহিত নিঃশেষে বহু গ্রাম্য দেবীকে মিলাইয়া দিয়া শেষে বলা হইয়াছে—

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে॥

—৯।১।১৫৮-৫৯

ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবী রহিয়াছেন তাঁহারাও বিধিপূর্বক

[৩৬] শাক্ত পদাবলী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ।
[৩৭] গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সঙ্কলিত।

মহাদেবীরূপেই পূজিতা হইয়া থাকেন—কারণ, মূলে তাঁহারা আদ্যাদেবী হইতে কিছু পৃথক্ নন, তাঁহারাও সকলে একই মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামাত্র। এইরূপে মূলদেবীর কল্যাস্পদা বলিয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্যদেবীকেও মহাদেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী

দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছি সেইখানেই আমরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষকে আশ্রয় করিয়াছি; কারণ, মানুষ ব্যতীত আমরা রূপ-গুণ আর কোথায় দেখিয়াছি? মানুষের রূপ-গুণই যতটুকু পারি বাড়াইয়া বাড়াইয়া আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি।

ঐতিহাসিক ক্রমে দেবদেবীর রূপ-গুণের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব বিভিন্ন যুগের সমাজজীবনের পটভূমিকাতেই এইসব দেবদেবী তাঁহাদের বিচিত্র রূপ-গুণ লাভ করিয়াছেন। অতিরিক্তভাবে সমাজজীবনের সহিত যুক্ত করিতে গিয়া স্থূল লৌকিকতা-দ্বারা আমরা দেবদেবীকে অনেক সময় অতিমাত্রায় ক্লিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি একথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার একথাও সত্য যে দেবদেবীকে আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইয়া আমরা আমাদের মানবীয় সম্বন্ধগুলিকে অনেক সময় আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছি, দেবতা-অবলম্বনে একটি স্নিগ্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মূর্তির পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মানবীয় সম্বন্ধগুলিকে আরও স্বাদনীয় এবং মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মাটির ঘরের আঙিনায় নিত্য নব লাবণ্য ও রসমাধুর্য বিস্তার করিয়া খেলিয়া বেড়ায় যে শিশুটি তাহার 'অমিয়া ছানিয়া' আমাদের বৈষ্ণব কবিগণ 'নিত্য গোপালে'র মধুরলীলাময় মূর্তি দান করিয়াছেন। এই লীলাবর্ণনা-দ্বারা তাঁহারা মানুষের মনেও কতকগুলি সংস্কারপ্রবণতা জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন—যে সংস্কারপ্রবণতা আমাদের আঙিনার রক্তমাংসের গোপালটিকে 'নিত্য গোপালে'র সঙ্গে যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। বাঙলা শাক্ত কবিরাও কৈলাসবাসিনী উমাকে বাঙলাদেশের সমতলে মাটির কুটিরের আঙিনায় নামাইয়া আনিয়া আমাদের রক্তমাংসে-গড়া মর্ত্যের উমাকে নূতন মহিমা দান করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা বলিতেছেন—

> গিরিবর, আর আমি পারি নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
> উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
> নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥[১]

এই গান বাঙলাদেশের দেউলে-নাটমন্দিরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়া ভাবে ও সুরে আমাদের গৃহাঙ্গনের উমাটির চারিদিকেও অনির্বচনীয় মহিমা আভাসিত করিয়া তোলে।

দেবদেবীগণের মধ্যে তিনটি যুগলরূপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, হরগৌরী বা উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম। ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসিদ্ধি বিশেষভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে—তাহাও পূর্বভারত ও উত্তরভারতেই বেশি। সীতারামের ধারাটি অনেক প্রাচীন হইলেও ইহার জনপ্রিয়তা খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতক হইতে এবং তাহাও বিশেষভাবে উত্তর-ভারতে—মুখ্যভাবে তুলসীদাসের রাম-চরিত-মানসকে অবলম্বন করিয়া। প্রাচীনতম এবং ব্যাপকতম ধারা হইল হরগৌরী বা হরপার্বতী বা উমামহেশ্বরের ধারাটি। পরবর্তী কালের জনপ্রিয় যুগললীলা হইল রাধাকৃষ্ণের লীলা; কিন্তু সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলীলার ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া যাইবার একটা বাধা ছিল: রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পরকীয়-প্রেম—এ প্রেম সমাজবন্ধন-বহির্ভূত একটি প্রেমাদর্শকে লইয়া লীলায়িত। রাধা দেবী বটেন, এবং সেই দেবীর ভিতর দিয়াই মানবীয় প্রেমের অনন্ত লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রাধার মধ্য দিয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সুযোগ ছিল না। রাধার মধ্যে কন্যামূর্তি অল্প, গৃহিণীমূর্তি নাই, মাতৃমূর্তি নাই—তিনি সর্বপ্রকার সমাজ-বন্ধনের বাহিরে নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রূপায়ণের মধ্যেও এই পরকীয়া প্রেয়সী রূপেরই প্রাধান্য। সীতারামযুগলকে অবলম্বন করিয়া কোনও লীলাবিস্তার নাই; রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনাদ্বারা অত্যন্তভাবে তাঁহাদের জীবন-কাহিনী সীমিত। কিন্তু দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছি আধ-আধ বোলের বালিকা-রূপে, অনূঢ়া কিশোরী-রূপে নবযৌবনের রূপগর্বিণী-রূপে, নবোঢ়া প্রেয়সী-রূপে, প্রেমকে মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য কঠোর তপস্বিনী-রূপে; তাঁহাকে দেখিয়াছি

[১] শাক্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভিখারীর ঘরে মলিন-ছিন্ন-বসন-পরিহিতা অনশনক্লিষ্টা ভিখারিণী-রূপে, আবার দেখিয়াছি অন্নপূর্ণার মহৈশ্বর্যে; তাঁহাকে দেখিয়াছি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'-রূপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছি ভয়ংকরী অসুরনাশিনী-রূপে; তাঁহাকে দেখিয়াছি কলানিধি নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্যসঙ্গিনী-রূপে, আবার দেখিয়াছি ব্যাঘ্রচর্মাবৃত জটাজুটধারী যোগেশ্বর শিবের নিত্যসঙ্গিনী জটাজুটধারিণী যোগেশ্বরী-রূপে; কুমারী-রূপে তিনি যেমন সর্বকল্যাণময়ী, মাতৃরূপে তিনি তেমনই সর্বমহিমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন করিয়া সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবীকে নয়।

ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পার্বতী'র প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ দেখিতে পাই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে। এই গ্রন্থখানি পরবর্তী কালের সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহিত্যে দেবী-রূপায়ণের আকর গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর অসুরমর্দিনী রূপের তেমন কোনও প্রভাব নাই, দেবীর মধুর মূর্তিরই প্রাধান্য। আমরা পরে লক্ষ্য করিব, অষ্টাদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের সহিত অসুরনাশিনী রূপের মিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকরী হইয়া উঠিতে পারেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভীষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে বিবিধভাবে।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের ভিতরে দেখিতে পাই, কবি তাঁহার নিজের সমাজ-জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া রূপ দান করিয়াছেন দেবী পার্বতীকে। প্রথমেই যখন পার্বতীকে গিরিরাজের গৃহে গিরিরাণী মেনকার ক্রোড়ে বালিকামূর্তিতে দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম এ পার্বতী অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে, এ পার্বতী অভিজাতগৃহের আদরিণী কন্যা। মন্দাকিনীর পুলিনে বেদী নির্মাণ করিয়া সেই বালিকা সখীগণের সঙ্গে খেলা করে—কখনও কন্দুক লইয়া খেলে, কখনও খেলে কৃত্রিম পুত্রক লইয়া।[২] তৎকালীন অভিজাত বংশের বালিকাদের যেমন বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল পার্বতীও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমনই বিবিধ বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াছিলেন।[৩] এই বালিকা যখন কুমারী হইয়া উঠিলেন তখন কঠোর তপস্যা-

[২] মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ
সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং
ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে॥—১।২৯

[৩] তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
[illegible]পদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥—১।৩০

দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার অধিকারিণী হইলেন; কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই অধিকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখা গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিতে পারিলেন না। কালিদাস যে মনুশাসিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন হরপার্বতীকেও সেই সমাজ-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিধি স্বীকার করিয়া পরিণয়াবদ্ধ হইতে হইল। মহাদেব উমার নিকট ধরা দিয়া 'তবাস্মি দাসঃ' এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই হর-পার্বতীর দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার হইল না। সমাজবিধি-সম্বন্ধে অতিসচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ দিয়াও সাক্ষাৎভাবে মহাদেবকে কোনও কথা বলাইলেন না, সখীগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে গোপনে বলাইলেন, 'গিরিরাজ হিমালয়ই আমার দাতা—ইহা বুঝিয়া তিনি সব ব্যবস্থা করুন।'—

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্।
দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি॥

মহাদেবও তখন 'স তথেতি'—'আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সপ্তর্ষিকে আশ্রয় করিলেন। দেবর্ষিগণকে এই সম্বন্ধ-প্রস্তাব লইয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া মহাদেব বলিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তিনি তাঁহাদের আশ্রয় এইজন্যই গ্রহণ করিয়াছেন যে 'বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ'—সজ্জন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে না। দাম্পত্য-জীবনের আদর্শরূপিণী সতী অরুন্ধতীর সহিত সেই দেবর্ষিগণ গিয়া গিরি-রাজ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। দেবর্ষিগণ যে ভাষায় গিয়া গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাও লক্ষণীয়—

উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্।
বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ॥

উমা হইল বধূ, আপনি (হিমালয়, সমাজেও যিনি উচ্চশির) হইলেন দাতা, আমরা হইলাম প্রার্থী, শম্ভু হইলেন বর; এ সম্বন্ধ আপনার কুলের মর্যাদার নিমিত্তই হইবে।

মেনকা ও গিরিরাজের সঙ্গে দেবর্ষিরা যখন এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন, পিতার পার্শ্বে অধোমুখী হইয়া কুমারী পার্বতী তখন শুধু লীলাকমলপত্রগুলি গণনা করিতেছিল। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা অরুন্ধতীকে পিতার আদেশে প্রণাম করিল, প্রণামের সময় নতমস্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণকুণ্ডল স্খলিত হইয়া পড়িল—অরুন্ধতী ভাবী বধূ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। ভাবী বিরহ-বেদনায় গিরিরাণীর নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; অরুন্ধতী জামাতার গুণকীর্তন করিয়া সেই শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই সামাজিক বিধিপূর্বক হরপার্বতীর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা। পার্বতীকে বিবাহ-বেশে সজ্জিত করিবার বর্ণনাতেও কালিদাস সখীগণের চিরাচরিত রসিকতাকে বাদ দিতে পারেন নাই। কোনও সখী পার্বতীর চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করিয়া দিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, 'এই অলক্তক-রঞ্জিত চরণের দ্বারা পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলাকে স্পর্শ কর।' পার্বতী প্রত্যুত্তরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা ছুঁড়িয়া আঘাত করিল।—

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন
স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশী-
র্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান॥

তাহার পরে গিরিরাণী মেনকা তৎকালোচিত বিবাহের মঙ্গলাচরণ এবং স্ত্রী-আচার সবই পালন করিলেন। বর আসিলে পাড়া-প্রতিবেশিনী অঙ্গনাগণের মধ্যে যেন হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কোনও রমণী মালার দ্বারা কেশপাশ বন্ধ করিতেছিলেন, তিনি মালা ফেলিয়া চুল হাতে করিয়াই আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইলেন: কেহ পায়ে আলতা মাখিতেছিলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর রঞ্জিত করিয়াই তিনি বাতায়নে দৌড়াইয়া গেলেন; কেহ কাজল মাখিতেছিলেন, এক চোখে কাজল দিয়া অপর চোখে কাজল দিবার সময় হইল না, কাজল-শলাকা হাতে করিয়াই গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন; কেহ আলুলায়িতবসনা, তাড়াতাড়িতে আর বসন সংবরণ করিবার খেয়াল হয় নাই, বসন হাতে ধরিতে ধরিতেই আসিয়া অলিন্দে দাঁড়াইলেন। কালিদাসের এই-সকল বর্ণনার সঙ্গে পুরাণে ও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-সাহিত্যে কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণমিলনে ব্যাকুলা গোপীগণের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। ইহার পরে দেখিতে পাই বরের রূপদর্শনে প্রতিবেশিনী রমণীগণের বিবিধ মন্তব্য। ইহারই অত্যন্ত স্থূল পরিণতি দেখিতে পাই বাঙলা মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতিতে এ-জাতীয় স্থলে রমণীগণের পতিনিন্দায়। বিবাহ-বাসরে পিতা হিমালয় যখন জামাতা শিবের হস্তে উমাকে অর্পণ করিলেন তখন প্রথম পুরুষহস্তস্পর্শে উমারও যেমন রোমাঞ্চ দেখা দিল, মহাদেব হইলেও বরের হস্তাঙ্গুলিও তেমনি প্রথম প্রেয়সী-স্পর্শে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।—

রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ
স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।

অজ্ঞাতনামা আর-এক কবি বিষয়টি লইয়া আরও রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় কন্যা পার্বতীকে শিবের হস্তে দান করিতেছেন; পার্বতীর হস্তস্পর্শে উল্লসিত শিবের রোমাঞ্চাদি বিকার উপস্থিত হইল; বিবাহ-বিধি ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হইল না মনে করিয়া আকুল মহাদেব বলিয়া

উঠিলেন—'তুহিনাচলের হাত দুখানির কি শৈত্য!' অন্তপুরচারিণীরা কিন্তু ব্যাপারটি বুঝিয়া শিবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।—

শৈলেন্দ্রপ্রতিপাদ্যমান-গিরিজাহস্তগ্রহ-প্রোল্লস-
দ্রোমাঞ্চাদি-বিসংষ্ঠুলাখিলবিধি-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাকুলঃ।
হা শৈত্যং তুহিনাচলস্য করয়োরিত্যূচিবান্ সর্বতঃ
শৈলান্তঃপুরমাতৃমণ্ডলগণৈর্দৃষ্টোঽবতাদ্ বঃ শিবঃ॥[৪]

কালিদাসের কালের জনপ্রিয় রীতি অনুসারে বিবাহের পরে বরবধূ হর-পার্বতী নাটকদর্শনও করিলেন। ইহার পরে নববিবাহিত বরবধূর স্নিগ্ধমধুর লীলাবিলাসের বর্ণনা; এ-বর্ণনায় কবির অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎকারিত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হরপার্বতীর শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে। একটি শ্লোকে দেখি—

শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা
সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে
মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ॥—৮।৭

নির্জনে হৃতাংশুকা হইয়া পার্বতী দুই হাতে মহাদেবের দুই চক্ষু চাপিয়া ধরেন, কিন্তু তৃতীয় নেত্রদ্বারা দৃষ্টা হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় বিধুরা হন। হালের গাহা সত্তসঈ'তে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই বর্ণনাটিই দেখিতে পাই।—

রই-কেলি-হিঅ-নিঅংসণ-কর-কিসলয়-রুদ্ধ-ণঅণ-জুঅলস্স।
রুদ্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পরিউম্বিঅং জঅই॥—৫।৫৫

রতিকালে হৃত-নিবসনা (পার্বতীর) করকিসলয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে নয়নযুগল যাঁহার—সেই রুদ্রের পার্বতীর দ্বারা পরিচুম্বিত তৃতীয় নয়নটির জয় হোক।

বিবাহের পরে মহাদেব নববিবাহিতা পত্নী পার্বতীকে লইয়া বহু বিজন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাঁহারা গন্ধমাদন-কাননে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধাতুরাগরঞ্জিত কাঞ্চনময় শিলাতলে পার্বতীকে বামে লইয়া উপবেশন করতঃ মহাদেব অস্তগামী সূর্য দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্বত্র সন্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারিলেন; সন্ধ্যাহ্নিকের সময় উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব বামবাহু-সমাশ্রিতা দেবীর নিকট কিছু সময়ের জন্য অবসর চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সন্ধ্যানুষ্ঠানের প্রতি মহাদেবের আসক্তি দেখিয়া দেবী অসূয়ান্বিত হইলেন;

---

[৪] সূক্তিমুক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই।

তিনি মহাদেবকে ছাড়িয়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহ্নিকে গেলেন বটে, কিন্তু দেবী মান করিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু চাটুবাক্য ও অনুনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রথমেই আসিয়া বলিতে হইয়াছে—

মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে
সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যয়া।
কিং ন বেৎসি সহধর্মচারিণং
চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ ॥—৮।৫১

হে অনিমিত্তকোপনে, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; আমি সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণমিত হইয়াছি, অন্য কাহাদ্বারা (অন্য রমণীদ্বারা) নহে; নিজের সহধর্মচারী (আমাকে) কি তুমি চক্রবাকসমবৃত্তি বলিয়া জান না?

মহাদেবের এই সন্ধ্যানুষ্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের বিবিধ ছলনা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কবিতা রচনা হইতে দেখি। ঘরের পুরুষ বেশি সময় সন্ধ্যাহ্নিক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গৃহিণীগণের অনেক সময়ই এ জিনিসটি বিশেষ মনঃপূত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যদি আবার নব-বিবাহিতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবটির সুকুমার প্রকাশ অনেক কবিতায় দেখিতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক। হালের 'গাহা সত্তসঈ'র প্রথম গাথাতেই দেখি—

পসুবইণো রোসারুণ-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং।
গহিঅগ্ঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংঝা-সলিলঞ্জলিং ণমহ ॥[৫]

'পশুপতির সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর যাহাতে গৌরীমুখচন্দ্রের রোষারুণ প্রতিমা সংক্রান্ত হইয়াছে এবং ফলে হস্ত-গৃহীত অর্ঘ্যপঙ্কজের ন্যায় মনে হইতেছে।'

এই গ্রন্থের শেষ গাথাটিও অনুরূপ।—

সংঝা-গহিঅ-জলঞ্জলি-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহ-কমলং।
অলিঅং বিঅ ফুরিওট্‌ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥[৬]

এখানেও দেখিতেছি হর সন্ধ্যার নিমিত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা গৌরীমুখকমল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হইয়া গেল, শুধু অলীকভাবেই তিনি ওষ্ঠ নাড়াইতে লাগিলেন।

রাজশেখর কবির একটি শ্লোকে দেখি, সন্ধ্যার্চনের কথাতেই কুপিতা দেবীর মুখপদ্ম সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত মুখ-পদ্মের তুলনা দিতে গিয়াই বলিলেন, 'দেবি, দেখ, আকাশ লোহিতবর্ণ ধারণ

[৫] ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।
[৬] ঐ।

করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য ঐ সরোবরে পদ্মগুলির এই দশা উপস্থিত হইয়াছে।' এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের অনুকরণের ছলে পার্বতীকে বঞ্চিত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জলিদ্বারা সন্ধ্যার্চনা সারিয়া লইলেনঃ

দেবি ত্বদ্বদনোপমানসুহৃদামেষাং সরোজন্মনাং
পশ্য ব্যোমনি লোহিতায়তি শনৈরেষা দশা বর্ততে।
ইত্থং সংকুচদম্বুজানুকরণব্যাজোপনীতাঞ্জলেঃ
শম্ভোর্বঞ্চিতপার্বতীকমুচিতং সন্ধ্যার্চনং পাতু বঃ॥[৭]

আবার—

প্রতিবিম্বিতগৌরীমুখবিলোকনোৎ-
কম্পশিথিলকরগলিতঃ।
স্বেদভরপূর্যমাণঃ শম্ভোঃ
সলিলাঞ্জলির্জয়তি॥[৮]

সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাহা দেখিয়া মহাদেবের কম্পিত শিথিল করের জল গলিত হই হ—অন্যদিকে আবার ঘর্মের দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

অন্য একটি শ্লোকে দেখি—

পার্শ্বস্থপৃথ্বীধররাজকন্যা-
প্রকোপবিস্ফূর্জথুকাতরস্য।
নমোঽস্তু তে মাতরিতি প্রণামাঃ
শিবস্য সন্ধ্যাবিষয়া জয়ন্তি॥

শিব সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছেন, পার্শ্বে দেখিতেছেন পার্বতীকে—কোপে তিনি (পার্বতী) ফুঁসিতেছেন; কাতর শিব বার বার প্রণাম করিলেন; 'হে মাতঃ, তোমাকে নমস্কার'। এ প্রণাম সন্ধ্যাবিষয়ে বটে—আবার পার্বতীর কোপপ্রশমন-বিষয়েও বটে।

অর্ধ-নারীশ্বররূপে সন্ধ্যাহ্নিকে মহাদেবের আরও বিপদ্ দেখিতে পাই, সেখানে দেখি, ওষ্ঠের একার্ধ জপমন্ত্রোচ্চারণে স্ফুরিত হইতেছে, অন্য অর্ধ (গৌরীর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফুরিত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে স্থাপিত, অন্য হস্ত তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য উত্তোলিত, এক অক্ষি ধ্যানবশে নিমীলিত—অন্য অক্ষি স্বল্প-বিকশিত অবস্থায় তাহা লক্ষ্য করিতেছে; এইরূপে একটি অনিচ্ছা এবং একটি কর্মচেষ্টা একই দেহে যুগপৎ দেখা দিয়াছে।

[৭] সুভাষিতরত্নকোষ, ডি. ডি. কোশাম্বী কর্তৃক সম্পাদিত; মহেশ্বরব্রজ্যা, ৫ সং শ্লোক। মতান্তরে শিতিকণ্ঠ-রচিত।

[৮] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই।

অর্ধং দন্তচ্ছদস্য স্ফুরতি জপবশাদর্ধমপ্যুৎপ্রকোপা-
দেকঃ পাণিঃ প্রণন্তুং শিরসি কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যস্তমেব।
একং ধ্যানান্নিমীলত্যপরমবিকসদ্বীক্ষতে নেত্রমিত্থং
তুল্যানিচ্ছাবিধিৎসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবিধানে॥[৯]

কিন্তু অপর স্থলে আবার দেখি, শিবের সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলি তাঁহার হস্তের বলয়ীকৃত সর্পের দ্বারাই পীয়মান হইতেছে, শিব 'গৌরীমুখার্পিতমনা', সুতরাং ইহার কথা জানিতে পারিতেছেন না; সখী বিজয়া শিবের অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন।

সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলিমপি
কঙ্কণফণিপীয়মানমবিজানন্।
গৌরীমুখার্পিতমনা
বিজয়াহসিতঃ শিবো জয়তি॥[১০]

অনেক সময় দেখা যায় গৃহিণী নিজে গৃহপতির সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাইতে সাহস না করিয়া ঘরের ছোটদের এই কাজে উস্কাইয়া দেন। গৃহপতি কখনও হয়তো চটিয়া যান,—আবার কখনও খোশমেজাজে জিনিসটি গ্রহণ করেন। হরপার্বতীর সংসারেও আমরা সেই চিত্রটি দেখিতে পাই। এখানে দেখিতেছি হাতের উপরে হাত রাখিয়া আসনপূর্বক শঙ্কর সন্ধ্যাঞ্জলি দান করিতেছিলেন; কার্তিক তাহা দেখিতে পাইয়া মাতা পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'মা, বাবা তাঁহার অঞ্জলিপুটে কি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন?' পার্বতী কহিলেন, 'বৎস, নিশ্চয়ই একটি স্বাদু ফল।' কার্তিক বলিল, 'আমাকে দিতেছেন না।' পার্বতী বলিলেন, 'নিজে গিয়া আন।' এইরূপে মাতা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া কার্তিক আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যাঞ্জলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, শম্ভুর সমাধি ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তিনি ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ঈষৎ হাসির সঙ্গে সব জিনিসটিকে গ্রহণ করিলেন।—

মাতর্, জীব, কিমেতদঞ্জলিপুটে তাতেন গোপায়িতং,
বৎস, স্বাদু ফলং, প্রযচ্ছতি ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বয়ম্।
মাত্রৈবং প্রহিতে গুহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলিং
শম্ভোর্ভগ্নসমাধিরুদ্ধরভসো হাসোদ্গমঃ পাতু বঃ॥[১১]

বয়সে, আকৃতি-প্রকৃতিতে, বেশ-ভূষায়, আভরণ-বিলেপনে, বাসস্থানে, বাহনে, অভ্যাস-আচরণে কোনও দিক্ হইতেই শিব যে গৌরীর তুল্য বর নহেন, পরন্তু সব বিষয়েই শিব ও গৌরী যে একটা শোচনীয় দ্বন্দ্বেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ একথা

[৯] সদুক্তিকর্ণামৃত।
[১০] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই।
[১১] সুভাষিতরত্নকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা, ৩০ সং।

শিবপার্বতী-অবলম্বনে সকল সাহিত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে শিবায়নে পাঁচালীতে ও শাক্ত-পদাবলীতে ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। বিশেষ করিয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্প-ভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজুটধারী শিব যখন বৃদ্ধ-বৃষভ-বাহনে শিঙা ফুঁকিয়া ভূতপ্রেতসহ গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তখন গৌরীমাতা ও প্রতিবেশিনীগণের আর খেদের অন্ত নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি—

কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে॥
চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে গন্ধ॥
অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খ্যায়া হেন বরে দিলাম দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বহ্নি জ্বলে॥

শুধু মেনকা নহেন—

বর দেখি এয়ো সবে করে কানাকানি।
চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি॥
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।
দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বলিছে অন্তর॥

ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়োর জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়োর দাড়ী শণের নুড়া
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়োর গলে হাড়ের ভার,
কেমন ক'রে ওমা উমা করবে বুড়োর ঘর লো।
আমার উমা মেঘের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥

শাক্ত-পদাবলীতে দেখিতে পাই, বিবিধভাবে ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রিত করুণ বিস্তার। এই দ্বন্দ্বচিত্রটি আমরা কালিদাসের কুমারসম্ভবের মধ্যেই বিশদভাবে

দেখিতেছি। শিব-কামনায় তপস্যানিরতা উমাকে তপস্যা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই মহাদেব নিজে বটুব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া উমার নিকটে আসিয়া বহুভাবে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন। উমার সখীগণ যখন বটুব্রাহ্মণের নিকট উমার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল তখন সেই বটুব্রাহ্মণ কিছুমাত্র হর্ষলক্ষণ ব্যঞ্জিত না করিয়া 'অয়ীদমেবং পরিহাস ইতি'—'অয়ি এ কথা কি এইরূপই, না পরিহাস মাত্র'—উমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উমা ঐ কথাই ঠিক জানাইলে বটুব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, 'আমি সেই মহেশ্বরকে চিনি; সর্বপ্রকার অমঙ্গল অভ্যাসে তাহার রতির কথা বিবেচনা করিয়া তোমাকে সমর্থন করিতে আমি উৎসাহিত হইতেছি না। (৫।৬৫)। হে অবস্তুলাভতৎপরে, বিবাহসূত্রযুক্ত তোমার এই হাত সর্পবলয়যুক্ত-করে প্রথম যখন শম্ভু গ্রহণ করিবেন তখন তুমি কিভাবে সহ্য করিবে?

অবস্তুনির্বন্ধপরে কথং নু তে
করোঽয়মামুক্তবিবাহকৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা
সহিষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্॥—৫।৬৬

তাহা ছাড়া—

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং
কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং
গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ॥—৫।৬৭

তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ, নববধূর কলহংসাঙ্কিত দুকূল বসন ও শোণিত-বিন্দুবর্ষি গজাজিন—এই দুইয়ের কি কখনও যোগ (গ্রন্থিবন্ধন) হইতে পারে?

আবার—

চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ
পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়ো-
র্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু॥—৫।৬৮

কুসুমাস্তীর্ণ দিব্যগৃহাঙ্গনে বিন্যস্ত হয় তোমার পদযুগের অলক্তক-রঞ্জিত যে পদচিহ্নগুলি তাহা কেশপরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে ন্যস্ত হইবে—ইহা পরেও অনুমোদন করিতে পারে না।

অযুক্তরূপং কিমতঃপরং বদ
ত্রিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি॥—৫।৬৯

ত্র্যম্বকের বক্ষ (আলিঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ফলে হরিচন্দন ধারণের যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মের ধূলি আসিয়া স্থান লাভ করিবে। বল ত, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অসঙ্গত হইতে পারে?

ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥—৫।৭০

এই তোমার সম্মুখে আর এক বিড়ম্বনা,—যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাহিত হইবার যোগ্যা—নবোঢ়া সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরূঢ়া দেখিয়া মহাজনেরাও স্মেরমুখ হইবেন।

বটুব্রাহ্মণ আরও বলিলেন, 'সেই পিনাকীর সমাগম-প্রার্থনায় সম্প্রতি দুইটি জিনিস শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একটি হইল, কলাবান্ (চন্দ্রের) কান্তিমতী কলা, অপরটি হইল জগতের নেত্রকৌমুদী তুমি।'—৫।৭১। তাহার পরে—

বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে
তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে॥—৫।৭২

(সেই শিবের) বপুটি বিরূপাক্ষ (বিরূপ অক্ষিবিশিষ্ট); জন্ম অজ্ঞেয়; সম্পদ্ দিগম্বরত্বের দ্বারাই সূচিত; হে বালমৃগাক্ষি, বরের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার একটিও কি ত্রিলোচনের মধ্যে আছে?

শেষপর্যন্ত উমাকে নিবৃত্ত করিতে বটুব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাদেব হইলেন একটি 'শ্মশানশূলে', যূপে অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য বৈদিকী সৎক্রিয়া কখনও এই শ্মশানশূলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে দ্বন্দ্বাত্মকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন পরবর্তী কালের সংস্কৃত কবিগণ এই চিত্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে রসবিস্তার করিয়াছেন।[১২] উমার বিবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রতিবেশিনী

[১২] বাঙলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে (প্রথম ভাগ) দেখিতে পাই, 'কুমারসম্ভবে'র এ বর্ণনাকে ভাঙিয়াই কবি দ্বিজরূপধারী শিবের দ্বারা উমাকে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।—

কহ গো নিরুপমা কাহার বোলে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে;
হইয়া সুনারী ভজহ ভিখারী
দরিদ্র বর দিগম্বরে॥
. . . . .
তুমি গো রূপবতী দেহের হেমজ্যোতি
মাণিক্য-রুচির-দশনা।

এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই অনুরূপ বর্ণনা পাই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কবির একটি শ্লোকে।

মহাদেব দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের জন্য আসিয়াছেন; বিবাহবাসরে দেবীগণ বর খুঁজিতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন—এ-জন ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ঐ হইলেন ত্রিদশপতি ইন্দ্র, ইঁহারা হইলেন লোকপালগণ; তবে এখানে জামাতা কে? ঐ যে ভুজগপরিবৃত ভস্মাবরণে রুক্ষ-কপালী—ঐ-ই নাকি? তাহা হইলে 'হা বাছা উমা, তুমি ত বঞ্চিতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ করিতে লাগিলেন সেই দেবীগণ—যাঁহাদের কাছে বর ছিল অনভিমত। উমার মন কিন্তু তাহাতে টলে নাই—সব শুনিয়াও সে কিন্তু 'উপচিতপুলকা'।—

ব্রহ্মায়ং বিষ্ণুরেষ ত্রিদশপতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে
জামাতা কোঽত্র যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী।
হা বৎসে বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভি-
র্দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী।

পরে আমরা দেখিতে পাইব, গৌরীর এই মনোভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "উৎসর্গ" বইয়ের 'মরণ' কবিতায় একটি ভাবগূঢ় রূপ দান করিয়াছেন।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্য শিবায়ন প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, শিবের বেশ দেখিয়া মেনকা ও অন্যান্য রমণীগণ খেদ করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেব মনোহর বেশ ধারণ করিলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।

কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা
শিব শিব গিরিপুত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়।
ইতি বদতি পুরন্ধ্রীমণ্ডলে সিদ্ধিলেশ-
ব্যয়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ॥[১]

ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহি পায়ে ঘরে
হইবে বিভূতিভূষণা॥

কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
নাহি দেখি ভাই বন্ধুজন।
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুখিনী
দারুণ দৈবের কারণ।

. . . . . .

বসন বাঘের ছাল গলায় হাড়ের মাল
উত্তরী যার বিষধরে।
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতার ধূলি অঙ্গে
বরিবে কেন হেন বরে॥
ইত্যাদি।

[১] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

রমণীগণ খেদসহকারে বলিতেছিলেন—'আরে শিব শিব! কেন মেনকা পার্বতীকে দান করিল এই একটি বৃদ্ধ কাপালিকের করে!' এই কথা বলিতে বলিতেই মহাদেব তাঁহার সিদ্ধির সামান্য অংশ ব্যয় করিয়াই মনোহর বরবেশ ধারণ করিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই বর শিবের সহচর সর্প-ভূতাদির ভয়ে পার্বতী ও বহু স্থলে পার্বতীমাতা মেনকা নানাপ্রকার মন্ত্র ও ওষধির ব্যবহার করিয়াছেন। কবি রাজশেখরের একটি শ্লোকেও এইরূপ পার্বতীকে বিবাহের পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রতিষেধক ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই।—

গোনাসায় নিয়োজিতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্ধৌষধিঃ
পাণিস্থায় বিষায় বীর্যমহতে কণ্ঠে মণিং বিভ্রতী।
ভর্তুর্ভূতগণায় গোত্রজরতীনির্দিষ্টমন্ত্রাক্ষরা
রক্ষত্বদ্রিসুতা বিবাহ-সময়ে প্রীতা চ ভীতা চ বঃ॥[১৪]

পার্বতী শিবের অঙ্গস্থিত গোনাস সাপের (গোরুর নাসার আকৃতির নাসাযুক্ত) জন্য লইয়াছেন বিষনাশক ধূলি, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন করিয়াছেন ওষধি; হস্তস্থিত মহাশক্তিশালী বিষের প্রতিকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন মণি, আর ভূতগণের প্রতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোত্রজরতী-নির্দিষ্ট মন্ত্রাক্ষর; বিবাহ-সময়ে এইরূপে সজ্জিতা পার্বতী প্রীতাও বটেন—আবার ভীতাও বটেন।

এই সর্প লইয়া নানা স্থলে রসিকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব অজিনবসন বা ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিতেন। ধর্মাশোকের একটি শ্লোকে দেখি, ইন্দ্র গারুত্মতমণি ধারণ করিয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মণিভয়ে অজিনবন্ধনের ফণিপতি পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; অদূরে পার্বতী অপাঙ্গবিক্ষেপসহ হাস্যমুখী হইয়া উঠিলেন।

পুরস্তাদানম্রাত্রিদশপতিগারুত্মতমণের্
বতংসত্রাসার্তৈরপসরতি মৌঞ্জীফণিপতৌ।
পুরারিঃ সংবৃণ্বন্ বিগলদুপসংব্যানমজিনে
পুনীতাদ্বঃ স্মেরক্ষিতিধরসুতাপাঙ্গবিষয়ঃ॥[১৫]

বঙ্গীয় কবিগণ অবশ্য ইহা লইয়া স্থূল রসিকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। পার্বতী বা মেনকার ধৃত ঔষধ বা ওষধির ফলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ-বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে দিগম্বর করিয়া ছাড়িয়াছেন।

মহাদেবের আভরণ ও আচরণের মধ্যে বহু বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; মহাদেব সম্বন্ধে পার্বতীর চোখের দৃষ্টি ও মনের ভাবও তাই একই

[১৪] সুভাষিতরত্নকোষ।
[১৫] সুভাষিতরত্নকোষ (অন্যান্য বহু সংকলনেও ধৃত)।

সময়ে অতি বিচিত্র। মহাদেব দিগ্বাস—পার্বতীর দৃষ্টি তখন লজ্জিত; মহেশ্বর মদনদ্বেষী—দেবী তাই মুগ্ধস্মিত; মহেশ্বর বিষমদৃষ্টিযুক্ত—দেবীর দৃষ্টি তাই সাশ্চর্য; মহেশ্বর কপালী—দেবী তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাপিত জাহ্নবী—দেবীর দৃষ্টি তাই অসূয়াযুক্ত; সর্প মহেশ্বরের হস্তে বলয়ীকৃত—দেবীর দৃষ্টি তাই সভয়; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে যুগপৎ এতগুলি ভাবের বিকাশ—

দিগ্বাসা ইতি সত্রপং মনসিজদ্বেষীতি মুগ্ধস্মিতং
সাশ্চর্যং বিষমেক্ষণোঽয়মিতি চ ত্রস্তং কপালীতি চ।
মৌলিস্বীকৃতজাহ্নবীক ইতি চ প্রাপ্তাভ্যসূয়ং হরঃ
পার্বত্যা সভয়ং ভুজঙ্গবলয়ীত্যালোকিতঃ পাতু বঃ॥[১৬]

ইহারই একান্ত অনুরূপ আর-একটি শ্লোক উদ্ধৃত দেখি বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলি'র মধ্যে—

সব্রীড়া দয়িতাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্মাম্বরে
সত্রাসা ভুজগে সবিস্ময়রসা চন্দ্রেঽমৃতস্যন্দিনি।
সের্ষ্যা জহ্নুসুতাবলোকনবিধৌ দীনা কপালোদরে
পার্বত্যা নবসঙ্গমপ্রণয়িনী দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ॥[১৭]

নবসঙ্গম-প্রণয়িনী পার্বতীর দৃষ্টি ব্রীড়াযুক্ত দয়িতানন বিষয়ে, সকরুণ হস্তি-চর্মের বসন দেখিয়া, ত্রাসযুক্ত সাপ দেখিয়া, বিস্ময়রসযুক্ত অমৃতনিস্যন্দী চন্দ্র বিষয়ে, ঈর্ষ্যাযুক্ত জাহ্নবীকে অবলোকন করিয়া, আর দীনতা লাভ করিয়াছে কপাল দর্শনে।[১৮]

[১৬] সুভাষিতরত্নকোষ।

[১৭] পিটার পিটার্সন সম্পাদিত। শ্লোকটি সূক্তিমুক্তাবলীতে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে ভাসের নামে পাওয়া যায়।—

ব্যানম্রা দয়িতাননে মকুলিতা শার্দূলচর্মাম্বরে
সোৎকম্পা ভুজগে নিমেষরহিতা চন্দ্রেঽমৃতস্যন্দিনি।
মীলদ্ভ্রূঃ সুরসিন্ধুদর্শনবিধৌ ম্লানা কপালোদরে
পার্বত্যা ইত্যাদি।

[১৮] আচার্য গোপীক ইহাকে আবার আরও আদিরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন—

নাদত্তে ফণিকঙ্কণপ্রণয়িনং নীবীনিবেশে করং
ন চূর্ণৈরুপহন্তি ভালনয়নজ্যোতির্ময়ীং দীপিকাম্।
ধত্তে চর্ম হরেণ মুক্তমপি ন দ্বৈপং ভয়াদিত্যসৌ
পায়াদ্বো নবমোহনব্যতিকরব্রীড়াবতী পার্বতী॥—সদুক্তিকর্ণামৃত

নবমোহনের ব্যাপারে ব্রীড়াবতী পার্বতীর বহু বিপদ্। মহেশ্বর যখন নীবিতে হাত দেন, সে হাতে ফণীর বলয় রহিয়াছে বলিয়া পার্বতী সে হাত ধরিয়া বাধা দিতে সাহস পান না; সেই সময়ে যে জ্যোতির্ময়ী দীপিকা জ্বলিতে থাকে, চূর্ণদ্বারা নিভাইবার চেষ্টা করা যায় না, কারণ তাহা হরের ললাটস্থিত নয়নজ্যোতির দীপিকা; হর কর্তৃক চর্ম মুক্ত হইলেও বাঘের ভয়ে তাহা পার্বতী ধরিতে সাহস পান না।

মহেশ্বরের বিবিধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন করিয়া রাজশেখর কবি আবার অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসম্ভোগের বৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়াছেন।—

জটাগুল্মোৎসঙ্গং প্রবিশতি শশী ভস্মগহনং
ফণীন্দ্রোঽপি স্কন্ধাদবতরতি লীলাঞ্চিতফণঃ।
বৃষঃ শাঠ্যং কৃত্বা বিলিখতি খুরাগ্রেণ নয়নং
যদা শম্ভুশ্চুম্বত্যচলদুহিতুর্বক্ত্রকমলম্॥[১৯]

শম্ভু যখন অচলদুহিতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন জটাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কন্ধ হইতে অবতরণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বনপূর্বক খুরাগ্রের দ্বারা নয়ন ঘষিতে থাকে।

প্রসন্না দেবী স্বামীর সকলই সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কুপিতা হইয়া তিনি অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর ভগবদ্‌গোবিন্দের একটি শ্লোকে দেখি—

শিরসি কুটিলা সিন্ধুর্দোষাকরস্তব ভূষণং
সহ বিষধরৈঃ প্রত্যাসন্না পিশাচপরম্পরা।
হরসি ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং ন্বিতি
প্রণয়কুপিতক্ষ্মাভৃৎপুত্রীবচাংসি পুনন্তু বঃ॥

শিরে তোমার কুটিলা নদী, দোষের আকর (চন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণসহ পিশাচপরম্পরা তোমার সহচর; হে হর, তুমি কেন প্রাণ হরণ করিতেছ না তাহা জানি না। প্রণয়কুপিতা পার্বতীর এই বচনসমূহ তোমাদিগকে পবিত্র করুক।

শিবের বেশভূষা প্রভৃতি লইয়া পার্বতীকে অত্যন্ত লজ্জায় পড়িতে হইয়াছে অন্যভাবে। তাঁহাকে স্মিতমুখে লজ্জাবতী হইতে হইয়াছে একদিন যখন নিজের পুত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'মা পিতার জটায় সুরসরিৎ কেন, শেখরে কেন চন্দ্রমা, কপালে কেন অগ্নি, বুকে এবং কটিতে কেন লম্বিত সর্প? আর কেনই বা পিতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম?'

মাতস্তাতজটাসু কিং সুরসরিৎ কিং শেখরে চন্দ্রমাঃ
কিং ভালে হুতভুগ্ লুঠত্যুরসি কিং নাগাধিপঃ কিং কটৌ।
কৃত্তিঃ কিং জঘনদ্বয়ান্তরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে
শ্রুত্বা পুত্রবচোঽম্বিকা স্মিতমুখী লজ্জাবতী পাতু বঃ॥[২০]

কালিদাসের বর্ণনায় এবং পরবর্তী কালের বহু কবির বর্ণনায় দেখা যায় বটে, শিবের সকল বিসদৃশ এবং বিরূপ বর্ণনা সত্ত্বেও শিববিষয়ে গৌরীর 'ভাবৈক-

[১৯] সুভাষিতরত্নকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা।
[২০] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

রসং মনঃ স্থিতং. কিন্তু অপর দুই-এক কবির বর্ণনায় দেখিতে পাই এমন স্বামীর ঘর তিনি কিভাবে করিবেন এই চিন্তায় গৌরী কাতরা।—

সন্ধ্যারাগবতী স্বভাবকুটিলা গঙ্গা দ্বিজিহ্বঃ ফণী
বক্রাঙ্গৈর্মলিনঃ শশী কপিমুখো নন্দী চ মূর্খো বৃষঃ।
ইত্থং দুর্জনসংকটে পতিগৃহে বস্তব্যমেতৎ কথং
গৌরীত্থং নৃকপালপাণিকমলা চিন্তান্বিতা পাতু বঃ॥

দেবীর পতিগৃহে এক দিকে সতিনী গঙ্গা: তিনি এক দিকে যেমন অত্যন্ত রাগবতী (সন্ধ্যাকালে গঙ্গা রাগবতী বা রক্তিমবর্ণবতী হইয়া ওঠেন, গঙ্গাদেবীর স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পতিপ্রীতি অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই তিনি আবার স্বভাবকুটিলা; স্বামীর সঙ্গে আছে দ্বিজিহ্ব সর্প; চূড়ায় আছে চন্দ্র—যাহা বক্র অবয়ব লইয়া মলিন; আর আছে বানরমুখ নন্দী—আর আছে একটি মূর্খ বৃষ! গৌরী কমলের ন্যায় হস্তে একটি নরকপাল ধারণ করিয়া চিন্তান্বিতা হইলেন, ইহা লইয়াই তাঁহাকে করিতে হইবে স্বামীর ঘর!

দেবীকেই শুধু চিন্তান্বিতা দেখিতে পাই তাহা নহে: অনুচর ভৃঙ্গীরও ভিক্ষাবৃত্তিনির্ভর ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে। একদিন কার্তিক পিতৃগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বাহির হইয়া আসিলে ভৃঙ্গী একটু ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, কোথা হইতে আসিতেছ?' কার্তিক বলিল, 'তাতগৃহ হইতে।' ভৃঙ্গী বলিল, 'বল দেখি সেখানকার নূতন কি বার্তা!' কার্তিক বলিল, 'দেবী কর্তৃক দেব জিত হইয়াছেন।' শুনিয়া ভৃঙ্গীর মেজাজ খারাপ হইয়া গেল: আরও বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'জিতিয়া কি কি পাইয়াছে বল না, একটি বৃষ? আর ডমরু? খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ্র?' ভিক্ষাবৃত্তি শিবকে জয় করিয়া ইহার অধিক আর কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে!

কস্মাত্ত্বং, তাতগেহাৎ. অপরমভিনবা ব্রূহি কা তত্র বার্তা,
দেব্যা দেবো জিতঃ, কিং বৃষ-ডমরু-চিতাভস্ম-ভোগীন্দ্র-চন্দ্রান্।
ইত্যেবং বর্হিনাথে কথয়তি সহসা ভর্তৃভিক্ষা-বিতৃষ্ণা-
বৈগুণ্যোদ্বেগজন্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভৃঙ্গরীটেঃ॥[২১]

হরকণ্ঠলম্বিত সর্পের প্রসঙ্গে পার্বতীসম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে'—

হরকণ্ঠগ্রহানন্দমীলিতাক্ষীং নমাম্যুমাম্।
কালকূটবিষস্পর্শজাতমূর্ছাগমামিব॥

হরের কণ্ঠগ্রহণে আনন্দে নিমীলিতাক্ষী উমাকে নমস্কার করিতেছি—যাঁহাকে মনে হয় কালকূটবিষের স্পর্শের দ্বারা মূর্ছাগতার ন্যায়।

[২১] সুভাষিতরত্নকোষ, তম্বর্গ-ব্রজ্যা।

হরচূড়ালগ্ন খণ্ডচন্দ্রসম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কবির—

স পাতু বিশ্বমদ্যাপি যস্য মূর্ধ্নি নবঃ শশী।
গৌরীমুখতিরস্কার-লজ্জয়েব ন বর্ধতে॥

গৌরীমুখের নিকট পরাভবের লজ্জায়ই যেন শিবের চূড়ার চন্দ্র চিরকাল নব চন্দ্র বা বাল চন্দ্রই রহিয়া গেল, আর বাড়িল না।

পরবর্তী কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের ভিতরে পার্বতীর সংসারের আর একটি ঝঞ্ঝাট দেখিতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের পরিজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাঙলা মংগলকাব্য, শিবায়ন, পাঁচালী প্রভৃতিতে দেখিতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগলে[২২] দেখি—

বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি।
গণার মুষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥
বাঘ-বলদে দ্বন্দ্ব সদা নিবারিব কত।
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত॥
ময়ূর মুষায় দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি সদাই কন্দল।
ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্মফল॥

অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দেখিতে পাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির হরপার্বতী-বিষয়ক পদগুলির মধ্যে এ-বিষয়ে একটি পদ দেখিতে পাই।—

আই তং সুনিঅ উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মূস ঝোরী মোর কাটী॥
ঝোরীরে কাটিএ মূস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥
বেটারে কার্তিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফনিপতি ঝূর॥
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা॥[২৩]

আজি শুনি উমা ভাল পরিপাটী; ছুটাছুটি করিয়া ফিরে মূষিক আমার ঝুলি কাটিয়া। ঝুলি কাটিয়া মূষা জটা কাটিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, আর মাথায় বসিয়া গংগার জল পান করিবে। বেটা কার্তিক পুষিল এক ময়ূর, তাহাকে দেখিয়া ডরে আমার ফণিপতি (সাপ) কাঁদিতে থাকে। তুমি যে পুষিলে গৌরী মোটা এক সিংহ, তাহাকে দেখিয়া ডরায় আমার বৃষটি।

[২২] প্রথম ভাগ।
[২৩] শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদারের সংস্করণ।

বাহন লইয়া এই পারিবারিক গোলমালের আভাস খানিকটা সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি হরের ফণী আর গুহের (কার্তিকের) শিখী লইয়া গোলমাল।—

ফণিনি শিখিগ্রহকুপিতে
শিখিনি চ তন্দেহবলয়িতাকুলিতে।
অবতাদ্বো হরগুহয়োরুভয়পরিত্রাণকাতরতা॥[২৪]

অন্য শ্লোকে দেখিতে পাই সিংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে সর্পকে রক্ষার সমস্যা।—

চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষতি সদা সদ্যোনমুণ্ডস্রজং
চণ্ডীকেশরিণো বৃষং চ ভুজগান্ সূনোর্ময়ূরাদিতি।

কিন্তু এতসব ঝঞ্ঝাটের পরেও আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠি যখন একটি শ্লোকে দেখিতে পাই বিবাহের পরে মা পার্বতীর প্রভাবে বিবাগী ছন্নছাড়া শিব আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।—

উজ্ঝিত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাসহর্ম্যাশ্রয়ঃ।
ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবঃ পাতু হিমাদ্রিজাপরিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিবঃ॥

পার্বতীকে বিবাহ করিয়া শিব দিক-রূপ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া ভালো বসন পরিধান করিলেন, শ্মশানবাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসের হর্ম্য আশ্রয় করিলেন; ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গবিলেপন করিতে লাগিলেন; এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন।

সংস্কৃত কবিতার সংকলন-গ্রন্থগুলিতে আমরা পার্বতী-মহেশ্বরকে লইয়া পূর্বরাগ প্রণয় পরিণয় সম্ভোগ প্রেম কলহ মান অভিমান পুনর্মিলন সব জিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাই বিবাহের পূর্বে পার্বতী যখন তপস্বী শিবের শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সমাধির খানিকটা অন্তরায়ভূতা জানিয়াও মহাদেব পার্বতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

বিকারের হেতু বর্তমান সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিকারগ্রস্ত না হয় তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। পরবর্তী কালের সকল কবি কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধীরত্ব রক্ষা

[২৪] সুভাষিতরত্নমহাকোষ।

করিতে পারেন নাই। শ্রীহর্ষদেবের রচিত একটি কবিতায় দেখিতে পাই, শঙ্কর-আরাধনের সময় স্তনভারে নম্রতাপ্রাপ্ত মহাদেবের পদাগ্রে স্থিত গৌরীকে মহাদেব তাঁহার সস্পৃহলোচনত্রয়ের দ্বারাই দর্শন করিতেছিলেন; ফলে গিরিজাও পুলক ও স্বেদোদ্গমে উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লজ্জাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মস্তকধৃত শিথিল কুসুমাঞ্জলি দূর হইতে মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়া গেলেন।—

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুঃ স্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং
শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনত্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে।
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্গমোৎকম্পয়া
বিশ্লিষ্যন্ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোহন্তরে পাতু বঃ॥[২৫]

বিবাহ-সময়ে গৌরীর বর্ণনায় ভাসের একটি কবিতায় পাই, প্রত্যাসন্ন বিবাহের মঙ্গলবিধিতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গৌরী; দেবার্চনা করিতে গিয়া সামনে দেখিতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধর শিবের অঙ্কিত আকৃতি; পার্বতীর উন্মাদনা, ঈষৎ হাস্য, রোষ ও লজ্জা উপস্থিত হইল; তথাপি বৃদ্ধস্ত্রীগণের বচনে কোনওরূপে প্রিয়ের প্রতিকৃতিতে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি।—

প্রত্যাসন্নবিবাহমঙ্গলবিধৌ দেবার্চনব্যস্তয়া
দৃষ্ট্বাগ্রে পরিণেতুরেব লিখিতাং গঙ্গাধরস্যাকৃতিম্।
উন্মাদস্মিতরোষলজ্জিতরসৈর্গৌর্যা কথঞ্চিচ্চিরা-
দ্বৃদ্ধস্ত্রীবচনাৎ প্রিয়ে বিনিহিতঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ পাতু বঃ॥[২৬]

বিবাহ-কালে শিবের বেশ ও আভরণাদি লক্ষ্য করিয়া বা বিসদৃশ রূপ-গুণ লক্ষ্য করিয়া পার্বতীর দৃষ্টিতে যে যুগপৎ বহুভাবের উদয় তাহার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই-সকল বিসদৃশ রূপ-গুণের কথা বাদ দিয়া বিবাহ-সময়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে কুমারীর দৃষ্টিতে যে বিচিত্র ভাবমিশ্রণ তাহাও চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে।—

আদৌ প্রেমকষায়িতা হরমুখব্যাপার-লোলা শনৈ-
র্ব্রীড়াভারবিঘূর্ণিতা মুকুলিতা ধূমোদ্গমব্যাজতঃ।
পত্যুঃ সম্মিলিতা দৃশা সরভসব্যাবর্তনব্যাকুলা
পার্বত্যাঃ পরিণীতিমঙ্গলবিধৌ দৃষ্টিঃ শিবায়াস্ত বঃ॥

প্রথমেই শিবের প্রতি অনুরাগিণী পার্বতীর নয়ন-দুইটি নবপ্রেমে অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; তদুপরি শিবের আননে স্থাপিত হওয়ায় দৃষ্টি চঞ্চল; আবার লজ্জাভারেও বিঘূর্ণিত—বিবাহকালে ধূমোদ্গমের ছলে মুকুলিত; আবার পতির চক্ষুতে চক্ষু পড়িতেই চক্ষু-দুইটি তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লওয়ায় ব্যাকুল;

[২৫] সূক্তিমুক্তাবলী; সদুক্তিকর্ণামৃত ও সুভাষিতভাণ্ডাগারেও ধৃত।
[২৬] সদুক্তিকর্ণামৃত; সুভাষিতরত্নকোষ এবং সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত।

সব জিনিস মিশ্রিত হইয়া গৌরীর চক্ষু-দুইটিতে দেখা দিয়াছে একটি বিচিত্র ভয়বিহ্বলতা। এই বর্ণনা পরবর্তী কালের কিলকিঞ্চিৎ-ভাবাশ্রিত রাধার চক্ষু-দুইটির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

জগজ্জননী পার্বতীর শৃঙ্গারবর্ণনা অবিধেয় বলিয়া উক্ত হইলেও সংস্কৃত কবিগণ প্রাকৃত দাম্পত্য-জীবনের চিত্রগ্রহণ করিয়া নানাভাবে দেবী-অবলম্বনে শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভবে'র অষ্টম সর্গে আমরা নবোঢ়া পার্বতীর সংগম-ঔৎসুক্যের সহিত স্বাভাবিক লজ্জা-ভয়ের সুকুমার বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রথম প্রথম মহাদেব কথা বলিলেও গৌরী কথা বলিতেন না, মহাদেব বস্ত্রধারণ করিলে গৌরী অন্যত্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেন, গৌরী অন্যদিকে ফিরিয়া শুইয়া থাকিতেন—কিন্তু এই-সকল আচরণের দ্বারাও তিনি মহাদেবের রতি-স্পৃহাকে জাগ্রত করিয়া দিতেছিলেন।—

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে
গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী
সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ॥—৮।২

সখীরা এ-বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু পতি সম্মুখবর্তী হইলে আকুলা গৌরী সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে লজ্জা ভাঙে, ধীরে ধীরে আপন যৌবন মুকুলিত হয়—উভয়তঃই ভোগস্পৃহা জাগ্রত হয়। পরবর্তী কালের কবিগণও নব-সংগমে গৌরীর ঔৎসুক্য ও লজ্জাভীতির নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একস্থানে দেখি—

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা হ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য বচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্টবাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতাশ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ॥[২৭]

এখানে দেখিতেছি, গৌরী নিজেই ঔৎসুক্যে ত্বরা করিতেছেন, আবার নিজেই লজ্জায় ফিরিয়া আসিতেছেন; বন্ধুবধূজনের কথায় হয়তো সামনে আগাইয়া আসিয়াছেন, আবার সম্মুখে বরকে দেখিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। নবোঢ়া পত্নীর এই চাঞ্চল্যই পতির বাসনাকে আরও সন্ধুক্ষিত করিয়া তোলে; এখানেও দেখিতেছি পুলকিতা গৌরীকে মহাদেব হাসিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন।

বিবাহের পরে গৌরী শিবের সাতিশয় আদরিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি ভগীরথদত্ত এইজন্য গৌরীকে বলিয়াছেন 'হর-হৃদয়-তড়াগ-রাজহংসী'।[২৮] বিবিধ নর্মলীলায় তাঁহার নববিবাহিত মধুর দিনগুলি কাটিয়াছে। রতিসমুৎসুকা

[২৭] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার। [২৮] সদুক্তিকর্ণামৃত, গৌরী, ৩।

হইলেও অন্যভয়ে ভীতা নবপরিণীতা বধূকে যেমন নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সংগম-প্রার্থনা করিতে হয় গৌরীর ক্ষেত্রেও মহাদেবকে তাহাই করিতে দেখিতে পাই। কঙ্কোল কবির একটি শ্লোকে দেখি—

বালঃ সুন্দরি চন্দ্রমাঃ স্রুতসুধাধারাভিরাপ্যায়িতো
নিদ্রামেতি ফণীশ্বরঃ সুরধুনী রুদ্ধা জটামণ্ডলে।
ইত্থং মন্মথকেলিকৌতুকবিধৌ ব্রীড়াবতীং পার্বতীং
পায়াদ্বঃ প্রতিবোধয়ন্নববধূং চন্দ্রার্ধচূড়ামণিঃ॥[২৯]

মন্মথকেলিকৌতুক-বিধিতে নববধূ পার্বতী স্বাভাবিকই ব্রীড়াবতী; শিবকে তাই তাঁহাকে নানাভাবে প্রতিবোধিত করিয়া লইতে হইয়াছে। পার্বতীকে লজ্জিতা দেখিয়া শিব বলিতেছেন—হে সুন্দরি, চন্দ্র শিশু, তাহাকে স্রুত-সুধাধারা দ্বারাই আপ্যায়িত করা হইয়াছে (সুতরাং তাহাকে লজ্জা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই); ফণীশ্বর এখন ঘুমাইয়া আছে; আর সুরধুনীকে জটামণ্ডলে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (বাহির হইয়া কিছুই দেখিতে পাইবে না)।

সম্ভোগে শম্ভুর সর্বেন্দ্রিয় গৌরীতে সংসক্ত। উমাপতিধরের একটি সম্ভোগ-বর্ণনায় দেখি—

শ্রুতিঃ সক্তা মুগ্ধে বচসি বদনেন্দৌ নিপতিতা
দৃশঃ স্বাদৌ বিম্বাধরমধুনি মগ্নৈব রসনা।
নিষণ্নাভূন্নাসা নিজপরিমলে শৈলদুহিতু-
র্ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরপি বিলীনং পুরভিদঃ॥[৩০]

পুরারি (ত্রিপুরারি) শিবের কান সংসক্ত গৌরীর মুগ্ধবচনে; দৃষ্টি নিপতিত গৌরীর বদন-ইন্দুতে; রসনা মগ্ন স্বাদু বিম্বাধর-মধুতে; নাসিকা নিষণ্ন অঙ্গ-পরিমলে; আর শৈলসুতার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও গিয়াছে বিলীন হইয়া।

বররুচির নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে[৩১] দেখি রতি-কলহে মহাদেবের চূড়া হইতে চ্যুত হইয়াছে ইন্দুলেখা, আর পার্বতীর ভাঙিয়াছে শুভ্র শঙ্খবলয়। মিলনান্তে হাস্যমুখী শৈলতনয়া শিবের সম্মুখে চ্যুত শুভ্র চন্দ্রলেখা এবং ভগ্ন শুভ্র হস্তবলয় উভয়কেই একসঙ্গে করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন—'একবার দেখ!'—

চ্যুতামিন্দোর্লেখাং রতিকলহভগ্নং চ বলয়ং
দ্বয়ম একীকৃত্য প্রহসিতমুখী শৈলতনয়া।
অবোচদ যং পশ্যেত্যবতু স শিবঃ সা চ গিরিজা
স চ ক্রীড়াচন্দ্রো দশনকিরণাপূরিততনুঃ॥

২৯ সদুক্তিকর্ণামৃত, হরশৃঙ্গার, ৩। ৩০ ঐ, ঐ, ৪।
৩১ সুভাষিতরত্নকোষ; শ্লোকটি কালিদাসের বলিয়াও গৃহীত।

হরগৌরীকে লইয়া যে একটি অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিকল্পনা ইহা তত্ত্ব এবং সাধনা উভয় দিক হইতেই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। তত্ত্বের দিক হইতে শিব শুভ্র জ্ঞানমাত্রতনু, গৌরী প্রকাশাত্মিকা। এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই অর্ধ; অর্ধনারীশ্বর পরম অদ্বয়-তত্ত্বেরই বিগ্রহ। কালিদাস এই পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত (বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ) বলিয়াছেন। তন্ত্র-সাধনার দিক হইতে প্রত্যেক জীবদেহই একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি; দেহের বামার্ধ হইল শক্তিতত্ত্ব বা নারীতত্ত্ব; দক্ষিণার্ধ হইল পুরুষতত্ত্ব: প্রত্যেক পুরুষ তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ; প্রত্যেক নারীও তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ। নারী কখনও বিশুদ্ধা নারী নয়, নারীতত্ত্ব প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুষ নয়, পুরুষতত্ত্ব প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পুরুষত্ব। এই নারী-পুরুষের যুগলতত্ত্বও হইল বাম-দক্ষিণে মিলিত অর্ধনারীশ্বর-তত্ত্ব। কিন্তু কবিগণ এই তত্ত্ব ও সাধন-রহস্যকে আদিরসের বিস্তারে নানারূপে ঢালিয়া লইয়াছেন। পার্বতীর সঙ্গসুখ ত্যাগ মুহূর্তমাত্রও অসম্ভব বলিয়াই মহাদেব তাঁহাকে একেবারে নিজদেহে যুক্ত করিয়া অর্ধাঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কবিগণকে অনুসরণ করিয়া কবি ভারত-চন্দ্রও 'অন্নদামঙ্গলে' বলিয়াছেন—

> হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সামান।
> হর-গৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
> দুই জনে সহাস্য-বচনে রসরঙ্গে।
> হরগৌরী এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে॥

কিন্তু মহাদেব একদিন স্মিতমুখে অর্ধাঙ্গিনী গৌরীকে ডাকিয়া বলিতেছেন. ব্যর্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ—ইহাও তো মস্ত বড় এক বিড়ম্বনা-রূপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দক্ষিণে মিলাইয়া এক করিয়া লইবার ফলে হাস্য-পরিহাসে রসালাপ প্রভৃতি তো দূরের কথা—এখন যে আর একের পক্ষে অন্যের মুখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না!—

> আশ্লেষাধরবিম্বচুম্বন-সুখালাপ-স্মিতান্যাসতাং
> দূরে তাবদিদং মিথো ন সুলভং জাতং মুখালোকনম্।
> ইত্থং ব্যর্থকৃতৈকদেহঘটনোপন্যাসয়োরাবয়োঃ
> কেয়ং প্রেম-বিড়ম্বনেত্যবতু বঃ স্মেরোঽর্ধনারীশ্বরঃ॥[০২]

ভগীরথ-নামক কবির নামে প্রচলিত একটি পদে দেখি—

> মিশ্রীভূতাং তব তনুলতাং বিভ্রতো গৌরি কামং
> দেবস্যাসীদবিরলপরীরম্ভজন্মা প্রমোদঃ।

[০২] সুভাষিতাবলিতে শূরবর্ধন কবির বলিয়া গৃহীত, সদুক্তিকর্ণামৃতে কস্যচিৎ বলিয়া গৃহীত।

কিং তু প্রেমস্তিমিতমধুরস্নিগ্ধমুগ্ধা ন দৃষ্টির্
দৃষ্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যতি ত্র্যম্বকস্য॥

ত্র্যম্বকের ছিল 'অবিরল-পরিরম্ভজন্মা প্রমোদ'; কারণ গৌরীর তনুলতাকে নিজের দেহে লইয়াছিলেন মিশ্রীভূত করিয়া, কিন্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমস্তিমিত-মধুরস্নিগ্ধমুগ্ধা দৃষ্টি'র আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়—তাই ব্যথিত হইতেছে ত্র্যম্বকের অন্তঃকরণ।

এই অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজশেখরের একটি কবিতায় বালগুহের (কার্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।—

অম্বেয়ং নেয়মম্বা ন হি খরকপিশং শ্মশ্রু তস্যা মুখার্ধে
ততোঽয়ং নৈষ তাতঃ স্তনমুরসি পিতুর্দৃষ্টবান্নাহমত্র।
কেয়ং কোঽয়ং কিমেতদ্ যুবতিরথ পুমান্ বস্তু কিং স্যাত্তৃতীয়ম্
শম্ভোঃ সংবীক্ষ্য রূপাদপসরতি গুহঃ শঙ্কিতঃ পাতু যুষ্মান্॥[৩৩]

নববিবাহিতা কন্যার পতিসোহাগিনীত্বই মাতার কাম্য; তাই কন্যা-জামাতার দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের কথা আড়শী-পড়শী বধূগণ যখন আসিয়া মাতার কাছে কানাকানি করিয়া বলে তখন তাহা মাতার আনন্দবৃদ্ধিরই কারণ হয়। গৌরীমাতা মেনকার ক্ষেত্রেও তাহাই দেখিতেছি।—

প্রাতঃ কালাঞ্জনপরিচিতং বীক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরঙ্গুলীভস্মমুদ্রাঃ।
প্রেমোল্লাসাজ্জয়তি মধুরং সস্মিতাভির্বধূভির্
গৌরীমাতুঃ কিমপি কিমপি ব্যাহৃতং কর্ণমূলে॥[৩৪]

সকালবেলা উঠিয়া হাস্যমুখী বধূগণ জামাতা শিবের ওষ্ঠে দেখিতে পাইলেন কাল অঞ্জনের অঙ্কন, আর কন্যা গৌরীর দুই স্তনে লক্ষ্য করিলেন অঙ্গুলির ভস্ম-চিহ্ন; তাঁহারা তখন নারীজনোচিত স্বাভাবিক প্রেমোল্লাসে আসিয়া গৌরীর মাতার কানে কানে কি-সব যেন বলিতে লাগিল!

ইহা তো নববিবাহিতার চিত্র, পরবর্তী চিত্রও অনেক আছে। গুহ (কার্তিক) এখনও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত বালক; একদিন মাতাকে ডাকিয়া বলিল, 'মা, অধরখণ্ডনের জন্য কাপালিক শিবের নিকটে তোমার পরাভব ঘটিয়াছিল—সে কথা আজ ব্রহ্মাদির নিকটে বল।' শুনিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি দুই হাতে অপোগণ্ড কার্তিকের মুখ চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না; তাহা দেখিয়া

[৩৩] সুভাষিতরত্নকোষ।
[৩৪] সুভাষিতরত্নকোষ, শুভাঙ্গ কবি রচিত।

সংকুচিত চতুরাননও অন্যদিকে মুখ ফিরাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন।—

মাতস্তেঽধরখণ্ডনাৎ পরিভবঃ কাপালিকাদ্ যোঽভবৎ
স ব্রহ্মাদিষু কথ্যতামিতি মুহুর্বাল্যাদ্ গুহে জল্পতি।
গৌরীং হস্তযুগেন ষণ্মুখবচো রোদ্ধুং নিরীক্ষ্যাক্ষমাম্
বৈলক্ষ্যাচ্চতুরাস্যনিষ্ফলপরাবৃত্তিশ্চিরং পাতু বঃ॥[৩৫]

বাম্য অবলম্বনে গৌরীর মানিনী অভিমানিনী মূর্তি এবং তাঁহার অসূয়া-বশে কুপিতা নায়িকামূর্তি আমরা দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি শিবের বক্ষঃস্থলের স্ফটিকমণিশিলামণ্ডলের স্বচ্ছদীপ্তিতে পড়িয়াছে পার্বতীর ছায়া; শিবের বুকে নারীর ছায়া দেখিয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা হইয়া উঠিলেন; শিব যতই বলিতেছেন, 'এ তুমিই, এ তুমিই' পার্বতী তাহাতে আশ্বাসিতা না হইয়া অসূয়াযুক্তাই হইয়া উঠিলেন, অসূয়ার কারণ-স্বরূপে পার্বতী বলিতেছেন, 'আমার বাম কর্ণে কুবলয়, ঐ নারীর যে দেখিতেছি দক্ষিণ কর্ণে কুবলয়!' শিব উত্তরে আর কি বলিবেন, হাসিয়া পার্বতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

বক্ষঃপীঠে নিরীক্ষ্য স্ফটিকমণিশিলামণ্ডলস্বচ্ছভাসি
স্বাং ছায়াং সাভ্যসূয়া ত্বমিয়মিতি মুহুঃ সত্যমাশ্বাসিতাপি।
বামে মে দক্ষিণেঽস্যাঃ শ্রবসি কুবলয়ং নাহমিত্যালপন্তী
দত্তাশ্লেষা সহাসং মদনবিজয়িনী পার্বতী বঃ পুনাতু॥[৩৬]

চক্রপাণি কবির একটি শ্লোকে দেখিতে পাই হরের মুখে অন্য রমণীর নাম শুনিয়া কুপিতা গৌরীর একটি চিত্র।—

তস্যা নাম ময়া কথং কথমপি ভ্রান্ত্যা সমুচ্চারিতং
জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গৌরি প্রসন্না ভব।
ক্ষান্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবতি ময়ি ক্রোধঃ পরিত্যজ্যতা-
মিত্যেবং বহু জল্পতঃ স্মররিপোঃ প্রেমাঞ্জলিঃ পাতু বঃ॥[৩৭]

কুপিতা গৌরীকে শিব বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রেমাঞ্জলি ধরিয়া বলিতেছেন, 'তাহার (সেই নারীর) নাম কোনও রকমে ভ্রান্তিবশেই আমি উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছি; হে গৌরি, তোমার জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি নিজেই তো জান, সুতরাং তুমি প্রসন্না হও; তুমি ক্ষান্তি স্বীকার কর, হে দয়াবতি, আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর।'

মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জলি যে গৌরীর মনঃপূত কার্য ছিল না তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি; মহাদেব সতিনী গঙ্গাকে যে মাথায় রাখিতেন তাহাতে

[৩৫] সুভাষিতরত্নকোষ; চিত্তপ কবি রচিত।
[৩৬] শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, পিটার পিটারসন-সম্পাদিত; সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারেও ধৃত।
[৩৭] সদুক্তিকর্ণামৃত, হরশৃঙ্গার।

গৌরীর আপত্তি হইবারই কথা। মহাদেব যে সমুদ্রমন্থনে বিষপান করিয়াছিলেন সেই ঘটনাটিকেও একটি গূঢ়ার্থ দান করা হইয়াছে। একজন কবি গৌরীর খণ্ডিতা-রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাং যৎ প্রণিপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জলির্যাচসে
ধৎসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ শিরসা তন্নাম সোঢ়ং ময়া।
শ্রীর্যাতামৃতমন্থনে যদি হরিং কস্মাদ্বিষং ভক্ষিতং
মা স্ত্রীলম্পট মাং স্পৃশেতি গদিতো গৌর্যা হরঃ পাতু বঃ॥[৩৮]

ইহা যেন সেই পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের 'ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক'র প্রাক্ রূপ। সন্ধ্যাকে প্রণতি জানাইয়া বদ্ধাঞ্জলি শিব লোকের সম্মুখেই প্রসাদ যাচ্ঞা করেন; বিলজ্জের ন্যায় গঙ্গাকে তো শিরে বহন করেনই; এখানে আবার নূতন জানিতে পারিতেছি যে অমৃতমন্থনে শ্রী আবির্ভূতা হইয়া হরিকে বরণ করিয়াছিলেন এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবন-ত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং গৌরী কুপিতা হইয়া ঠিকই বলিয়াছেন, 'হে স্ত্রীলম্পট, আমাকে তুমি ছুঁইও না।'

গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরীর নিকটে বহুভাবে জবাবদিহি করিতে হইয়াছে; শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোক্তিবন্ধনেও গঙ্গাকে বহু সময়ে গৌরীর নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।[৩৯]

মান-অভিমানের পরে অনুনয়-বিনয় করিয়া পিনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী 'কলহান্তরিতা' হইয়া ওঠেন নাই। শিবকে বার বার গৌরীর পদে নত হইতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্' বলিয়া শ্রীরাধার পদধারণ করাইয়া শ্রীজয়দেব কবি বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্বে সংস্কৃত কবিগণ বহুবার শিবের দ্বারা

[৩৮] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার, সুভাষিতাবলিতেও ধৃত।

[৩৯] এষা তে হর কা সুগাত্রি কতমা মূর্ধ্নি স্থিতা কিং জটা
হংসঃ কিং ভজতে জটাং নহি শশী চন্দ্রো জলং সেবতে।
মুগ্ধে ভূতিরিয়ং কুতোঽত্র সলিলং ভূতিস্তরঙ্গায়তে
যশ্চৈবং বিনিগূহতে ত্রিপথগাং পায়াৎ স বঃ শঙ্করঃ॥
কেয়ং মূর্ধ্ন্যন্ধকারে তিমিরমিহ কুতঃ সুভ্রু কান্তেন্দুযুক্তে
কান্তাপ্যত্রাস্তি কাচিন্ননু ভবতু ময়া পৃষ্টমেতাবদেব।
নাহং দ্বন্দ্বং করোমীত্যপনয় শিরসস্তূর্ণমেনামিদানী-
মিত্থং প্রোক্তো ভবান্যা প্রতিবচনজিতঃ পাতু বশ্চন্দ্রচূড়ঃ॥—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার
ধন্যা কেয়ং স্থিতা তে শিরসি শশিকলা কিংনু নামৈতদস্যা
নামৈবাস্যাস্তদেতৎ পরিচিতমপি তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ।
নারীং পৃচ্ছামি নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদেন্দু-
র্দেব্যা নিহ্নোতুমিচ্ছোরিতি সুরসরিতং শাঠ্যমব্যাদ্বিভোর্বঃ।—মুদ্রারাক্ষস

গোরীর পদধারণ করাইয়াছেন। গৌরীর পদে আনত দৃষ্টির কথা তো অনেকই পাওয়া যায়। ভাস কবির নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে দেখি—

নখদর্পণসংক্রান্তপ্রতিমাদশকান্বিতঃ।
গৌরীপাদানতঃ শম্ভুর্জয়ত্যেকাদশঃ স্বয়ম্॥[৪০]

শম্ভু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশটি নখ-দর্পণে দশটি শিবের প্রতিমা দেখা যাইতেছে; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্বয়ং শম্ভু যেন একাদশ শিব-রূপে শোভা পাইতেছেন।

অজ্ঞাতনামা অন্য একজন কবির একটি শ্লোকে দেবীর পদনখের মহিমা কীর্তন করা হইতেছে—

লাক্ষারাগং হরতি শিখরাজ্জাহ্নবীবারি যেষাং
যে তন্বন্তি স্রজমধিজটামণ্ডলং মালতীনাম্।
প্রত্যুৎসর্পদ্বিমলকিরণৈর্যৈ স্তিরোধানমিন্দো-
র্দেব্যাঃ স্থাণৌ চরণপতিতে তে নখাঃ পান্তু বিশ্বম্॥[৪১]

শিব গৌরীর পদে নত হইয়াছেন; ফলে হরশিরস্থিতা জাহ্নবীর জলে গৌরীর পদের নখগুলির লাক্ষারাগ ধৌত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামণ্ডলে সেই শুভ্র নখগুলি মালতীমালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগুলি হইতে যে বিমল কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘটিয়াছে।

শ্রীহর্ষরচিত একটি শ্লোকে দেখি, গৌরী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া শিবকে বলিতেছেন, 'দূরে সর ওহে দারুবনে অভিসারকারী; এখন তোমার সব মিথ্যা চাটুবাক্য পরিত্যাগ কর; আবার যদি সেই তুমি এবং পুনরায় সেই আমি (হইব) তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে।' গিরিসুতা এই কথা বলিলে মস্তকচূড়ার চন্দ্রকে ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত করিবার ছলে শশিমৌলী শিব দেবীর পাদপদ্মে মস্তক নত করিলেন।—

দূরে দারুবনাভিসারক মৃষা চাটূনি মুঞ্চাধুনা
ভূয়স্ত্বং পুনরপ্যহং যদি তদা চন্দ্র ক্ষিতিং যাস্যতি।
ইত্যুক্তঃ শশিমৌলিরদ্রিসুতয়া চূড়েন্দুভূলম্ভন-
ব্যাজব্যঞ্জিতপাদপদ্মপতনপ্রীতপ্রিয়ঃ পাতু বঃ॥[৪২]

গোত্রানন্দ কবি-লিখিত একটি সমজাতীয় শ্লোক পাইতেছি।—

ক্রীড়াসরোষগিরিজাচরণারবিন্দং
বন্দে যদগ্রপতিতা হরিণাঙ্কলেখা।

[৪০] সুভাষিতরত্নকোষ।
[৪১] সদুক্তিকর্ণামৃত।
[৪২] ঐ; সূক্তিমুক্তাবলীতে কবির নাম আছে হর্ষপণ্ডিত।

কামাপহস্তিতবৃষধ্বজধৈর্যলক্ষ্মী-
পাতাবভগ্নবলয়ার্ধনিভা বিভাতি॥[৪৩]

কৌতুকচ্ছলে রোষযুক্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে গিরিজা তাঁহার চরণারবিন্দের সামনে পতিত হইয়াছে চন্দ্রলেখা; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারিত বৃষধ্বজের ধৈর্যলক্ষ্মীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পতিত হইয়া ভগ্নভাবে শোভা পাইতেছে।[৪৪]

উমাপতিধর এই পাদপতনের আরও অনেক বিস্তার করিয়াছেন।—

চূড়াভস্মকণাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্
নেত্রাগ্নিদ্যুতিতাপিতাবিব করৈঃ সিঞ্চন্ সুধাদীধিতেঃ।
নাগশ্বাসকলঙ্কিতাবিব মুহুর্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্
মানিন্যাশ্চরণৌ গিরীন্দ্রদুহিতুর্ভূত্যৈ গিরিশোঽস্তু বঃ॥[৪৫]

গিরীন্দ্র-দুহিতা মান করিয়াছেন, সেই মানিনীর চরণযুগলে পতিত হইয়াছেন গিরিশ শিব। এই পতনের ফলে শিবের চূড়া-ভস্মের দ্বারা অঙ্কিত হইল যে গিরিজার চরণযুগল তাহা যেন জটাপত্রাঞ্চলের দ্বারা শিব মুছিয়া দিতেছিলেন; আবার গিরিজার চরণযুগল হরের নেত্রাগ্নিদ্যুতি-দ্বারা তাপিত হইতেছিল—সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রের সুধাস্নিগ্ধ কিরণ-সিঞ্চনে সেই তাপ দূর করা হইতেছিল; আবার হরের গললগ্ন সর্পের শ্বাসের দ্বারা কলঙ্কিত হইতেছিল যে চরণযুগল তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই করা হইতেছিল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এইভাবেই চলিতেছিল মানিনী গিরিজার মানভঙ্গের চেষ্টা।

পার্বতীর পত্নীরূপের যেমন বিবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার মাতৃরূপেরও কিছু কিছু চিত্র দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখিতে পাই স্তন্যদাত্রী পার্বতীর মাতৃরূপ। ষড়ানন শিশু কার্তিক তাহার দুই আনন বিস্তৃত করিয়া গিরিজার স্তনযুগল পান করিতেছে।—

শৈলরাজতনয়াস্তনযুগ্ম-
ব্যাপৃতাস্যযুগলস্য গুহস্য।
শেষবক্ত্রকমলানি মলং বো
দুগ্ধপানবিধুরাণি হরন্তু॥[৪৬]

[৪৩] সূক্তিমুক্তাবলী।

[৪৪] তুলনীয়—প্রণয়কুপিতপ্রিয়াপদলাক্ষাসন্ধ্যানুবন্ধমধুরেন্দুঃ।
তদ্বলয়কনকনিকষগ্রাবগ্রীবঃ শিবো জয়তি।—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

[৪৫] সূক্তিমুক্তাবলী। তুলনীয়—
উদ্বাহারোপিতার্দ্রাক্ষতনিজপদয়োঃ সঙ্গতামিন্দুমৌলা-
বানম্রে যাং সুধাংশোর্ব্যধিত কিল কলাং তূর্ণমেবান্নপূর্ণাম্।
সন্তানামক্ষতানামমৃতদৃগনলোপাধিতঃ পক্বভাবা-
ন্নানার্থৈরন্নপূর্ণা প্রণতজনততেঃ পূর্ণতামাতনোতু॥—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

[৪৬] সুভাষিতাবলি।

অপর একটি শ্লোকে কলাহব্যাপৃত দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশের ঝগড়া মিটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্যময়ী মূর্তিখানি অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে—

হে হেরম্ব কিমম্ব রোদিষি কথং কর্ণৌ লুঠত্যগ্নিভূঃ
কিং তে স্কন্দ বিচেষ্টিতং মম পুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুষাম্।
নৈতত্তেঽপ্যুচিতং গজাস্য চরিতং নাসাং মিমীতেঽম্ব মে
তাবেবং সহসা বিলোক্য হসিতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ॥[৪৭]

মা পার্বতী গণেশকে ডাকিলেন—'হে হেরম্ব'; গণেশ বলিল—'কি মা'; মা বলিলেন—'কাঁদ কেন?' 'কার্তিক আমার দুই কান মলিয়া দিয়াছে।' মা কার্তিককে ধমক দিয়া বলিলেন—'স্কন্দ, তোমার এ কি কাজ?' কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল—'ও প্রথমে আমার চক্ষুগুলির (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষুর) সংখ্যা করিতেছিল।' গণেশকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন—'এটাও তোমার উচিত হয় নাই গজানন।' গজানন বলিল—'ও যে মা আমার নাসা মাপিতেছিল!' তখন দুইজনকেই দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

দেবী পার্বতীর আমরা আবার আর-একটি রূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে নৃত্যশিক্ষাভিলাষিণী লাস্যময়ী-রূপে। শিবই নটরাজ—নৃত্যের আদিগুরু; লাস্যময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিষ্যা। শিব তাই নানাভাবে পার্বতীকে নৃত্য-শিক্ষা দান করিয়াছেন। বিদ্যাপতির হরপার্বতী-সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই হরপার্বতীর নৃত্যের কথা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। একটি শ্লোকে দেখিতেছি হর পার্বতীকে হাতে ধরিয়া নৃত্যের প্রতিটি জিনিস শিক্ষা দিতেছেন।—

এবং স্থাপয় সুভ্রু বাহুলতিকামেবং কুরু স্থানকং
নাত্যুচ্চৈর্নম কুঞ্চয়াগ্রচরণৌ মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্।
এবং নর্তয়তঃ স্ববক্ত্রমুরজেনাম্ভোধরধ্বানিনা
শম্ভোর্বঃ পরিপান্তু নর্তিতলয়চ্ছেদাহতাস্তালিকাঃ॥[৪৮]

শিব প্রথমে পার্বতীকে দেখাইয়া দিতেছেন, 'হে সুভ্রু, বাহুলতাকে এইভাবে রাখ, এই বিশেষ ভঙ্গিতে অবস্থান কর; বেশি নমিত হইও না, চরণের অগ্রভাগ কুঞ্চিত কর—কিছুক্ষণ আমাকে দেখ।' শিব এইভাবে উপদেশ দিতেছেন, নিজের মুখ-মুরজের দ্বারাই মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতেছেন, তাল দিয়া দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন।

অপর একটি শ্লোকেও পার্বতীকে নৃত্যশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্য হইবার বর্ণনা পাই। মহেশের এই যে 'আচার্যক' তাহা 'নানাভাবরসাত্মক'।

---

[৪৭] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।
[৪৮] সুভাষিতরত্নকোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতে যোগেশ্বর কবির নামে ধৃত।

নৃত্যকালে অভিনয় ভঙ্গ হইলে আচার্য শিব রোষ প্রকাশ করিতেছেন, ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইলে প্রশংসা করিতেছেন; নিজের হাত দিয়াই সব ভঙ্গি শিক্ষা-দানকালে পার্বতীর অঙ্গস্পর্শহেতু রোমাঞ্চিত হইতেছেন, নৃত্যের দ্বারা শৈল-তনয়া খিন্না হইয়া পড়িলে গাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতেছেন।—এইভাবে পার্বতীকে তিনি নৃত্যশিক্ষা দান করিতেছেন।—

বিশ্লিষ্টেঽভিনয়ে রুষং রচয়তঃ সম্পাদিতে শংসতো
রোমাঞ্চং বহতঃ স্বহস্ত-রচিত-স্থানক্রিয়া-স্পর্শজম্।
খিন্নাং শ্বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাঢ়ৈঃ সমালিঙ্গনৈ-
র্নানা-ভাবরসাত্মকং পশুপতেরাচার্যকং পাতু বঃ॥[৩২]

অপর একটি শ্লোকে ভর্তার নৃত্তানুকারের সময়ে পার্বতীর পাদপদ্মশোভা বর্ণিত হইয়াছে। পার্বতীর নিজ তনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপীতেই জাগিয়াছে এই পদ্ম-শোভা। জঙ্ঘা এই পদ্মের কাণ্ড, উরু নাল, নখকিরণেই বিচ্ছুরিত কেশরশোভা; অলক্তকের আভাতে এখানে প্রকাশিত কিশলয়শোভা, আর পায়ের মঞ্জুমঞ্জীরই হইল ভৃঙ্গ।—

জঙ্ঘাকাণ্ডোরুনালো নখকিরণলসৎকেসরালীকরালঃ
প্রত্যগ্রালক্তকাভা-প্রসর-কিশলয়ো মঞ্জুমঞ্জীর-ভৃঙ্গঃ।
ভর্তুর্নৃত্তানুকারে জয়তি নিজ-তনু-স্বচ্ছ-লাবণ্য-বাপী-
সম্ভূতাম্ভোজশোভাং বিদধদভিনবো দণ্ডপাদো ভবান্যাঃ॥[৩৩]

হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া আরও অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় 'প্রশ্নোত্তরে'র। এই 'প্রশ্নোত্তর' শ্লোক বিষ্ণু-লক্ষ্মী বা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যায়—বেশিই পাওয়া যায় হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া। এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্য হইল বক্রোক্তি এবং শ্লেষোক্তির সাহায্যে প্রশ্নকারীকে উত্তরকারীর নির্বচনীকরণের চেষ্টা। বচন-চাতুর্যই এখানে সর্বাধিক আস্বাদনীয়, যদিও সেই বচন-চাতুর্যের ভিতর দিয়া হর-গৌরীর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক্‌ও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

কস্মাৎ পার্বতি নিষ্ঠুরাসি সহজঃ শৈলোদ্ভবানাময়ং
নিঃস্নেহাসি কথং ভস্মপরুষঃ স্নেহং বিভর্তি ক্বচিৎ।
কোপস্তে ময়ি নিষ্ফলঃ প্রিয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবেদ্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো গিরিজয়া শম্ভুশ্চিরং পাতু বঃ॥[৩৪]

শম্ভু পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন তুমি নিষ্ঠুর, হে পার্বতি?' পার্বতী উত্তর করিলেন, '(প্রস্তরদেহ) পর্বত হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার পক্ষে তো

[৩২] সূক্তিমুক্তাবলী।
[৩৩] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।
[৩৪] সুভাষিতরত্নকোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতে ভোজদেবের নামে ধৃত।

ইহাই সহজ।' শম্ভু বলিলেন, 'তুমি স্নেহহীন কেন?' উত্তর হইল, 'ভস্মপরুষ তো কখনও স্নেহ (স্নেহপদার্থ) ধারণ করে না।' শম্ভু বলিলেন, 'আমাতে তোমার কোপ সবই নিষ্ফল' : উত্তর হইল, 'স্থাণুতে আর (স্থাণু=মহাদেব; স্থাণু= অচল বৃক্ষকাণ্ড) কি ফল হইবে?' এইভাবেই গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নির্বচনীকৃত হইলেন।

আবার—

স্বেদস্তে কথমীদৃশঃ প্রিয়তমে তন্নেত্রবহ্নের্বিভো
কস্মাদ্ বেপিতমেতদিন্দুবদনে ভোগীন্দ্রভীতের্ভব।
রোমাঞ্চঃ কথমেষ দেবি ভগবন্ গঙ্গাম্ভসাং শীকরৈর্
ইত্থং ভর্তরি ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥[৩২]

গৌরীর ভাব-বিহ্বলতার জন্য নানাবিধ দেহ-বিকার দেখা দিয়াছে; তাহা লক্ষ্য করিয়া মহাদেব বলিতেছেন, 'প্রিয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন?' গৌরী বলিলেন, 'হে বিভো, তোমার নেত্রবহ্নির জন্য।' প্রশ্ন হইল, 'হে ইন্দুবদনে, তোমার এত কম্প কেন?' উত্তর হইল, 'হে ভব, সর্পভয়ে।' 'হে দেবি, এত রোমাঞ্চ কেন?' 'ভগবান্, গঙ্গাজলের কণা দ্বারা।' এইভাবেই প্রিয়তমের নিকট হইতে সব ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন গৌরী।

ভারতী কবির একটি শ্লোকে দেখি—

কস্ত্বং শূলী মৃগয় ভিষজং নীলকণ্ঠঃ প্রিয়েঽহং
কেকামেকাং কুরু পশুপতির্নৈব দৃশ্যে বিষাণে।
স্থাণুর্মুগ্ধে ন বদতি তরুর্জীবিতেশঃ শিবায়া
গচ্ছাটব্যামিতি হতবচাঃ পাতু বশ্চন্দ্রচূড়ঃ॥

এখানে দেবী প্রশ্নকারিণী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা। 'তুমি কে?' 'আমি শূলী (শূলধারী মহাদেব; অপরপক্ষে শূল-বেদনা আছে যাহার)।' 'তবে কোনো চিকিৎসক খোঁজ কর।' 'আমি নীলকণ্ঠ (শিব, ময়ূর)।' 'তবে একটি কেকাধ্বনি কর।' 'আমি পশুপতি (শিব, মৃগ)।' 'তোমার তো বিষাণ (শিঙা, পশুশৃঙ্গ) দুইটি দেখিতেছি না!' 'আমি স্থাণু (শিব, অচল বৃক্ষ)।' 'তরু তো কখনও কথা বলে না।' 'আমি শিবার (গৌরী, শৃগালী) প্রাণনাথ।' 'তবে তুমি বনে যাও।' শুধু শ্লেষার্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবী এখানে চন্দ্রচূড়কে হতবাক্ করিয়া দিলেন।

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই রসিকতারও নানা রকম আছে। একটি শ্লোকে অপর্ণা রসিকতা করিয়া অজ শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা আমার যেমন পিতা-মাতা তেমন কোথায় তোমার পিতামাতা?' শিব আবার অপর্ণাকে পাল্টা প্রশ্ন

[৩২] সুভাষিতরত্নকোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতেও ধৃত।

করিলেন,—'আচ্ছা বল তো, আমার যেমন শ্বশুর-শাশুড়ী তেমন কোথায় তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী!'—

ক্ব তিষ্ঠতস্তে পিতরৌ মমেবে-
ত্যপর্ণয়োক্তে পরিহাসপূর্বম্।
ক্ব বা মমেব শ্বশুরো তবেতি
তামীরয়ন্ সস্মিতমীশ্বরোঽব্যাৎ॥[৫৩]

আবার—

ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং প্রিয়ে স তু ভবন্মৌলিস্থ-গঙ্গোদরে
মুগ্ধে মানমপূজিতং ত্যজ কৃতং যুষ্মন্নিয়োগদ্বয়ম্।
বক্তে্র শ্লেষমমুং নিরাকুরু কদাঽশ্লিষ্টোঽসি বক্তে্র ময়া
বামাঙ্গ্যেতি হৃতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ॥[৫৪]

শিব বলিলেন, 'হে প্রিয়ে, ক্রোধ করিও না', দেবী উত্তর করিলেন, 'সে (ক্রোধ নামক দানব) তো তোমার মস্তকস্থিত (সতীন) গঙ্গার উদরে।' শিব বলিলেন, 'হে মুগ্ধে, তোমার এই অপূজিত মান পরিত্যাগ কর।' দেবী উত্তর করিলেন, 'তোমার নিয়োগদ্বয় পালন করিলাম (দেবী 'মানমপূজিতং ত্যজ'কে গ্রহণ করিলেন 'মা নম' অর্থাৎ 'নত হইও না', এবং 'পূজিতং ত্যজ', অর্থাৎ 'পূজিতকে ত্যাগ কর' এই ভাবে)। শিব শ্লেষের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমার মুখে ঐ শ্লেষকে ছাড়'; দেবী বলিলেন, 'তুমি মুখে আমা কর্তৃক কখন আশ্লিষ্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াছ?' নিরুত্তর শিব মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

'সুভাষিতাবলিতে'[৫৫] একসঙ্গে পরস্পরাবদ্ধ বহু প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ।—

অয়ি সংপ্রসীদ পার্বতি শিবোঽপি
তব পাদয়ো র্নিপতিতোঽহম্।
শিব ইতি কথং হি জল্পসি
সরুধিরগজচর্মসংবীত॥

শিব বলিলেন, 'অয়ি পার্বতি, প্রসন্না হও, আমি শিব হইয়াও তোমার পদযুগলে নিপতিত হইয়াছি।' দেবী বলিলেন, 'রক্তাক্ত গজচর্মে আচ্ছাদিত হইয়া নিজেকে শিব বলিতেছ কেন?'

[৫৩] শার্ঙ্গধরপদ্ধতি।

[৫৪] তুলনীয়— কিং গৌরি মাং প্রতি রুষা ননু গৌরহং কিং
কুপ্যামি কং প্রতি ময়ীত্যনুমানতোঽহম্।
জানামি সত্যমনুমানত এব স ত্ব-
মিত্থং গিরো গিরিভুবঃ কুটিলা জয়ন্তি॥
—সদুক্তিকর্ণামৃত, রুদ্র কবি।

[৫৫] পিটারসন সম্পাদিত।

শিব ইতি যদি তব গদিতে
দ্বিগুণো রোষো ভবাম্যহং স্থাণুঃ।
স্থাণুরসি সত্যমেতচ্চেতসি
ভবতো ন কিঞ্চিদপি॥

শিব বলিলেন, 'শিব এই কথা বলিলে যদি তোমার দ্বিগুণ রোষ হয়, তাহা হইলে আমি স্থাণু।' দেবী বলিলেন, 'তুমি স্থাণু এ কথা সত্য; কারণ তোমার চিত্তে কিছুই নাই।'

ত্যজ রুষমবেহি মানিনি
মামীশ্বরমর্চিতং ত্রিভুবনস্য।
ত্র্যম্বক যদীশ্বরস্ত্বং
নগ্নঃ কিং ধূলিধূসরিতঃ॥

শিব বলিলেন, 'হে মানিনি, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ত্রিভুবনের অর্চিত ঈশ্বর বলিয়া জানিও।' দেবী বলিলেন, 'হে ত্র্যম্বক, তুমি যদি ঈশ্বরই, তবে এমন নগ্ন এবং ধূলিধূসরিত কেন?'

সম্প্রতি কিমত্র বক্ষ্যসি
পশুপতিরেষোঽস্মি পাণ্ডুরকপোলে।
পশুপতিরেব ন গণয়সি
যুক্তাযুক্তানি যস্মাত্ত্বম্॥

শিব বলিলেন, 'হে পাণ্ডুকপোলে, আমি পশুপতি। সম্প্রতি এ-বিষয়ে তুমি কি বল?' দেবী বলিলেন, 'পশুপতিই বটে, যেহেতু তুমি যুক্তাযুক্ত কিছুই গণনা কর না।'

মুগ্ধে ভ্রমসি কিমেবং
সত্যমিমং মাং ভবং বিজানীহি।
সত্যং ভবোঽসি শঠ হে
যেনাতিবিচিত্ররূপোঽসি॥

'হে মুগ্ধে, কেন তুমি এমন ভ্রম করিতেছ? সত্যই এই আমাকে ভব বলিয়া জান।' 'হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি অতিবিচিত্ররূপ!'

পণ্ডিতবাদস্তব যদি
লোকেঽহং ত্র্যম্বকো বিদিত এষঃ।
অম্বা হ্যেকাপি ন তে
প্রজল্পসি ত্বং কুতস্তিস্রঃ॥

'এত যদি তোমার পণ্ডিতবাদ, এই আমি লোকে ত্র্যম্বক নামে বিদিত।' 'তোমার অম্বা (মা) তো একটিও নাই তিনটির কথা কোথা হইতে বলিতেছ?'

বাদো মহানিহৈব হি তথা
বিজানীহ্যনঙ্গহনং মাম্।
দগ্ধমিদঙ্গমঙ্গং
ত্বয়া মমৈবেদৃশৈশ্চরিতৈঃ॥

'এখানে আরও একটি বড় কথা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্গ-দহন বলিয়া জানিও।' 'তোমার এইরূপ চরিতের দ্বারা তোমা কর্তৃক (অঙ্গধারিণী) আমারই প্রতি অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে।'

এইসকল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সন্ধ্যাকে প্রণামরূপ অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অনুনয়। এই অনুনয় দেখিতেছি শেষপর্যন্ত সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যঞ্জিত করিয়াছেন।—

সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ্ যোঽ-
নুনয়তি তং বিজিত্য পার্বত্যা।
আলিঙ্গিতশ্চ সরভসমুরসা
বৈ হরন্তু দুরিতং বঃ॥

হরপার্বতীর এই-জাতীয় বাগ্-বিতণ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য করিতে পারি। বাণভট্টের সমসাময়িক শ্রীময়ূর কবির রচিত এই-জাতীয় একটি বাগ্-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। এখানে হরপার্বতী পাশা খেলিতে বসিয়াছেন, পাশাখেলা লইয়াই সব কথা।—

বিজয়ে কুশলস্ত্র্যক্ষো
ন ক্রীড়িতুমহমনেন সহ শক্তা।
বিজয়ে কুশলোঽস্মি ন তু
ত্র্যক্ষোঽক্ষদ্বয়মিদং পাণৌ॥

পার্বতী সখী বিজয়াকে বলিতেছেন, 'হে বিজয়ে, (পাশাখেলায়) ত্র্যক্ষ (ত্রি-অক্ষিযুক্ত শিব) কুশল, আমি ই'হার সহিত খেলা করিতে সক্ষম নই।' শিব বলিলেন, 'আমি বিজয়ে (সমরবিজয়ে, হে বিজয়ে,) কুশল ঠিকই, কিন্তু আমি তো এখন ত্র্যক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে আছে।'

কিং মে দুরোদরেণ প্রযাতু
যদি গণপতির্ন তেঽভিমতঃ।
কঃ প্রদ্বেষ্টি বিনায়কমিহ লোকঃ
কিং ন জানাসি॥

পার্বতী বলিলেন, 'এই দুরোদর (পাশা) দিয়া কি হইবে'; 'দুরোদর' শব্দে শিব বুঝিলেন লম্বোদর গণেশকে—'যদি গণেশ তোমার অভিমত না হয় তবে সে চলিয়া যাউক।' গৌরী তখন আবার একটু ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, কোন্

ব্যক্তি বিনায়ককে (গণেশকে, পক্ষে গরুড়কে) দ্বেষ করে? শিব বলিলেন, 'সর্পেরা দ্বেষ করে, তাহা কি তোমার জানা নাই?'

বসুরাহতেন ভবতা সহ
কীদৃশী ন জিহ্রেষি।
কিং বসুভিন্নমতোঽমুন্
সুরাসুরানেব পশ্য পুরঃ॥

দেবী বলিলেন, 'ধনহীন তোমার সঙ্গে আর কি রকম খেলা—তোমার কি লজ্জা করে না?' শিব বলিলেন, 'বসুভিন্ন' (ধনহীন, অনুচরহীন) কি বল,—সম্মুখে ঐ-সব সুরাসুরকে দেখ।'

চন্দ্রগ্রহণেন বিনা নাস্মি রমে
কিং প্রবর্তয়স্যেবম্।
দেব্যৈ যদি রুচিতমিদং
নন্দিন্নাহূয়তাং রাহুঃ॥

দেবী বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত, অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজি না রাখিলে, আমি আর খেলিব না: কেন আর খেলায় এরূপ অগ্রসর হইতেছ?' শিব বলিলেন, 'দেবীর যদি তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ভালো লাগে) তবে হে নন্দিন্, তুমি রাহুকে ডাকিয়া আন।'

হা রাহৌ নিকটস্থে সিতদ্রংষ্ট্রে
ভয়কৃতি রতিঃ কস্য।
যদি নেচ্ছসি তত্ত্যক্তঃ
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহিঃ॥

দেবি বলিলেন, 'হায়, সিতদ্রংষ্ট্র ভয়ংকর রাহু নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে ভালো লাগে?' উত্তরে শিব 'হা রাহৌ' পদদ্বয়কে 'হারাহৌ' (সাপের হার) রূপে একপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—'যদি তুমি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই এখনই এই সাপের হার পরিত্যাগ করিলাম।'

আরোপয়সি মুধা কিং
নাহমভিজ্ঞা তদঙ্কস্য।
দিব্যং বর্ষসহস্রং স্থিত্বৈবং
যুক্তমভিধাতুম্॥

দেবী বলিলেন, 'আমার বাক্যে তুমি ভুল অর্থ আরোপ করিতেছ কেন? তোমার সেই অঙ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নহি।' শিব বলিলেন, 'দিব্য সহস্রবর্ষ, এইখানেই (অঙ্কে=কোলে) থাকিয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।'

পশুপতির সহিত এইরূপ বক্রোক্তির ফলে হর্ষবশে দেবীর আঁখির তারকা তরল হইয়া তাঁহার আননশ্রীকে বর্ধিত করিয়া তুলিল।

আর-একরূপ প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই পার্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে—পরস্পরের সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সম্ভাষণে। একটি শ্লোকে দেখি—

ভিক্ষু ক্বাস্তি বলের্মখে পশুপতিঃ কিং নাস্ত্যসৌ গোকুলে
মুগ্ধে পন্নগভূষণঃ সখি সদা শেতে চ তস্যোপরি।
আর্যে মুঞ্চ বিষাদমাশু কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা
চেত্থং বৈ গিরিজাসমুদ্রসুতয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ॥[৫৬]

সমুদ্রসুতা লক্ষ্মী গিরিজাকে বলিলেন, 'কোথায় ভিক্ষু' (ভিখারী শিব)? গৌরী লক্ষ্মীকে উত্তর দিলেন, 'বলির যজ্ঞে' (বিষ্ণু বামন অবতারে বলি রাজার যজ্ঞে ভিক্ষু হইয়াছিলেন)। লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় পশুপতি?' গৌরী বলিলেন, 'তিনি কি গোকুলে নাই!' লক্ষ্মী বলিলেন, 'তোমার স্বামী সর্পভূষণ।' গৌরী বলিলেন, 'তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন।' লক্ষ্মী শ্লেষ-সহকারে বলিলেন, 'আর্যে, বিষাদ ত্যাগ কর।' এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একটি খেদ, অপরটি বিষ খান যিনি সেই 'বিষাদ' শিব। গৌরী উত্তর দিলেন, 'হে কমলে, আমি তো প্রকৃতিতেই চলা (ভ্রষ্টা, চলস্বভাবা নারী, পক্ষে লক্ষ্মী) নহি!'

অনুরূপ আর-একটি শ্লোকে দেখি—

ভিক্ষার্থী স ক্ব যাতঃ সুতনু বলিমখে তাণ্ডবং ক্বাদ্য ভদ্রে
মন্যে বৃন্দাবনান্তে ক্ব নু স মৃগশিশুর্নৈব জানে বরাহম্।
বালে ক্বচিন্ন দৃষ্টো জরঠবৃষপতি র্গোপ এবাস্য বেত্তা
লীলা-সংলাপ ইত্থং জলধি-হিমবৎ-কন্যয়ো স্ত্রায়তাং বঃ॥[৫৭]

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গেল সেই ভিক্ষু?' পার্বতী উত্তর দিলেন, 'বলির যজ্ঞে।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় হইবে আজ তাণ্ডব?' পার্বতী উত্তর দিলেন, 'মনে হয়, বৃন্দাবনের প্রান্তে।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'কোথায় সেই মৃগ-শিশু?' পার্বতী বলিলেন, 'বরাহের (বিষ্ণু-বরাহের) কথা আমি জানি না।' লক্ষ্মী বলিলেন, 'সেই জীর্ণবৃষপতিকে তুমি কি কোথাও দেখ নাই?' পার্বতী বলিলেন, 'গোপেরাই তাহার সন্ধান জানে।'

আমরা উপরে কালিদাসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবির রচিত বহু কবিতা উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী পার্বতী কিভাবে অঙ্কিতা হইয়াছেন তাহার একটু বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম। অনেক কবিতা অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রচিত, সুতরাং এইগুলির রচনাকাল স্থির করিবার

[৫৬] সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।
[৫৭] ঐ।

উপায় নাই। অনেক কবিতা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে পাওয়া যায় বলিয়া এই কবিগণ দ্বাদশ শতকের এবং তৎপূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়, তৎপরবর্তী নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একটি শ্লোক পাইতেছি তাহা যদি প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভাসের হয়, তবে কালিদাসের পূর্ববর্তী রচনাও কিছু কিছু পাইতেছি।

উপরের আলোচনা লক্ষ্য করিলে আমাদের পূর্বোক্ত মতই সন্দেহাতীত-রূপে প্রমাণিত হইবে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাশিনী মূর্তির তেমন প্রসিদ্ধি বা জনপ্রিয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য বিচিত্রভাবে বর্ণিতা দেবীর মধুর-রসাশ্রিতা মূর্তির। দেবীর অসুরনাশিনী রূপ যে একেবারেই পাওয়া যায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলন-গ্রন্থগুলির ভিতরে চারি-পাঁচটি শ্লোকে মাত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা বাঙলা সাহিত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তরের প্রসঙ্গেই এত আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। আশা করি আমাদের এই আলোচনার ভিতর দিয়া আমাদের উক্তি স্পষ্টভাবে সমর্থিত হইয়াছে যে, দেবীর মানবীয় রূপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহিত্যে আসিয়াই ঘটে নাই—তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত কবিগণও দেবীকে আমাদের সমাজজীবন এবং গার্হস্থ্যজীবনের পটভূমির উপরেই বিচিত্রবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। মুখ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত কবিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকোটি-সম্ভূত এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এইজন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের চিত্র পাই কম। দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যময় সংসারের যে চিত্র পাই তাহা অনেক স্থানে প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু বাঙলার এবং অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ভূত, তাই তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পরিবারের চিত্র দেবীকে অবলম্বন করিয়াই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি রামেশ্বরের শিবায়নে বর্ণিত দরিদ্র কৃষকপত্নী পার্বতী যে কৃষকস্বামীর নিকটে আর কিছু নয় শুধু হাতের দুইগাছি শাঁখার জন্য আব্দার জানাইয়াছিলেন তাহা কালিদাস শ্রীহর্ষ রাজশেখর—এমন কি উমাপতিধরের বর্ণিত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অবশ্য আশ্চর্যভাবে একটি শ্লোক শুধু লক্ষ্য করিতে পারি যেখানে দেবী শিবকে ত্রিশূল ভাঙিয়া লাঙল গড়িয়া হাল চাষ করিতে বলিয়াছেন।—

রামাদ্ যাচয় মেদিনীং ধনপতের্বীজং বলাল্লাঙ্গলং
প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং তব।
শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোঽস্তি গোরক্ষণে
খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ॥

গৌরী শিবকে বলিতেছেন, 'রামের (পরশুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ, আর বলরামের নিকট হইতে লাঙল; প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে—আর তোমার ত্রিশূলই তো ফাল; আমি নিজে তোমাকে (মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব; স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষায় আমি খিন্ন, তুমি এইবারে কৃষি কর।'

বাঙলা সাহিত্যের শিবায়নে আমরা গৌরীর শিবের প্রতি যে অনুরোধ দেখি এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথার সহিত তাহার মিল রহিয়াছে। পুরাণাদির মধ্যেও শিবের কৃষকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্র শিবের শস্যের সহিত যোগ যজুর্বেদেই লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; ইহার ভিতরে কবির সমসাময়িক যুগের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকটি আধুনিক সংকলন 'সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় করিবারও সুযোগ নাই; তবে শ্লোকটি অর্বাচীন কালে লিখিত বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের বিশিষ্ট ছাপ না পড়িলেও দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নাই। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কালিদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসম্ভব'-কাব্যে অনেকখানি স্থান দিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রের যে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য কবিগণ দেবীসম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা তাঁহাদের রচিত বিবিধ ধরনের কাব্যের ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশীর্বচন-রূপেই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন। একে প্রকীর্ণরূপে রচিত তদুপরি একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লিখিত; সুতরাং যুগসমাজের স্পষ্ট প্রভাব এখানে আশা করিতে পারি না। কিন্তু এইসব শ্লোকের মধ্যে দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, নবোঢ়ারূপ, নব-সম্ভোগ, প্রেম-কৌটিল্য, মান-অভিমানের যে বর্ণনা পাই তাহার আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশ্যস্বীকার্য। মানবীয় দাম্পত্য প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হরগৌরীর ভিতর দিয়া কবিগণ রূপায়িত করিয়াছেন—পাঠক-সাধারণের আস্বাদনের ভিতরেও সেই মানবীয় প্রেমরসেরই প্রাধান্য। কতকগুলি শ্লোকের মধ্যে যে গার্হস্থ্য চিত্র ফুটিয়াছে চিত্র-হিসাবে স্থানে স্থানে তাহাকে নিখুঁত বলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। মানবীয় ছাঁচে ঢালিয়া যুগল-প্রেমের বর্ণনা পরবর্তী কালে আমরা বিশেষভাবে পাই বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই রাধাকৃষ্ণের ধারাটির সমৃদ্ধি অনেক পরবর্তী কালে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই

বটে,[৫৮] কিন্তু তাহার অধিকাংশই খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছি সময়ে লিখিত। সেই কারণে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের যুগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা হরপার্বতীর যুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহীত। আমরা পার্বতীর যে খণ্ডিতা রূপ দেখিয়াছি, সেই খণ্ডিতা নায়িকার রোষপ্রশমনের জন্য পদানত নায়কের যে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবর্তী কালের রাধার খণ্ডিতারূপ ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষ্ণের অনুনয়-প্রকাশ প্রভৃতির প্রাক্-রূপ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে—আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে আসলে হরপার্বতীর প্রেম বা রাধাকৃষ্ণের প্রেম বলিয়া বিশিষ্ট কোনো জিনিস নাই; আসল জিনিস হইল ভারতীয় কবি-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কবি-মনের কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রবণতাই হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া এবং পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

[৫৮] দ্রষ্টব্য লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থ।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ-দেবী

দেবী-পূজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা আমরা নানাভাবে বলিয়া থাকি। হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ-দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। হিন্দু-দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে পাই; এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত। হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রে এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম—পর্ণ (হলুদ পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালায়'ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় আমরা বেতালা-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ-তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে শক্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতির নাম পাই; বৌদ্ধ 'সাধনমালা'র মধ্যেও মহামায়ূরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী 'শিবদূতী' নামে খ্যাতা, বৌদ্ধ-তন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে 'কালদূতী' নামে দেখিতে পাইতেছি।[১] প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ-তন্ত্রের 'যমদূতী'র কথাও স্মর্তব্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু-দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধ-তন্ত্রে কালিকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ইঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ংকরী, নীলবর্ণা, দ্বিভুজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহাতে কংকাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শবের উপর অবস্থিতা।[২]

এইভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্রাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতেছি, হিন্দুধর্মে তাহাদিগকে গৃহীত হইতে দেখিলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বলিয়া থাকি—এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেবী—বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দুধর্মে তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু এই বৌদ্ধ-দেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধ-তন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি

[১] ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত *Buddhist Iconography* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।
[২] ঐ, পৃ. ১২২।

সে দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপর্য কি? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুহ্য যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দু-তন্ত্রগুলি হইতে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতেই হিন্দু-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে[৩] আমরা এ জিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মূলে হিন্দু-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ-তন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধনধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দু-তন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব—উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চনাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু-দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ-দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার জন্যই আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে-কথা আমরা স্বীকার করি না, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধনমালায়[৪] যে-সকল দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি দেবী-হিসাবে বজ্র, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দু-দেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পরিকল্পনা এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পরিকপনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বৌদ্ধ-দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরূপ।

অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছিল মহাচীনে—অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে; ফলে এই অঞ্চলের

[৩] এই লেখকের *An Introduction To Tantric Buddhism.*
[৪] ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, দুই খণ্ড।

প্রসিদ্ধা কিছু কিছু দেবী বৌদ্ধ-তন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের মারফতে হিন্দু-তন্ত্রাদিতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বলিয়া ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।[৫] পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতেই গৃহীত বলিয়া কাহারও কাহারও মত।[৬] হিন্দু-তন্ত্রে বর্ণিত ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিণী, শাকিনী দেবীগণের সকলে না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাঞ্চল হইতে গৃহীতা বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে আমরা বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-তন্ত্রের সন্ধান পাইতেছি; তিব্বতী অনুবাদ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা। মূল তন্ত্রাদির উপরে টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তন্ত্রসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টিপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙলাদেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্যাগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পন্থা-অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটিভাবে খৃীস্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; সুতরাং এই-গুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।

বৌদ্ধ-দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই; এই দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত। সাধনতত্ত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তি-তত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি। সহজিয়া বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই

[৫] *Cultural Heritage of India*, চতুর্থ খণ্ড। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-লিখিত 'Evolution of the Tantras'.

[৬] ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত 'সাধনমালা'র ভূমিকা এবং *Buddhist Iconography*.

দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়োজন মনে করি।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে—অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যা শক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাযানের ধর্মকায়-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যেরূপ বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বহুর পরমাধিষ্ঠান কারণাত্মক একরূপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্ত্বই পরিকল্পিত হইয়াছে আদি-বুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান। অতএব তাঁহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসূত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাযানের ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই—ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন খানিকটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব; তাঁহারও ঊর্ধ্বে হইল বুদ্ধের চরম স্থিতি—তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যতায়—ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্রের পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী—তেমনই আদিবুদ্ধের নিত্যা শক্তি হইলেন আদিদেবী। এক্ষেত্রে হিন্দু-তন্ত্রগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছ, না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী ,হিন্দু-তন্ত্রের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন ? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দু-তান্ত্রিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাত্মক যে বহিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত অভিন্না সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহ-শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অন্যরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের সিসৃক্ষাত্মক পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি

ধ্যান হইতে প্রসূত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ। ইঁহারা হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি,—তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চতথাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশুদ্ধির দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।

বৌদ্ধ-তন্ত্রে আদিবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সর্বেশ্বরী মহাদেবী আদিদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীকে পাই।—তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

বৌদ্ধ-তন্ত্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাযানী বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা মত এবং পথকে হীন বলিবার কারণ এই যে, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি—অর্থাৎ অর্হত্ত্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্বমুক্তির প্রশ্ন—সুতরাং মুক্তিদাত্রী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্তলাভের সাধনা, আর বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, 'শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে'—শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বই হইল বোধিচিত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে নানাভাবে বহু দূরে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিত্ততত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল- বা যামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী—উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান্। এই ভগবান্-ভগবতী সামরস্য-রূপ মিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ, উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ত্ব। শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞাই নৈরাত্মা-রূপিণী নির্বাণ—উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল যুগনদ্ধতত্ত্ব—সেই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ত্বই হইল পরম কাম্য।

তন্ত্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়—তাহা দ্বয়ের মিথুনতত্ত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতত্ত্ব-মতে সে দ্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব—একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্রতনু নিবৃত্তিমূলক——অপরটি ত্রিগুণাত্মিক প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তি-মূলা। দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব—শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সংকুচিত বিন্দু—শক্তিই পরম প্রসারিতা নাদরূপিণী।

তন্ত্রের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথুনীকৃত দ্বয়তত্ত্বের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধ-তন্ত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে লইয়া। শুধু তফাত এই—বৌদ্ধ-তন্ত্রে ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবান্‌ই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক।

প্রজ্ঞাই গ্রাহকতত্ত্ব, আর উপায়াত্মক করুণাই হইল গ্রাহ্যতত্ত্ব। এইভাবে দেখিতে পাই, হিন্দু-তন্ত্রেও যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মিথুন-সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধ-তন্ত্রেও করুণারূপী ভগবান্ ও প্রজ্ঞা-রূপিণী দেবী ভগবতীকে লইয়া তান্ত্রিক মিথুন-সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগ-সাধনায় এই ভগবতী এবং ভগবান্ ইড়া-পিঙ্গলা, গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বই ত অর্ধনারীশ্বর-তত্ত্ব—বামে দেবী ভগবতী, দক্ষিণে ভগবান্, দুই মিলিয়া এক। একে দুই—দুইয়ে এক; হিন্দু-তন্ত্রেও এই কথা—বৌদ্ধ-তন্ত্রেও সেই একই কথা।[৭]

তন্ত্রসাধনার এই ভগবান্ এবং ভগবতী পূর্বালোচিত আদিবুদ্ধ ও আদি-দেবীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধ-তন্ত্রেও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র, শ্রীহেরুক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, শ্রীমন্‌মহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কবিহারিণীরূপে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্তরূপে। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহেশ্বর-মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দেখিতে পাই।

৭ *An Introduction to Tantric Buddhism* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রতি করুণায় বিগলিতা জগজ্জননী পার্বতী সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জীবের হিতকর সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্র হিন্দু-আগম-শাস্ত্র এই-ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগন্মাতা মহাদেবী স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এবং জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বক্তা। তাবৎ হিন্দু-তন্ত্রগুলির মধ্যে আমরা এই রীতিই লক্ষ্য করিতে পারি। প্রত্যেক তন্ত্রেই দেখি, দেবী জীবের দুঃখে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আর্তিনাশ, মঙ্গল ও মুক্তিবিধানের জন্য মহাদেবকে অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার স্বমুখ হইতে সকল তত্ত্ব জানিয়া লইতেছেন। প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধ-তন্ত্রেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখি। বৌদ্ধ-তন্ত্রের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্র-তন্ত্রে দেখিতে পাই,—

কপাল-মালিনং বীরং নৈরাত্মাশ্লিষ্টকন্ধরম্।
পঞ্চমুদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পৃচ্ছতি স্বয়ম্॥

এখানে 'দেবের' বিশেষণে 'কপাল-মালিনং বীরং' কথাটিও বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। উত্তরে দেখিতে পাই,—

চুম্বয়িত্বা তু নৈরাত্মং———
———দেবো মণ্ডলং সম্প্রকাশতে॥[৮]

বজ্রবারাহী-কল্প-মহাতন্ত্র, একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ত্র, ডাকার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলি এইভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিতে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু-তন্ত্রে পরম-সামরস্য-জনিত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নরনারীর মিলিত সাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিতেও দেখিতে পাই। হিন্দু-তন্ত্রগুলিতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিশুদ্ধ শক্তিস্বরূপা হইতে হইবে। বিশুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও যামলসাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গূঢ়ার্থ। বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলিতেও আমরা বহুভাবে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। নারী মাত্রই প্রজ্ঞারূপিণী—পুরুষ বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব; এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধনাই হইল প্রজ্ঞোপায়-সাধনার তাৎপর্য। কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্ত্রে এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্টভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। একবল্লীর-চণ্ডমহারোষণ-তন্ত্রে[৯] স্পষ্টই দেখি—

নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ যোষিতঃ বজ্রযোষিতঃ॥

নাগার্জুনপাদের 'পঞ্চক্রম'-গ্রন্থে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে,

[৮] এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি।
[৯] এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি।

'স্ত্রী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোক্তা'। একল্লবীর-চণ্ডামহারোষণ-তন্ত্রে এক স্থলে স্বয়ং বজ্রধর চণ্ডরোষণ দেবীকে বলিতেছেন—

ভাবাভাববিনির্মুক্তশ্চতুরানন্দ-তৎপরঃ।
নিষ্প্রপঞ্চ-স্বরূপোহহং সর্বসংকল্পবর্জিতঃ॥
মাং ন জানন্তি যে মূঢ়া সর্বপুংবপুষি স্থিতম্।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতা॥

আবার দেবীর দিক্ হইতে দেখিতে পাই—

অথ ভগবতী দ্বেষবজ্রী সমাধিমাপদ্যেদম্ উদাজহার—

শূন্যতা-করুণাভিন্না দিব্য-কাম-সুখ-স্থিতা।
সর্ব-কল্প-বিহীনাহং নিষ্প্রপঞ্চা নিরাকুলা॥
মাং ন জানন্তি যে নার্যঃ সর্বস্ত্রীদেহ-সংস্থিতাম্।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতা॥

এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-সুত বুদ্ধদেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞাপারমিতাত্মিকা দেবীই হইলেন বুদ্ধপত্নী গোপা। বিশ্বের সকল স্ত্রী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্মিকা দেবীস্বরূপা এবং দেব চণ্ডরোষণ-স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ।

মায়াদেবীসুতশ্চাহং চণ্ডরোষণতাং গতঃ।
ত্বমেব ভগবতী গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাত্মিকা॥
যাবন্তস্তু স্ত্রিয়ঃ সর্বা স্ত্বদ্রূপেণৈব তা মতাঃ।
মদ্রূপেণ পুমাংসস্তু সর্ব এব প্রতীর্তিতাঃ॥

এই-সকল ক্ষেত্রে হিন্দু-তন্ত্র হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধ-তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে বা বৌদ্ধ-তন্ত্র হইতে এই এই ধারণা হিন্দু-তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ কতকগুলি কাটাছাটা কথা বলিয়া দিলেই সবখানি কথা বলা হইল না। আসলে তন্ত্রসাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতীয় কতকগুলি ধারণা সমাজ-মানসে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল- হিন্দু-তন্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের তান্ত্রিক সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান্ ও ভগবতী বাহিরের কিছু নহেন—সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক-চিত্তই স্বয়ং ভগবান্—নৈরাত্মাই গৃহিণী।[১০] সেই নৈরাত্মার সঙ্গে সাধক-চিত্ত নিঃশেষে মিলিয়া যায়—যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে।

জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিয়েহি
তিম ঘরিণী লেই চিত্ত।

[১] কাহ্নপাদের দোহা।

সমরস জাই তক্‌খণে
জই পুণু তে সম নিত্ত॥

অদ্বয়-সিদ্ধি-নামক বৌদ্ধ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

ভগবানিতে নির্দিষ্টঃ চিত্তস্যাধিপাতিঃ প্রভুঃ।

তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বলিয়াছেন—

চিত্ত খসম জহি সমসুহ পলট্‌ঠই।
ইন্দিঅ-বিসঅ তহি মত্ত ণ দীসই॥

চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে প্রবিষ্ট হয় তখন ইন্দ্রিয়-বিষয় তাহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আবার—

মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ।
দিবারাত্তি সহজে রহিঅই॥

মন ভগবান্‌—শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা ভগবতী; ইহারা দিবারাত্রি সহজে (মিলিত) থাকে।

চর্যাগীতিকার কুক্কুরীপাদ একটি গীতিতে বলিয়াছেন—

হাঁউ নিরাসী খমণভতারী
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।

এখানে দেবী নিজে বলিতেছেন, আমি হইলাম, আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা, খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন—অর্থাৎ তান্ত্রিকগণের চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্য স্তরের প্রকৃতিপ্রভাস্বর মন।

চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানাভাবে পাইতেছি; কোথাও তিনি দেবী বলিয়া আখ্যাতা—কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরণী' (গৃহিণী) বলিয়া, কোথাও আবার ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি বলিয়া। বজ্রধরস্বরূপ সাধকের ইহার সহিত নাচগানের কথা দেখি,[১১] কোথাও জাঁক-জমক করিয়া ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাইবার দৃশ্য দেখিতে পাই, এবং সেখানে দিন-রাত্রি তাঁহার সহিত সুরতপ্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই।[১২]

[১১] নাচন্তি বাজিল গান্তি দেঈ
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥ (১৭ সং)

[১২] ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহর্ণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ
জোইণিজালে রএণি পোহাঅ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

কোথাও আবার বজ্রধর সাধক বলিতেছেন—

জোইণি তঁই বিণু খণহিঁ ণ জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

যোগিনি, তোমাকে বিনা ক্ষণমাত্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল-রস পান করিব।

কোথাও আবার ডোম্বীর 'ভাভরিআলী' অর্থাৎ চতুরালী দেখিয়া বজ্রধর সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে 'ছিনালী'র অগ্রগণ্য বলিয়া গাল দিয়াছেন।

'অদঅ বঙ্গালে' গিয়া এই চণ্ডালীকে 'নিজ ঘরণী' করিয়া বজ্রধর সাধক একদম 'বঙ্গালী' ('বাঙাল'?) হইয়া গিয়াছেন।[১৩] কোথাও এই দেবীকে মাতঙ্গী-রূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগীকে লীলায় পার করিয়া দিতে দেখি।[১৪] কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহারিণী বেদেনী-রূপে বাঁশ-বেতের চুপড়ি-চাঙ্গাড়ি বিক্রী করিতে দেখি।[১৫] কোথাও তাঁহাকে দেখি উঁচু পর্বতের শিখরে ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হইয়া গুঞ্জার মালা গলায় শবরীরূপে—উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার।[১৬]

চর্যাপদে নানা রূপকে এবং কবিকল্পনা-যোগে বিচিত্র-রূপে বর্ণিত এই দেবী কে?

সাধকগণ-বর্ণিত এই দেবীকে বুঝিতে হইলে হিন্দু-তান্ত্রিক সাধকগণ কর্তৃক বর্ণিত দেবী বা শক্তিকেও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হিন্দু-তন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির কথা জানিতে পারি; এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত হইয়া নিদ্রিতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সাধনায় সাধকের কোনও অনুভূতির স্পন্দনই নাই—দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরেই আরম্ভ হয় তাঁহার ঊর্ধ্বগতি—একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি ঊর্ধ্বে উত্থিত হন—সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমা স্থিতি। শক্তির একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূতির স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরমবিশুদ্ধি এবং পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনী-

[১৩] ৪৯ সংখ্যক পদ।
[১৪] ১৪ সংখ্যক পদ।
[১৫] ১০ সংখ্যক পদ।
[১৬] ২৮ সংখ্যক পদ।

শক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই, যোগ-তন্ত্রাদিতে এই শক্তির উত্থান ও গতি একটি বিচিত্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রতিক্ষণে সাধকের বিচিত্র দিব্যানন্দের অনুভূতি। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনায়ও এই-জাতীয় একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শক্তির ব্যুত্থানের সঙ্গে যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমলে পেঁাছিয়া তাহারই পরিণতি বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের পরম কাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই হইল প্রত্যেক প্রাণীর—শুধু প্রাণীর নয়—সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ—তাহাই মহাসুখ; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের নিত্য স্বভাব। বৌদ্ধ-তন্ত্রমতে দেহমধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত; তদূর্ধ্বে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল নির্মাণচক্র—আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখচক্র।[১৭] নির্মাণচক্র শুধু নিম্নতম চক্র নয়—ইহাই স্থূলতম তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষট্টি-দল-যুক্ত পদ্মে; এইখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিশুদ্ধ নহে—বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জড়িত; ঊর্ধ্বগতিতে এই আনন্দ পরমানন্দে, পরমানন্দ বিরমানন্দে, বিরমানন্দ সহজানন্দে পরিণতি লাভ করে; সহজানন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি উষ্ণীষকমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া—তথা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের দেবী; এইজন্য তিনি সর্বদাই সহজস্বরূপা বা সহজানন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্মারূপিণী বা আদরিণী 'নৈরামণি'। এই আনন্দরূপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ—সেখান হইতে তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে)—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকচিত্তের সুরত-যোগ; এই সুরতযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণানুভূতিতে—সে অনুভূতিতে সাধকচিত্তের সহজ-স্বরূপিণীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব—তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধস্থিতি।

এই আনন্দসন্দোহ-রূপিণী শক্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন সহসা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই বলা হইয়াছে 'চণ্ডালী'।[১৮] আবার এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরূপা দেবী ইন্দ্রিয়

[১৭] *An Introduction to Tantric Buddhism.*

[১৮] 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ'—হেবজ্রতন্ত্র।

দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা—এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী'।[১৯] দেহরূপ নগরের বাহিরে অবস্থিত হইল এই ডোম্বীর কুঁড়েঘর—'ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া'র দল তাহাদের সকল আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিক সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিঘৃণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্ববিধ-আবরণ-রহিত) কপালিক যোগী। একটি হইল পদ্ম, চৌষট্টিটি তাহাতে পাপড়ি (নির্মাণচক্রস্থিত চৌষট্টিদলযুক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই 'ডোম্বী বাপুড়ী'।[২০] যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দস্পন্দনের নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোম্বী' খুব ভাল নহে—কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে বজ্রধর সাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন ঊর্ধ্বায়ন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদারিণী হইয়া হৃদয়ে—পরে কণ্ঠে স্থান পাইল; উষ্ণীষকমলে গিয়া—

ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

চর্যাপদাদিতে বর্ণিত এই সহজানন্দরূপিণী শক্তিরূপিণী দেবীর প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও কিছু কিছু তথ্য লক্ষ্য করিতে পারি। দেবী এখানে 'মাতঙ্গী', 'চণ্ডালী', 'শবরী'। দেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি দশমহাবিদ্যার মধ্যে গৃহীত দেখিতে পাই। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাদিতে দেবীকে 'কিরাতী'[২১] 'শবরী' প্রভৃতি রূপে বর্ণিত দেখি। চর্যাগীতিতে বর্ণিত 'শবরী'-দেবীও কিন্তু উচ্চপর্বতবাসিনী, অতএব এই 'শবরী'-দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী। এই 'শবরী'র বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

শবরী-দেবী শুধু পর্বতের উচ্চশিখরবাসিনী নন, ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিতা শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। সাম-বিধান-ব্রাহ্মণে কুমারী রাত্রি-দেবীকে আমরা 'কন্যাং শিখণ্ডিনীং'-রূপেই দেখিতে পাই। এই শবরীর বর্ণনায় আরও দেখিতে পাই—

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী শবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ বনে খুঁজিয়া বেড়ায়—সে কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।

[১৯] অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা—ঐ।
[২০] ১০ম সংখ্যক চর্যা।
[২১] খিল হরিবংশ।

পার্বত্যবনে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়ায় এই শবরী বালিকা—কর্ণকুণ্ডলবজ্র-ধারী এই শবরী। একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী দেবীর বর্ণনা তন্ত্র-পুরাণে দুর্লভ নহে।

শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, বাড়িতে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকেই সে নেশার ঘোরে চেনে না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অনুনয়-বিনয় করিতে হয়—

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥

শবরী খাট পাড়ে—মহাসুখে শয্যা বিছায়—তাহার পরে সেই শবর-ভুজঙ্গের সহিতই এই নৈরামণি শবরী স্ত্রীভাবে প্রেমের রাত্রি পোহায়। শবরকে আদর করিয়া খাইতে দেয় তাম্বুল—আর কর্পূর; ক্ষণিকের জন্য পোষ মানে মাতাল স্বামী—শবরীকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়।

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥

কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই শান্তখুশি দিব্য মানুষ, আবার কখন গুরুরোষে উন্মত্ত; গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া সে প্রবেশ করে গিয়া পর্বতের শিখরসন্ধিতে—কি করিয়া আবার তাহাকে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনা যায়!

উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের লৌকিকভাবে বর্ণিত হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের আভাস মিলিতেছে কি? পার্বতীর স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাইতেছি নেশাখোর পাগলা ভোলা—বাড়িতে বাধান কোন্দল—নেশার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ান কুচনী-পাড়া, চেনেন না নিজের ঘরের সুন্দরীকে। কত কষ্টে কত অনুনয়ে-বিনয়ে এই ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম রক্ষা করিতে হয় পার্বতীকে। তাহাতেও কি মানেন, কখন আবার গুরু রোষে চলিয়া যান পর্বতের কোনো শিখর-সন্ধিতে—কে করে আবার তাঁহার সন্ধান। চর্যাপদটির বর্ণনায় কি ভাষা-সাহিত্যে বর্ণিত লৌকিক শিব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে?

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় হর-গৌরী-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন; লোকমুখ হইতে এই-জাতীয়

কিছু কিছু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ করিতেছি—চর্যার আলোচিত পদটির সহিত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। মহাদেব গৌরীর প্রতি রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; গৌরী বলিতেছেন—

হমসোঁ রূসল মহেসে।
গৌরী ৰিকল মন করথি উদেসে॥
পুছিঅ পথুক জন তোহী।
এ পথ দেখল কহুঁ বুঢ় বটোহী॥
অংগমে ৰিভূতি অনূপে।
কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে॥
ৰিদ্যাপতি ভন তাহী।
গৌরী হর লএ ভেলী বতাহী॥[২২]

আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ। গৌরী বিকল মন, উদ্দেশ করিতেছেন। হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ পথে দেখিলে কোনও বৃদ্ধ পথিককে? অঙ্গে তাঁহার অনুপম বিভূতি, কত আর বলিব, সেই যোগীর স্বরূপ? বিদ্যাপতি বলে তাহাতে—হর লইয়া গৌরী হইলেন পাগলিনী।

অপর একটি পদে দেখি—

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা সি কি দহু ভেলা॥
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বেসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জো মোর কহতা উগনা উদেস।
তাহি দেবঁও কর কংগনা বেস॥
নন্দন বনমে ভেটল মহেস।
গৌরি মন হরসিত মেটল কলেস॥

আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল? কোথায় গেল, তাহার কি হইল? বটুয়াতে ভাঙ নাই, রুষিয়া বসিল; যেমনই খুঁজিয়া আনিয়া দিলাম—হাসিয়া উঠিল। যে মোরে বলিবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরীর মন হরষিত—মিটিল ক্লেশ।

আর একটি পদে দেখি—

পীসল ভাঁগ রহল এহি গতী।
কথি লই মনাইব উমতা জতী॥

[২২] অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি।

আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী॥
আনক নীক আপন হো ছতী।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী॥
ভণহি বিদ্যাপতি সুন দে সতী।
ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী॥[২৩]

পেষা ভাঙ এমনভাবে রহিল; কি করিয়া মানাইব এই উন্মত্ত যতিকে? অন্যদিন ভাল ছিল মোর পতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উন্মত্ততা? অপরের ভাল, নিজের হয় ক্ষতি; কোথায় এক ঠোকর লাগিবে—পড়িবে বিপত্তি। বিদ্যাপতি বলে, শুন হে সতি,—এ নহে পাগল—এ যে ত্রিভুবনের পতি।

শুধু বিদ্যাপতির পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দেখিতে পাই। নিম্নে এই-জাতীয় একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি:

সবকে দৌরি দৌরি পুছকিন ব্যাকুল গৌরী
এহি পংথ দেখল দিগম্বর রে কী।
তোহর দিগম্বর কে কৈসন রূপ
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছৈহি।
জীর সন দাঁত হৈহি
অংগ মে ভসম রমাবথি রে কী।
সবকে দৌরি দৌরি ... ...
হাথ মে ডমরু বগল মে ত্রিসূল ছৈহি
জটা মে গঙ্গা বিরাজথি রে কী—
অহে রামা এহি পংথ দেখল দিগম্বর রে কী॥[২৪]

সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী—'এই পথে দেখিলে কি দিগম্বরকে?' (লোকে জিজ্ঞাসা করিল)—'তোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ?' 'আমার দিগম্বরের শণের মত কেশ। দাঁত আছে—আর অঙ্গে আছে ভস্ম মাখা।' সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, 'এই পথে দেখিলে

[২৩] ইহার সহিত পরবর্তী কালের কবি ঈশনাথের এই পদটির তুলনা করিতে পারি:
বসহা-চঢ়ি রুসিকত ভাগি পড়এলা, ত্রিভুবনপতি শিবদানী॥ ধ্রুব॥
ভাঙ ধথুর পীসি জাবে হম, আনক ঘরস' আনী।
তাবে অনট-বিনট বজইত রুসি, কতএ গেলা নহি জানী॥
কতবও কুবচন কহথি তদপি হম, কনিও খেদ ন মানী।
তেহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী॥ ইত্যাদি।
—গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত।

[২৪] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। বিদ্যাপতির নামেও এইরূপ একটি পদ প্রচলিত আছে।

কি দিগম্বরকে? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ত্রিশূল; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা। 'ওহে মেয়ে—এই পথে দেখিয়াছি দিগম্বরকে।'

সভকেঁ দৌড়ি দৌড়ি পুছথি বিকল গৌরী,
আহে এহি পথ দেখল দিগম্বর রে কী।
দেখইত বুঢ় সন বসথি সভক মন,
আহে লখইত পুরুষ পুরন্দর রে কী।
অপনে নে অএলা শিৱ ঘর নহি কৌড়ী থিক,
আহে গণপতি আউরি পসারল কে কী।
বসহা চঢ়ল শিৱ ফিরথি আনন্দবন,
আহে ঘুমি ঘুমি ডমরু বজাবথি রে কী।
ভনই ৱিদ্যাপতি সুনু গৌরা পারৱতি,
আহে ইহো থিকা ত্রিভুৱন নাথ রে কী।

—গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত।

আমরা আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্ত্রের হর-পার্বতী বা শিবশক্তি জনপ্রিয়ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ-তন্ত্রে স্থানে স্থানে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা শিব-শক্তিরূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্ত্রে আদিপ্রজ্ঞার ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রেরও উল্লেখ পাই। বাঙলা-সাহিত্যের মধ্যে এই আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলা বিবিধ প্রকারের সাহিত্যে বর্ণিত আদিদেব আদিদেবীর কল্পনায়। এই আদিদেব আদিদেবীর সাক্ষাৎলাভ করি বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যের মধ্যে আমরা এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম-মঙ্গলগুলিতে এই সৃষ্টি-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই। নাথ-সাহিত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' সৃষ্টি-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডী-মঙ্গলে' এবং দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' সৃষ্টি-কাহিনী বর্ণিত আছে। কিছু কিছু মনসামঙ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও এই সৃষ্টি-কাহিনী বাদ পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে এবং ওড়িয়া-সাহিত্যেও নানাভাবে অনুরূপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা এবং সেখানে বর্ণিত তত্ত্ব ও কাহিনীসমূহের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।[২৩]

বাঙলায় বর্ণিত এই সৃষ্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছু কিছু

[২৩] এই লেখকের *Obscure Religious Cults* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

তফাত সত্ত্বেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্রই দেখি, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিত্বের অন্ধকার (ধুন্ধুকার); শূন্যতার মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা—তিনি সর্বত্রই 'নিরাকার নিরঞ্জন'—তিনিই আদি-দেব। সিসৃক্ষু এই আদিদেব শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আদিদেবীর সৃষ্টি হইল। 'শূন্যপুরাণে' দেখি, শূন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যা শক্তি'র জন্ম; বর্ণনায় তিনি 'আদ্যা' নামেই খ্যাতা। সহদেব চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গলে'ও এই কথাই দেখি। সীতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, নিরঞ্জন নিজেই এক সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া নিজেই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অন্যান্য 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আদিদেবের বাম পার্শ্বে 'আচম্ভিতে' দেবীর আবির্ভাব ঘটিল। রামদাস আদকের 'অনাদিমঙ্গল' অনুসারে মহামায়া ধর্ম-নিরঞ্জনের বামপার্শ্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরসিংহ বসুর 'ধর্মায়ণ'-মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতিরূপা আদ্যার উৎপত্তি। নাথ-সাহিত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে এক ছায়া-মূর্তিকে দেখিতে পাইলেন, এই ছায়ামূর্তিই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহিত্যের কোথাও কোথাও দেখি, অলেকনাথ নিজদেহের শক্তি হইতেই কাকেতুকা-দেবীকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা-দেবী হইলেন আদিদেবী।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' দেখি, 'সৃষ্টি সৃজিতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে।' কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মতে—

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ॥

তখন—

চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।

এই আদিদেব নিরঞ্জনের তনু হইতে উৎপন্না প্রকৃতিই হইলেন আদিদেবী।

আদি দেবরাজ-শক্তি ভুবন-মোহন-মূর্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পুট পাণি মৃদু মন্দ সুভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী॥

একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং কিছু কিছু ধর্মমঙ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক্ বর্ণনা দেখিতে পাই—সে-সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাই আদিদেব-

আদিদেবীর বর্ণনা। তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই-সব ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ শিব-পার্বতীর পাশাপাশি আর-একটি যুগলের পৃথক্ ধারা একটি সামাজিক ঐতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধ-তন্ত্র-অবলম্বনে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে করি।

আদিদেবীর উৎপত্তির পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আদিদেবী আদিপ্রকৃতি-রূপ গ্রহণ করিলেন। আদি-প্রকৃতিরূপে তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তিকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব করিলেন; এই ত্রিমূর্তি হইলেন আদিপ্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণেরই ত্রি-বিগ্রহ।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দেবী

ভারতীয় ধর্মে ও সাহিত্যে শক্তি-তত্ত্বের একটি চমৎকার বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি বৈষ্ণব-ধর্ম এবং সাহিত্যের শ্রীরাধার ভিতরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও পাই, কিন্তু শক্তি-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া রাধা-তত্ত্বের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণদ্বারাই সাধিত হইয়াছে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শক্তি-তত্ত্ব বাঙলার জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল; তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শক্তি-তত্ত্বের দ্বারাই শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শক্তি-তত্ত্বের সহিত শাক্ত-ধর্মের একটা ভাবানুষঙ্গ আমাদের মধ্যে দৃঢ় হইয়া আছে; ফলে বৈষ্ণবগণের রাধা-তত্ত্ব যে ভারতীয় শক্তি-তত্ত্বেরই দেশ-কালে একটি অভিনব প্রকাশ একথাটা প্রথমে খানিকটা যেন আমাদের সংস্কারে বাধা দেয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, ভারতবর্ষের শাক্ত-ধর্ম হইতেই যে শক্তি-তত্ত্বের উদ্ভব আমাদের এই সংস্কারটি ঠিক নহে। শক্তি-তত্ত্ব ভারতবর্ষের বিশেষ কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের নিরপেক্ষ একটি দার্শনিক তত্ত্ব। এই শক্তি-তত্ত্ব ভারতীয় দার্শনিক মনের একটি মনন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। আমরা উপনিষদাদিতেই এই শক্তি-তত্ত্বের বীজ লক্ষ্য করিতে পারি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টির আদি এককে রমণেচ্ছায় স্ত্রী ও পুরুষ রূপে দ্বিধাবিভক্ত হইতে দেখি; কারণ দ্বিতীয়-অভাবে কখনও রমণ হয় না; একের আত্মরতির জন্যই তাই প্রয়োজন হইয়াছিল একের দ্বিধা-করণ। এই দ্বয়ের মিলনেই আত্মরতির উপলব্ধি—ইহাই আদি মিথুন-তত্ত্ব। উপনিষদাদিতে আর-এক রূপে মিথুন-তত্ত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। সৃষ্টি-প্রকরণের প্রসঙ্গে বহু স্থলেই দেখিতে পাই, সৃষ্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে একটি মিথুন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মিথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ 'প্রাণ' এবং 'রয়ি', বা 'প্রাণ' এবং 'অন্ন', অথবা 'অন্নাদ' এবং 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বাক্' ও 'প্রাণে'র মিথুনের কথা পাই; বহু স্থলে আবার দেখি 'অগ্নি' ও 'সোমে'র মিথুনের কথা। তত্ত্বের দিক হইতে প্রাণ ও রয়ি, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক্, অন্নাদ ও অন্ন, অগ্নি ও সোমের মিথুন-তত্ত্ব একই তত্ত্ব। ইহাকেই কোথাও শুক্ল-কৃষ্ণ, দিবা-রাত্রি, রবি-চন্দ্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি যে তপস্যাদ্বারা প্রথমে এই মিথুন

সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের যাহা কিছু তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রয়ি, এই দুই অংশের মিলনে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি 'প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত, অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্ত্য।' ইহার ভিতরে প্রাণ 'কারণাংশ', রয়ি বা অন্ন 'কার্যাংশ'। অন্ন বা রয়ি হইল প্রাণের আধার. এই আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া। অগ্নিই এই প্রাণ, কারণ সে 'অত্তা', সে অন্নের ভক্ষক; এইজন্য অগ্নি বা প্রাণই হইল 'অন্নাদ। সোমই হইল অন্ন বা রয়ি, সে ভোজ্য। ঋগ্বেদে অগ্নিকেই 'আয়ুঃ' বা প্রাণের প্রথম বিকাশ বলা হইয়াছে। প্রাণিদেহের ভিতরে এই অগ্নি বৈশ্বানর-রূপে অন্নকে গ্রহণ করিতেছে। অন্নের আহুতি ও প্রাণাগ্নির গ্রহণ—উভয়কে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে দেহযাত্রা, দেহযাত্রা-সম্বন্ধে যাহা সত্য—বিশ্বযাত্রা-সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই প্রাণ ও রয়ি, অগ্নি ও সোম কোথাও স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে না, তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রিত, একে অপরের পোষকতা করিয়া থাকে, উভয়েই যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশমাত্র। পরবর্তী কালের শৈব ও শাক্ত-তন্ত্রগুলিতে প্রাণ বা অগ্নিকেই শিব, এবং অন্ন, রয়ি বা সোমকে শক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রাণ-রয়ি বা অগ্নি-সোম-তত্ত্বই পরবর্তী কালের শিব-শক্তি-তত্ত্বের ভিত্তিভূমিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক অদ্বয়-তত্ত্বের অগ্নি-সোমাত্মক দ্বিধাবিভক্তির পাশাপাশিই গড়িয়া উঠিতে দেখি, আর-একটি তত্ত্ব—তাহা হইল এক অদ্বয় সত্যকে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়ভাবে দর্শনের তত্ত্ব। পরবর্তী কালে এই অদ্বয়ের এই অগ্নি-সোমাত্মক বিভক্তি এবং শক্তিমান্-শক্তিরূপে বিভক্তি মিলিয়া এক হইয়া গেল। উভয় তত্ত্ব জুড়িয়া একটি শক্তি-তত্ত্বের বিবর্তন চলিতে লাগিল।

আমরা চণ্ডীর বিষ্ণুমায়ারূপের প্রাধান্যের প্রসঙ্গে এ-কথার উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাচীন শক্তি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিস্তার বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-শক্তিকে লইয়াই বেশি দেখিতে পাই। পুরাণগুলির ভিতরেও দার্শনিক শক্তিকে শিব-শক্তি অপেক্ষা বিষ্ণু-শক্তি করিয়াই বেশি দেখিতে পাই। এই বিষ্ণু-শক্তির এক বিশেষ পরিণতিই হইলেন শ্রীরাধা। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি বলিয়াই এ-স্থলে আর বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহি না।[১]

রাধাকে কোনও শক্তিদেবী বলিয়া আদৌ মনে হয় না এইজন্য যে রাধা বিশুদ্ধ প্রেম-রূপিণী—অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যেরই ঘনীভূত বিগ্রহ; প্রচলিত শক্তিদেবীর সহিত যে 'বলে'র যোগ রহিয়াছে রাধার সহিত পরোক্ষভাবেও

[১] লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

তাহার কোনও যোগ নাই। তিনি অসুর-নিধন করেন না, ধন-জন-যশ দান করেন না, সৌভাগ্য-বিজয়-আরোগ্য দান করেন না—তিনি স্বজন-বর্ধন বা শত্রু-নিধন—ইহার কোনটাতেই তৎপরা নহেন। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দ-বর্ধিনী—আর 'ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।' আসলে রাধার যে শক্তি-রূপিণীত্ব তাহা বিশুদ্ধ দার্শনিক শক্তি-রূপিণীত্ব, দেবী-পূজা বা মাতৃ-পূজাকে অবলম্বন করিয়া যে শক্তি-আরাধনার ধারা তাহার সহিত রাধার পরোক্ষভাবেও কোন যোগ নাই। যে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রেমই শক্তির পরাকাষ্ঠা সেই দৃষ্টিতেই রাধা শক্তি-রূপিণী।

রাধার এই বিশুদ্ধ প্রেম-স্বরূপত্বের জন্য অতি স্বাভাবিকভাবে মনে হইতে পারে যে রাধাও শক্তি-বিগ্রহা বটেন, কিন্তু তিনি পূর্ণা নহেন, কারণ তাঁহার মধ্যে শক্তির সমস্ত দিকের সম্যক্ বিকাশ নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক-গণ তাঁহাদের শক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় এই সন্দেহ নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরূপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপ-শক্তিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন, সত্তা-বিধৃতিকারিণী সন্ধিনী, চৈতন্যদায়িনী সংবিৎ এবং আনন্দ-বিধায়িত্রী হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সংবিৎ-শক্তির বিরোধী বা বিকল্প শক্তি নহেন, হ্লাদিনীতে অপর দুই শক্তির পূর্ণতা। সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হ্লাদ; সুতরাং সন্ধিনী-শক্তির সারভূতা শক্তি হইল সংবিৎ, আবার সংবিতের সারভূতা হইলেন হ্লাদিনী, এই হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা; সুতরাং রাধার ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পরিপূর্ণতা। রাধারূপে এই পরিপূর্ণ হ্লাদিনীত্বেই দেবীর নিত্যস্থিতি—সুতরাং কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমরূপে অনন্তরস-আস্বাদন আর ভক্তহৃদয়ে ভক্ত্যানন্দ-রূপে বিগলন—ইহা ব্যতীত দেবীর অন্য কোনও কার্য নাই।

শক্তিরূপিণী রাধার আর-একটি বিশেষ রূপ আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মে ও সাহিত্যে। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের প্রেমের সাধনা মূলতঃ তন্ত্রসাধনা; তন্ত্রের যোগ-সাধনার সহিত এখানে বৈষ্ণব-প্রেমের ভাব-সাধনা যুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই অদ্বয় সহজের দুইটি ধারা—প্রজ্ঞা এবং উপায়—একটি বামস্থা, অপরটি দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, অপরটি অপান; হিন্দু-তন্ত্র-সাধনায়ও যেমন দেখিতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের দুইটি ধারা—শক্তি এবং শিব—শক্তি বামস্থা, শিব দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, অপরটি অপান; ঠিক তেমনই বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনায় দেখিতে পাই মহাভাব-রূপ সহজের দুইটি ধারা, একটি রস, অপরটি রতি। রসই কৃষ্ণ, রতিই রাধা। রাধা বামস্থা, কৃষ্ণ দক্ষিণস্থ; বাম নেত্রই সহজিয়াগণের রাধাকুণ্ড, দক্ষিণ নেত্রই শ্যামকুণ্ড। বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধনায় নর-নারী মিলিত সাধনার ভিত্তিভূমি, যেমন

নারীতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলব্ধি আর নরে উপায়-ভাবনা এবং উপায়-উপলব্ধি, হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, নারীতে শক্তি-ভাবনা এবং শক্তি-উপলব্ধি আর পুরুষে শিব-ভাবনা এবং শিবোপলব্ধি, তেমনি মহাভাবের সাধনারও মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি; স্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনার পূর্ণতা হয় না। নারীর রূপের মধ্যে স্বরূপে অবস্থিতি শ্রীরাধার; পুরুষ-রূপের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে চাই রূপে স্বরূপের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রাথমিক স্তর মাত্র; রূপে স্বরূপের আরোপের পরে চাই রূপে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা। এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপত্তি; মহাভাবই জীবের সহজ-স্বরূপ। এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি, তন্ত্রের শক্তির স্থান স্পষ্টতঃই গ্রহণ করিয়াছেন রতি-রূপিণী রাধা।[২]

আমরা পূর্বে এ-কথার আভাস দিয়া আসিয়াছি যে, দেবীরূপে পার্বতী উমারও অসুরবধাদির সহিত কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তিনি তথাকথিত বল-রূপিণী দেবী নহেন; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহাকে আমরা সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতিমা-রূপেই অধিক দেখিতে পাই। তাই দেখি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চিত্র ও ভাস্কর্যে যেমন মধুর রসের বিচিত্র বিকাশ রাধা-কৃষ্ণের যুগলকে লইয়া, তেমনই পূর্ববর্তী সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে মধুর রসের বিচিত্র প্রকাশ উমা-মহেশ্বরের যুগলকে লইয়া।

বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহিত্যের সহিত একটি দেবী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া আছেন, তিনি বাসুলীদেবী; 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র মধ্যে প্রত্যেকটি পদের সঙ্গেই কবির নামের ভণিতার সহিত এই দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই 'বাসলী-দেবী'-রূপে। বাসলীই হয়ত দেবীর নাম, স্বর-সঙ্গতির জন্য পরবর্তী কালে তাহা বাসুলী বা বাশুলী রূপ ধারণ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির ভণিতায়ও বহুভাবে এই বাসুলীদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস এই বাসুলীর সেবক ছিলেন; তাঁহারই বরে বা তাঁহারই আদেশ শিরে ধরিয়া• চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের সব পদ রচনা করিয়াছেন। এই বাসুলীদেবীও রাঢ়-অঞ্চলের একজন আঞ্চলিক লৌকিক দেবী, তিনি পৌরাণিক দেবী নহেন। পরবর্তী কালে সব দেবীই যেমন পার্বতী চণ্ডিকার সহিত মিলিয়া গিয়াছেন—ইনিও তেমনি চণ্ডিকা—বিশেষ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। এই দেবীকে 'বিশালাক্ষী', 'বজ্রেশ্বরী', 'বাগীশ্বরী'-প্রভৃতি বহু নামের সহিত টানিয়া-বুনিয়া মিলাইয়া 'সংস্কৃত' করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু দেবীর মূল রূপ বাসুলী বলিয়াই মনে হয়। রাঢ়-অঞ্চলের সংলগ্ন উড়িষ্যার কিছু

[২] এই বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ' গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কিছু অঞ্চলেও এই দেবীর প্রচলন দেখা যায়—এ তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই অনেকে করিয়াছেন।[৩]

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রাগাত্মিকা পদাবলীর মধ্যে এই বাসুলী দেবীর একটি বিশেষ স্থান দেখিতে পাই। তিনি সহজ প্রেমের মূল দেবী 'নিত্যা'র সহচরী বা ডাকিনী দেবী। মূলদেবীর মাহাত্ম্য ও আদেশ প্রচার করাই এই সহচরী দেবীর কাজ। সহজিয়া-মতে প্রেমই পরম শক্তি, এই নিত্যপ্রেমশক্তির মূলদেবীই হইলেন 'নিত্যা' (কোথাও 'নিত্য'রূপেও দেখা যায়); তিনি নিত্য-প্রেমস্বরূপিণী। এই নিত্যপ্রেমস্বরূপিণীর আদেশেই সহচরী দেবী বাসুলী সহজ-প্রেমের গূঢ়-রহস্য সাধক-সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য বাসুলীই হইলেন 'প্রেম প্রচারের গুরু'। স্বপ্নে এই নিত্যা-সহচরী বাসুলীই চণ্ডীদাসকে 'চাপড় মারিয়া' রজকিনী রামীর সহিত সহজ সাধন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বাসুলীর নিকট হইতেই চণ্ডীদাস সহজ-সাধনের রহস্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রাগাত্মিক পদগুলিতে আমরা জানিতে পারি। চণ্ডীদাস যে বাসুলী-সেবক ছিলেন এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে এই-সব কাহিনী-কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করি।

পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই একটি লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, তন্ত্রের শিব ও শক্তি বা মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্ত্বের দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার পরে আবার কৃষ্ণের সহিত যখন রাধার প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই যুগলের সহিত কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতাও যুক্ত হইয়া গেলেন। যাঁহারা উমা-মহেশ্বর তাঁহারাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সত্যটি পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে (অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে) অতি সহজ-ভাবেই গৃহীত হইতে দেখি।[৪] লোকপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে এ-কথার উল্লেখ বহুভাবে দেখিতে পাই। 'শিবায়ন' কাব্যগুলির মধ্যেও এই সহজ সত্যটি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামেশ্বর (অষ্টাদশ শতক) তাঁহার 'শিবায়নে' বলিয়াছেন, একই যুগল-মূর্তি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে রাধা-শ্যাম, সীতা-রাম, ভবানী ও শঙ্কর প্রভৃতি অনন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন।

আপনি গোপিনী বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে
রাস কৈলে ব্রহ্মরতিরসে।

[৩] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থের 'লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[৪] এই লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ' গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিস্তারিয়া গুণ-কোষ কাল্যে মহা পরিতোষ,
আত্মারাম আপনার সনে॥
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সীতারাম
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য
এক মূর্তি অনন্তরূপিণী॥[৫]

অন্যত্র দেখি 'গৌরীর গুণ-বর্ণনা'-য় মহাদেব গৌরীকে একেবারে তত্ত্বতঃই কৃষ্ণপ্রেমদায়িনী কৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধা করিয়া তুলিয়াছেন।

হর বলে হৈমবতী হরি-ভক্তি তুমি।
তোমাকে তোমার তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
... ...
বৃথা বিষ্ণু-সেবা করে তুমি যারে বাম।
নিকটে না লাগে তার নবঘনশ্যাম॥
বৈষ্ণবের ব্যবসায় ব্যক্ত তব কলা।
তিলক মৃত্তিকা তুমি তুলসীর মালা॥
... ...
রাধাকৃষ্ণ না বল্যা যে শুধু কৃষ্ণ বলে।
কৃষ্ণের করুণা তার নাই কোনও কালে॥
তুমি রাধা তুমি সীতা তুমি গঙ্গা কাশী।
তোঁঞে পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাসি॥

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে রামেশ্বরের শিবও প্রথমাবধি একজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-রূপেই দেখা দিয়াছেন! এই বৈষ্ণবপ্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের কথা হর-গৌরীর প্রসঙ্গে এই 'শিবায়নে' বহু স্থানে দেখা দিয়াছে।[৬] রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (সপ্তদশ শতক) রচিত 'শিবায়নে' আবার কবি 'ফুলশয্যায় গৌরী'-র বর্ণনা দিতে গিয়া ভাষায়, ছন্দে ও বচন-বিন্যাসে নিজের অজ্ঞাতে গৌরীকে যে

[৫] নারায়ণী-বন্দনা; শ্রীযোগিলাল হালদার সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ।
[৬] চাষ করিবার জন্য শিব কৈলাসধাম ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় বিরহিণী দেবী বলিতেছে
মহেশ মাধব হৈল মহী মধুপুরী।
কৈলাস হৈল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি॥
আবার গৌরী অভিমান করিয়া বসিলে শিব বলেন ঃ
রাসরসে রাধা পায়্যা রাজীবলোচন।
চাপিতে কৃষ্ণের কান্ধে কর‍্যাছিল মন॥
আবার হর-গৌরীর বর্ণনায়—
যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা।
প্রেম আলিঙ্গন কর‍্যা পিয়ে মুখসুধা॥

কতখানি রাধা করিয়া ফেলিয়াছেন নিম্নের উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেষ
চিত্র বসন ওড়নি।
কনক মুকুর বদন কাঁতি
বসন ভূষণ বিবিধ ভাতি
চলুনি বর বরটা পাঁতি
ভঙ্গিমা করদোলনী॥
আজি রাজকুমারী গৌরী
নব সমাগম শঙ্কিনী।
চলি পদ দুই চারি যাএ
চমকি চাহে আই মাএ
ঝমরু ঝমরু নূপুর পাএ
রুনু ঝুনু কটিকঙ্কণী॥
সাজিল গৌরী সখীসমাজ
ভবন মাঝ শশী বিরাজ
পথে অকারণ করহ ব্যাজ
চরণে মন্দগামিনী।
কেহ করে ধরি করএ অঙ্ক
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক
পতি প্রতি কেন বদন বঙ্ক
অভিসর বরকামিনী॥

বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধা-বর্ণনার প্রভাব আমরা মাধবাচার্য এবং মুকুন্দরামের 'গৌরী' বর্ণনার মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারি। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি যথার্থ উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "তাঁহার (মুকুন্দরামের) কাব্যের অন্যত্র বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাঁহার নায়িকার রূপ-বর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধুর্য সুপরিস্ফুট। তাঁহার আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষ্ণবকবিবর্ণিত শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি সমুজ্জ্বল। সুকোমল দেহ-লাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সুষমাময় উপমাপ্রয়োগে ও মাধুর্যপ্রধান ভাবাবহ রচনায় চণ্ডী বৈষ্ণবের রাধিকার সহিত অভিন্ন।"[১]

[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র প্রথম ভাগের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন-শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
অতসী কুসুম তনু ভ্রূযুগ কামের ধনু
সুগন্ধি চন্দন-বিলোপন॥
—গৌরীর-রূপ, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

—প্রভৃতি বর্ণনা গৌরী চণ্ডীর না গৌরী রাধার তাহা বিশেষভাবে বলিয়া না দিলে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। পরে গৌরীর বর্ণনায় আরও যখন দেখি—

স্থূলতা উদরে ছিল বলে তা লুটিয়ে নিল
উরস্থল জঘন দুজনে।
চরণ-চঞ্চল-ভাব লোচন করিল লাভ
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥

তখন আর বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির রাধাকে স্মরণ না করিয়া উপায় নাই। আমরা যখন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে রচিত শাক্ত-পদাবলী লইয়া আলোচনা করিব তখন দেখিতে পাইব সাধক কমলাকান্ত (ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক্) মূলাধার-স্থিতা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ ও সহস্রারস্থ শিবধামে তাহার গমন সবই বৈষ্ণবের ভাষায় ও ছন্দে রাধার কৃষ্ণাভিসারে গমনের একান্ত অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাব যে শুধু এইভাবে দেবীর রূপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক রাধার রূপবর্ণনার প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মধুর রসের যুগলমূর্তিরূপে উমা-মহেশ্বর-মূর্তি যখন রাধাকৃষ্ণ-মূর্তির সমান হইয়া উঠিল তখন রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র বৃন্দাবনলীলার কিছু কিছু লীলাও উমা-মহেশ্বরে আরোপিত হইল। আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'-র বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের একটি বিশেষ লীলা দেখিতে পাইতেছি। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে অপর্যাপ্ত ফুল ফুটাইলেন: তাহার পরে বড়ায়ি বুড়ীর সহিত যুক্তি করিয়া ফুলের লোভ দেখাইয়া গোপীগণসহ রাধাকে কুসুমিত উপবনে আনয়ন করিলেন। বিভিন্ন বর্ণগন্ধের প্রচুর ফুল হাতের কাছে পাইয়া সখীগণসহ রাধা অনেক ফুল তুলিয়া লইল। কৃষ্ণ সহসা নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ

ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।
ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে॥
মোর বনতরু ডালে সজায়িআঁ আঙ্গুড়ী।
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী॥
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতী মালে করিল বিলাসে॥

বৃন্দাবন দেখি মোর পোড়এ আন্তর।
তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর॥
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী॥

... ...

বৃন্দাবন ভাঁগি মোর করিলে বিকল।
পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত ফল॥

এই ব্যাপদেশে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইলেন।

এই লীলার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া শিবায়ন-কাব্যগুলিতে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়নে 'পুষ্পচয়নোপাখ্যান' বলিয়া একটি পালা রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাই সখীস্থানীয়া মুনিকন্যাগণ লইয়া দেবী গঙ্গাতীরবর্তী শিবের মালঞ্চে প্রবেশ করিলেন। দেবীর ফুল তুলিবার বর্ণনার পূর্বে কবি একটি 'ধুয়া' দিয়াছেনঃ

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে।
মজিল মহত্ত্ব মোর রাখালের হাতে॥

এই 'ধুয়া' হইতেই হর-গৌরীর এই কৈলাসের মালঞ্চ-লীলা কোথা হইতে গৃহীত তাহা বেশ বোঝা যায়। যুবতী দেবীর চঞ্চল রূপের বর্ণনাতেও লীলাময়ী রাধার আভাস পড়িয়াছে। যাহা হোক—

উদ্যান ভিতরে দুর্গা আইলা একেশ্বরী।
বাহিরে রহিল যত সখী সহচরী॥
যত পক্ষিগণ আসি পার্বতীরে বেড়ে।
ভ্রমর যাইতে চাহে মালঞ্চ ভিতরে॥
আঁচল ফিরাইয়া দুর্গা নাড়েন আঁকুষি।
বিস্মিত হইলা বড় মালঞ্চেতে আসি॥

দেবী যখন শিবের মালঞ্চ হইতে ফুল তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন কিছু কিছু ফুলই দেবীকে সাবধান করিয়া দিতেছিল—

তুমি হেমন্তের কন্যা আমি জানি তোমা।
এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীমা॥
মহৌষধিপ্রস্থ হেমন্তের অধিকার।
না জান হরের বার্ত্তা ফুল লোট কার॥
শিবের আছুক দায় যদি শুনে নন্দি।
প্রমথের হাতে কন্যা বনে হইবে বন্দি॥

হইলও তাহাই।—

সরোবর মধ্যে টঙ্গ তাহাতে রক্ষক ভৃঙ্গ
সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল।

তাহারা—

ধর মার করি ধায় রাক্ষসীর অভিপ্রায়
কেহ বান্ধিবারে আনে দড়া॥

সংবাদ শুনিয়া শিবও রুষিয়া গেলেন। তিনি আদেশ দিলেন—

নন্দি, চল রে আপুনি চল রে আপুনি।
আমার মালঞ্চ লুটে কেমন মালিনী॥

যাহা হোক, সংক্ষেপে দেবী মালঞ্চ-ভঙ্গের দায়ে পড়িলেন, ক্ষতিপূরণস্বরূপ মালঞ্চে শিবের সহিত দেবীকে মিলিতে হইল। মালঞ্চে 'গৌরীর অন্বেষণে শিব' বর্ণনার পূর্বে 'ধুয়া' দেখিতে পাইতেছি—

বুড়ী (বড়ায়ি বুড়ী?) বলে নাতিয়া নারে হের।
হাথে নিধি পাইয়া কেন ছাড়॥

তাহার পরে শিব যখন 'গৌরীর সন্ধান লাভ' করিলেন তখনকার 'ঘোষা' হইল—

তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ।
দান্ডাইয়া বিকলী আর কত দেখ॥

পরবর্তী কতকগুলি শিবায়ন বা হরমঙ্গল-গ্রন্থে এই উপাখ্যানটিকে আরও অনেক বিস্তার করা হইয়াছে। দ্বিজ বিনয়লক্ষ্মণের 'হরমঙ্গলে' দেখি দেবী মালঞ্চে ফুলচুরির অপরাধে বন্দিনী হইয়া রহিলেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনিচ্ছায় শিবের সহিত তাঁহাকে রাত্রিবাস করিতে হইল।[৮] জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গলেও আমরা হর-গৌরীর এই মালঞ্চলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাই।[৯]

নৌকাবিলাস রাধা-কৃষ্ণ লীলার একটি বিশেষ বৈচিত্র্য। চন্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকের কবিগণের রচনায় নৌকাবিলাসের নানা পদ দেখিতে পাই। রাধা-কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের প্রভাবে পড়িয়া কবি রামেশ্বর তাঁহার শিবায়নে হর-গৌরীর নৌকা-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। দেবী একদিন শখ করিয়া বৃদ্ধ স্বামী শিবের নিকট শাঁখার আব্দার করিলেন : দরিদ্র শিব তাঁহার অসামর্থ্যের জন্য এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবী রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিলেন। স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে পিতৃগৃহ হিমালয়—মাঝখানে এক মায়ানদীর সৃষ্টি হইল এবং ক্রুদ্ধা দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য শিব স্বয়ং বৃদ্ধ পাটনী সাজিয়া ভাঙা নৌকা লইয়া ঘাটে বসিলেন। দেবী

[৮] বিশ্বভারতী পুঁথি, সংখ্যা ৯২৭; পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।
[৯] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কার্তিক-গণেশ পুত্রদ্বয়সহ পার হইতে আসিলে বৃদ্ধ পাটনী শিব বলিলেন ঃ

কি করিব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাণ্ডা।
কর্ণধার ভাল বটি নৌকাখানা ভাঙ্গা॥
তিনলোক তারি মোকে তায় নয় ঠেক।
সয় নাই নায় যদি হয় অতিরেক॥
নদী হইল পাথার প্রচুর হৈল জল।
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
তিন লোক দুর্গম তারিবা হয় ঘোর।
চারি লোক চাপাত্যে ভরসা নাহি মোর॥
প্রথমেতে দুটী ছাল্যা থুয়্যা আসি পারে।
তার পর তুমি আমি যাব একবারে॥
ইহা বল্যা দুটী ছাল্যা থুয়া পার কুলে।
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে॥
ঈশ্বরী আসন কর্য়া বসিলেন নায়।
ত্রিলোচন বায় তরি তব তর যায়॥
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরাল্যা বয় বা।
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না॥
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্য়া আল্য জল।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
মহাবল অনিল সলিল সপ্ততাল।
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল॥
তায় কর্ণধার কেবুয়াল কৈল হারা।
বসিয়া রহিল বুড়া বর্ব্বরের পারা॥

অবশ্য দুর্গা রাধার মতন 'অবলা অখলা' নহেন; তাই মায়ানদীর জল—

গণ্ডূষে করিল গ্রাস ত্রাস পাল্য দেখ্যা।
পলাইল পশুপতি পার্বতীরে রাখ্যা॥[১০]

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন দেখিতে পাই রাধা একদিন কৃষ্ণকে নর্তক হইয়া নাচিতে বলিতেছেন এবং সেই নাচের আবার বিবিধ শর্ত বলিয়া দিতেছেন—

শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে।
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥

১০ শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ।

উদ্ভট-তালেতে যদি হার বনমালী।
চূড়া-বাঁশী কেড়ে সব দিব করতালী॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুখিনী শুনে হাসি॥

সেইরূপ বিদ্যাপতির রচিত হর-গৌরী-পদে দেখিতে পাই, গৌরী একদিন হরকে নটবেশ ধারণ করিয়া ডমরু বাজাইয়া নাচিবার জন্য আব্দার ধরিয়াছেন—

আজু নাথ এক ব্রত মহাসুখ লাগত হে।
তোহেঁ সিব ধরু নট বেস ডমরু বজাবহু হে॥

শিব অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সুলভ রসিকতায় তাঁহার পক্ষে নৃত্যের নানাবিধ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া পার্বতীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি একটি হিন্দী লোক-গীতিতে দেখি, কৃষ্ণ যেমন রাধাকে দোলায় দুলাইয়াছেন, শিবও আবার তেমনই গৌরীকে দোলায় দুলাইয়াছেন।—

মলিয়া গিরি মেঁ পড়ারী হিণ্ডোলা জী, চন্দন ডারী পড়োরী হিণ্ডোলনা জী—
ঐ জী কোঈ ঝুলে গৌরী মাতা, চন্দন ডালী পড়া রী হিণ্ডোলনা জী।
রেশম ডোরী পড়া রী হিণ্ডোলনা জী, ঐ জী কোঈ শংকর ঝুলারন হার।
গৌরা পীংগ বঢা নহী জী, ঐ জী কোঈ নাগোঁ কী ফুসকার॥ ইত্যাদি।[১১]

মলয় গিরিতে চন্দনের ডালে বাঁধা হিণ্ডোলা—তাহাতে ঝুলিতেছেন গৌরী মাতা; রেশমের ডোরী—ঝুলাইতেছেন শঙ্কর; গৌরী দুলিবার জন্য বেশি ঝোঁক দিতেছেন না, কারণ হইল শিবের অলঙ্কার সাপের ফোস্ ফোস্ শব্দ।

ইহার সহিত আমরা ভোজপুরী একটি লোক-সঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলনের বর্ণনার তুলনা করিতে পারি।

ঝুলা ঝুলে রাধিকা প্যারী,
সংগ মেঁ কৃষ্ণ মুরারী না।
কথি কে পালনা কথি কে ডোরী,
কথি কে গদ্দিয়া না।
সোনে কে পালনা রেসম কে ডোরী,
চনন কে গদ্দিয়া না।
ঝুলা ঝুলে রাধিকা প্যারী,
সংগ মেঁ কৃষ্ণ মুরারী না।[১২]

[১১] আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ।
[১২] 'ভোজপুরী ঔর উস কা সাহিত্য', কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়; ৩০ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

লোক-সঙ্গীত দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, হর-গৌরী এবং কৃষ্ণ-রাধা লোক-সঙ্গীতে কিরূপ সহজে মিলিয়া মিশয়া গিয়াছে। ভোজপুরী লোক-সঙ্গীতে হর-পার্বতীর হোলী খেলার গানও পাওয়া যায়—'আজু সদা সিব খেলত হোরী'।[১০] হিন্দী লোক-সঙ্গীতে গৌরীর শ্রাবণের ঘন বর্ষায় ঝুলন-লীলার পদও দেখিতে পাই; সেখানে গৌরী আবার ঠিক গৌরী নন, তিনি 'সাঁৱল মাইয়া'।

ঘনিয়র গরজৈ বিজলী চমকে পৱন চলে পুরৱইয়াঁ।
রিমঝিম রিমঝিম মেহর বরসে ইন্দ্র জল ভরবাইয়াঁ॥
উঁচে পৰ্বত পড়া হিংডোলা রেশম ডোর বটাইয়া।
মাতা মেরী ঝুলন নিকসী লোকড় ৱীর ঝুলাইয়া॥
বাৱন ৱীর চহুঁ ওর ৱিরাজে ভৈরোঁ চমর ডুলাইয়াঁ
ব্রহ্মা ৱিষ্ণু মহাদেৱ আয়ে গোরখ দ্বারে অলখ জগায়ে
হাথ জোড় মৈঁ করূঁ বীনতি তু সুন সাঁৱল মাইয়াঁ॥[১০]

[১] ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপূজার কাহিনী বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণেই এই কাহিনীটির বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। রাবণ দেবী অম্বিকার আশ্রিত—সুতরাং দেবীর বর লাভ না করিয়া রাবণ-বধ সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় করিতে হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপূজা করিয়া বর লাভ করিতে হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, হনুমান্‌কে মাছিরূপ ধারণ করিয়া রাবণ-ব্যবস্থাপিত চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রতি বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে। রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক বিধি-বিচার করিতে হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসন্তী পূজার সম্ভবতঃ সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, শারদীয়া পূজার নহে। শারদীয়া পূজা তাই অকালের পূজা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাই দেখি—

শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধ সময়
শরৎ অকাল এ পূজার॥

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে ব্রহ্মার নিকট হইতে বিধি লইয়া রামচন্দ্রকে অকালে 'চণ্ডীকল্পে' বোধন করিতে হইল; সপ্তমী ও অষ্টমীতে পূজার পর 'নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পূজা। এই নবমী পূজাতেই রামচন্দ্রের একশত আটটি নীলোৎপলে দেবীকে পূজার সংকল্প। হনুমান্ 'দেবীদহ' হইতে একশত আটটি নীলোৎপল আনিলেন; পূজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবীই লুকাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ একটি অক্ষি নিবেদন করিবার সংকল্প এবং উদ্যোগ করিলেন; দেবী তুষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর দিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, বহু প্রক্ষেপ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এ-বিষয়ে আমাদের মন সংশয়িত। সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানের প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শাক্তগণের কীর্তিও হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার প্রচলিত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁটি বলিয়া মনে হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণ-বধের সহিত কোনও দেবীপূজার সম্পর্ক নাই, থাকিবার কথাও নহে। রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই। পরবর্তী কালের কোনও সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাহিনী পাই না। শুধু 'অদ্ভুত-রামায়ণে'র মধ্যে দেখিতে পাই—রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ করিয়াছিলেন সীতা; তিনিই তাঁহার স্বরূপ কালী-মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ-সংহার করিয়াছিলেন।[১] এই প্রসঙ্গে এই কবি সীতাই যে পরমা দেবী এবং রামচন্দ্রই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা করিয়া বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

'অদ্ভুত-রামায়ণে' বর্ণিত সীতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে সীতার রাবণ-বধের কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় ওড়িয়া কবি সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত 'বিলঙ্কা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন দশানন, কিন্তু 'বিলঙ্কা'র রাবণ 'সহস্রশিরা'। রাম ও লক্ষ্মণ মিলিয়া বহুভাবে চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই রাবণ বধ করিতে পারিতেছিলেন না। তখন দেবগণ মিলিয়া সীতার শরণ গ্রহণ করিয়া সীতার স্তব করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করিলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন (জ্যোতির্ময়-ভুবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে সিংহবাহনে আগমন করিয়া তিনি সীতাকে পুষ্পধনু দান করিলেন। সীতা তখন সহস্রশিরা রাবণকে তাঁহার (সীতার) যৌবন দেখাইয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন; রাবণের তখন সীতার প্রতি 'পাপ-প্রলোভন' উপস্থিত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষ্মণ সহস্র-শিরা অসুরকে (রাবণকে) হত্যা করিলেন।

কিন্তু সহস্রশিরা রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষশিরা রাবণের উৎপত্তি হইল এবং সেই লক্ষশিরা রাবণ নূতন করিয়া বিলঙ্কা নির্মাণ করিয়া লইল। লক্ষ্মণ এই লক্ষশিরা রাবণকে কিছুতেই মারিতে না পারিয়া সীতার শরণ গ্রহণ করিলেন; সীতা পূর্বমত স্তব করিলেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সর্বমঙ্গলা দুর্গা দেবী আসিয়া সীতাকে বলিলেন,—

> তোর মোর কিছুমাত্র প্রভেদ ত নাহীঁ॥
> তোর তেজ তোরে মুহীঁ করুছি প্রদান।
> মহাভৈরবী রূপকু কর তু ধারণ॥

তখন—'মহাকালী রূপ সীতা করিলে ধারণ' এবং 'আরে রে দানব বোলি সীতা

[১] নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
নৃত্যন্তীং চাপরাং কালীমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে॥
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড়্গখর্পরধারিণীম্।
শবরূপমহাদেবহৃৎসংস্থাঞ্চ দিগম্বরাম্॥
পিবন্তীং রুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং ক্ষুধাতুরাম্।
জগদ্গ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাবিভূষণাম্॥—ইত্যাদি। ২৫।২৯-৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপূজার কাহিনী বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণেই এই কাহিনীটির বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। রাবণ দেবী অম্বিকার আশ্রিত—সুতরাং দেবীর বর লাভ না করিয়া রাবণ-বধ সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় করিতে হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপূজা করিয়া বর লাভ করিতে হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, হনুমান্‌কে মাছিরূপ ধারণ করিয়া রাবণ-ব্যবস্থাপিত চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রতি বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে। রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক বিধি-বিচার করিতে হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসন্তী পূজার সম্ভবতঃ সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, শারদীয়া পূজার নহে। শারদীয়া পূজা তাই অকালের পূজা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাই দেখি—

শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধ সময়
শরৎ অকাল এ পূজার॥

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে ব্রহ্মার নিকট হইতে বিধি লইয়া রামচন্দ্রকে অকালে 'চণ্ডীকল্পে' বোধন করিতে হইল; সপ্তমী ও অষ্টমীতে পূজার পর 'নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পূজা। এই নবমী পূজাতেই রামচন্দ্রের একশত আটটি নীলোৎপলে দেবীকে পূজার সংকল্প। হনুমান্ 'দেবীদহ' হইতে একশত আটটি নীলোৎপল আনিলেন; পূজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবীই লুকাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ একটি অক্ষি নিবেদন করিবার সংকল্প এবং উদ্যোগ করিলেন; দেবী তুষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর দিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই, বহু প্রক্ষেপ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এ-বিষয়ে আমাদের মন সংশয়িত। সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানের প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শাক্তগণের কীর্তিও হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার প্রচলিত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁটি বলিয়া মনে হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণ-বধের সহিত কোনও দেবীপূজার সম্পর্ক নাই, থাকিবার কথাও নহে। রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই। পরবর্তী কালের কোনও সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাহিনী পাই না। শুধু 'অদ্ভুত-রামায়ণে'র মধ্যে দেখিতে পাই—রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ করিয়াছিলেন সীতা; তিনিই তাঁহার স্বরূপ কালী-মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ-সংহার করিয়াছিলেন।[১] এই প্রসঙ্গে এই কবি সীতাই যে পরমা দেবী এবং রামচন্দ্রই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা করিয়া বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

'অদ্ভুত-রামায়ণে' বর্ণিত সীতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে সীতার রাবণ-বধের কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় ওড়িয়া কবি সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত 'বিলঙ্কা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন দশানন, কিন্তু 'বিলঙ্কা'র রাবণ 'সহস্রশিরা'। রাম ও লক্ষ্মণ মিলিয়া বহুভাবে চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই রাবণ বধ করিতে পারিতেছিলেন না। তখন দেবগণ মিলিয়া সীতার শরণ গ্রহণ করিয়া সীতার স্তব করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করিলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন (জ্যোতির্ময়-ভুবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে সিংহবাহনে আগমন করিয়া তিনি সীতাকে পুষ্পধনু দান করিলেন। সীতা তখন সহস্রশিরা রাবণকে তাঁহার (সীতার) যৌবন দেখাইয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন; রাবণের তখন সীতার প্রতি 'পাপ-প্রলোভন' উপস্থিত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষ্মণ সহস্রশিরা অসুরকে (রাবণকে) হত্যা করিলেন।

কিন্তু সহস্রশিরা রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষশিরা রাবণের উৎপত্তি হইল এবং সেই লক্ষশিরা রাবণ নূতন করিয়া বিলঙ্কা নির্মাণ করিয়া লইল। লক্ষ্মণ এই লক্ষশিরা রাবণকে কিছুতেই মারিতে না পারিয়া সীতার শরণ গ্রহণ করিলেন; সীতা পূর্বমত স্তব করিলেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সর্বমঙ্গলা দুর্গা দেবী আসিয়া সীতাকে বলিলেন,—

তোর মোর কিছুমাত্র প্রভেদ ত নাহীঁ॥
তোর তেজ তোরে মুহীঁ করুছি প্রদান।
মহাভৈরবী রূপকু কর তু ধারণ॥

তখন 'মহাকালী রূপ সীতা করিলে ধারণ' এবং 'আরে রে দানব বোলি সীতা

[১] নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
নৃত্যন্তীং চাপরাং কালীমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে॥
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড্গখর্পরধারিণীম্।
শবরূপমহাদেবহৃৎসংস্থাঞ্চ দিগম্বরাম্॥
পিবন্তীং রুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং ক্ষুধাতুরাম্।
জগদ্‌গ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাবিভূষণাম্॥—ইত্যাদি। ২৫।২৯-৩১

ডাক দেলে'; রণক্ষেত্রে তখন 'ভদ্রকালী রূপ ধরি দেবী যে নাচন্তি'। দেবগণ সকলে মিলিয়া তখন মহাদেবীর রূপধারিণী সীতার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন।[২]

বঙালী কবি জগৎরাম-কৃত রামায়ণেও আমরা দেবীমূর্তিধারিণী সীতা কর্তৃক রাবণ-বধের কাহিনী দেখিতে পাই। 'জৈমিনী ভারতে'র আশ্রমপর্বেও এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। 'আনন্দ রামায়ণে' সীতা কর্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ-বধের কাহিনী আছে। 'আনন্দ রামায়ণে' ও 'লিঙ্গামৃতে' সীতা কর্তৃক কুম্ভকর্ণের পুত্রের নিধন-কাহিনী বর্ণিত আছে।[৩]

এই-সকল উপাখ্যানের ভিতর দিয়া একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি—রাম-লক্ষ্মণ নিজের শক্তিতে রাবণ-বধ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে দেবীর শরণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং দেবীই রাবণ-বধের মুখ্য কারণ। সারলা দাসের 'বিলঙ্কা-রামায়ণে' আরও একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে পারি যে রাবণ মূলতঃ দেবীর ভক্ত এবং আশ্রিত ছিল। রাবণকেও আমরা ভদ্রকালীর স্তব করিতে দেখি—

জয় মাতা শাকম্ভরী শংকরঘরণী।
ত্রিলোক পালিনী মাতা ভক্ত উদ্ধারিণী॥
অভয় বর দায়িনী জয় মা পার্বতী।
রক্ষা কর মহামায়া পড়িল বিপত্তি॥

তখন 'রাবণ স্তবরে তোষ হোই ভগবতী' রাবণকে নির্ভয় দান করিলেন। আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রাবণ কর্তৃক ঠিক এইভাবেই অম্বিকার স্তব দেখিতে পাই। সুতরাং দেবীর আশ্রিত জনকে দেবীর শক্তি বা সাহায্য ব্যতীত বধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

কিন্তু দেবীর আশ্রিত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাবণ দেবী দ্বারাই নিহত হইয়াছিল এবং সীতা নিজেই সেই দেবী, এই-জাতীয় একটা লোকায়ত মত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। শূরবীর সিংহ ফতেহ্‌পুর জিলার একটি গ্রামে 'জানকী বিজয়' নামে ছোট একখানি হিন্দী পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহাতে সীতাদ্বারা শ্বেত দ্বীপের অধিপতি সহস্রশীর্ষ রাবণের বধের কাহিনী বর্ণিত আছে।[৪]

ব্রজ-অঞ্চলে (মথুরা-বৃন্দাবন এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে) যে লৌকিক রামায়ণ-গীত বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একটি মজার কাহিনী

[২] বিলঙ্কা-রামায়ণ;শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কটকের মনোহর প্রেসে মুদ্রিত।
[৩] রেভারেন্ড ফাদার কামিল বুল্‌কে কর্তৃক হিন্দীতে লিখিত 'রাম-কথা' গ্রন্থখানির ৪৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৪] দ্রষ্টব্য 'অমৃত পত্রিকা' (হিন্দী), ২৭শে মে, ১৯৫৬।

দেখিতে পাই। সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে পর সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন যে রামচন্দ্র ত 'রমনিয়া'কে মারিয়াছেন, রাবণকে মারিতে পারেন নাই। রাবণ লঙ্কায় থাকে না, সে থাকে 'পলঙ্কা'য়—তাহার সহস্র শির এবং দ্বিসহস্র বাহু। শুনিয়া ভরত রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'তুমি ত এখন অযোধ্যার সিংহাসনে বস—আমি গিয়া রাবণ মারিয়া আসিতেছি।' ভরত সৈন্য-সামন্ত লইয়া পলঙ্কা চলিলেন; কিন্তু নাকাসুর তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনিয়া আটকাইয়া রাখিল। তখন সীতা নিজেই অগ্রবর্তী হইলেন, পলঙ্কা গিয়া রাবণকে খাইয়া ফেলিলেন এবং সেখান হইতে আর অযোধ্যায় ফিরিলেন না, সোজা কলিকাতায় আসিয়া 'কালী মাই' হইয়া রহিলেন। নারদ আসিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সীতা কিছুতেই রাজি হইলেন না, কালী মাই হইয়া কলিকাতায় রহিয়া গেলেন।

কিশন অগারী পরি রহে পেস এক না খাই
সবরে জোধা চলি দএ, সবু লীনে বান উঠাই
পহুঁচী গয়ে কলকাত্তা মেঁ, তৌ মাতা মংদির পহুঁচী জাই।
মংদির পহুঁচী জাই পাস নারা তব জাগৌ
নারহু চরণ পর্যো ভৈরাই বাত অপনী ঠহরায়ো
মাতা তৌ ন্যোঁ কহৈ সুনিলৈ জননী বাত
হমতে তু তৌ কহা কহঁতি ঐ চলৌ হমারে সাথ।
সব চলিবৈ কী নাঁহি অবউ মতি আস লগায়ো
সবু দলু তুম ভগি জাউ পাস মতি মেরে আয়ো
বার বার তুমতে কহুঁ বচন কহুঁ সমুঝাই
কলকত্তা কী কালী বনি গঙ্গৈ সবরে ঘার কু জাই।[৫]

আধুনিক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ('নিরালা') বাঙলাদেশেই জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাঙলাদেশের রামায়ণের প্রভাব পাইয়াছিলেন। 'নিরালা' কবি 'রাম কী শক্তিপূজা'[৬] নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন; কবিতাটিতে তিনি বাঙলাদেশের রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী-পূজার কাহিনীকে আধুনিক কবি-কল্পনা ও কাব্য-কলায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী-সাহিত্যে কবিতাটির প্রসিদ্ধি আছে। অবশ্য হিন্দী-সাহিত্যে রামচন্দ্রের দেবী-পূজার কথা

[৫] আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ভারতীয় সাহিত্য' পত্রিকায় (জুলাই, ১৯৫৭) ডক্টর সত্যেন্দ্র লিখিত 'ব্রজলোক সাহিত্য মেঁ রামকথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
[৬] শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর 'অনামিকা'-শীর্ষক কবিতা-গ্রন্থে সঙ্কলিত।

'নিরালা' কবির পূর্বেই দেখিতে পাই। ঊনবিংশ শতকের কবি বালমুকুন্দ গুপ্ত তাঁহার 'শারদীয়া পূজা' কবিতায় বলিয়াছেন—

ত্রেতা জাকে পদ পূজিকৈ রামচন্দ্র কীরতি লঈ।
সীতা পাঈ রাবণ হত্যো, লঙ্ক বিভীষণ কহ° দঈ॥[৭]

রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে দেবী-পূজার কথা পাই 'কালিকা-পুরাণ', 'দেবী-ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে'। এই উপ-পুরাণগুলি পূর্ব-ভারতেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।[৮] 'কালিকা-পুরাণ' ও 'দেবী-ভাগবত' (বর্তমানে প্রচলিত দেবী-ভাগবতের কিছু কিছু অংশ অতিশয় অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়) দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময় রচিত বলিয়া মনে করি। 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' হয়ত আরও অর্বাচীন। মনে হয়, বাঙলাদেশে যখন বিপুল অনুষ্ঠানের সহিত দুর্গাপূজার প্রচলন হয় তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী পূজারই সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল; শারদীয়া পূজাও ছিল, কিন্তু তাহার প্রসিদ্ধি সম্ভবতঃ কম ছিল। তাই শারদীয়া পূজাকে দেবীর অকাল-বোধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আমরা সেই কথাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু দেবীর অকাল-বোধন করাইতে হইলে—অর্থাৎ দেবীপূজার মাহাত্ম্য এবং সমারোহকে বাসন্তী পূজা হইতে শারদীয়া পূজায় সরাইয়া লইতে হইলে তাহার যথেষ্ট যৌক্তিকতার প্রয়োজন; সেই যৌক্তিকতার প্রয়োজনেই রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল-বোধনের নজিরকে বিস্তার করিয়া লইতে হইয়াছে। এই নজিরের ইঙ্গিত 'কালিকা-পুরাণ', 'দেবী-ভাগবত' প্রভৃতির রচনাকারগণ কোথায় পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রাবণ রাক্ষস, সে অনার্য; দেবীকে আমরা পূর্বে বহুস্থলে অনার্য-সেবিত বলিয়া দেখিয়া আসিয়াছি; সেই কারণেই কি আস্তে আস্তে পূর্ব-ভারতে রাবণ দেবীর আশ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল? রাবণ দেবীর আশ্রিত হইলে রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রের দেবী-পূজার কথা অতি স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিল। 'কালিকা-পুরাণে' স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে—

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥—৬০।২৬

এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণও পাইতেছি; কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কথায়,—"(কবি) পূর্বাপর সংগতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্তিকী পূর্ণিমায়

[৭] গুপ্ত নিবন্ধাবলী, ১ ভাগ, গুপ্ত-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, কলিকাতা।

[৮] 'দেবী-ভাগবত' কাশীপ্রবাসী কোনও বাঙালী ব্রাহ্মণের দ্বারা লিখিত বলিয়া ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। *The Journal of Oriental Research*, Madras পত্রিকায় (Vol. XXI, Parts I—IV) 'The Devi-Bhagavata' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সুগ্রীব ভল্লুক ও বানরগণকে আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লংকায় প্রবেশ করিলেন। সেদিন হইতে রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবীর অনুগ্রহ লাভার্থ আর্দ্রা নক্ষত্র সংযুক্ত কৃষ্ণ নবমীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন করিলেন।"[১] আবার এই পুরাণেই দেখিতেছি—

ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রৌ নবম্যাং রাবণং ততঃ।
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী॥—৬০।৩০

'দেবী-ভাগবতে' শরৎকালে ও বসন্তকালে দেবী-পূজা-বিধির অত্যন্ত লৌকিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। রচনাকার-মতে এই দুই ঋতুই হইল যমদংষ্ট্রাখ্য; কারণ এই দুই ঋতুই মহাঘোর ঋতু, অত্যন্ত রোগকর—উভয়ই জননাশকর।—

দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্।
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ॥—৩।২৬।৬

এইজন্যই রোগবিঘ্ননাশের জন্য 'তস্মাত্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ'। এখানে বোঝা যাইতেছে যে উপ-পুরাণকার আশ্বিন এবং চৈত্রে দুই ঋতুতেই দেবীর পূজার কথা দেখিতে পাইয়াছেন, কারণ-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না, তাই লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার পরে শারদীয়া পূজারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শারদীয়া পূজার সহিত রামচন্দ্রের দেবী-পূজার কাহিনী যুক্ত করিয়া দিলেন। এখানে কিন্তু রামচন্দ্রকে দেবী-পূজার পরামর্শ দিতেছেন ব্রহ্মা নন, নারদ ঋষি। রাবণ বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারের উপায় রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে নারদ মুনি বলিয়াছেন—

উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য বধস্য রাঘব।
ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্বসিদ্ধিকরং রাম জপহোমবিধানতঃ॥—৩।৩০।১৮-১৯

নারদই দেবী-পূজার সব বিধান বলিয়া দিলেন। পূজা শেষ করিয়া দশমী দিনে রামচন্দ্র বিজয়ের জন্য প্রয়াণ করিলেন, সেইজন্যই দশমী বিজয়া।

রামায়ণ-কাহিনীর সহিত মাতৃপূজা যুক্ত করিয়া লইবার এই চেষ্টার প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। অভিনন্দ কবি বাঙলা-দেশেরই কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশেষ কাব্য-শৈলীর জন্য তিনি বহুবিদিত। তিনি খ্রীস্টীয় দশম শতকের কবি ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত 'রাম-চরিত' কাব্যের ষোড়শ সর্গে দেখিতে পাই হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনকালে 'সরমা'-

[১] পূজা-পর্বণ, পৃ. ১৫৮।

নামক যে দেবী হনুমানের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন স্বয়ং 'মহাদেবী'। হনুমান্ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্ট উত্তর করিয়াছিলেন,—

শক্তিরস্মি জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়প্রতিপক্ষম্।
উদ্ধরামি চ ভবার্ণবমগ্নানীক্ষিতেন পশুকানুপসন্নান্॥—১৬।৪৮

তখন দেখিতেছি হনুমান্ সরমাকেই আদিশক্তি মহাদেবী বলিয়া দীর্ঘস্তব করিতেছে। সেই দীর্ঘস্তবের কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি।

ওঁ নমোঽচ্যুতবিরিঞ্চিবিডৌজস্ত্র্যম্বকাদিসুরসংঘনতায়ৈ।
তুভ্যমদ্ভুতবপুগ্রহলীলাক্লিন্নবিশ্বজনঘোরভয়ায়ৈ॥
সর্বধর্মময়ি সর্বনমস্যে সর্বশক্তিসমবায়িশরীরে।
সর্বতোমিমুখি সর্বশরণ্যে সর্বভূতপতিপত্নি নমস্তে॥
দুষ্টদৈত্যকুলমারি নমস্তে যোগবিভ্রমকুমারি নমস্তে।
চাটুকারিমদনারি নমস্তে বিষ্টপৈকবরনারি নমস্তে॥
ত্বাং জগন্মতমহাং মহয়ামি ত্বাং জগৎকৃতমহাবলিমীড়ে।
ত্বাং জগৎপ্রসবিনীং প্রণমামি ত্বাং জগৎক্ষয়করীমুপতিষ্ঠে॥
ব্রাহ্মি বৈশ্রবিণি বৈষ্ণবি রৌদ্রি স্কান্দি চান্দ্রমসি চণ্ডি নমস্তে।
কস্তব প্রতিবিশেষমবৈতি স্তৃয়সেঽত্র বরদেতি ন কেন॥
ত্বং সৃজস্যবসি সংহরসি ত্বং ত্বং বিভর্ষি ভুবনানি ভবানি।
ত্বং নিমীলয়সি বোধয়সি ত্বং ত্বং বিচিত্রগতিরীশিতুরিচ্ছা॥—১৬।৫৭-৬২

হনুমানের সহসা পথরোধকারিণী সরমাকে এমন করিয়া স্তব করিবার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য আর কিছুই নহে, বাঙালী কবি যতই রাম-কাহিনী রচনা করুন, কোনও একটি ব্যপদেশে একটি দেবীস্তব জুড়িয়া দিবার জন্য যেন তাঁহার সমগ্র দেহমন উৎসুক হইয়াছিল; সরমাকে যখন দেবগণই পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন তিনি যেমনতরই হোন দেবী বটেন,—অতএব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে প্রাপ্ত দেবীস্তবের অনুরূপ একটি দেবীস্তব কবি জুড়িয়া দিয়াছেন।

আমরা এইসব তথ্যের সাহায্যে যে কথাটি বলিতে চাই তাহা হইল এই যে, শাক্তভাব-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাম-কাহিনীর সহিত দেবীকে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা এই দশম শতক হইতেই দেখিতে পাইতেছি; সেই চেষ্টারই প্রমাণ দেখিতেছি দশম শতকের পরবর্তী কালে রচিত উপ-পুরাণগুলির মধ্যেও। কৃত্তিবাস কবি অতি স্বাভাবিকভাবেই সেই ঐতিহ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার কাহিনীর বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এইসব কারণেই এই অংশটিকে আমাদের পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয় না। দেবীর অনুগ্রহেই যে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়াছিলেন একথা চণ্ডীমঙ্গলের

প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরামেরও জানা ছিল।[১০] দেবদেবীর ভক্তগণের ভিতরকার সংগ্রাম যে দেবদেবীর সংগ্রামেই গিয়া পর্যবসিত হইত তাহার দৃষ্টান্ত বাঙলা-সাহিত্যে অনেক আছে। মনসা-মঙ্গলের চাঁদসদাগর হর-উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী সনকা দেবী-উপাসিকা ছিলেন; চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর হর-ভক্ত এবং খুল্লনা দেবী-উপাসিকা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলের লাউসেন ও ইছাই ঘোষ। লাউসেন ধর্ম-ঠাকুরের আশ্রিত, ইছাই ঘোষ দেবীর আশ্রিত। দেবী-আশ্রয়চ্যুত করিয়া ইছাই ঘোষকে লাউসেনের দ্বারা পরাস্ত করাইতে ধর্ম-ঠাকুরকে পরামর্শদাতা উলুকের বুদ্ধিতে এবং বহুশক্তিমান্ হনুমানের সক্রিয় সাহায্যে বহু ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে!

দেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহই যে রাবণ-বধের মুখ্য কারণ, রামচন্দ্র দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াই যে রাবণ-বধে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বা প্রবাদ বাঙলাদেশে যে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে রচিত পাঁচালীওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের গানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেবীর মহিমা প্রচারের প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক কবিই করিয়াছেন। রঘুনাথ দাসের (অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক্) কবিগানে দেখি—

তোমার অপার লীলে,
আবার শুনি সীতা উদ্ধারিতে, অভয় দিয়ে অকালেতে,
লঙ্কাপুরে রঘুনাথে, আপনি সদয় হোলে॥[১১]

নীলমণি পাটুনী (অষ্টাদশ শতক) বলিয়াছেন—

তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে,
অতি যত্নে যত্ন কোরে
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।[১২]

এণ্টনী ফিরিঙ্গি পর্যন্ত গাহিয়াছেন—

মা রাবণ রাজা অন্তিমকালে রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা বলে ডেকেছিল বদনে,
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে,
তার দুঃখ ভাবলি নে,

[১০] লঙ্কার রাবণ রাজা, করিত আমার পূজা,
তার তুমি বিপদের মূল।
হইয়া রামের পক্ষ, বধিলে সেবক মুখ্য,
হৃদয়ে রহিল বড় শূল॥
—ধনপতি সদাগর পালা

[১১] প্রাচীন কবিওয়ালার গান—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।

[১২] ঐ।

তারে ধ্বংস করে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখলি নে।[১৩]

রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবীপূজার উল্লেখও বহু ভাবে পাই। পরাণচন্দ্রের একটি সুন্দর গানে দেখিতে পাই—

শ্রীরাম যেমন যুদ্ধকালে, পূজেছেন নীলপদ্ম ফুলে,
শ্রদ্ধা করে মা,
দিতে সেই নীলপদ্ম আমার সাধ্য নাই শ্যামা,
দেহে আছে পদ্মবন, তাতে করি পদ্মাসন,
হৃৎপদ্মে মা পূজে চরণ, মনের মানস পুরাব।[১৪]

রামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরতীরে বসিয়াই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এই মতও বাঙলাদেশে চলিত ছিল এবং আছে। কবিওয়ালা রাজারাম বলিয়াছেন—

শরৎকালেতে ওমা ভবানী আপনি হলে দশভুজা।
সেই সাগর পারে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা॥[১৫]

সারদা ভাণ্ডারী আবার বলিয়াছেন যে সেতুবন্ধে দেবী রাম কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবী 'সেতুবন্ধে রামেশ্বরী' নামে খ্যাতা।[১৬]

হিন্দী লোকগীতেও এই-জাতীয় কিংবদন্তী চলিত আছে; যেমন—

আনন্দী জগবন্দী কাট জগ কী ফন্দী,
নাম জপো—ভক্তি করো।

[১৩] প্রাচীন কবিওয়ালার গান—প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)।

[১৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, পৃ. ২৭৫। তুলনীয়—

ঠেকে রাবণ বধে
রঘুপতি করলে তোমার পূজা,
হ্যাদে গো দীনদয়াময়ি,
করলে তোমার পূজা শতাষ্ট নীলপদ্ম তুলে,
মা তোমাকে পূজা দিলে,
সেই দিন রামকে দেখা দিলে
হয়ে আপনি দশভুজা।

—বাইচরণ মাল,
প্রাচীন কবিওয়ালার গান।

[১৫] প্রাচীন কবিওয়ালার গান।

[১৬] প্রাচীন কবিওয়ালার গান।

নাম কী মহিমা যহ হৈ তুম্‌হারে,
লিখ লিখ নাম পাকর সাগর ডালে,
জলকে উপর পত্থর ধরো।
ভক্তি করো॥[১৭]

কৃত্তিবাস-বর্ণিত দেবীর প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা জানি, বহু পুরাণ-উপপুরাণে হিমাচল-সুতা পার্বতীর মূল রূপ কৃষ্ণবর্ণা কালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ কালী-প্রাধান্যের দেশ, এখানে এই মতটি ক্রমান্বয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনায়ও এই সত্যের সমর্থন পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখিতে পাই রাবণ সংকটে পড়িয়া যে অভয়া অম্বিকার শরণ লইয়াছিল সেই দেবীও কৃষ্ণবর্ণা কালী বা শ্যামবর্ণা শ্যামা। রাবণ শঙ্করী অম্বিকার স্তব করিল, ফলে দেখিলাম—

অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ঘটায় ঘন তিমিরনাশন॥
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামারূপে নীলসৌদামিনী বেশ॥

অন্যত্র রামচন্দ্র বলিতেছেন—

কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণ আজি হর-বরাঙ্গনে॥
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥

রামচন্দ্র অকাল-বোধন করিয়া তিন দিন ধরিয়া যে দেবীর পূজা করিলেন তিনি কালী দেবী। দেবী যখন নীলোৎপলের একটি হরণ করিয়াছিলেন তখন হনুমানকে স্পষ্টই বলিতে দেখি—

হেন লয় চিতে তোমারে হেরিতে
পঙ্কজ হরিলা কালী॥

দেবী নীলোৎপলবর্ণাভা বলিয়াই কি রামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলোৎপলের দ্বারা পূজা করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

[১৭] ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ।

সপ্তম অধ্যায়

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী

পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি বিশেষরূপে বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই বাঙলার মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ্; কারণ, আমাদের মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহিত্য রহিয়াছে তাহা অল্পবিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র বাঙলা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলি সংস্কৃত-পুরাণ হইতে অনেকাংশে পৃথক্ হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্যও স্পষ্ট লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখি, পুরাণগুলিতে বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষুদ্রাঞ্চলে বৃহদঞ্চলে প্রচলিত খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীকে নানা কাহিনী বা দার্শনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা এবং দার্শনিক-শক্তিতত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা এক মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সব দেবীই যে এক আদিশক্তিরই দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকারগণের সকল কাহিনী ও তত্ত্বব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই সত্যটিরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দেখিলাম পুরাণগুলির মধ্যে বাঙলাভাষায় তাহারই একটি নূতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে।

ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে অতি স্বাভাবিকভাবেই সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল। ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দেখিতে পাইলাম আবার অন্যভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। ভাষাসাহিত্য যখন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল তখন তাহার রচয়িতা, শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্য হইতে। সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেব-দেবীকে অবলম্বন করিয়া আঞ্চলিক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহিনী

গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে-সকল দেবী আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে—প্রথমতঃ, উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া। ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ বিশেষ দেবীর নিজস্ব শক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাঁহার সহিত এই দেবীগণের অভিন্নতা সম্পাদন করিয়া। এই দুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি মঙ্গল-কাব্যগুলিতে। সেখানে বিবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর অবাধ অনুগ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবমহিমা তো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেই, পরন্তু দেবী যে শেষ পর্যন্ত আদিশক্তি মহাদেবীরই বিশেষ মূর্তিমাত্র, অতএব আদিশক্তি মহাদেবীর সহিত একান্তভাবে অভিন্না. এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কি করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আদিদেবী সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আদি-শক্তিরূপে মহাদেবী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী চণ্ডিকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরূপে সর্বকোটিতে এবং সর্ব-অঞ্চলে স্বীকৃতা ছিলেন; তাই তিনিই মহাদেবী—তাঁহার সহিত অন্য সব দেবীকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা। মনসা-মঙ্গলের 'মনসা' দেবী যে কোনও প্রাচীন বহুপ্রচারিতা পৌরাণিক দেবী নহেন একথা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; সর্পদেবীরূপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধা একজন লৌকিক দেবী। মনসা-মঙ্গলে তাঁহার কত মহিমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, দেবী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে[১] দেখি, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পুত্র জিয়াইয়া এবং চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করিয়া চম্পক-নগরীতে ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাঁদ সদাগরকে একবার মাত্র মনসাকে পূজা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও চাঁদ সদাগর বলিয়াছিল—

> ধনে জনে কার্য নাই যাউক আর বার।
> পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার॥

বেগতিক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডীর নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে

[১] প্যারীমোহন দাশগুপ্তের সংস্করণ।

ডাকিয়া দৈববাণী করিতে হইল--

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর॥
... ...
যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি॥

এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বুদ্ধি আসিল এবং সদাগর মনসাপূজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমদিকে একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া পদ্মবনে শিব-দুহিতা মনসার প্রতি চণ্ডীর বিমাতা-জনোচিত যে অশেষ দুর্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা সর্পদেবী মনসার চণ্ডীকে দংশনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী এই 'ঐক্যে'র কোনও সংগতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য কোন সংগতিজাত নহে, আদিশক্তির একত্ব সম্বন্ধে একটি দৃঢ়সংস্কারজাত। এই কারণেই দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর যখন মনসার পূজা অন্তে মনসার স্তুতি করিতেছে তখন বলিতেছে—

নমোনমঃ জগৎমাতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী॥
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণী॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও[১] দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার স্তবে বলিতেছে—

আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িনী
জগতপূজিতা তুমি জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিবে তব মায়া॥

কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে মনসার কেতকবনে শিববীর্যে জন্ম; শিব-কন্যার সম্বন্ধে 'হর মহেশের মন' বলা সংগত নহে। কিন্তু সেই শিব-দুহিতা পরিচয় কি শুধু চাঁদ সদাগর ভুলিয়াছে? দেবী নিজেও ভুলিয়াছেন। নিজের পরিচয় দিয়া তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন—

আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা॥

[১] শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

শুধু মনসাই যে মূল শক্তিরূপা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে শক্তিরূপা—সুতরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলে মহেশ্বরী। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠী-মঙ্গলে'[৩] দেখিতে পাই, আসলে ষষ্ঠীও দুর্গা; দুর্গা ষষ্ঠীরই নামভেদ মাত্র—

দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥

ঐ কবিরচিত 'শীতলা-মঙ্গলে'[৪]ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দেখিতে পাইতেছি। সেই স্তবে দেখি—

দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে।
... ...
মস্তকমালিনী মুকুটধারিণী
মহিষমুণ্ডনাশিনী।
... ...
বিধিবিষ্ণু মায়া বিধি-বিষ্ণুপ্রিয়া
বরণমই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনী শূলিনী সংকর গৃহিণী
শৈলসুতা শিবদাতা॥

কবি কৃষ্ণরাম-রচিত 'কমলা-মঙ্গলে'র প্রারম্ভে দেখিতে পাই, কমলা ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী দেবী। দক্ষিণা রায়কেই আমরা ব্যাঘ্রের দেবতা জানি; কমলা লক্ষ্মী-রূপেই কি করিয়া ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী হইলেন বোঝা যায় না।[৫] কিন্তু বিপন্ন 'সাধু' কর্তৃক এই কমলার বর্ণনায়ও দেখি—

সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত।
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত॥

[৩] ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

[৪] ঐ।

[৫] এ-বিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছি, চৈত্র-সংক্রান্তির কিছু দিন পূর্বে গ্রামের লোক (সাধারণতঃ নিম্নজাতির) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাত্রিতে ভিক্ষায় বাহির হয়। এই ভিক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর ভিখ'; 'ঠাকুর কুলাই ভো' বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধ্বনি করা হয়। এই গানের প্রথম ছড়াটি হইল—'আইলাম লো স্মরণে। লক্ষ্মীদেবীর বরণে॥ লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর। ধানে চাউলে ভরুক ঘর॥' ইত্যাদি। পৌষে ফসল ঘরে তুলিবার পরে ইহা শস্যদেবী লক্ষ্মীর গান সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মী-বন্দনার পরই দেখিতে পাইতাম 'বারো বাঘের লেখাপড়ি', অর্থাৎ বারো রকমের বাঘের উল্লেখ করিয়া ছড়ায় তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা। পৌষের শীতের সময়েই সর্বত্র বাঘের ভয় দেখিতাম, এই সময়েই বাঘ বন ছাড়িয়া শিকারলোভে লোকালয়ে ঢুকিয়া পড়িত। শস্যরূপিণী লক্ষ্মী বা কমলার সহিত এইভাবেই কি ব্যাঘ্রের সম্পর্ক দেখা দিয়াছে?

সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা॥

রাজাও কমলার স্তব করিয়া বলিলেন—

জগত জননী তুমি সনাতনী একা।
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা॥
সকল তোমার মায়া আর কার নয়।
প্রতিজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয়॥
... ...
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে॥

অন্যত্রও দেখি—

কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া।
যত দেখি সকলি ঐ জননীর মায়া॥
... ...
পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা॥
... ...
নীলায় (লীলায়) অসুরকুল বধিয়ে প্রবল।
তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল॥

এই কমলা-দেবীর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল তখন—

এক শত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ভরি ভকতি করিল॥

সুতরাং লক্ষ্মী হইলেও তিনি চণ্ডী-চামুণ্ডার সহিত ঐক্যে রক্তলোলুপা।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়া পাইতেছি চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে। চণ্ডী-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতেছি তাঁহার সাধারণ নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা। এই মঙ্গল-চণ্ডিকা যে মূলে পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্না নন, ইনি যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক দেবী একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।[৬] মঙ্গল-চণ্ডিকার পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্নতালাভের ইতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মূলে দেবীর নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা ছিল না বলিয়াই মনে হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঙ্গলা, বা সর্বমঙ্গলা বা অষ্টমঙ্গলা; উপ-পুরাণগুলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণ্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক

[৬] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস।

চণ্ডিকা দেবীও বহু স্থলে মঙ্গলময়ী বলিয়া কীর্তিতা; মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাকে আমরা 'সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে' ও 'শিবে' বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখি; মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার 'শিবা' বর্ণনা বহুবার দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ অর্গলা-স্তোত্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঙ্গলা' বলা হইয়াছে। দেবীর 'মঙ্গলা' বা 'শিবা' নাম বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী একজন স্থানীয় লৌকিক দেবী। দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভৃতিতে মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ-উপপুরাণকারগণ দেবীর 'মঙ্গলা' নামের এতখানি প্রসিদ্ধির কারণ-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মঙ্গলকারিণী বলিয়া 'মঙ্গলা' এই সাধারণ এবং সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপতি, মঙ্গলাকাঙ্খী নরগণ—সর্ববিধ মঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ[৭] এবং দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দেখিতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা' নাম দেখিয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল-নামযুক্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ দেখান হইয়াছে।

আসলে 'মঙ্গলা' দেবী হইলেন বাঙলাদেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী। পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহু দেবী ছিলেন এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঙ্গলা, পিঙ্গলা ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধি ও সঙ্কটা এই অষ্ট দেবীকে অষ্টযোগিনী বলা হইয়াছে।[৮] ইহার মধ্যে ভ্রামরীর মহাদেবীত্ব তো চণ্ডী-সপ্তসতীতেই স্বীকৃত। মঙ্গলার ব্রত এবং সঙ্কটার ব্রত এখন পর্যন্ত হিন্দু-নারীদের মধ্যে প্রচলিত। প্রতি মঙ্গলবারে উপবাস করিয়া মঙ্গলার ব্রত করিতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস করিয়াই এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই-সকল দেবীর কোনও পূজার প্রচলন নাই—মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্যা। এই-সকল দেবীকে যোগিনী বলিবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদিগকে রমণীগণের ব্রতে বা অন্যভাবে আরাধিতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেবী দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত অভিন্নত্বের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তুত হন নাই, তাই ইঁহাদিগকে যোগিনী-জাতিভুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ও দেবী-ভাগবতে 'যোষিতামিষ্টদেবতা' বলিয়া বর্ণনা

৭ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, ৯।৪৭ অধ্যায়; দেবী-পুরাণ, ৪৫ ও ৫০।

৮ মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।
উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥—শব্দকল্পদ্রুম।

করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন।[৯] এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই আসল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের ভিতরে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র[১০] মধ্যে এবং দ্বিজ রামদেব-বিরচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র[১১] মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী দেখিতে পাই। কিছু কিছু পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যেই মঙ্গল-দৈত্যের উল্লেখ রহিয়াছে এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পুরাণ-উপপুরাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই পূর্ববঙ্গের এই কবিদ্বয় মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্যবধের কাহিনী-রচনায় কোনও অসুবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত করিবেই; নির্যাতিত দেবগণ শেষ অবধি অগতির গতি সর্বশক্তিময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ করিবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ করিয়া অসহায় দেবগণকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছেই, অতএব দেবগণের শরণমাত্র দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ করিলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী-রচনায় দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের মধ্যে ঐকমত্য রহিয়াছে। মুকুন্দরামের মধ্যে এই কাহিনী নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি যে ওড়িষ্যার শাক্ত কবি সারলা দাস তাঁহার বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পুরাণ কাব্যে বহুভাবে সর্বমঙ্গলার উল্লেখ করিয়াছেন; সর্বমঙ্গলারূপেই যেন দেবীর প্রধান পরিচয়। কিন্তু এই সর্বমঙ্গলা যে মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পুরাণের একটি কাহিনীতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'চণ্ডী-পুরাণে'র শেষে দেখিতে পাই যে মহিষাসুরকে যখন দেবী কিছুতেই বধ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন দুর্গার সহচারিণী মনোরমা দুর্গা দেবীকে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই উপদেশে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিয়া দুর্গা মহিষাসুর নিধন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। দুর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারিণী দেব-মনুষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকারিণী বলিয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা বলিলেন—

সমস্ত সুলভ হেব তোর পরসাদে।
সর্বমঙ্গলা নাঅ তোহর হেউ হাদে॥

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দেখিতে পাই— একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার

[৯] বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ. ৩৪৭-৪৮।
[১০] শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
[১১] ডক্টর আশুতোষ দাস সম্পাদিত।

মধ্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলেই আমরা যোষিৎগণ-সেবিতা সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলাদেবীর স্বরূপের অনেকখানি সন্ধান পাইব।

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসাময়িক দুই জন কবি দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মুকুন্দরাম মাণিক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলের যে সংস্করণটি মুদ্রিত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে দেখিতে পাই, সপত্নী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিতা হইয়া ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল। একটি ছাগল দেবীর চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ত্রাসযুক্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দেবীর লীলাসহচরী ছিলেন পদ্মা। বাঙলার সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই; ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বিপদে পরামর্শদাত্রী এবং পূজাপ্রচারের সহায়-কারিণী। চণ্ডী-মঙ্গলগুলিতে চণ্ডীর সহচরী দেখিতে পাই পদ্মা; মনসা-মঙ্গলগুলিতে মনসার সহচরী দেখি নেতা ধোপানী; কমলা-মঙ্গলে কমলার সহচরী নীলাবতী; সহজিয়া-বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'নিত্যা'র সহচরী (বা ডাকিনী) বাসুলী; ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সহচর এবং বুদ্ধিদাতা হইলেন উলুক। যাহা হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধ্বনি (হুলুধ্বনি?) দিয়া দেবীর ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল ঐ দিকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দেখিল পঞ্চকন্যা (পদ্মাসহ?) সেই বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিতেছে। পঞ্চকন্যার মুখপাত্র পদ্মা খুলনাকে ভরসা দিল, বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিলে সে তাহার হারানো ছাগল খুঁজিয়া পাইবে। খুলনা তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া পদ্মাকথিত বিধানে দেবীর পূজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ করিল। বনমধ্যে বসিয়া পঞ্চকন্যার কথিত-বিধানে যে দেবীর পূজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চা নয়—ইহা মেয়েলি ব্রত বলিয়াই মনে হয়। বাড়িতে বসিয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক ধনপতি সদাগর লাথি মারিয়া সেই মেয়েলি দেবতার ঘট ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল।[১২]

মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা যে মূলে মেয়েলি ব্রত মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে সে কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম-রচিত ধনপতি সদাগরের

[১২] লক্ষ্য করিতে হইবে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকাও এমনই লুকাইয়া ঘটে মনসার পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাথি মারিয়া সেই ঘট ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে দেবীর রোষে ধনপতি সদাগরের যে দশা হইয়াছিল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াছিল।

উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে স্পষ্টোক্তি—

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চন্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি॥[১০]

স্ত্রীলোক-কর্তৃক পূজা-প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকী রত্নমালাকে তালভঙ্গ-দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মর্ত্যে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন তখন রত্নমালাও স্পষ্ট বলিল—

ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনী-মন্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রতের বিধান॥

বনে খুল্লনার (মুকুন্দরাম খুল্লনা নামই ব্যবহার করিয়াছেন) ছাগল হারাইবার উপাখ্যানে মুকুন্দরামের বর্ণনায় দেখি বনে ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত হইয়া খুল্লনা তরুতলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে. দেবী স্বপ্নে খুল্লনাকে ছাগল ফিরিয়া পাইবার জন্য দেবীর ব্রত করিবার উপদেশ দিলেন। তখন—

এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥

ব্রতকারিণী দেবকন্যাগণ খুল্লনার নিকটে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—

আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভগিনী।
করিতে চন্ডীর ব্রত আইলাম অবনী॥

... ...

পূজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গলবাসরে।
বিপদ্-সাগরে চন্ডী হইবে কান্ডারে॥

... ...

এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পতি।
পতির প্রেমেতে তুমি হবে পুত্রবতী॥
লহনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান।
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥

[১০] বঙ্গবাসী সংস্করণ।

দেবী স্বয়ং খুল্লনাকে বলিয়াছেন—

অষ্টতণ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥

এইখানেই 'মঙ্গলা' পূজার স্বরূপপ্রকাশ, অষ্টতণ্ডুল দূর্বা দিয়া মঙ্গলবারে মেয়েরা মিলিয়া হুলুধ্বনি-সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই অষ্টধান্যদূর্বার 'মঙ্গলা' দেবীই 'অষ্টমঙ্গলা'; অষ্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন তাঁহারাই আট দিন ধরিয়া গাহিবার মত পালা রচনা করিয়াছেন। দিনে (দুই বেলায়) দুইটি করিয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলটি পালায় সব গান বিভক্ত। দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥

দেখা যাইতেছে যে খুল্লনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিয়া ব্রত শিখিয়া আসিল। ঘরে বসিয়া প্রতি মঙ্গলবারে সে গোপনে এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপতি সদাগর বাড়ি ফিরিয়া আসিলে খুল্লনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করিবার মানসে সপত্নী লহনা সাধুকে গোপনে গিয়া বলিয়াছিল—

সদাগর, তোমায় আমায় আছে কিছু বিরল কথা।
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥
হেম ঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্বা
অষ্ট শালিতণ্ডুল অন্তরে।
মস্তকে চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী গুয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥
আমান্ন নৈবেদ্য দধি ফল পুষ্প নানাবিধি
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা।
দিয়া জয় শঙ্খধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
বন্ধুজনে করে কাণাঘুণা॥

বাঙলাদেশের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে এইসব সদাগর বণিক্-সম্প্রদায়ই সমাজপতি ছিলেন। আর ইঁহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন শূলপাণিকে ছাড়িয়া 'লঘুজাতি কানি'—অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূতা ঐ মনসা দেবীকে কিছুতেই পূজা করিতে চাহেন নাই, ধনপতি সদাগরও তেমনই সিংহলের বন্দীশালায় বসিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥

এই সমাজপতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি ব্রতের দেবী সর্বমঙ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত এক এবং অভিন্না হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মেয়েলি 'মঙ্গলা'-দেবী চণ্ডিকার সহিত অভিন্না হইয়াই নাম গ্রহণ করিলেন 'মঙ্গল-চণ্ডিকা'। তৎকালীন সমাজধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি লৌকিক ধর্মের যে ক্রমপ্রাধান্যলাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মঙ্গলকাব্যের এই কাহিনীর মধ্যে নিহিত।

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী হইল কালকেতু ব্যাধের কাহিনী। আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাহিনী বলিতেছি; চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর মধ্যে আবার দেখিতেছি, ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বাঙলাদেশের অতি মিশ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-জাতীয় আদিম জাতিগুলির প্রচলিত দেবীগণও কি করিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়া উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া চণ্ডীদেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে লিখিত পুরাণগুলির মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ-জাতির মধ্যে প্রচলিতা দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস আসলে বাঙলাদেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ়-অঞ্চল আজিও বহু প্রকারের আদিম-অধিবাসি-অধ্যুষিত। এই আদিম অধিবাসিগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চ-কোটি হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতিলাভের ভিতর দিয়াই আদিম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীগণও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনুচারী ধর্মবিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ়-অঞ্চলে একটি পশু-হিংসক অতি নীচজাতির লোক; পুরুষানুক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া তীর-ধনুক-পরশু দ্বারা পশু শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, চামড়া, নখ-দন্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী করিত। এই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাকিবারই কথা; কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম—তাহার অমিত দেহশক্তি তাহাকে প্রচুর ধনের বর দান করিল। ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বসিল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, 'শিয়রে কলিঙ্গ-

রাজা বড়ই দুর্বার' (মুকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন—

পশু বধি ভ্রমে বন   অকস্মাৎ পাইয়া ধন
গুজরাট হৈল হেমময়।—দ্বিজ রামদেব

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান ব্যাধসর্দার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পারিলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনহেতু এই-যে সমাজ-পরিবর্তন ইহাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতেই হইবে; তাই কালকেতুকে নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং লাঞ্ছিত করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনি-বনা করিয়া লইতেই হইল।

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই; প্রথমে সে বন কাটিয়া পত্তন করিল যেই নগরের বর্ণহিন্দুসমাজ সেই নগরের অধিবাসী হইতে স্বীকার করে নাই। তখন তাই মন্ডলের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাকে 'কানে দিব কনক-কুন্ডল'—এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার লোভ—

আমার নগরে বৈস   যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা   কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
নাহিক বাউড়ি দেড়ি   রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ি   নানা বাবে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে॥[১৪]

এদিকে কলিঙ্গ-রাজ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল; সেই সুযোগে বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের পত্তন হইয়া গেল।

চন্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং 'পিয়রে'র কলিঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সহিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুজরাট-দেশ বা কলিঙ্গ-দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অঞ্চলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অঞ্চলের কয়েকটি বন্য অঞ্চলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য কবিগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুজরাট, কলিঙ্গ প্রভৃতি গালভরা নাম

[১৪] মুকুন্দরাম, কালকেতু-উপাখ্যান, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

দিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে কলিঙ্গরাজ কংস-নদীর তীরে দেবীর 'দেহারা' তুলিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ রামদেব কংস-নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়া ইহাকে 'কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস-নদীর তীরেই কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সুতরাং কলিঙ্গ-রাজ্য কংস-নদীর অঞ্চলভূমি বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি, এই কংস-নদীর তীরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন দিয়া পশুগণের (বন্য অধিবাসিগণের?) পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম বলিয়াছেন, 'বিজুবনে' পশুগণ দেবীর পূজা দিয়াছিল; এই বিজুবনও কংস-নদীর তীরে। কালকেতু যে গুজরাট-নগর পত্তন করিলেন তাহা কলিঙ্গ-রাজ্য হইতে অতিশয় দূরবর্তী নহে, কারণ, 'শিয়রে কলিঙ্গরাজ'। গুজরাট রাঢ়েরই একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট বন' (মুকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের 'বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া' (মাধব) নূতন নূতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর পত্তন হইল তখন 'ইঁদিলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' (মাধব); কালকেতু 'চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় করিল চারিভিতে' (মাধব)। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের বর্ণনা পড়িলেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে কলিঙ্গদেশ বেশি দূরবর্তী নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যেদিন কালকেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই—

মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত।
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়ু মনে নাঞি হেলা।
চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচাকলা॥
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু করি পরিপাটি।
বাড়ীর বার্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি॥
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে।
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে॥
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে।
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপতির আগে॥—দ্বিজ মাধব

সকালবেলা পুকুর-জলে ডুবটি দিয়া কাঁচকলা-শাক প্রভৃতির ভেট লইয়া কালকেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড়ু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল; এই কলিঙ্গ-রাজ্যেরও দূরবর্তী কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা নহে; আর কাঁচকলা বাথুয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে

সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই—

দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়াকোশ বাট॥
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥

ভাঁড়ু দত্ত যখন কলিঙ্গরাজকে গিয়া কালকেতুর খবর সব পেঁছাইয়াছিল তখন সে বলিয়াছে—

দিন গোঁয়াও মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার॥
কাননে বাঁধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল ভ্রমিয়া দেশ দেখুক বীরের বেশ
কালকেতু রাজা গুজরাটে॥—মুকুন্দরাম

ইহা পড়িলে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গ-রাজেরই প্রজা; কলিঙ্গরাজেরই অধিকার-ভুক্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুক্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে 'রাতারাতি বড়লোক' হইয়া সে-যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-রাজা তাহা কিছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে—সমস্ত অঞ্চলটিই একটি বিরাট বন্য অঞ্চল. তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং শক্তিশালী হইয়া কোন্ বনে বড় বড় গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে, কেহ আসিয়া সংবাদ না দিলে কে তাহার সন্ধান রাখে?

আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কলিঙ্গ গুজরাট সব দেশই হইল রাঢ়ভূমির কংস-নদীর (বর্তমান কাঁসাই নদী) তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বনাঞ্চল। এই বিরাট বনভূমিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আদিম জাতির ভিতরকার বীরগণ প্রবল হইয়া উঠিয়া বন কাটিয়া নগর-পত্তন করিয়াছেন, ইহাই এই অঞ্চলের সাধারণ ইতিহাস। এই নগর-পত্তন-ব্যাপারে বর্ণহিন্দুগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সামন্ত-রাজগণ এবং আদিবাসিগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর দিয়াই ঐ অঞ্চলের মিশ্র সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন ও ধর্ম-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিঙ্গরাজ যে তৎকালীন বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ তাহার পরিচয় তাঁহার রাজসভার বর্ণনার ভিতরেই আছে। কালকেতুকে ধরিয়া আনিতে কলিঙ্গরাজ লোক-লস্কর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; 'দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ।' তখন—

বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল॥

বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত ঘটা।
পরিধান পীত-বাস ভাল-জুড়ি ফোঁটা॥—মুকুন্দরাম

ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত করিলে কলিঙ্গরাজ বলিয়াছিলেন—

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি॥
কোন্ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥—মুকুন্দরাম

ভাঁড়ু দত্তও আসিয়া কলিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যভিমান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা দেখি—

নিবেদহুঁ নরনাথ কর অবধান।
রাজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান॥
গোপতে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে।
ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছত্র ধরে শিরে॥—মাধব

এই বর্ণহিন্দু কলিঙ্গ-ভূপতির প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই-অঞ্চলে প্রসিদ্ধি ছিল, এবং কংস-নদীর তীরে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল বলিয়া মনে করি। বর্ণহিন্দু-পূজিতা বলিয়া দেবী পৌরাণিক চণ্ডিকা বলিয়াই প্রসিদ্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ-জাতির প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যেও তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি-লাভের সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিকভাবেই কতকটা প্রচারলাভ করিলেন। কালকেতুর গুজরাট-নগরে যে-সকল বর্ণহিন্দু বসতি স্থাপন করিল তাহাদিগকে এই বন্য ব্যাধ-পূজিতা বা বনের অধিবাসী 'পশু'গণ-কর্তৃক পূজিতা দেবীকেই দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। পশুগণ-পূজিতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই দেবী কে? সবগুলি চণ্ডী-মঙ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবী স্বর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা দিয়াছিলেন। ব্যাধ কালকেতু মৃগয়ার শিকার-রূপেই স্বর্ণ-গোধিকাকে গৃহে লইয়া আসিল; কালকেতুর অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণ-গোধিকা অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ গোধিকার সহিত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগুলির মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে গোধিকারূপে দেবীর কালকেতু ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপতি সদাগর-কর্তৃক

কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই।[১৫] কিন্তু এই শ্লোক হইতে যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপতি সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকটির উৎপত্তির সম্ভাবনা, এ-বিষয়ে আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবীর সহিত গোধিকার সম্পর্কের কথা অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কালিকা-পুরাণে ও বিশ্বসার-তন্ত্রে। "কালিকা-পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বলিদান করার উপদেশ পাওয়া যায়। বিশ্বসার-তন্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে গুহ্যকালী তুষ্টা হন।"[১৬] উক্তিগুলি কিঞ্চিৎ বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর দিয়া মোটামুটিভাবে দেবীর সহিত গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতেছি। এই গোধার সহিত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই মূর্তিগুলিব নিম্নদেশে একটি গোধামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কাছাকাছির বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই-জাতীয় একটি মূর্তি প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। প্রস্তরমূর্তির মধ্যে যেমন এই গোধা-সমন্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লিখিত কিছু কিছু প্রতিমা-নির্মাণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমন্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন মূর্তি-শিল্পেও গোধা-বাহনা গৌরীমূর্তি পাওয়া যায়। সেই দেবীর ধ্যান এইরূপ—"গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্।"[১৭]

গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প-সম্বন্ধে গ্রন্থ 'রূপ-মণ্ডন' হইতে যে 'প্রতিমা-লক্ষণ' উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়[১৮]—

গোধাসনা ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।

প্রতিমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়,—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা॥

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যুক্তা দেবীর প্রসঙ্গে

১৫ ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী (?)॥

১৬ শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা, পৃ. ২॥৶০।

১৭ B. C. Bhattacharya, *Jaina Iconography,* পৃ. ১৭২; শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বোক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

১৮ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩৫২।

শ্রীযুত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (totem) পূজা করিয়া থাকে।"[১১] এইখানেই সব জিনিসটির মূল-সত্যের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি। যে-সকল আদিম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্রমে ক্রমে নানা ভাবে গোধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে আর্য-অনার্য সব দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতি-গুলির দেবীই গোধাসনা গৌরীরূপে সংস্কৃত প্রতিমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন।

ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু-জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করি। যিনি এই জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই গোধাশ্রিতা; সেই গোধাশ্রিতা দেবীই কবি-কল্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ-গোধিকা মূর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকস্মিকভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, সে তাহার কায়িক পরিশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকিতে পারে। যেরূপেই হোক, অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য-প্রতিপত্তি-লাভ ঘটিলে তাহা যে কোনও দেবীর অনুগ্রহেই ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান কালেও প্রচুরভাবেই দেখিতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে নূতন করিয়া আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোনও দেবীর প্রতিষ্ঠার ও অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে তাঁহার পূজা-প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কালেও দেখিতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কলিঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত কংস-নদীর তীরবর্তী 'দেহরা'য় বর্ণহিন্দুগণ-স্বীকৃতা এবং পূজিতা চণ্ডিকাদেবী; কলিঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নীচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমন্বিত কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রিতা দেবী যে একই দেবী, সমাজে সেই যুগে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই স্বীকৃতির ইতিহাসই দেখি চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জীবনে কালকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রতিপত্তিতে এমনভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে তখন তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া বিরাট সমাজদেহের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল তখন তৎপূজিতা দেবীকেও সমাজে প্রচলিত মহাদেবীর সহিত অভিন্না বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। গোধা-কুলকেতুর আদিম-জাতিগণ-কর্তৃক পূজিতা গোধাশ্রিতা দেবী এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়া-

[১১] প্রাগুক্ত ভূমিকা।

ছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অঞ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রসিদ্ধি ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তাই চণ্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রূপধারণের এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া আবার অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিবার কাহিনীটুকু মাত্রই দেখিতে পাইতেছি; আর বনের পশুগণের সহিতও দেবীর একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখিতেছি; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রসিদ্ধা হরজায়া পার্বতী-চণ্ডিকা। পরবর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই গোধা-সংশ্লিষ্টা দেবীর আর কোন উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঙলা কবিওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধসুত কালকেতুকে অনুগ্রহ করিবার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই—যেমন দেখিতে পাই শ্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দিয়া অনুগ্রহ করিবার কাহিনী।[২০]

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির ভিতরে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবীর আর-একটি রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর 'কমলে কামিনী' রূপ। ধনপতি সদাগর এবং তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই সিংহল-গমনের পথে সমুদ্রমধ্যে 'কালীদহে' দেবীর এই 'কমলে কামিনী' মূর্তি দর্শন করিয়াছে। সঙ্গের নাবিকগণ কেহই এই 'কমলে কামিনী' দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা আসিয়াও প্রথমে দেখিতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দেখি—

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥

মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখি—

অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার॥

কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি,
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে।—লালু-নন্দলাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গীত
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে
কালকেতু তোমায়।—নীলমণি পাটুনী, ঐ
তম গুণে সাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল;
জানি তম গুণে তরে গেল,
কালকেতু ব্যাধের ছেলে॥—কানাই। ঐ
একবার মুখে দুর্গা ব'লে কালকেতু তোর চরণ পেলে।—রসিকচন্দ্র রায়,
শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একটু বিস্তারিত করিয়াছেন—

কমল কোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে
গজরাজে সংহারে পদ্মিনী।
কি যে দেখি অপরূপ বিদরে আন্ধার বুক
যেন দেখি হিমালয়-নন্দিনী॥
কমলে কমলমুখী কমল যুগল আঁখি
কমলিনী কমলতরঙ্গে।
পাকাইয়া করিবরে গর্জে রামা হুহুঙ্কারে
পেখি মন পড়ে মন ভঙ্গে॥
খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছারিয়া মারি
খেনে খেনে গগনে উতারি।
ও কী বিস্তারিয়া অতি ও কী ধরে মুখ পাতি
ও কী কি কমলে-কুমারী॥

এই 'কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবর্তী কালে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা-পাঁচালী গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী' গানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত। মধুসূদন 'কমলে কামিনী' লইয়া সনেট লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন; কিন্তু পূর্ব-ভারতে কোন যুগেই ইহার তেমন কোন প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই না; ইহার প্রসিদ্ধি দক্ষিণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে। বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ-লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 'কমলে কামিনী'।

দক্ষিণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে গজলক্ষ্মীর যে মূর্তি খুব প্রচলিত তাহা হইল এই—সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষ্মীদেবী; দুই পাশ হইতে দুইটী হস্তী দুইটি হেমকুম্ভ শুঁড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সলিল-সিঞ্চন করিতেছে। কোথাও শুধু শুঁড়ের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূল পরিকল্পনাটিও পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক খিলসূক্ত শ্রী-সূক্তের[২১] ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-দেবী (বা লক্ষ্মীদেবী)

[২১] ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসূক্তস্থ পঞ্চদশটি মন্ত্র।

নানাভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টা। পুরাণগুলিতেও আমরা শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পদ্মের এই সংস্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশক্তির প্রতীক-রূপে গৃহীত। এইজন্যই বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এইজন্য লক্ষ্মী বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোদ্ভূত; সেইজন্যই কি লক্ষ্মীর সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা বৈদিক শ্রী-সূক্তেই লক্ষ্য করিতে পারি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মোত্থিতা, আবার 'আর্দ্রা'। বিষ্ণু-পুরাণে সমুদ্র-মন্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আবির্ভাবের বর্ণনায় দেখি—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা॥

... ...

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে॥
দিগ্‌গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্॥[২২]

তখন বিকশিত কমলে স্থিতা পদ্মমালাধারিণী স্ফুরৎকান্তিমতী শ্রীদেবী সেই জল (সমুদ্রবারি) হইতে উত্থিতা হইলেন।...তখন গঙ্গাদি নদীসমূহ বিবিধ জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজগণও হেমপাত্রস্থ বিমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইয়াছিল।

আমাদের মনে হয়, এই-জাতীয় কবিত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষ্মীর পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মী-পরিকল্পনার বিস্তারেই দেখিতে পাই, কমলস্থিতা দেবী দুই হাতে করী লুফিয়া খেলিতেছেন; একবার তাহাকে গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ করিয়া দিতেছেন (গ্রসতী বমন্তী)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-সূক্তে দেবীকে 'পুষ্করিণীং' বলা হইয়াছে।[২৩] 'পুষ্কর' শব্দ গজশুণ্ডাগ্রবাচক। আর-একটি পৌরাণিক তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পুরাণে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণুমায়ার প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই দেবী সদেবাসুর-মানুষ সর্ব জগৎকে গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কূর্ম-পুরাণে দেখি—

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজামি চ॥[২৪]

[২২] প্রথমাংশ, ৯ম অধ্যায়।
[২৩] আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং ইত্যাদি।
[২৪] পূর্বভাগ, ১।৩৫, বঙ্গবাসী সং।

ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তী কি এখানে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকার-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর লৌকিক রূপান্তর। পৌরাণিক তত্ত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও কাহারও হয়ত পুরাণাদির সহিত কিছু কিছু প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। উমার হিমালয়-দুহিতা-রূপে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ মোটামুটিভাবে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এইসব উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গল-কাব্যকারগণের রচনায় স্থান পাইয়াছে—এইসব উপাদান লইয়া আর পৃথক্‌ভাবে বিস্তারিত আলোচনার তেমন কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। লক্ষণীয় নূতন উপাদান হইল সেই সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলাসবাসী যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী 'মাতাল ভোলা'য় রূপান্তরিত হইয়াছেন; দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগিনী বঙ্গবাসিনী দারিদ্র্য-লাঞ্ছিতা 'ঘরণী'। হর-গৌরীর এই লৌকিক রূপান্তরের আভাস বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু সেখানেও দেবীর স্বামি-পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লৌকিক গৃহচিত্রকে অবলম্বন করিয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে 'দিন-আনে দিন-খায়'-পর্যায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত বর্ণনাগুলির ভিতরে মনে হয় সাময়িকভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া পড়িলেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; কিন্তু বাঙালী কবিগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার-উঠান-রান্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে সেখান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বুঝি আর কোনও পথ নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে পৌরাণিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই মানবীয় রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 'বাপের ঘরে' যাইবার অনুমতি চাহিয়া সতীরূপে দেবী শিবের নিকট যে বিনতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই বাপের-বাড়ি-মুখী বাঙালী মেয়ের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী শিবকে বলিতেছেন—

সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ বৎসর হইল সাত।

দূর কর অপরাধ   পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পর্ব্বত কন্দরে বসি   নাহি পাট পড়সী
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
একদিন কোথা যাই   যুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥[২৫]

কয়েক বৎসর একাদিক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুতি—'মায়ের রন্ধনে খাব ভাত!' যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য ঐ মায়ের হাতের রান্নাটুকু। আবার মায়ে-ঝিয়ে যেখানে কলহ লাগিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের চিত্র। সতী দেহ ত্যাগ করিয়া উমারূপে গিরিরাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। হর-গৌরীর বিবাহে বাঙালী স্ত্রী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই;[২৬] প্রতিবেশিনীগণকে লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও বিধিমত পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীর আর শ্বশুর-গৃহ হইতে নড়িবার চড়িবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। নড়িয়া চড়িয়া লাভই বা কি, নড়িলে চড়িলেই ত আবার ছেঁড়া ঝুলি লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে। পার্বতীও বাপের বাড়ি মহা আনন্দেই আছেন, দিন-রাত্রি পাশা খেলিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার কিছু ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রহিয়াছে। তদুপরি জামাইয়ের আবার একটু নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘর জুড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিন-রাত বসিয়া পাশাই খেলিবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি ছিঁড়িয়া ভিন্ন করিবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রতি কিছু কর্কশবাণী প্রয়োগ করিতেই হইল—

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥

[২৫] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

[২৬] রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের "শিবায়নে" হর-গৌরীর 'শয্যা তোলনী'রও চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই।

প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।
অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ॥
রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥—মুকুন্দরাম

কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বলিবার পাত্রী নহেন; তিনি নিজের অংশের জমা-জমি ভাগ-বাঁটারাও বেশ বোঝেন।—

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমি দান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা॥

এই বলিয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' বহাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। ইহার পরে মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘর-করনা—সে-সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন 'কষ্টের সংসারে'র চিত্র।

পূর্বের দিন শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর বাহির হইতে ইচ্ছা করে না; এদিকে সেদিনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎ-পূর্বদিনের 'উধার শুধিতে'ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানিবার কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে 'গণেশের মাতা'কে একটু ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন; এই রান্নার পদ-প্রকরণের তালিকাটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।—

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
নটিয়া কাঁটাল-বিচি সার গোটা দশ।
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা-রস॥
কটু তৈল দিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক॥
রান্ধিবে মুসুরি ডাল দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥

ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥—মুকুন্দরাম

শিব ঠাকুরের কিঞ্চিৎ নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ পরিপাটিভাবেই পাইলেন; কিন্তু তিনি ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃষ্টি-কারিণী বিশ্বজননীও নন, তিনি হইলেন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যে-সব 'রমেশের মাতা', 'পরেশের মাতা', 'যোগেশের মাতা' রহিয়াছেন তাঁহাদেরই অন্যতমা 'গণেশের মাতা'। তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তন্ডুল॥

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে যে রূপ ধারণ করে শ্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল।

দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন, বাড়ির নিকটে আসিয়া 'বুড়া-ভিখারী' বিষাণে ফুঁ দিলেন; 'হাভাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কিঞ্চিৎ খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ-কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং—

বালকে বারণ করে বিশাল-লোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে॥[২৭]

কিন্তু ক্ষুধিত বালকেরা কি আর এইসব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? তাহারা ধাইয়া গিয়া বাপের 'পথ আগুলিল' এবং পিতার কাঁধের ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া একপায়ে নাচিতে আরম্ভ করিল। তখন 'শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটী কর‍্যা খায়।' দুই ভাই হাঁটু গাড়িয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল; কাড়াকাড়ি হইতেই হুড়োহুড়ি, হুড়োহুড়ি হইতেই হাতাহাতি। কার্তিকের ত মোটে দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং সে নিজে চারি হাত দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই 'কার্তিক কান্দেন করাঘাত কর‍্যা বুকে'। ইহা ত প্রায় নিত্য-

[২৭] শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ।

নৈমিত্তিক ব্যাপার—তর্জন-গর্জন, মারধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই—

দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কার্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন॥
বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূরে।
কিছু দিল কার্তিকে কোন্দল হৈল দূর॥

শিব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝুলি কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শিবকে বসিতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায়?

শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী।
ফাক্ক উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেক্কা হয়্যাছি॥
ঘরে ছিল ঘোটনা মুষল গেল ফাট্যা।
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা॥

কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও প্রচুর; কিন্তু ঘরে বসিয়া বুড়া ভিখারী স্বামীর ভাঙ বাটিতে মায়ের বড় অনিচ্ছা। সুতরাং—

পার্বতী বলেন আর পারি নাই যাও।
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁকি কর্যা খাও॥

কিন্তু—

গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে।
গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মরি পাছে॥

বলিয়া বুড়ামানুষ দেবীর নিকটে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, এবং পার্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে 'ভার্যার পরম ভাগ্য ভাঙ্গি যার ভর্তা' এবং স্বামীর কথার উপরে 'মুখসাট মার্য্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই অশোভন। তখন দেবী আর কি করেন?—

হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল।
গৌরী গর্গরী হস্তে গড়াইল জল॥
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে।
মহিষমর্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্তেকে॥
হিন্ডীর সমীপে চন্ডী দিল হান্ডী ভর্যা।
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্ত্র ধর্যা॥

সিদ্ধি খাইয়া বুড়াশিবের বেশ মৌতাত বৃদ্ধি হইল; ঝট্‌পট্ দুটি রান্না করিয়া দিবার জন্য 'গিরীশের ঝি'র প্রতি আদেশ হইল। দেবী রান্না করিলেন; বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বসিলেন। দেবী খাবার দিতেছেন, কিন্তু পারিয়া

উঠিবেন কেন? এদিকে কার্তিকের 'ষড়ানন', গণেশের এক; সুতরাং দুই পুত্রের সাত মুখ—স্বামীর পঞ্চ মুখ—একুনে বারখানি মুখ।

তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥

… … …

সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা॥

মায়ের কথা শুনিয়া কার্তিক ধৈর্য ধারণ করিয়া মৌনী হইয়াছিল—কিন্তু শিব পিছন হইতে কার্তিককে উস্কানি দিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব দিতে হইবে তাহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কার্তিক বলিয়া উঠিল—

রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥

পুত্রের উক্তি শুনিয়া মা রাগিলেন না; হসিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন।—

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥

… … …

হরবধূ অম্লমধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি কুচে পয়োধর ভার॥
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥

স্বামি-পুত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বসিলেন। মায়ের সেই খাইতে বসার মধ্যেও কবি রামেশ্বর বঙ্গ-পল্লীর জনৈকা 'গণেশের মা'র সমবয়সী-দের বা সহচরীদের লইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্পে-গুজবে হাস্য-কৌতুকে আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি ভুলিতে পারেন নাই।

সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রাস গড়ে গিরিসুতা গণেশের মা॥
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে॥

একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস' একটু বেশী মাত্রায় সেবন করিয়া নেশায় বুঁদ হইয়া আছেন, আজ আর ভিক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু নেশায় জমিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় কি? 'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী ব্রাণ।'

নিত্যকারের সেই তিক্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব?' এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ করিলেন; তিনি বলিলেন, তিনি 'ভিক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তিনি 'ভূপতির ঝি', সুতরাং সংসারের জিনিস এদিক-ওদিক করিবার অভ্যাস তাঁহার নাই—'দিয়াছিলেন যত ধন লেখ্যা-কর‍্যা নেও।' নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে কোনদিন লেখাপড়ার ধার ধারেন নাই; তিনি একটু 'রামরস' পান করেন আর হরিনাম গান করেন।—

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার।
বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার॥
লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা।
হয়্যাছি অজরামর হরিগুণ গায়্যা॥
মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর।
ঠেক্যাছি তোমার ঠাঁঞি ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী খাব নাই ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ॥

পার্বতী বলিলেন, "এখন ত ভাঙ-সিদ্ধির নেশায় জমিয়া আছ—ভাতের আর দরকার নাই, নেশা ভাঙিলেই তো আবার দুটি কিছু খুঁটিয়া খাইবার দরকার হইবে। তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ, একদিন খাবার না হইলেও চলিবে; বাপের কাছেই যে দুই 'পো' বসিয়া আছে, তাহারা ত একটু পরেই 'ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দে না গো'; তখন আমি কি উপায় করিব?" প্রসঙ্গত মহামায়া একথা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া রাখিলেন যে তাঁহার নিজের কিন্তু আর করিবার কিছুই নাই; কারণ—

ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ।
ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ॥
বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাতা।
জঠর আনলে বলে জগতের মাতা॥

এখানে 'জগতের মাতা' শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দরিদ্রের ঘরের সাধারণী-কৃত মাতা।

অতএব শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া-ফুটা তালিমারা ঝুলিটি কাঁধে করিয়া বুড়াশিবকে আবার বাহির হইতে হয়। এদিনে কিন্তু ভিক্ষায় অনেক কিছু মিলিল; শুধু চাল-ডাল নয়, ধন-রত্নও। বাড়িতে আসিয়া 'বুড়া' যখন ঝুলিটি পার্বতীর সামনে হাসিয়া রাখিলেন তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতা এবং ভীতাও হইলেন। এত ধন যে ফোঁটাকাটা হরিনাম-করা বুড়া ভিক্ষা করিয়াই

লাভ করিয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; তাই—

সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শূলী।
কারে মার্য্যা ধন হর্য্যা পুরাইলে ঝুলি॥
গলা ভর্য্যা মালা যার কপাল জুড়্যা ফোঁটা।
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা॥
... ...
বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ।
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ॥

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর 'গণেশের মা'র পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গতই হইয়াছে।

এইভাবেই চলে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের বঙ্গপল্লীর হর-পার্বতীর সংসার। কিন্তু এইভাবে শুধু উঞ্ছবৃত্তিতে আর কত দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছু বাড়িয়া যাইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একদিন বৃদ্ধ পতিকে বলিলেন—'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।' শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। যজুর্বেদে ভগিনী অম্বিকাসহ যে রুদ্রের উল্লেখ পাই সেখানে রুদ্র ও অম্বিকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুক্ত। বাঙলা 'শূন্য-পুরাণে' শিবের চাষ চষিয়া বিবিধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা পাই। এখানে শিবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপতি-রচিত পদে দেখি দেবীই শিবকে চাষ চষিতে বলিতেছেন। এই বর্ণনার সহিত রামেশ্বরের বর্ণনার মিল আছে।—

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষি করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ
গুন গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহে সিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে॥[২৮]

---

[২৮] শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত, বিদ্যাপতি।

বারে বারে হে শিব, তোমাকে আমি বলি, মন দিয়া কৃষি কর। বিনা লজ্জায় তুমি ভিক্ষা মাগ, গুণ-গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর-অনুকম্পা করে না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধুতুরা ফুল, (আর) হরি পাইল চাঁপা ফুল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া কর ফাল; ধুরন্ধর বৃষভকে হল লইয়া জুড়িয়া দাও—সুরেশ্বরীর (গঙ্গার) ধারায় পাট কর।

যাহা হোক, রামেশ্বরের শিবায়নে দেখি, একদিন নয়, দুদিন নয়—এখন দেবী নিত্যই সময় সুযোগ মত 'নরমে গরমে' এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা আর যে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; দরিদ্র হইলেও দেবতার জাতি (ব্রাহ্মণ?)—চাষ করাটা কি শোভন হইবে? দেবীকে শিব বলিলেন—

বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥

তাহা ছাড়া 'শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর'; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। কারণ—

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥

ভাল চাষ করিলেই ভাল ফসল ফলিবে এমন কথা নাই, 'শুখা হাজা'র ভয় আছে। তাহার পরে 'গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা' তখন আবার 'রাজা' (ভূম্যধিকারী) আছেন, রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বুদ্ধি চাহিলেন। দেবী বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণিজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয়—একটি 'পুঁজি' (পুঞ্জি), অপরটি প্রবঞ্চনা-বুদ্ধি; ইহার একটিও শিবঠাকুরের নাই, তাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 'রাজসেবা', 'সেব্য' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সুতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য বৃত্তি। শিব বলিলেন, চাষের জন্য অনেক কিছু যে চাই, তাহার যোগাড় হইবে কিরূপে? দেবী বলিলেন—

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি।
গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গলের ফালি॥
ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল।
শূলে ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল॥

এই 'বিশাই' মূলে 'বিশ্বকর্মা' বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের

'গণেশের মা'র প্রতিবেশী 'বিশাই কামার'—যাহাকে বলিয়া-কহিয়া সম্প্রতি বিনা মজুরীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বলিয়া গণেশের মায়ের বিশ্বাস। এতক্ষণ গৃহিণীর (ব্রাহ্মণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শুনিতেছিলেন; কিন্তু 'শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।' কিন্তু কোপ করিলে কি হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। শিবঠাকুর তাঁহার বাহন বৃষটি লইয়া এবং শূলপাণির শূলের দ্বারা তৈরী লাঙ্গল লইয়া হরিনাম করিতে করিতে চাষে চলিলেন—

চলিল চঞ্চল বৃষ চণ্ডী রন চায়্যা।
হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা॥

জমি কিছু পাওয়া গিয়াছে কোচ্-পাড়ায়—নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা অনেক দূর। শিব সেই কোচ্-পাড়ায়ই চলিলেন চাষ চষিতে। শিব যখন বাড়ি ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য চলিলেন, তখন—

ত্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু।
ছাল্যা দুটীর তত্ত্ব লইও কভু কভু॥
শিব বলে সম্প্রতি সে কথা রাখ হাতে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুন্যা অম্বিকার মাথে॥

শঙ্কর চাষের জন্য চলিয়াছেন দেবীচকের (রামেশ্বরের মেদিনীপুরে কৃষি-অঞ্চল এখনও বিভিন্ন 'চক' নামেই পরিচিত) দিকে, কারণ এইখানেই 'হরিহর' শিবের সংসার চলিয়া যায় এমন কিছু চাষ-জমি দেবোত্তর লিখিয়া দিয়াছেন। বাড়িতে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া একা গৌরীকে। শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অল্পবয়স্কা কুলবধূ; শিবের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষায় বাহির হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শিব বলিয়া গেলেন, 'ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি'; কিন্তু 'পার্বতী বলেন প্রভু পারি নাই আমি'; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; 'মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥' পাওনাদার যখন-তখন আসিয়া হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের; তাহারা বাহিরে আসিয়া কথাও বলিতে পারে না, ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিয়া ছেলের মুখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা বলিতে হয়। তাহা ছাড়া—

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর।
কতবার ক্রোধিয়া বল্যাছে ঋণচোর॥

এই 'কুবের'কেও সোজা ধন-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, ইনি গ্রাম্য লগ্নি-কারবারী—হয়ত 'বিশাই কামারে'র কাছাকাছি বাড়ি। মোটামুটি

গৌরীর একা একা বাড়ি থাকিবার কোনও দিক্ হইতেই ইচ্ছা নাই; তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিলেন—

ভাল যদি চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে।
বাপ-নেওটা ছাল্যা আমি নারিব পত্যাতে॥
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর।
দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর॥

কিন্তু কোনও কথায়ই কিছু ফল হইল না; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার অনুচর ভীমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চলিয়া গেলেন।

বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পরিশ্রমে ও যত্নে দেবীচকে ফসল ভালই ফলিয়াছে; শিব জমি ছাড়িয়া আর বাড়িতে আসিলেন না। এদিকে দেবী একা বাড়িতে আর কতদিন থাকিবেন, নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া শিবকে বাড়ি আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী বাগ্দিনীরূপ ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। শিব বাগ্দিনীর ভোলে পড়িলেন, ইহা লইয়া হর-পার্বতীর কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক লীলা দেখিতে পাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শিব বাড়ি ফিরিলেন; শিব-শিবানীর মিলন হইল।

শিব এবারে দেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর বহুদিন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে নির্ভর করিয়া আব্দার জানাইলেন—

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই॥
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥

কিন্তু বুড়া স্বামী শিব বড় রূঢ়ভাষী; প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই—

শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥

প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা ও ভঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে; কিন্তু

পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাগিল—অপমানে অভিমানে দেবী রক্তবর্ণা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধূ, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন? শেষ পর্যন্ত সেই বাপের বাড়ি! পার্বতীও সেই বাপের বাড়িই চলিলেন। শেষে অবশ্য শিব নিজেই শাঁখারি সাজিয়া গৌরীর বাপের বাড়ি গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া আসিয়াছিলেন।

এই কাহিনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন কবিওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা ভাল জমে মামায়-ভাগিনায় বসিয়া। ভাগিনা নারদ গিয়াছেন মামা শিবের বাড়ি; শিব ভাগিনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বলিতেছেন—

আমার হলো একি দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়।
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়॥
কার্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন,
ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্বক্ষণ,
ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায়॥
তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন,
সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্রিলোচন,
.. ..
আমি কাঙ্গাল ত্রিলোচন, কোথা পাব ধন,
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিব রে এখন,
(আমার) সম্ভারনা ছেঁড়া তেনা বাঘের ছালা পরি গায়॥[২১]

আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের চিত্র একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। রামেশ্বর অবশ্য তাঁহার কবিকল্পনায় দেবীর লৌকিক রূপের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থূলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র 'আয়্যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর-শয্যা এবং শয্যাতোলনী-উপলক্ষ্যে আদিরসাত্মক স্থূল রসিকতাও বাদ দেন নাই। তাঁহার 'শিবায়নে' আরও দেখি, কুমারী অবস্থায় নির্জন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার জন্য দেবসমাজে পার্বতীর চরিত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা দিয়াছিল এবং সেই অপবাদ স্খালনের জন্য মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নায়িকাগণের মত পার্বতীকেও বলিতে দেখি,—

কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্ঞাতিসভা
বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি॥

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ-দুঃখ-অভাব-অভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া

[২১] শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল-সম্পাদিত, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দেখিবার চেষ্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীকে ব্যাবহারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারূপে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে বেড়া'—এই কিংবদন্তীর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। আমরা রামেশ্বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবীর শাঁখা পরিবার উপাখ্যান দেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীলপূজা-উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা গীত হইতে শুনিয়াছি। সর্বশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সিন্দূর; যিনি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ্যই শাঁখা-সিঁদুর-প্রিয়া হইবেন। এই মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিবার স্নিগ্ধমধুর উপাখ্যানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি তরু দত্ত উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়াছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কর্তৃক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই—তখনও ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধরিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল একটি শাঁখারি—'শাঁখা চাই, চাই শাঁখা'। কাছে 'ধানসেরা' দীঘির ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চলিয়াছিল অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণী; শাঁখারির 'শাঁখা চাই' ডাকে সাড়া দিল সেই রমণী। শাঁখারি তাহার কোমল সুগঠিত দুই হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাঁখা। রমণী শাঁখা পরিয়া অদূরের একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, সেইখানে তাহার বাড়ি, শাঁখারি যেন সেখানে গিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপির মধ্যেই ঠিক দাম পাওয়া যাইবে। শাঁখারি মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বলিলে বিস্মিত পূজারী শাঁখারিকে লইয়া ঘাটে আসিয়া কন্যারূপিণী দেবীকে দেখা দিতে বলিলেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাঁখা-পরা হাত দুখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল!

ইহা বিশেষ কোনও কবির কবিকল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ বিশ্বাসেরই একটি সহজ প্রকাশ।

এই-যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক্ লক্ষ্য করিতে পারি। একদিকে দেখিতে পাই, দেবীর সকল লীলাবর্ণনার ভিতর দিয়া মানবীয় রূপ-গুণের প্রকাশ; এই মানবীয় রূপ-গুণ দেবীর মহিমাকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না; মানবতার আধারে দেবীর মহিমা আরও যেন স্নিগ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—আরও আমাদের আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের অনেকগুলি শাক্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব। কিন্তু দেবীর এই মানবীয়তা-লাভের আর-একটি স্থূল রূপ আছে

যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মাত্র, সেখানে আমাদের যুগচিহ্নিত সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের স্থূল রূপের চিত্রটিই অঙ্কিত হইয়াছে। 'শিবায়ন'গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলতা লাভ করিয়াছে। এই-জাতীয় স্থূলত্বের চরম নিদর্শন দেখিতে পাই দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কিছু কিছু বর্ণনায়। চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী (ইঁহারা সকলেই দক্ষকন্যা) যখন দক্ষালয়ে যজ্ঞ-উপলক্ষ্যে চলিয়াছেন; তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা বড় ভগ্নী সতীর সহিত দেখা করিলে সতী দুঃখ করিয়া বলিলেন—

অশ্বিনী দিদি, আমারে দুঃখিনী দেখিয়া পিতে।
অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে॥

তখন কন্যাগণের মধ্যে গরিব কন্যার প্রতি ধনী পিতার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে মানবীয় রূপান্তর দান করিলেও একান্ত স্থূল করিয়া তোলে না। কিন্তু তাহার পরে যখন দেখিতে পাই শিব সতীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার (শিবের) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

আমাদের ভাব যেমন জামাই আর শ্বশুরে
যেমন দেবতা আর অসুরে॥
... ...
যেমন জল আর আগুনে।
যেমন তৈল আর বেগুনে॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা।
যেমন আদা আর কাঁচকলা॥
যেমন ঋষি আর জপে।
যেমন নেউল আর সাপে॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে।
যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥
যেমন কাক আর পেচকে।
যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীর আর রোগে।
যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥
এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়।
শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমায়॥[১]

আর কিছু কহিবার আর প্রয়োজন করে না; দাশু রায় এই পর্যন্ত শিবের মুখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যে-কোনও মর্ত্যবাসীর নিকটে কানে হাত

[১] অথ দক্ষযজ্ঞ।

দিবার পক্ষে যথেষ্ট। দাশরথি রায়ের এই-জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে কতদূর পর্যন্ত নামিতে হইয়াছে তাহারই আরও একটু নমুনা দিবার জন্যে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। গিরিরাণী মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধাত্রী প্রসূতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শুনিয়া বাক্যশেলাহতা গিরিরাণী খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিলেন এবং পরে সরবে কান্না জুড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

সুসন্তান শুনে গিরি কর্তো কত বাবুগিরি
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে।
সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালী
মর্তে এসেছিলি মোর পেটে॥
না করে কোলে অম্বিকায় পড়ে রন মা মৃত্তিকায়
নারীগণ শুনিল পরস্পরে।
সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে॥
মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলেছিস্ ধরা উদরে
তুই তো মায়ের মেয়ে বটিস্ কিনা।
চমকে মরি চমৎকার মর মাগির কি অহঙ্কার
দেখি নাই তো করে এত কারখানা॥[৩১]

মুখের উপর এইরূপে কড়া কথা শুনাইয়া দিবার আড়শী-পড়শীগণ উপস্থিত না থাকিলে গরিব বাঙালী মায়ের কৃষ্ণবর্ণা বালিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। পিতা গিরিরাজ কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান করিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমতি পড়িল। তখন—

অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে।
দানের দুঃখের কথা মানের অতি খর্বতা
তার কাছে কহে খেদমতে॥
বলিব কি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার কিমাশ্চর্য
ভার্যার কথায় রাজ্য এলেম হেঁটে।
পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে॥

৩১ অথ শিববিবাহ।

ঠুঁটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই।
ছিল দুই দুরন্ত দ্বারি দ্বারে দুটো স্কন্ধে হাত দে ধরে
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই॥[৩২]

ইহার পরে পাবর্তীর অন্নপ্রাশনের পালা। পর্বত-পুরবাসিনিগণের সঙ্গে একত্র হইয়া গিরিরাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও সুখী; কিন্তু সেদিনও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বনিন্দুক ছিলেন॥—

বিশ্বনিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বান্ধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥
তারে দেখি যত্ন করে একজন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পরিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট॥
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারি কর্মে তারিপ ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহাপ্রেত সে গিরিবেটা
মিনসে হতে মাগি দ্বিগুণ কসা॥

মা পার্বতীর অন্নপ্রাশনে আসিয়াই থামিয়া গেলাম, বিবাহাদির ঘোঁট-জোলসে আর প্রবেশ না-ই করিলাম।

৩২ অথ শিববিবাহ।

অষ্টম অধ্যায়

বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য

(ক) বাঙলা শাক্ত-পদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলী

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যে শক্তির যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা সাধারণ পরিচয় আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয় (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইঁহার জন্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কালিকা-মঙ্গলে' রামপ্রসাদ-আরাধিত কালিকারও যথার্থ পরিচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধক-কবিরূপে যে প্রতিভা তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার শাক্ত-ধর্মে ও শাক্ত-সাহিত্যের একটি নূতন দিক্ খুলিয়া দিলেন এই সাধক কবি; ইহা হইল শাক্ত-সঙ্গীতের দিক্। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর সংযুক্ত করিয়া (যাহা আজকাল 'প্রসাদী' সুর নামে খ্যাত) তিনি এক দিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অন্য দিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোনও সাহিত্যেই আর দেখি নাই। এই আর্তি যেন বাঙালী-মনে সঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে যখন তাহার প্রকাশ ঘটিল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট-বড় বহু সাধক-কবির মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। আমরা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বহু-সংখ্যক শাক্তগীত পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত-পদাবলী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব-পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শাক্ত-গানগুলির শাক্ত-পদাবলী নাম দেওয়া হইলেও বৈষ্ণব-পদাবলী এবং শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শাক্ত-সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত-রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীত রচনার পশ্চাতে বৈষ্ণব-পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বলিতে পারি না।

রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে—ভাবের দিক্ হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক্ হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা-দেশে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-পদ রচনার ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহু শতকে প্রবাহিত সাহিত্যের একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সাময়িক ও পরবর্তী শাক্ত-কবিগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পরিবেশের প্রভাব অতি স্বাভাবিক-ভাবেই পড়িয়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব-কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর-রসে। জীবনের মাধুর্য প্রেমে; সেই প্রেমই বৈষ্ণব-কবিগণের প্রধান নহে—একমাত্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে দেহও মধুর—গেহও মধুর। বৈষ্ণব-কবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধুর্যের প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলাদেশের শক্তিদেবীর উপরেও। সর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্যের ঘনীভূত প্রতিমা রাধার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিতা দেবীগণও যে অনুরূপ মাধুর্যমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাধা-সৌন্দর্যের প্রভাব ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য করি এই শাক্ত-সঙ্গীতগুলির মধ্যে যখন দেখি যে শুধু বাহিরের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পরিকল্পনাতেই দেবী মধুর-রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—তিনি প্রথমাবধিই মধুররসাশ্রিতা; তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—বা উমাকে যখন মধুর-রসেই প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত-ভাবে সচকিত হইয়া উঠি যখন দেখি, শুধু অসুরনাশিনী দুর্গা-দেবী নহেন—ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুর-রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর-রসের উপাসক। এ-প্রসঙ্গে মধুর-রস কথাটিকে আমরা ইহার পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া একেবারে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আমরা দেখিতে পাইয়াছি, মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার একটি বিশিষ্ট ধারা, অসুরনাশিনী দেবীর আর-একটি পৃথক্ ধারা। পৌরাণিক যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কবিগণ ঐতিহ্যসূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু

লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন দুগ্ধকেই পান করিবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিমনোহংসও তেমনই ভাবে মায়ের মধুরূপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে মধুরূপিণীকেই বাছিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাকে লইয়া বাঙলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর-রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখি, বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিত-মহলে বা উচ্চকোটি-মহলে যতই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুর-নাশিনী মূর্তিতে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই; তাহার পরে তাঁহারা স্থির-নিশ্চিত-রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়—উমা মায়ের স্বামিগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ত আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া'-সংগীতের উদ্ভব।

এই সংগীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারিব, গিরিরাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপুরে ফিরিয়া আসিলেন তখন গিরিরাণী কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশে ধাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীতে বলিলেন, মেনকা দশভুজা রণরঙ্গিণী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেই চাহিলেন না, মা স্পষ্টই বলিলেন,—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী?

এই রণরঙ্গিণীকে মেনকা—এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কবিমন—শুধু যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না; মা স্পষ্ট বলিলেন,—

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

তখন আর উপায় নাই! বাঙালী কবির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য দশভুজা রণরঙ্গিণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল।—

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥

দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা।
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥[১]

রসিকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, তাঁহার মেনকাও অভিনব এই নারীকে চিনিতে পারেন নাই, অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই।

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে?
এ তো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে!
* * *
মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর;
এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে ঝঙ্কারে।
হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে![২]

শুধু যে ভয়ঙ্করী মূর্তি চাই না তাহা নয়, ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিও চাই না—শুধু মাধুর্যময়ী মূর্তি চাই।—

বলে গেলে হে গিরি, যাই—
আনি গে গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়?
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে;[৩]

অপর কবি বলিতেছেন,—

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে?
সর্বদেব-তেজ দেহ, জটাজূট শিরোরুহ,
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার।[৪]

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানটিতে উমার যে-সব বর্ণনা

[১] দাশরথি রায়ের পাঁচালী। [২] শাক্ত পদাবলী।
[৩] ঐ, ঠাকুরদাস দত্ত।
[৪] ঐ, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও তুলনীয়—

কে রণ-রঙ্গিণী!
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, মনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।
—ঐ, ব্রজমোহন রায়

করিতেছেন তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অসুরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন কবিগণের একান্তভাবে 'স্নেহের দুলালী' উমার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে আপত্তি। পদের শেষে কবিরা একটা আপোস-রফা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রফার চেষ্টা তাঁহাদের তত্ত্ববুদ্ধিজাত—কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপায়িত মধুর-রূপিণী উমাকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর সহিত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন ধারাগত আপত্তি স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কবিগণ এই আপত্তি জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অসুরনাশিনী ভয়ংকরী কালী-মূর্তিকে নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। কালীকে এইভাবে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি 'অসুর-ভয়াউনী' 'পশুপতি-ভামিনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা করিতেছেন—

বাসর রৈনি সবাসন সোভিত
চরণ, চন্দ্রমনি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল,
কতও উগিল কৈল কূড়া॥
সামর বরণ, নয়ন অনুরঞ্জিত
জলদ-জোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁড়রি
লিধুর-ফেন উঠ ফোকা॥[৫]

দিন-রজনী তোমার চরণ শবাসন-শোভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চন্দ্রমণি; কত দৈত্যকে মারিয়া মুখে ফেলিলে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় করিয়াছ। শ্যামল তোমার বর্ণ, তাহাতে রক্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম; তোমার পাটল ওষ্ঠপুটে বিকট ধ্বনি, রুধিরের ফেনায় বুদ্বুদ উঠিতেছে।

এই বিকট মূর্তির মধ্যেই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রক্তিম নয়নের শোভা কবির মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রক্তপদ্মের শোভার কথা। রামপ্রসাদের কালীমূর্তির একটি অনুরূপ বর্ণনায় দেখিতেছি—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজগরাসে॥

[৫] বিদ্যাপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সং পদ।

কে রে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত,
নগর-নিকর তিমির নাশে;
কে রে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥[৬]

পদটির পশ্চাতে যে কবি-মানস রহিয়াছে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে পদটির একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। কালী আসব-আবেশে—অর্থাৎ সুরাপানে বিহ্বলা হইয়া এলোকেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন; কিন্তু ঢলিয়া ঢলিয়াও দানব-দলনে তাঁহার চরণের ক্ষিপ্রগতি—এবং রণক্ষেত্রে তিনি দানবপক্ষের গজগুলিকে করে ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন, রণোন্মাদিনী দেবীর সর্বাঙ্গে রুধিরচিহ্ন। এই পর্যন্ত কালীর পৌরাণিক রূপ; কিন্তু সাধকের মনের মাধুরীর স্পর্শে এই রূপও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না; কালীর কালো দেহে রুধিরের ছটা যেন কালিন্দীর কালো জলে ভাসিয়া-যাওয়া কিংশুকের ছটা। আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি যেন নীলকমল—চূড়ার অর্ধচন্দ্র এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নীলচরণের নখরগুলি হইতে যেন নীলকান্তমণির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া অন্ধকার নাশ করিতেছে; নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—দেবী যে ঘোর রবে রণে লম্ফ দিতেছেন; তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী নীলনবীন মেঘে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

এই বর্ণনাটি কাব্যের দিক্ হইতে নিখুঁত না হইতে পারে—অতিরেক দোষে দুষ্ট হইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, পৌরাণিক ভয়ঙ্করী দেবীর কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার কি একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কবির সবটুকু বর্ণনার মধ্যে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দেখি—

তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি'
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥[৭]

[৬] শাক্ত পদাবলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। [৭] ঐ।

তুষার-ধবল মহাদেব—তাঁহার হৃদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হ্রদে প্রস্ফুটিতা একটি 'নীলিম নলিনী'! তিমিররাশি দিয়াই সে রূপ গড়া—কিন্তু রূপের বিদ্যুৎ-বিভায় দশ দিক্ আলো করাই হইল তাহার কাজ।

কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রবি-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উন্মাদিনী রণরঙ্গিণী মায়ের চরণে নূপুরও বাঁধিয়া ছাড়িয়াছেন।[৮] কেহ আবার চরণে নূপুরের সহিত কটিতে ঘুঙুরযুক্ত করিয়াছেন।[৯] কোনও কবি আবার সর্বত্র শুধু 'অমিয়া' রূপই লক্ষ্য করিয়াছেন।—

অমিয়া জিনি মুখ শোভা তায়, অমিয়া-সম শ্রমজল তায়,
অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধা ক্ষরে॥[১০]

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের—

নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী,
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥[১১]

প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক্ হইতেও বৈষ্ণব কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।[১২]

[৮] কে ও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী।
চমকে অরুণ রবি শশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি॥
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী॥
—কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) শা. প. (ক. বি.)।

[৯] নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে পায়॥
ইত্যাদি।
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. (ক. বি.)।

[১০] গৌরমোহন রায়, শা. প. (ক. বি.)।

[১১] শা. প. (ক. বি.)।

[১২] মঙ্গল-কাব্যগুলির ভিতরে পার্বতীর মনোহর মূর্তির বর্ণনায় আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। দেবীর রূপ-বর্ণনাতে আমরা শাক্ত-পদাবলীতেও মাঝে মাঝে এই ভঙ্গির অনুসরণ দেখিতে পাই, যেমন—

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা, -
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা।
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা॥
ধনুসদৃশ ভ্রূলতা, ত্রিনয়ন-সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুরবচনা॥ ইত্যাদি
—মহাতাব চাঁদ, শা. প. (ক. বি.)

রামপ্রসাদেরও এই বৈষ্ণব-ভাষাভঙ্গিতে কালীর বর্ণনা দেখিতে পাই-

নব নীল নীরদ তনুরুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥[১৩]

অথবা—

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর,
রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিণী,
হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হতরিপু সমা॥[১৪]

অথবা—

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥[১৫]

হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কালী অসুর বিনাশ করিতেছেন তাহাকেও বাঙালী মন রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামিনী॥[১৬]

[১৩] ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৩৭ সং পদ)।
[১৪] ঐ, (১৪৮ সং পদ)। তুলনীয়—

কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ
করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি। ইত্যাদি।
—ঐ (১৩৮ সং পদ)।

[১৫] ঐ (১৫৩ সং পদ)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ পদগুলি দ্রষ্টব্য।
[১৬] মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শা. প. (ক. বি.)।

ভক্ত-হৃদয়ে এই কালী-রূপের আকুতি রসঘনরূপ লাভ করিয়াছে কমলাকান্তের একটি গানে—'মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে।' রামপ্রসাদের দুই-একটি গানে এই রূপকে লইয়া ভক্ত-হৃদয়ের রীতিমত একটি উল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে, যেমন—

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে॥[১৭]

অথবা—

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে॥[১৮]

কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগ' সহসা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এ-ক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাঙলাদেশে শত শত বৈষ্ণব কবি রূপানুরাগের সাধনা করিয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার কবিমানসে 'রূপানুরাগে'র একটা বাসনাকেই প্রবল করিয়া রাখিয়াছিল; সেই বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালীমূর্তিকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে। নূতন দৃষ্টি বলিতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগে'র আভাস কোনও পুরাণে নাই—তন্ত্রেও নাই।

তবে এই 'রূপানুরাগে'র পশ্চাতে মধুররস-প্রীতি ব্যতীত শাক্ত সাধক-কবিগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কবিগণ বহুস্থানে কালীর কালো-রূপে হৃদয় আলো করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহার ভিতরে একটি গভীর সাধন-রহস্যের কথাও নিহিত আছে, তাহার আলোচনা আমরা এই সাধক-কবিগণের সাধনার কথা বিবৃত করিবার সময়েই পরে আলোচনা করিব।

আমরা উপরে লক্ষ্য করিলাম, দেবীর রূপ-বর্ণনার কতকগুলি পদে ভাষা ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়াছে। বর্ণনায় এই প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে। কমলাকান্ত এ-সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য মূর্তির বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডলিনী'-শক্তি—বাস তাঁহার ষট্‌চক্রের ভিতরকার সর্বনিম্ন মূলাধারচক্রে। তিনি কখনও বালিকা, কখনও কিশোরী,—কখনও নবীনা যুবতী। তাঁহার দয়িত শিবের অবস্থিতি ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে চলে এই 'নবীনা যুবতী'র অভিসার-

[১৭] ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১০৪ সং পদ)।
[১৮] ঐ (১৩৪ সং পদ)।

যাত্রা। এই আজ্ঞাচক্র-রূপ দয়িতধামে আসিয়া মিলিয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর) ধারা—এখানে জাগিয়াছে ত্রিবেণী-সঙ্গম। 'সাধক-রঞ্জনে'র এই নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণ-অভিসারিণী রাজার প্রতিচ্ছবিতে; সমস্ত ষট্‌চক্র-সাধনাই এখানে বৈষ্ণববর্ণিত লীলার অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বৈষ্ণব-লীলার রূপকই নয়—ভাষা ও ছন্দও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। রজনীর শেষে, প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোকে দেহ-মন উদ্ভাসিত হইলে) এই 'রমণী' (শিবসঙ্গে রমণের অভিলাষিণী কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি) জাগ্রত হইলেন; তিনি তখন ত্রিবেণী তরঙ্গিণীতে স্নানে চলিলেন।

ত্রিগুণা ত্রিবেণী তরঙ্গিণী ধায়।
কেলি করে কুলকামিনী তায়॥
বিহরই রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে॥
হেরি হেরি সুন্দরী চকিত নয়ান।
তড়িত সুচঞ্চল করি অনুমান॥
সমবয় সঙ্গিনী নব অনুরাগে।
কিশলয় পরশে কুসুমধনু জাগে॥[১১]

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকেলি; সেই কেলি সমাপন হইলে আবার ধীরে ধীরে তিনি চলেন আপন নিবাসে (মূলাধারে)। এই আপনার ঘরে ফিরিবার বর্ণনা দেখি—

গজপতিনিন্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে॥
চারু চরণগতি অভরণবৃন্দে।
নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে॥
উরসি সরসীরুহ বামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী রামা॥
মৃগপতি দূরে শিখরমুখ চায়।
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায়॥ ইত্যাদি।

এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভাবের কিছু কিছু বর্ণনাও দেখি। ইহার বাল্যভাবের বর্ণনায় দেখি—

কিয়ে-ধনী পেখলু হেরি হেরি তনু
বেরি বেরি মন ধায়।

[১১] সাধক-রঞ্জন, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)।

ইহ তনু অবস দিবস রজনী
রমণী পুন আঁখি ভুলায়॥
মন এ সুন্দরী যদি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মৃত তনু মুঞ্জরে
এ তনু সফল করি মানি॥ ইত্যাদি।

তাহার পরে মধ্যভাবে—

কদম্ব কুসুম জনু সতত সিহরে তনু
যদবধি নিরখিলাম তারে।
যদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে জাই
এনা দুখ কহিব কাহারে॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনোচোর
রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয় মাঝে
না ছাড়িব দিবস রজনী॥

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই; উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ধৃতি দিলাম তাহা দ্বারা শাক্ত-সাধকগণও যে নিজেদের সাধনতত্ত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষ্ণব-ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ নমুনা দিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলার প্রতিবেশী মৈথিলী সাহিত্যেও দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি-দুইটি ছত্রে দেবীর কমনীয় মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৈথিল কবিগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের 'তারা' বর্ণনার ভিতরে দেখি—

জয় জয় জয় ভয়ভঞ্জিনি ভগবতি
আদি শক্তি তুঅ মায়া।
জনি নব সজল জলদ তুঅ তনুরুচি
পদরুচি পঙ্কজ ছায়া॥[২০]

মহারাজ মহিনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছত্রে দেখি—

বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল
বিকট দশন পাঁতি।

[২০] গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কলিত।

কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রেই দেখি—

ফুজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ
জনি নব জলধর কাঁতি।[২১]

কবি মুকুন্দের দুর্গা-বর্ণনায় দেখি—

সিংহ চঢ়লি মাতা অসুর-নিকন্দিনি,
মেদিনী ডোল গতি-দাপে।
আয়ুধ উগ্র শোভএ আঠো কর,
জাহি ডরে অরি উর কাঁপে।

কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল—

দূর্বাদল সন কান্তি মনোহর,
শিরে শোভ চান কলাপে।[২২]

আধুনিক কবি বিশ্বনাথ ঝা ভগবতীর গীতে বলিয়াছেন—

জয় জয় সকল অসুরকুলনাশিনি, আদি সনাতনি মায়া।
গিরিবর বাসিনি, শঙ্করভামিনি, নিজ জন পর করু দায়া॥
শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজিত, তড়িতবিনিন্দক নয়নে।
বঘছাল পহিরন, কটি অতি শোভিত, ফণিকুণ্ডল যুগ কানে॥[২৩]

বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলীর সহিত বাঙলা শাক্ত-পদাবলীর আর-একটি গভীর মিল লক্ষ্য করিতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়। এই বাৎসল্য-রসের প্রাবল্যে বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবন ও গিরিপুরের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে- স্থানে স্থানে মুছিয়াও গিয়াছে। এইরূপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবনও উত্তর প্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপুরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে স্থিত নয়: উভয়ের অবস্থিতিই বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-জোড়া শ্যামল অঞ্চলে। সুতরাং ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক-ভাবেই ভেদচিহ্নের বিস্মৃতি। একই চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীরও আপোসে ভাব-বিনিময় হইয়া গিয়াছে; ইহার মাঝখানে এক স্থলে দাঁড়াইয়া 'স্নেহের দুলালী উমা' অপর স্থলে 'স্নেহের দুলাল গোপাল'; বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতায় গোপালের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করিয়া বুকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাঙলাদেশের শাক্ত-কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করিয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন একই মা। অবশ্য লীলার এবং লীলাক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে। একজনের বাল্যলীলা মুখ্যতঃ গোষ্ঠ অবলম্বনে—অপরের বাল্যলীলা অষ্টমবর্ষেই স্বামীর ঘর করণে। কিন্তু পুত্রকে

[২১] গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কলিত। [২২] ঐ। [২৩] ঐ।

অবলম্বন করিয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই হোক, যশোদা-রূপেই হোন আর মা মেনকা-রূপেই হোন—সেই একই 'মা'কে চিনিয়া লইতে কোনও অসুবিধা হয় না। রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা যেখানে হিমালয়কে ডাকিয়া বলিতেছেন—

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

সেখানে চিত্রটিকে সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং মেনকা স্থলে যশোদা এবং গিরিরাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা স্মরণ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না। গোপলের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কবিওয়ালার গান দেখি—

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর
নীলমণি ধনে;
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ,
বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি,
যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে ত নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা,
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইরে হারা
নয়নতারা দিয়ে বনে॥[২৪]

ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শাক্ত-সঙ্গীত—

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার।
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।

[২৪] মনুলাল মিশ্র; শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।[২৫]

লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য সত্ত্বেও মাতৃ-মনের ঐক্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া নন্দরাণী সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং গোষ্ঠ হইতে গাপোল ফিরিয়া আসিলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া যাইতেন।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসুখে
নিরখয়ে চাঁদ মুখপানে॥[২৬]

শাক্ত-পদাবলীতেও অনুরূপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন—

পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন-কমলে।[২৭]

কানু সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে—

গোগণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতি আওল
মোহন ভণিত রসাল॥[২৮]

এবং তাহার পরে—

পঞ্চদীপে নিরমঞ্ছন কেল।
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল॥[২৯]

[২৫] শা. প. (ক. বি.)।
[২৬] বলরাম দাস, পদকল্পতরু।
[২৭] মহেন্দ্রলাল খান (রাজা), শা. প. (ক. বি.)।
[২৮] পদকল্পতরু।
[২৯] মোহন, পদকল্পতরু।

আগমনী-সঙ্গীতেও দেখি কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে গিরিরাণী মেনকা—

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥[৩০]

কৃষ্ণের মথুরাগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও বাঙালী কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কৃষ্ণের মথুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই—

কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করতহি গান।[৩১]

তেমনই উমার কৈলাস-গমনেও দেখিতে পাই—

রাণি গো, সুধু তোমারি বেদনা ব'লে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়॥[৩২]

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর রাত্রিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখিয়া নন্দরাণী যশোদা কাঁদিয়া উঠিতেন। এই-জাতীয় চমৎকার একটি পদ দেখিতে পাই কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্ন-বিলাস' পালার মধ্যে। স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছে—সকালবেলা ব্রজরাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই কথা ব্রজরাজ নন্দকে বলিতেছেন।

শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
"জননী, দে ননী, দে ননী" ব'লে॥
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুস্বর
সঞ্চারিয়া ডাকে "মা" ব'লে।
যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,

৩০ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি)।
৩১ গোবিন্দদাস।
৩২ রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা. প. (ক. বি.)।

বললেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর্ সর্ বলি ফেলিলেম ঠেলে॥ ইত্যাদি।

সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাণী মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে!
ধৈরয না ধরে মম জীবনে।[৩৩]

আবার—

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার;
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।[৩৪]

দাশরথি রায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরী, কি করি, অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥

কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কবিতায় বাৎসল্য-রসের শুধু একটানা স্রোতই দেখিতে পাই—মাতৃ-হৃদয়ের বিগলিত স্নেহধারার সন্তানের উপরে অবিরল বর্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি স্রোত আছে; উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—যে আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অন্য সকল আসক্তির বন্ধন হইতে একেবারে মুক্তি দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বাৎসল্য নামে বহুখ্যাত বলিয়া মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রতিবাৎসল্য নাম

[৩৩] কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. (ক. বি.)।
[৩৪] কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. (ক. বি.)।

দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্ববিস্মারক আকুতি বৈষ্ণব-সাহিত্যে নাই—শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্যে নয়, অন্য কোনও সাহিত্যেই এমন করিয়া নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের এই শাক্ত-সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক—রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি। সুখে দুঃখে, আশায় নৈরাশ্যে, পাওয়ায় না-পাওয়ায়, হাসিতে অশ্রুতে মিলাইয়া এই 'মা' ডাক। সর্বব্যাপিনী সর্বৈশ্বর্যময়ী আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া রস-বিস্ফারিত-নেত্রে করুণার্দ্র-কণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার 'ভবের গাছে জুড়ে দেওয়া' চোখে ঠুলি বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘুরিতে ঘুরিতেই শ্রান্ত-কণ্ঠে মায়ের নাম,[৩৫] না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে ভুগিতে ভুগিতেই মায়ের নাম[৩৬], আবার ডাকিতে ডাকিতে সাড়া না পাইয়া অভিমানের অবিরল অশ্রুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই সাধন-শক্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বলিয়াছিলেন—

এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা।
বৎস্য পাছে গাভী যেমন তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥

হৃদয়ের সমস্ত আর্তি আকুতি উত্তরহীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন শিলাতটে মাথা কুটিয়া কুটিয়া একদিন হয়ত ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিয়াছে—

মা ব'লে আর ডাকিস্ না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥[৩৭]

অভিমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বলিয়াছে—

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই॥[৩৮]

পুঞ্জীভূত অভিমানের জ্বালায় রামপ্রসাদও একদিন মায়ের সহিত সব হিসাব-নিকাস বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

মা মা ব'লে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না॥

[৩৫] 'মা আমায় ঘুরাবি কত' প্রভৃতি, রামপ্রসাদ।
[৩৬] 'তারা কোন্ অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল।'—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)।
[৩৭] নরচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.)।
[৩৮] নরচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.)।

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছিস চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥

কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এইসব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমানের চোখের জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মা যে শ্মশানবাসিনী, অন্যত্র মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলা-ক্ষেত্র রচনা করিবার সাধনা। কামনা-বাসনা-আসক্তিকে নিঃশেষে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে শ্মশান করিতে হয়; দগ্ধ কামনা-বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়িনী মা তাঁহার দুই চরণ। সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান—

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি॥

আমরা বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলীর ভিতরকার মিলের কথাই আলোচনা করিতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলীতে বর্ণিত বাৎসল্য-রসের কথা বলিতেছিলাম। এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপূর্বক বিষহরীর পূজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দিয়া বাসুলী পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ, ফলে শাক্ত-ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পূর্ণিমা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহা-সমারোহে পূজিতা হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বের একটা জনপ্রিয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবলুপ্ত হইয়া যায় দুই জাতীয় হৃদয়ে, এক যথার্থ সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কবি হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই নাই। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী; সুতরাং কবিগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে আমাদের যে-সকল যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের সুর দেখিতে পাই। এইসব যাত্রা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শক্তি-উপাসক —কালী-উপাসক। রাধা লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা! ননদিনী

কুটিলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে অভিযোগ করিল, বধূ রাধা লুকাইয়া কৃষ্ণের পূজা করে। আয়ান ভগিনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে আসিলেন—আসিয়া দেখেন—

কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জীব ভ্রান্ত॥
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।
কি বা কাল শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালো শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধি তুলসী দিয়ে
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রঙ্গিণী রাই করে সেবা
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত।[৩৯]

বাঙলাদেশে চলিত কৃষ্ণ-যাত্রায় এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোল্লাস সমর্থন লাভ করে—এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামপ্রসাদের গানেও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে।[৪০]

ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শাক্ত-পদাবলীতে। সেখানে সমন্বয় দেখা দিয়াছে শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিত্বের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভীর রূপ দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম অনুভূতির মধ্যে তিনি লাভ করিয়াছিলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরমআনন্দ তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তিনি কোথাও কোন ভেদ দেখিতে পান নাই। তাই তিনি অতি সহজভাবেই গাহিতে পারিলেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।

... ...

নিজ-তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥

সাধকের নিকট রূপ ত কেবল ভিতরে কতগুলি ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া

[৩৯] দাশরথি রায়ের পাঁচালী।

[৪০] কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
কৃষ্ণ-কালী-বিষয়ে কবিওয়ালা লালু নন্দলালের বিস্তৃত বর্ণনা 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সঙ্কলিত) গ্রন্থের ৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লইবার জন্য এবং লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ কালীকে অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—মায়ের যে একই সময়ে অসি-মুণ্ড-বর-অভয়ের লীলা চলিয়াছে তাহাই আস্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে এক পরমসত্যের কালীরূপে লীলা—তাঁহারই কৃষ্ণ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন করিতে সাধকের কিছুই বাধা নাই। তাই লীলা-বৈচিত্র্য-প্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দেখি—

যশোদা নাচত গো ব'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী?

গভীর অধ্যাত্মানুভূতির সহিত সরল কবিপ্রাণ যুক্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে যে সত্য প্রতিভাত হইল তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই অন্যান্য কবিগণের মধ্যেও। সাধক কমলাকান্তও কালীকে 'পরম কারণ' বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এই 'পরম কারণে'র নারীরূপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই।

জান না কি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥[৪১]

এ সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার। ইঁহারা কবি মরমিয়া সহজপন্থীদের দলের। হৃদয়ের যে মন্দিরে অসি-মুণ্ডধারিণী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা-আস্বাদন করিবার অভিলাষ।—

হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।

[৪১] শা. প. (ক. বি.); তুলনীয়—
অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী॥—রামলাল দাস দত্ত, ঐ।

হৃৎ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে॥[৪২]

একটু প্রণিধান করিলেই বোঝা যাইবে, শাক্ত-পদাবলীতে এই-জাতীয় গান কোনও তরল প্রভাবজনিত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছু নাই এমন কথা বলিতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা দিতে হইবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব শাক্ত-সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে নাই এমন কথাও বলিতে পারি না। গোবিন্দ অধিকারীর রচিত রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ্ব একটি প্রসিদ্ধ গান।[৪৩] ইহারই অনুকরণে পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী-জয়ার দ্বন্দ্ব' দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া।

নন্দী বলে, আমার শম্ভু যেন রজতগিরি,
জয়া বলে, গৌরী আমার সুবর্ণ বল্লরী,
রূপে জগৎ আলো।
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী,
জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা বলব কত!
নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা,
জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী।
নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ বদনমণ্ডলে,
জয়া বলে, দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে,
পাগল পঞ্চানন। ইত্যাদি।[৪৪]

(খ) শাক্ত সাধন-সঙ্গীত ও লীলা-সঙ্গীতের সাধারণ পরিচয়

বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলীর ভিতরে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিল আমরা লক্ষ্য করিলাম; কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও উভয়বিধ পদাবলীর মধ্যে আকার-প্রকারগত মৌলিক পার্থক্যও রহিয়াছে।

৪২ শা. প. (ক. বি.)।

৪৩ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন? ইত্যাদি।

৪৪ শা. প. (ক. বি.)।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষ্ণব-কবিতার সহিত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া আমরা শাক্ত-কবিতাগুলিকে 'পদাবলী' নাম দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শাক্ত-পদাবলী সবই মূলতঃ শাক্ত-সঙ্গীত। বৈষ্ণব-পদাবলীও অবশ্য সবই গান; তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কবিতার দিক্‌ও আছে। শুধু গানরূপে আস্বাদ না করিয়া গীতি-কবিতা-রূপেও বৈষ্ণব-পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। শাক্ত-পদাবলীর এই গীতি-কবিতার দিক্ অতি অপ্রধান। গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, গীতি-কবিতাও রচনা করিয়াছেন। যেগুলি গীতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সুর-সংযোগ করিলে সেগুলি গানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু সুরসংযোগ ব্যতীতও কবিতার ছন্দে আবৃত্তি-দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব। কিন্তু যেগুলি মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দিয়া দিলে সেগুলি কবিতা হইয়া ওঠে না; সুর-সংযোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্ স্ফুরণ নাই; সুর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফুট সূক্ষ্ম-সুকুমার অর্থসকল ব্যঞ্জিত হইতে থাকে—সুরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা যাহাকে 'শাক্ত-পদাবলী' নাম দিয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা। গীতি-কবিতার প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বেশি; এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে এগুলিকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় না। বৈষ্ণব-কবিতার বিচার বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে। মূলতঃ গান বলিয়া অধিকাংশ শাক্ত-কবিতাই আকারে সংক্ষিপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়বন্ধ বলিয়াই তাহার পরিধিও স্বাভাবিকভাবেই সংহত।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, শাক্ত-সঙ্গীতগুলি মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত। বৈষ্ণব-কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্ আছে; কিন্তু সব বৈষ্ণব-কবিতার প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পারি না। চৈতন্য-পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষ্ণবগণের একটা প্রধান সাধনা-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণও কৃষ্ণ-লীলার বা গৌরাঙ্গ-লীলার পরিকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লীলা-শুকের ন্যায় লীলা-সঙ্গীতের দ্বারাই লীলা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির কাব্য-প্রেরণার মূলেই এই সাধন-স্পৃহা বলবতী ছিল, একথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিগণের সম্বন্ধে তো বলা আরও শক্ত। রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবর্তী কালেও কবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ছিল—এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষ্ণব-সাধক তাঁহারা সব পদই লীলা-সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু বৈষ্ণব-প্রার্থনার পদগুলি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীগুলি মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা

এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্যকারগণ-কর্তৃকও রচিত হইয়াছে—সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তি-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবন্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সংগীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রসূত। অন্ততঃ শাক্ত-সংগীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যটিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে।

অবশ্য শাক্ত-গানগুলিকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়া-সংগীতগুলি মুখ্যভাবে লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলিরও একটি সাধনার দিক্ রহিয়াছে—যেমন রহিয়াছে বৈষ্ণব-লীলা-গীতির সাধনার দিক্। আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শাক্ত-লীলা-গীতির ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সংগীতগুলির অন্তর্নিহিত সাধনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

একটি জিনিস আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও সাহিত্য-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর সহিত শাক্ত-পদাবলীর ঠিক ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্মসংগীতের ক্ষেত্রে শাক্ত-পদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা গোষ্ঠী-চেতনার রূপ লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বা ভগবৎ-চৈতন্যরূপে বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবিত জনসমাজে ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা একরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা তখন ক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে একটা গোষ্ঠী-চেতনারূপে দেখা দিল। এই ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসক্তির মধ্যে কোনও রূঢ় ব্যক্তি-জীবনের জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই গোষ্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কবিগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে। বৈষ্ণবতা তাহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা-দ্বারা যখন এই-জাতীয় একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে কবিগণের মধ্যে দেখা দিল, তখন বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেকখানি প্রথাবদ্ধতা, গতানুগতিকতা এবং রীতি-প্রবণতা।

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গানগুলিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিধার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের

একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিতেছেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।[১]
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥......
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥

কিন্তু মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি—এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়া-চলা জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য-শক্তি রহিয়াছে কিনা—এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার জমিদারিতে মুহুরীগিরি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবর্তী জীবনে শুধু কিঞ্চিৎ রাজ-অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইয়াছে। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝাভরা জীবন —তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ী মাতৃ-চেতনা। এই চেতনায় বার বার প্রতিকূল কম্পন দেখা দিয়াছে। কোনও শুভ মুহূর্তে হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মন অনেক ঊর্ধ্বে এক সীমাহীন মহাচৈতন্যের মধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়—'কালীপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল!' কিন্তু সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাভ করা যায় কই? তাই ত পরমুহূর্তেই আবার—'কলুষ-কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।'[২] তত্ত্বকথার বাঁধাবুলিতে বাস্তব দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলিতে না পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দারিদ্র্য লইয়া তাঁহার 'মায়ের' সহিত রীতিমত তর্ক করিতে দেখি—

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥

[১] ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই—পাঠান্তর।
[২] পদটি রামপ্রসাদের বলিয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভণিতাতেও গৃহীত হয়।

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারি ॥

এই তর্ক শুধু রামপ্রসাদের তর্ক নয়; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যবিত্ত দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সম্প্রদায় তাহাদেরই চেতনায় একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই তর্কের ইচ্ছা। রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের অদ্ভুত একটি পদে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন ,

এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি
সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥

কালী মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মা বলিয়া সমস্ত জীবনটা শুধু মঙ্গলে আর আনন্দেই ভরা—এমন ছেঁদো বুলিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই; রামপ্রসাদ সারা জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহাপেটা'ই করিয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ 'সাবাস্' পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই-সমস্ত 'লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার করিয়া তিনি মাকে স্বীকার করিবার চেষ্টা করেন নাই, এই 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তিনি ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্ব-জীবনের পিছনে একটি মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে অটুট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার রক্তাক্ত দেহমন লইয়া। রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক ধর্মবোধের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আভাসিত বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটায়।

রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে বাস্তব-জীবন-জিজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখিতে পাই তাঁহার পরবর্তী শাক্ত-সঙ্গীতকারগণের গানের মধ্যেও ধর্ম-বিশ্বাসের এই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। আর বাস্তব জীবনের সঙ্গে শাক্তগণের সঙ্গীত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বলিয়াই দেখিতে পাই, শাক্ত-সঙ্গীতের ভাষাও হইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা। তালুক-জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, লেন-দেন, দলিল-দস্তাবেজ, ঋণ-বন্ধক, নায়েব-তফিলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কলু-কৃষক—কাহারই এই সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শাক্ত-সঙ্গীতকেই সাধন-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিলেও উহাদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—লীলা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রিত সাধন-সঙ্গীত, আর বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীতগুলিতে তৎকালে প্রচলিত বাঙলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই বিবরণ দেখিতে পাই। ভক্তি ও যোগাশ্রিত তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে

ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শাক্ত কবিগণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি এবং ঐ বিশিষ্ট ভঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগুলির সহিত এই শাক্ত-সাধন-সঙ্গীতগুলির একটা মিল অতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গুহ্য রহস্য ও সাধনালব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতকগুলি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই রূপকগুলিও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব সমাজ-জীবনের আশপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে। শাক্ত-সাধন-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই জিনিসটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও যে-সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জীবনের চারিদিকে ছড়ানো দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীত। চর্যাপদের মধ্যে একটি পদে দেখি দাবাখেলার রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদটি এই—

'করুণাকে পিঁড়ি করিয়া নয়বল (দাবা) খেলিতেছে; সদ্‌গুরুর বোধে ভববল জিতিলাম।...প্রথমে তুড়িয়া বড়িয়া মারিলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া (কিস্তিমাৎ করিয়া) ভববল জিতিলাম।'[৩]

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি রামপ্রসাদের একটি পদ :

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥

... ...

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে
অবশেষে এই কি ছিল!
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল॥[৪]

রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা :

ভবের আশা খেলব পাশা,
বড়ই মনে আশা ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো॥

[৩] করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল। ইত্যাদি, ১২ নং।
[৪] ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ গ্রন্থে সঙ্কলিত।

পঁবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো
পাঁজা ছক্কায় বন্ধ হলো॥[৫]

একটি চর্যাগানে দেখিতে পাই সূর্যকে লাউ করিয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবর্তী দণ্ড করিয়া একটি বীণা-যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সুমধুর ধ্বনি বাহির হইতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্ত সমরসে প্রবেশ করিয়াছে।[৬] গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শাক্ত-সঙ্গীতে দেখি—

মন-সেতারে বাজারে তার, তারা তারা ব'লে

... ...

তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'লো,
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে॥
ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে,
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দুস্তরে॥[৭]

একটি চর্যাপদে আমরা শুঁড়ীর ভাঁটিতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই।[৮] রামপ্রসাদের একটি গানে দেখি—

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে॥

ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে পঞ্চতথাগতরূপ পঞ্চ কেড়ুয়াল (দাঁড়), সৃষ্টি-সংহার-রূপ দুই চাকা ও মাঝখানে অম্বয়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।[৯] কমলাকান্তের একটি গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দেখিতে পাই :

মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা,
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে॥[১০]

[৫] তুলনীয় রসিকচন্দ্র রায়ের গ্রাবুখেলার রূপক—
সাধন-রূপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা মেরে॥—শা. প. (ক. বি.)

[৬] সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। ১৭সং

[৭] শা. প. (ক. বি.)

[৮] এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ৩ সং

[৯] ১৪ সং।

[১০] শা. প. (ক. বি.)

ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারির রূপক,[১১] কোথাও তবিলদারের রূপক,[১২] কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক,[১৩] কোথাও দিনমজুরের রূপক,[১৪] কোথাও 'কুয়োর ঘড়া'র রূপক,[১৫] কোথাও রোগের রূপক,[১৬] কোথাও কূপের রূপক,[১৭] কোথাও আবার ঘুড়ি উড়াইবার রূপক[১৮] কোথাও বা কাপড় ধোপ দিবার রূপক[১৯] দেখিতে পাই। এই-সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই-একটি রূপক জনপ্রিয়তার দ্বারা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; একটি হইল কৃষির রূপক :

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥

১১ শুনরে মন-জমিদার, ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি!
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উসুল তহশীল দিলি ছাড়ি।
—কবি অজ্ঞাত, শা. প. (ক. বি.)

১২ আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি॥—রামপ্রসাদ, শা. প.।

১৩ মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?—রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.)

১৪ ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে—রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.)

১৫ আর কত কাল ভুগবো কালী হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া॥
—প্যারীমোহন কবিরত্ন, শা. প. (ক. বি.)

১৬ তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন?
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন॥—রামচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.)

১৭ দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড়্‌রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল—কাল্-রূপ জল—কাল-মনোরমা!—দাশরথি রায়, শা. প. (ক. বি.)

১৮ শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি॥—রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.)

১৯ বাসনাতে দাও আগুন জেবলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই আপদ্ বালাই,
মনের ময়লা যাবে কাটি॥
কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল।
(আর) পাপকাষ্ঠের আখা জ্বালো,
চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁটি॥—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)

অপরটি হইল ডুবুরীর রূপক :

ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে॥

গৃহীর ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-যাত্রার একটি রূপকও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপুত্র,
তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি।

আমরা বলিয়াছি, শাক্ত-পদাবলীকে সাধারণতঃ দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। লীলা-সঙ্গীত হইল উমার স্বামি-গৃহ কৈলাস হইতে পিতৃগৃহ গিরিপুরে আগমনে এবং গিরিপুর হইতে পুনরায় বিদায়ে; সাধন-সঙ্গীত মায়ের রূপের ধ্যানে এবং ভিতরে তান্ত্রিক সাধনায়। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভাগ খুব সুষ্ঠু নয়, কারণ অনেকগুলি লীলা-সঙ্গীতের সঙ্গেই সাধনার কথাও যুক্ত আছে। সাধারণভাবে যেখানে মানবীয়-রসে দেবীর কন্যা-লীলাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহার পিছনেও একটা গভীর সাধনার দিক্ আছে—সেই সাধনার কথাও আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। তবে আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই লীলা-সঙ্গীতে মর্ত্যজীবনের প্রতিচ্ছায়ায় দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে লীলা বিস্তার করা হইয়াছে মানব-রসই তাহার বহু স্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে এবং শিবায়নে দেবীর মানবীকরণের কথা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভিন্ন যুগেও এই মানবীকরণ যে কতভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা লইয়াও আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনার মধ্যে আমরা এই সত্যটিও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে দেবীর এই মানবীকরণের মধ্যে একটা যুগোচিত রূপান্তর রহিয়াছে। কবিগণ তাঁহাদের নিজের নিজের সমাজ-জীবনের পটভূমিতেই দেবীকে মানবীয় মূর্তিতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা রামেশ্বরের শিবায়নের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছি দেবীকে কবি অষ্টাদশ শতকের সমাজ-জীবনের সকল স্তরের সহিত কিরূপে সহজে যুক্ত

করিয়া লইয়াছেন। আমাদের শাক্ত-পদাবলীর ভিতরকার আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগুলি মুখ্যভাবে অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে রচিত; কবিগণও মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত; ফলে এই আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া আমাদের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটি যেমন বাস্তবরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে আমাদের অন্য কোনও জাতীয় সাহিত্যেই আর এমনটি দেখিতে পাই না।

আপাততঃ আমরা আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতের পিছনকার ধর্মের পটভূমির কথা একেবারে বাদ দিয়া, এই গানগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে আমাদের তৎকালীন সমাজ-জীবনের যে বাস্তবরূপ, তাহারই একটা পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি কালিদাসের সময় হইতে উমার যে দেবী-মানবী-মিশ্রিত মূর্তিখানি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট গার্হস্থ্যছবি এবং একটি সাধারণ সমাজ-চিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। শঙ্করের সহিত যে উমার বিবাহ হইয়াছিল পার্থিব দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল, বটুব্রাহ্মণবেশধারী মহাদেবের তপস্বিনী উমার নিকটে শিব-নিন্দার মধ্যেই সেই অসঙ্গতির আভাস রহিয়াছে, একথা আমরা বিস্তৃতভাবে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। উমা একান্তই উদ্ভিন্ন-যৌবনা সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী; মহাদেব জটাজুটধারী, বিভূতিভূষণ বৃদ্ধ পতি; পরিধানে তাঁহার ব্যাঘ্রাম্বর, সর্প তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, ভূতাদি তাঁহার সহচর—শ্মশানে তাঁহার বিচরণ। সমস্ত বর্ণনার পিছনে একটি অধ্যাত্মবিশ্বাস যোগেশ্বর শিবের মহিমা ব্যঞ্জিত করিয়াছে, তথাপি পার্থিব দৃষ্টিতে অসঙ্গতির কথাগুলিকেও কালিদাস একেবারে অস্বীকার করেন নাই। শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য-জীবনের এই অসঙ্গতি পরবর্তী কালে বিবিধ পুরাণাদিতে, বিভিন্ন সংস্কৃত কবির বর্ণনায় এবং প্রবাদ-উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সমাজ-জীবনের মধ্যে উমা-শঙ্করের মিলন এবং গার্হস্থ্য-জীবন একটি বাস্তব অর্থ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই চরম পরিণতি। আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলি এবং শিবায়নের মধ্যে বৃদ্ধ ভিখারী শিবের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীর বিবাহ এবং পরবর্তী দারিদ্র্য এবং তজ্জনিত কলহ-অশান্তিময় গার্হস্থ্য-জীবনের বহু-রঞ্জিত চিত্র দেখিয়া আসিয়াছি। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং তৎসহচর আর্থিক বিপর্যয়ের ভিতরে বাঙলার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণ নিজদিগকে একটা চরম দুরবস্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আর্থিক জীবনের বিপর্যয় আরও তীব্রতা লাভ করিল সামাজিক রীতি-নীতির নিপীড়নে। একদিকে কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহপ্রথা—অন্যদিকে অষ্টম-

বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদানপ্রথা বর্ণহিন্দুর নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকাবহ ফল ধারণ করিতে লাগিল। বিত্তহীন এবং উপযুক্ত পুত্রহীন পিতা-মাতার পক্ষে উপযুক্ত বরে কন্যাদান সম্ভব ছিল না; শরণ লইতে হইত তাই ব্যবসায়ী ঘটকের। তাঁহাদের সমূহ কিছু লাভের প্রত্যাশা ছিল, বিবেকের কোন বালাই ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কপর্দকহীন হোক, ভাঙ-ধুতুরা-খোর হোক, আর অতিশয় বৃদ্ধ হোক, বন্দ্যবংশজাত বর একটি যোগাড় করিয়া দিতে পারিতেন এবং বচনচাতুর্যের দ্বারা সাময়িকভাবে পিতামাতার দুরাশঙ্কাও দূর করিয়া দিতে পারিতেন। বিবাহ হইয়া অষ্টমবর্ষীয়া সোনার পুতুলী গৌরী স্বামীর ঘর করিতে যাইত; কিন্তু হায়! যাইয়া দেখিত, সংসার নয় ত শ্মশান-পুরী—দারিদ্র্যে, কলহে-কোন্দলে খাঁখাঁ করিতেছে! একে কঠোর দারিদ্র্য, তাহাতে স্বামী উদাসীন, ক্ষ্যাপাটে, নেশাখোর,—তাহাতে আবার গৃহে একাধিক সতিন। দুদিনে উমার সোনার অঙ্গ কালী হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে বছর ফিরিয়া আসে। লোকমুখে সংবাদ গিয়া পেঁছায়, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে জাগে কানাকানি; পিতা শুনিতে জানিতে পান সকল কথা, কিন্তু কি করিবেন, নিরুপায় হইয়া পাষাণ হইয়া 'অচল'ভাবে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন ত কিছুতেই মানে না—দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; তিনি পাগলিনী হইয়া ওঠেন—শতবার মাথা খুঁড়িয়া তাগিদ দিতে থাকেন পাষাণ পতিকে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, ভাঙ্গা কুঁড়েতেই মাটির প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে, আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যায়, তিন দিন সে বাপের ঘরে থাকে—আবার সকলকে অশ্রুমুখী করিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ইহা লইয়াই বাঙলার নিম্নমধ্যবিত্ত কবিগণ কবিতা রচনা করিলেন—তাহাই আমাদের আগমনী ও বিজয়া-গান।

সামাজিক পটভূমির উপরে মানবীয় রসকে জমাইয়া তুলিবার জন্য এই যুগের কবিগণ হিমালয়-মেনকাকে একটি অত্যন্ত নিঃস্ব দম্পতি করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কালিদাসে কিন্তু দেখিতে পাই, শিব ব্যাবহারিকভাবে ভিখারী হইতে পারেন বটে, কিন্তু দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনও অভাব নাই। অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনায়ও শিবের দারিদ্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিরাজ-মেনকার দারিদ্র্যের কোথাও আভাসমাত্র নাই। কিন্তু গিরিরাজ গিরি-রাণীর সংসারেও দারিদ্র্যের আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল বাঙলা মঙ্গল-কাব্য-গুলিতে আসিয়া—আর শুধুমাত্র স্নেহসম্বল বিত্তহীনরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এই আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতে। তাঁহারা একদিকে যেমন সমাজ-জীবনে একান্ত ধনহীন, অন্যদিকে তাঁহারা জনহীন; বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যা গৌরী ছাড়া আর সন্তান নাই; শুধু যে নাই তাহা নয়—একমাত্র উপযুক্ত পুত্র ছিল মৈনাক; কিন্তু সেও মনের দুঃখে (সমাজ-জীবনের সর্ববিধ ব্যর্থতায়?) সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপ দিয়া

মরিয়াছে।[২০] এই অবস্থায় কন্যা-বিবাহের উপায় কি? সম্বল একমাত্র 'ঘটক'; 'চক্ষুলজ্জাহীন' নারদকে দেখিতে পাই এই ঘটকের ভূমিকায়। 'কুমারসম্ভবে' কিন্তু ঘটক হইয়াছিলেন অরুন্ধতী-সহ সপ্তর্ষি; কিন্তু সপ্তর্ষিতে বাঙালী কবিগণের তেমন সুবিধা হয় নাই, তাই মঙ্গল-কাব্যের সময় হইতে দুরভিসন্ধিপ্রবণ এবং চক্ষুলজ্জাহীন এই নারদটিকে তাঁহারা যোগাড় করিয়া লইয়াছেন। আর এ-সব কাজের জন্য বাঙলা সাহিত্যে নারদকে ত আর বেশি খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না, বাঙালী কবিগণের হাতের কাছে অতি সহজলভ্য লোক ছিলেন এই নারদ; হিমালয়-মেনকার নিকটেও তাই তিনিই সহজলভ্য এবং ঘটকালি-মধ্যস্থতায় পরমোৎসাহী বলিয়া সাদরে অভ্যর্থিত এবং নিয়োজিত হইলেন। আসলে আমাদের গৌরীর পিতা গিরিরাজ যে কেবল সামর্থ্যহীন তাহা নয়, তিনি আবার স্বভাবেই একটু 'অচলপতি' (আধুনিক 'কুঁড়ের বাদশা'); নাড়িয়া-চাড়িয়া কোনও কাজকর্মের মধ্যে যাওয়াই তাঁহার একান্তভাবে স্বভাব-বিরুদ্ধ; সুতরাং সঙ্গতিহীন হইলে যে পরিমাণ করিতকর্মা হইয়া হাঁটিয়া-ছুটিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বর যোগাড় করিতে পারা যাইত গৌরী-পিতার দ্বারা আর তাহা কিছু হইল না,—অতএব সেই 'অল্পেয়ে কাণা ঘটক' নারদকে দিয়াই তিনি কাজ সারিলেন। ফলে জুটিলেন একটি বন্দ্যবংশীয় কুলীন বহুপত্নীক কপর্দকহীন ভাঙখোর প্রায় দিগ্বসন বর। বর দেখিয়া পাড়া-প্রতিবেশী যতই বিমর্ষ হইয়া পড়ুক আর উমার মা অঝোরে যতই কাঁদুন আর স্বামীর প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করুন, অথবা ঘটক নারদের বাপান্ত করুন—শেষ পর্যন্ত এই বরেই মেয়ে দিতে হইল।

এই বরে মেয়ের বিবাহ দিয়া বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামী ত একে 'অচল-পতি' তাহাতে পাষাণে-গড়া দেহমন—সুতরাং তিনি ত একেবারে নির্বিকার! কিন্তু মায়ের যে মুখের আহার চোখের নিদ্রা সব ঘুচিয়া গিয়াছে! একে উপার্জনে অক্ষম বিত্তহীন বৃদ্ধ স্বামী—তাহাতে আবার নেশায় মাতাল হইয়া ভূতপ্রেত-সঙ্গে শ্মশানে-মশানে রাত্রিবাস—তাহাতে আবার সতিনীর জ্বালা—তাহাতে গৌরী অষ্টমবর্ষীয়া কিশোরী। দুশ্চিন্তার দুঃস্বপ্নেই মায়ের রাত্রি কাটে। আমরা নানা উপাখ্যানে দেখি, গৌরীই কালী। তাঁহারা কেন অভেদ সে সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু আগমনী-বিজয়া-গানের কবিগণ গৌরীর কালী

[২০] মৈনাক-পর্বত হিমালয়-পর্বতের পুত্র বলিয়া কল্পিত। গোত্রভিদ্ ইন্দ্রের ভয়ে মৈনাক দক্ষিণ-সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়াছে (অথবা পলায়ন-কালে ইন্দ্রকর্তৃক পাখা কর্তিত হওয়ায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে) বলিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান। বাঙালী কবিগণ এই মৈনাকের সমুদ্রে পতনের উপাখ্যানকে নানাভাবে রঙ্ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি, 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥' এমন বরের সহিত একমাত্র বোনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া 'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।'

হইবার অদ্ভুত মমতাস্নিগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণেই গৌরীর সোনার অঙ্গ দুই দিনে কালী হইয়া গিয়াছে! মা মেনকা তাই একদিন প্রভাতে গিরিরাজকে রাত্রের দুঃস্বপ্নের কথা বলিতেছেন—

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি নয়নে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।[২১]

মেয়ের সব আভরণ ত ভিখারী মাতাল ভোলা বেচিয়া খাইয়াছে! বাঙলা-দেশের বৈরাগীরাও গান গায়—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।
উমার যতেক বসন-ভূষণ, ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে॥

সুতরাং এই ঘরে বরে পড়িয়া উমা যে অস্থিচর্মসার হইয়া 'নির্মাংসা' চামুণ্ডা কালী হইয়া উঠিয়াছে! পৌরাণিক কাহিনীর কি অপূর্ব মানবীয় ব্যাখ্যা! কবি শ্রীধর কথক ইহার উপরে আরও রঙ চড়াইয়াছেন। স্বামী রাত্রিতে বাড়িতে আসে না, নেশা করিয়া শ্মশানে পড়িয়া থাকে; দেখিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উমাও ঘর ছাড়িয়াছে, নিজের বেশভূষা ছাড়িয়া বিপরীত বেশভূষা ধরিয়াছে—অভিমানে সে পাগলিনী হইয়াছে—সেও এখন নেশা ধরিয়া সুরা পানে মত্ত হইয়াছে।—

শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে॥[২২]

এই নিঃস্ব নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কঠোর দারিদ্র্যের সত্য শিবের নীল-কণ্ঠত্বের এবং দিগ্বসনত্বের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছে। পেটের জ্বালায় গরল খাইয়াই তিনি নীলকণ্ঠ, বস্ত্রাভাবেই তিনি দিগ্বসন!—

পেটের জ্বালায় গরল খেলেন,
দিক্‌বাস বসন বিনা॥[২৩]

শুধু ত ঘরে বসিয়া একা একা দুশ্চিন্তা এবং দুঃস্বপ্ন নয়; কালে-ভদ্রে বাপের

[২১] হরিশচন্দ্র মিত্র, শাক্ত পদাবলী।
[২২] পদটি ঈশ্বর গুপ্তের নামেও পাওয়া যায়; শাক্ত পদাবলী (ক. বি.)।
[২৩] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শাক্ত পদাবলী (ক. বি.)।

বাড়ি গিরিপুরের কোনও লোককে যদি উমা কৈলাসে পায় তাহার নিকটেই যে সে তাহার দুঃখের কথা এবং মায়ের প্রতি অভিমানের কথা জানাইয়া দেয়। একদিন উমা নারদকে পাইয়াছিল, তাঁহার কাছেই কত কহিয়া দিয়াছে।—

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখে নারদে কত কয়েছে—
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে॥[২৪]

এমনি করিয়া একদিকে যেন গ্রামবাসীদের মুখের খবর—অন্যদিকে তেমনই আবার পাড়াপ্রতিবেশিনীগণের গায়ে পড়িয়া পড়িয়া 'বাসনা' দেখান। মা নিজে যদি কখনও বা একটু ধৈর্য ধারণ করেন, পাড়াপ্রতিবেশিনীরা যে আসিয়া ফুঁ দিয়া দিয়া স্তিমিত আগুন জ্বালাইয়া দিয়া যায়।—

কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাণি!
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী।
* * *
পাঠাইয়া উমা-ধনে ভিখারী শঙ্কর-সনে,
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী?
* * *
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি ব'লে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর-রমণি!
বিয়ে দিলে এম্নি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে,
অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুখিনী।[২৫]

কিন্তু যতই শুনুন আর যতই বসিয়া বসিয়া ভাবুন, মা মেনকা কি করিতে পারেন? তিনি যে বাঙালী ঘরের মেয়ে-মানুষ, তাঁহার সাধ্য কি? স্বামীর যাঁহার কোনও চেত-ভেদ নাই—পাষাণ দেহ, পাষাণ মন,—তদুপরি শুধু অটল নন, অচলও বটেন—ফিরিয়া বসিতেও নারাজ—তাঁহার গৃহিণীর ঘরে বসিয়া মাথা খারাপ করা ছাড়া আর উপায় কি?—

উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে।[২৬]

শুধু এইটুকুই নয়। অচল পিতাটির আরও অনেক গুণ ছিল। স্ত্রীর তাগিদে গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না তখন মেয়ে আনিতে যাইবার ভান করিয়া বাহির হইয়া যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া যত

[২৪] কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)।
[২৫] প্যারীমোহন কবিরত্ন, ঐ।
[২৬] মনোমোহন বসু, ঐ।

রাজ্যের মিথ্যা ওজর-আপত্তি ছলা-কলার দ্বারা গে'য়ো স্ত্রীকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও—

'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
'শরতে আসবেন পুরেতে'—ব'লে ভুলাতে।[২৭]

কিন্তু পিতার সেই ছলনা সব ফাঁস হইয়া যাইত যখন মেয়ে বাপের বাড়ি আসিয়া অভিমানে সব কথা বলিয়া দিত। মা-বাপ কিছুতেই আর তত্ত্ব করিতেছেন না দেখিয়া মেয়ে নিজেই একদিন মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা সমাদর করিয়া জড়াইয়া ধরিতে গেলে—

অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে ব'লে আন্‌তে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'ব না, যাব দু-দিন গেলে॥[২৮]

মেয়ের অভিমান শুনিয়া মা বুঝিতে পারিলেন, গিরিরাজের সবই তবে 'ভড়াকি'। তখন মা 'ঘরের মানুষে'র উপর এক হাত না লইয়া থাকিতে পারিলেন না।—

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে—'মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানী,
আস্‌তে চেয়েছে।'
তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে ঐ হে,—
'আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।'[২৯]

উমার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা পরস্পরের কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়া মা মেনকা গিরিরাজকে নিজের চোখে গিয়া একবার সব দেখিয়া আসিতে কত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। গিরিরাজ হয়ত তাড়নায় ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া চাদর-কাঁধে একবার পাড়া ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, না, উমার শরীরও ভাল আছে—সচ্ছল অবস্থায়ও আছে। কিন্তু তাহার পরে উমা নিজে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

[২৭] শাক্ত পদাবলী (ক. বি.)।
[২৮] গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঐ।
[২৯] রাম বসু, ঐ।

নিজের দুঃখের কথা যখন মাকে বলিয়াছে তখন মাকেও চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে—

বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়:
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অন্নদায়।[৩০]

কবিগণ মাতা মেনকার এই কন্যা-শোককে আরও তীব্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাকে পুত্রশোকাতুরা অঙ্কিত করিয়া। একমাত্র পুত্র মৈনাক যে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে এই দুর্বিষহ ঘটনাটিকে তাই কবিগণ মাতা মেনকার কন্যার জন্য বিলাপের মাঝে মাঝে জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ আর সন্তান থাকিলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রতি পড়িয়া থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পুত্র-সন্তান জীবিত থাকিলে আজ আর মেনকাকে কন্যার তত্ত্ব লইতে বৃদ্ধ পতির পায়ে সর্বদা এমন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইত না। মেনকার যে একদিকে 'ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার' অন্যদিকে আবার—

বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার।[৩১]

অন্যত্র মেনকা গিরিকে বলিতেছেন—'উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ-ঘর লাগে আন্ধার॥' ইহার সঙ্গেই দেখি—

সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়েছি পরাণ ধ'রে,
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর॥[৩২]

আবার—

পুত্রশোকে জীর্ণ-জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা-হারা, জীবনে কি ফল বল॥[৩৩]

[৩০] গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)।
[৩১] ঈশ্বর গুপ্ত, শা. প. (ক. বি.)।
[৩২] কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ঐ।
[৩৩] রূপচাঁদ পক্ষী, ঐ। তুলনীয়—

একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী, ডাক 'মা' বোলে।
উদয়চাঁদ বৈরাগী, ঐ।

আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিনদিন সুখে ছিলাম, তোর মুখ দেখে,
আজি কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শূন্য ক'রে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে॥

—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য', কৃষ্ণলাল।

বিজয়া-গানে দেখি, উমা কৈলাসে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া মা মেনকা বলিতেছেন—

আমার পাঁচ নাই, সাত নাই,
মা বলতে আর কেউ নাই,
রজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাঁচবে না।[৩৪]

লীলা-বিস্তারের জন্য কাহিনীকে নানা বৈচিত্র্য দান করিয়া কবিগণ রসের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও কোনও কবি বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া পিতামাতার সাড়া না পাইয়া অভিমানিনী হইয়াও উমা নিজেই আসিয়া মায়ের কাছে দেখা দিয়াছে; অন্য বর্ণনায় দেখি, গিরি নিজে গিয়া কন্যাকে লইয়া আসিয়াছেন। আবার পিতার এই কন্যা আনিবার বর্ণনায় কেহ কেহ বলিয়াছেন গিরি গৌরীকে দুই পুত্রসহ হাতীতে করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কোনও কবির মতে নিঃস্ব গরীব বাঙ্গালী পিতা হাতী-ঘোড়া কোথায় পাইবেন,—মেয়েকে সঙ্গে করিয়া হাঁটাইয়া আনিয়াছেন। সেই হাঁটিয়া আসিবার পথশ্রমের একটি চমৎকার চিত্র দেখিতে পাই কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে।—

পিতঃ বলগো অধিক বেলা হোলো
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে।
পারি নে আর চোলে যেতে,
অঙ্গ অবশ পথ শ্রান্তে;
দারুণ কঠিন পথ,

* * *

দারুণ রবির কিরণ, সর্বাঙ্গ করে দাহন,
আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দহিছে॥[৩৫]

যাহা হোক. উমা আসিয়া মায়ের কাছে পৌঁছিল। প্রথমটায় ত পাড়াপড়শী লইয়া কেবল আনন্দ-উৎসব। উমা যে আসিয়াছে, এখন ত উমা আর শুধু উমা নাই—এখন যে সে গণেশ-জননী। পুত্র লইয়া কন্যা বাপের বাড়ি আসিয়াছে। এ অবস্থায় মাতামহীর কাছে কাহার আকর্ষণ বড়—মেয়ের না নাতীর? দাশরথি রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মেনকারও সেই মাতামহীসুলভ ব্যাকুলতা—

বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়নযুগলে!

[৩৪] সারদা ভাণ্ডারী, প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি.)।
[৩৫] প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি.)।

এই আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেলেই ত মায়ে-ঝিয়ে সাংবৎসরিক সব সুখ-দুঃখের কথা। এই সুখ-দুঃখের কথাতেও সমাজের চিত্রকে নানাভাবে উপস্থিত করিয়া কবিগণ বিচিত্র রসের পরিবেশন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মেয়ে নিজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা অভিমানের সুরেই মায়ের কাছে খুলিয়া বলিতেছে। গৌরীর সবচেয়ে অভিমান এই, বৃদ্ধ মাতাল দরিদ্র স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া পিতামাতা আর তাহার কোনও সংবাদই করেন নাই।

বিদেশ হইলেও তবু এক কথা ছিল, 'হিমালয় আর কৈলাস—নহে দূর যাতায়াত'; অদূরে পাশের গাঁয়ে বিবাহ দিয়াও পিতামাতা তত্ত্ব করেন নাই! গৌরী মা-কে বলিতেছে—

কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,
"তোর কি মা নাই? তোর কি মা নাই?"
অমনি সরমে মরে যাই॥
তাদের বলি আমার পিতে
এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥[৩৩]

শুধু ব্যথা বেদনা নয়, মা-বাপের অবহেলায় সমবয়সী পাড়া-প্রতিবেশিনীদের নিকটেও যে বাপ-মায়ের অবহেলায় অপমান; তাইত মেয়ের এত অভিমান।

এই কন্যা-মিলনের দৃশ্য-রচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙালী মায়ের একটি চমৎকার চিত্র রচনা করিয়াছেন। গিরি মেয়ে আনিতে যান, মেয়ে উমাকেই লইয়া আসেন; ছিন্ন-বসন-পরিহিত বৃদ্ধ মাতাল জামাতা-বাবাজীকে তাঁহার আদৌ পছন্দ নয়, তাই অবজ্ঞাভরে তাহাকে বাড়ি আনিবার কথা তিনি আর কোন দিনই তোলেন নাই। কিন্তু এবারে গিরি যখন কন্যা আনিতে যাইবেন তখন মা বলিলেন—'গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।' তিনি আরও বুঝাইয়া বলিলেন—

'মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন',

এই প্রসঙ্গে মেনকা তাঁহার পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—

আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা ক'রে, জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব তো আছেন ভাল?"

[৩৩] গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি.)।

উমা বলে—"আছেন ভাল",—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—"চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল,
জামায়ের প্রসঙ্গে॥[৩৭]

কয়েকটি গানে আবার দেখি, উমা স্বামীর সত্য অবস্থা চাপিয়া গিয়া নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া মায়ের কাছে স্বামীর ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেছে।—

কে বলে দরিদ্র হর, রতনে খচিত ঘর মা,
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী॥[৩৮]

অথবা—

ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে![৩৯]

ইহার পিছনে উমার দুইটি মনোভাব—একটি হইল সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া খানিকটা বাড়াইয়া স্বামীর চরিত্র ও বৈভব সম্বন্ধে জননী মেনকাকে আশ্বস্ত করা। দ্বিতীয় হইল চিরন্তন বাঙালী বধূভাব; বিবাহের পরে মা-ও পর, স্বামীর রূপগুণ বৈভবের গর্বই মেয়েদের আসল গর্ব; সুতরাং মায়ের নিকটেই বা কেন স্বামীকে এবং শ্বশুরবাড়িকে ছোট করিয়া নিজে ছোট হইতে যাইবে? এখানে আরও একটি নারী-সংস্কার দেখা দিয়াছে। বিবাহের পূর্বে স্বামীর চরিত্র ভাল না থাকিলেও বা তাহার অবস্থা ভাল না থাকিলেও বিবাহের পরে নারীর ভাগ্যেই সকল অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—ইহাও নারীদের একটি বড় গর্ব। সে গর্ব শুধু মেয়ের নয়, সে গর্ব মেয়ের মায়েরও। আড়শী-পড়শীর নিকট মা মেয়ের সৌভাগ্যে জামাইয়ের অবস্থান্তরের কথা গর্ব করিয়া একটু বাড়াইয়া বাড়াইয়াই বলিয়া বেড়ান। এ-জাতীয় বর্ণনা আমরা সংস্কৃততেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি, শৈলদুহিতা গৌরীকে বিবাহ করিবার পর শিব শ্মশান ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে নূতন হর্ম্য গড়াইয়া বাস করেন, দিগ্বসন ত্যাগ করিয়া এখন উত্তম বসন পরিধান করেন, ভস্ম ত্যাগ করিয়া এখন অঙ্গে চন্দন মাখেন,—মোটামুটি বিবাহ করিয়া 'বাউণ্ডুলে' শিব এইবারে গৃহী হইয়া উঠিয়াছেন। এই মনোভাবটিরই আরও একটু বিস্তার দেখি বাঙলা গানে। বাঙলা দেশের মেয়ের মায়ের মুখে যেমন আমরা শুনিতে পাই, জামাই দূরদেশে গিয়া এখন উজির-

[৩৭] শা. প. (ক. বি.)।
[৩৮] কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)।
[৩৯] অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শা. প. (ক. বি.)।

নাজির হইয়া কত ঐশ্বর্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, মেনকার মুখে ঠিক তেমনটিই শুনিতে পাই; তিনি বলিতেছেন—

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই—
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে—'মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।[৪০]

অন্যত্র মেয়েকেই মা বলিতেছেন—

আমি জানিতাম শিব ভিখারী,
ভিখারিণী তুই শঙ্করী।
শুনিলাম—রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য।[৪১]

পৌরাণিক সত্যকেই বাঙালী কবিগণ কেমন একটু স্নেহ-মমতার স্পর্শে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।[৪২]

ইহার পরে দেখি, বাঙালী মেয়ের মায়ের ঘরে আসিয়া দু'-একদিন একটু স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবার আনন্দ। স্বামীর ঘরে ত সর্বদাই বাঁধা-বাঁধা—তাই মায়ের ঘরে দু'দিনের জন্য আসিয়া একটু ছাড়া পাইয়া পাড়া বেড়াইয়া লওয়া। পড়শীরা এ-ঘরে ডাকে, ও-ঘরে ডাকে—সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া পাড়াপড়শীদের ঘর হইতে পান মুখে করিয়া গৌরীর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া

[৪০] রাম বসু, শা. প. (ক. বি.)।
[৪১] রসিকচন্দ্র রায়, ঐ।
[৪২] তুলনীয়—
পর-চিতেন।—পূর্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব,
অভাব কিছুই নাই।
কত মণিময় হার, অভাব নাই তার,
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই।
ফুকা—শিবের নিত্য ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝুলি নাই,
ভস্মভূষণ নাই অঙ্গেতে।
কৈলাসধামেতে
এখন নাই অন্নের কষ্ট শুভ অদেষ্ট,
অন্নপূর্ণা তার গৃহেতে॥
মেলতা—এখন শ্মশানে নাই বাস,
অট্টালিকায় করেন বাস,
সদাই গৃহেতে বাস করেন উদয় বলে॥
—উদয়চাঁদ, প্রাচীন কবিওয়ালার গান।

শ্রান্তিতে সেই পান-মুখেই ঘুমাইয়া পড়া। মা সদা সতর্ক, মেয়ের শ্রান্তিতে আরামের ঘুমটুকু না ভাঙে!

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে,
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে—
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।[৪৩]

তাহা ছাড়া মায়ের কাছে আসিয়া উমা কয়েক দিন একটু আলসে বেলা পর্যন্ত ঘুমাইয়া লইতেছে—মা মেনকা ডাকিয়া তুলিতেছেন,—'গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো'।[৪৪] কোথাও দেখি উমা পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিতা, মা আদরে ডাকিয়া তুলিয়া কিছু খাবার জন্য বলিতেছেন।—

উঠ মা সর্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী।
পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী॥
কর্পূরবাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি,
খাও কিছু প্রাণ-কুমারী করি আয়োজন।[৪৫]

ইহার পরেই বিজয়ার পালা। মায়ের ঘরে দু'-তিন দিন ত দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, এখন ত আবার গিরিপুর ছাড়িয়া কৈলাসে যাইবার তাড়া। উমারই গরজ বেশি, কড়া মেজাজের ক্ষেপাটে স্বামীর ভয়। মা ডাকিয়া বলেন,—এখন ত আর কচি খুকীটি নাই—এখন ত ডাগর-ডোগর—এখনও আবার অত ভয় কিসের?

এসেছিস্ মা—থাক না উমা দিন-কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত?
* * *
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর।
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।[৪৬]

ডাগর-ডোগর হইয়াই ত মুশকিল হইয়াছে, উমা যে এখন নিজের ঘর চিনিয়াছে, মায়ের বাড়িই তাই এখন পরের বাড়ি হইয়া উঠিয়াছে! এখন শিব নিতে না আসিলেও মেয়ে যে নিজের গরজেই যাইতে চায়।—

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায়![৪৭]

[৪৩] রাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. (ক. বি.)। [৪৪] নীলকণ্ঠ, ঐ। [৪৫] অজ্ঞাত, ঐ।
[৪৬] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঐ। [৪৭] বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ঐ।

মায়ের প্রাণ আবার আকুল হইয়া ওঠে—শিহরিয়া ওঠে বিজয়া-দশমীর বিদায়-বিসর্জনের কথা স্মরণ করিয়া।—

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে,
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।[৪৮]

মায়ের তাই কেবল ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রাত্রিটি আর না পোহায়।

'ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান'।[৪৯]
রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।[৫০]

কিন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্ত্বেও নবমীর নিশি অবসান হয়; একদিকে 'মা প্রকাশি নিজ মায়া হ'লেন চঞ্চল', অপর দিকে আবার গিরিপুরে হরের 'বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে'! অবশ্য কোথাও দেখি, উমা কৈলাসে যাইতে চঞ্চলা বটে, কিন্তু মাকে ছাড়িয়া যাইবার দুঃখে সেও সারানিশি কাঁদিয়া কাটাইয়াছে—

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি।
যাবে ব'লে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥[৫১]

কিন্তু সারানিশি গৌরীই কাঁদুক আর তাহার মাতাই কাঁদুন, তাহাতে লাভ নাই কিছুই! এদিকে যে—

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার॥[৫২]

শেষ অবধি 'আঁধার ক'রে ঘরের আলো' উমাকে বিদায় লইতেই হয়। যাইবার সময় মা মেনকা বলেন—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই', 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোল্‌তে নাই॥[৫৩]

(গ) লীলা-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সাধনা

শাক্ত-পদাবলীর ভিতরকার লীলা-সঙ্গীতগুলির ভিতরে উমাকে অবলম্বন করিয়া যে বাৎসল্য-লীলার বিস্তার ঘটিয়াছে আমরা একটু বিশদভাবেই তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এই শাক্ত-লীলা বৈষ্ণব-লীলার মতই লৌকিকে-অলৌকিকে মিলাইয়া-মিশাইয়া একাকার। পৌরাণিক তথ্য-উপাখ্যান-কিংবদন্তীকে অস্বীকার না করিয়া তাহাদিগকেই একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া স্নেহরসে রঞ্জিত করিয়া কবিগণ এই আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছেন। আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের কবিগণ সকলেই যে শাক্ত-সাধক ছিলেন

[৪৮] দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)। [৪৯] কমলাকান্ত, ঐ। [৫০] অজ্ঞাত, ঐ। [৫১] হরিনাথ মজুমদার, ঐ। [৫২] রামপ্রসাদ, ঐ। [৫৩] জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ।

এবং শাক্ত-সাধনার মূল প্রেরণা লইয়াই এই সংগীতগুলির সবগুলি রচিত এমন কথা বলা যায় না। কেহ কেহ সাধক ছিলেন, কেহ কেহ শুধু কবি ছিলেন। সমস্ত কাহিনী ও ভাব একটা সাধারণ সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপেই তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে একই জিনিস ঘটিয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাধকের নিকটে বৈষ্ণব-লীলাই হোক আর শাক্ত-লীলাই হোক, লীলা শুধু লীলা নয়—লীলা সাধনার অবলম্বন মাত্র। উমা-অবলম্বনে এই শাক্ত-লীলারও একটা গূঢ় অধ্যাত্ম-সাধনার দিক্ আছে। লীলা-সাধনার বৈশিষ্ট্য এই, ইহা সত্যকেও ছাড়ে না, রূপকেও ছাড়ে না—সত্য ও রূপ উভয়কে এক করিয়া একই অন্বয় সত্যের এপিঠ-ওপিঠ করিয়া লয়। নিম্নে আমরা সেই অন্বয় সাধনারই একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

মূল শক্তিরূপিণী ও চৈতন্যরূপিণী দেবী উমা শিবধাম কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরে একবার পিতৃগৃহ গিরিপুরে আসেন। কৈলাস শিবধাম—মায়ের স্বরূপাবস্থিতির ধাম। সেখান হইতে স্নেহ-প্রেমে বিগলিত হইয়া মা নামিয়া আসেন গিরিপুরে—প্রেমসৌন্দর্যের দেশে—মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়ের স্নেহনীড়ে। স্বরূপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীনা মাকে যখন জ্ঞানমাত্রতনু নির্গুণ ভোলানাথের অবিনাভাব হইতে খানিকটা যেন একটু পৃথক্ করিয়া দূরে সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্ত্যের কবিগণ সাহসী হইয়া আরও একটু আগাইয়া গেলেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও কবিকল্পনার বলে মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত করিয়া অত্যুচ্চ গিরিপুর হইতে একেবারে সমতল নিম্নভূমি বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহ্লার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ সমারোহের মধ্যে শিশিরসিক্ত বাঙলার কুটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা আসিয়া নামিল; বাঙলার লক্ষ লক্ষ কুঁড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাষাণী-মা ও পাষাণ-পিতা বাহির হইয়া প্রতিবেশীর হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাটির ঘরে বরণ করিয়া লইল। বাহিরের কঠোর দারিদ্র্য আর অন্তরের অফুরন্ত প্রাচুর্য মিশিয়া গিয়া একটি অভিনব প্রতিবেশের সৃষ্টি করিল; সেই প্রতিবেশের ভিতরে সকলে চাহিয়া দেখিল, কৈলাসবাসিনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত-হাস্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া 'স্নেহের দুলালী' রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমানা —তিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী, আবার মানবী হইয়া দেবী। আশ্চর্য তাঁহার সেই রূপ—দেবীতে আর মানবীতে—স্বরূপে আর রূপে—কোথায় যে ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে—প্রেমলীলার ক্ষেত্রে—আগমন করিলেন, বাঙালী প্রাণ ভরিয়া আগমনী-গান গাহিল; দশমী-দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরূপের দেশে যাত্রা

করিলেন, রসপিপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিল, চোখের তারার ধারায় ভিজাইয়া তাহার কৈলাসগামিনী তারার গান গাহিল—তাহাই বিজয়-সংগীত।

বঙলাদেশ প্রেমধর্মের দেশ। ত্রয়োদশ শতকের জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশে ভগবান্‌কে সকল ঐশ্বর্য-বিমুক্ত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য-মধুর্যের বিগ্রহরূপে দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ধারায় বান ডাকাইয়া বাঙলাদেশের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত ভরাইয়া দিলেন। বাঙলাদেশের শক্তিবাদের সহিতও এই মাধুর্যবাদের যোগ দেখা দিয়াছে, একথা পূর্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি। মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আমরা সৌন্দর্যময়ী প্রেমময়ী উমার গার্হস্থ্যলীলার ছবি কিছু কিছু পাইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছি খেয়ালী শক্তির অনুগ্রহ-নিগ্রহ—দ্বন্দ্ব-কোলাহল-লীলার। সেই খেয়ালী শক্তির ভিতরে আসিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে প্রেম-সৌন্দর্যের রূপান্তর—সেই রূপান্তরের অভিনব অভিব্যক্তি আগমনী-বিজয়ার উমার মধ্যে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের উমা-কাহিনীর পিছনে আমরা অনেক সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সকলই সত্য; কিন্তু তাহাই একমাত্র সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে উমাকে যে আমাদের সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সহিত যুক্ত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, উমা-সম্বন্ধে সেইটিই একমাত্র কথা বা প্রধান কথা নহে, উমাকে গ্রহণ করিয়াছি আমরা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যান-বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াও। তাই অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল কবি উমাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উমা-সংগীতের পশ্চাতে একটি সচেতন বা অচেতন অধ্যাত্ম-ধ্যান-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার যে দিক্‌টি দেশে এবং বিদেশে অতি পরিচিত তাহা হইল ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে নৈতিমার্গে অগ্রগতি। 'সত্য ইহা নয়', 'সত্য উহা নয়',—যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি, আস্বাদ করিতেছি—দেহ ভরিয়া, মন ভরিয়া স্পর্শ করতেছি—তাহার কিছুই সত্য নয় – সত্য সকল অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের পরপারে—আমাদের মানস-লোকের অগম পারে —সত্য সৎ, সত্য অসৎ—সত্য দ্বৈতবিহীন বিকারবিহীন শাশ্বত শূন্য। সত্য আমাদের রক্তমাংসের দেহে নাই, তাহা আমাদের বিচিত্র নিত্যনব প্রাণপ্রবাহে নাই, আমাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্নেহ-প্রীতি সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে নাই,—ইহার সব কিছুই মায়া—সব কিছুই মিথ্যা—সব কিছুই বন্ধন; সত্য নিত্যমুক্ত 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। সুতরাং শুধু ত্যাগের পথে আমাদের ঊর্ধ্বায়ন—

বিশ্বজগৎ পরিত্যাগ করিয়া—অভিব্যক্তির বহুত্বকে অস্বীকার করিয়া সর্বশূন্য একের মধ্যে 'ব্রাহ্মী স্থিতি'।

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই-সকল কথাই সত্য, কিন্তু ইহা অর্ধেক সত্য—চরম সত্য বা পূর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা যাইতে পারে; এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা—অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা। প্রথমে স্থূলতম জাগতিক সত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা গেল অন্ন সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, মন সত্য নয়, বিজ্ঞান সত্য নয়,—আনন্দ সত্য নয়,—ত্যাগের দ্বারা এই-সকলকে শূন্যে পরিণত করিয়া সর্বশূন্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অনুভব করিতে হইবে—এই-সকলের ঊর্ধ্বে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে এক—তাহাই একমাত্র সত্য। ইহা হইল বৃত্তের প্রথমার্ধের সাধনা। ইহার পরে আরম্ভ হয় বৃত্তের দ্বিতীয়ার্ধের সাধনা। এই সাধনার শুরু শূন্যতত্ত্ব হইতে—নেতিতত্ত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ত্বের দিকে। তখন এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে তাঁহারই রচিত বহুর মধ্যে—নিম্নের সকল তত্ত্বের মধ্যে অনুভব করা। আমাদের উপনিষদে বলা হইয়াছে, এই যে প্রপঞ্চময় জগৎ তাহাকে ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপে ভোগ করিতে হইবে? তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইবে। জগতের কিছুই যে আপনাতে আপনি সত্য নয়, পরম একের সত্যে সব সত্য, এই দৃঢ় বিবেকই হইল পরম ত্যাগ; সেই ত্যাগে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, অর্থাৎ সেই একের গন্ধের দ্বারা যদি 'যাহা কিছু সব'কে আবাসিত করিয়া লওয়া যায়, তখন সবই সত্য, তখন সকল কিছুকেই ভোগ্য করা, আস্বাদন করা যাইতে পারে।

আমরা সংসারে আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গভীর অনুভূতি লাভ করি আমাদের প্রেমে। সন্তানকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার যে স্নেহ-মায়া-মমতা তাহার আর অবধি নাই। একটি শিশুসন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পিতামাতা রূপের মাধুর্যের আর শেষ করিতে পারেন না, অতটুকু শিশুর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন দিয়া বলিতে চান,—এই শিশু—এই পুত্র, এই কন্যা—এই আমাদের জীবনের সর্বস্ব—ইহাদের মধ্যেই জীবনের সর্ব অর্থ। শিখর হইতে ধার্মিক বলিবেন, দার্শনিক বলিবেন, সব মিথ্যা—সব মায়া—সব বন্ধন; সুতরাং ত্যাগ কর। কিন্তু এখানে ভারতীয় ত্যাগ-সাধনার আদর্শ ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবার আদর্শ নয়, এ ত্যাগের অর্থ হইল, যে বুদ্ধিতে—যে দৃষ্টিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই বুদ্ধি, সেই দৃষ্টির পরিবর্তন করা। যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া; কিন্তু এই শক্তির আর-একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্-ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে। সেই ভগবদ-ইচ্ছারূপে

ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। মায়াকে ত্যাগেই আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা —এইখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মায়াত্যাগ হইল পূর্বোক্ত বৃত্তের প্রথমার্ধ, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ; পূর্ণযোগের যোগী শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, এই দুই অর্ধ মিলিয়া সাধনার পূর্ণতা। এই সাধনা পূর্ণ হইলে দেখা যায়, মায়াই ক্রমে ক্রমে মহামায়ায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, মহামায়া আবার মায়ার ভিতর দিয়া প্রেম-সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা বিস্তার করিতেছে।

এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই আমাদের বাঙলাদেশের উমা। শুধু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আবার 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং' বলিয়া এই সংসারযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই সাধনাকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করিবার মত সাধকের অভাব ছিল না আমাদের বাঙলাদেশে, এই সাধনা যেখানে নাই সেখানে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে বেড়া' এই কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই যে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে বেড়া' কিংবদন্তী তাহাকে উভয় দিক্ হইতেই বাঙলাদেশের সাধনার ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহামায়াও যেমন আসিয়া মায়িক কন্যারূপ ধারণ করিয়া বেড়া বাঁধিতে পারেন, মায়িক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া থাকেন। এই যে দেবীর মানবী-রূপ, মানবীর দেবীরূপ ইহা আমাদের দেশে যে কত সহজরূপ গ্রহণ করিয়াছিল, মহামায়া-সম্বন্ধে বাঙলাদেশের কিংবদন্তী উপাখ্যানগুলি লক্ষ্য করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, স্নানের ঘাটে অপরূপ কন্যামূর্তিতে শাঁখারীর হাত হইতে শাঁখা পরিয়া দেবী মন্দিরের পূজারীকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাঁখার মূল্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন; এই কিংবদন্তী বাঙলাদেশের জলবায়ুতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই যে মায়া-মহামায়া মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়—সেই সমন্বয়ের সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলাদেশের উমা-সঙ্গীত—আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীত। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙলাদেশের আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের কবিগণ সকলেই এই ধরণের উচ্চ সাধক ছিলেন, তাহা সত্য নয়,—থাকিবার প্রয়োজনও করে নাই। উচ্চস্তরের সাধক 'কোটিতে গোটিক'ই হন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সাধনাদ্বারা জাতীয় মানসকে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত করিয়া দেন। তখন সেই-জাতীয় মানসের ধ্যান-মনন সেই জাতির ভিতরকার ধ্যান-মননপন্থী সকলে অনেকখানি জাতীয় উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করেন। সেই সাধনা এবং তাহার উত্তরাধিকার মিলিয়া এই উমা-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে।

কোনও প্রচলিত ধর্মমতের আওতার মধ্যে না বসিয়াও বলা যাইতে পারে, সত্যের স্বরূপ হইল বৃহৎ-বাচি ব্রহ্ম। যাহা ক্ষুদ্র—যাহা লৌকিক—যাহা আনে চিত্তের সঙ্কোচন তাহাই জড়মায়া—তাহাই বন্ধনের। আর ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবার পরে—অর্থাৎ বৃহতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যে মায়া তাহাই ত মহামায়া—তাহাই মুক্তিদায়িনী। পূর্বে বলিয়াছি, প্রেমে মানুষের সত্যবোধের গভীরতম অনুভূতি। বাঙলাদেশের গরীব মা—তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তান; জীবনের সকল দুঃখ-দারিদ্র্য-বেদনাকে ভরিয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্নেহ-ধারার অজস্র-প্লাবনে; সেই অজস্র স্নেহধারায় স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্গে লাগিয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, তাই সেই স্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘটিয়াছে মহামায়ার আবির্ভাব। বাঙলার উমার মানবী-দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সৌন্দর্যে জাগিয়াছে বৃহতের মুক্তির স্পর্শ—অনন্তের অতলস্পর্শ মহিমা, এই করিয়াই সে বাঙালীর ভাঙা কুটিরের মধ্যেই 'ভবানী'। তাই সেখানে দেখিতে পাই,—

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী;
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত-ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥[১]

মায়ের হাত-ধরা সুধাধরা এই নন্দিনীটি শুধু ছোট একটি রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক অধিক এবং এই অধিকের মহিমা তাহার ক্ষুদ্র দেহের প্রত্যেকটি অংশ হইতে সৌন্দর্যে, কমনীয় মাধুর্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সেই মহিমার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া যিনি এই মূর্তিটি দেখিয়াছেন, তিনি যথার্থ উমাকে দেখিয়াছেন।

এই দেখা—এই ধ্যান-মননের বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে মানুষের সত্যকারের পূজা। দেবীর ঘট পাতিয়া শাস্ত্রীয় মন্ত্রোপচারেই যে বিল্বমূলে মায়ের বোধন করিতে হইবে এমন কথা কি? যথার্থ দেবীবুদ্ধি লইয়া একটি সারারাত্রির অঘোর ঘুমে ঘুমন্ত কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে যদি জাগাইয়া তোলা যায় তবেই ত বিল্বমূলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে। এই দৃষ্টি লইয়া কবি গাহিলেন—

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কিরূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।[২]

[১] কালী মির্জা, শা. প. (ক. বি.)।
[২] রাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. (ক. বি.)।

আসলে যামিনীর শেষে দুলালী কন্যার প্রভাত-আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা যে মা ভাল করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই বিল্বমূল হইতে দেবীর জাগরণ। পদকার বলিতেছেন—

দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিবে বল!

সত্যই ত! স্নেহ-প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর দিয়াও যদি বৃহতের স্পর্শ লাভ না করিতে পারা যায়—সেই উমাও যদি আমাদের জীবনে ও জগতে জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসিয়া আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিবে কোন্ সুযোগে? যে কন্যাটিকে আমার জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘরের—একান্তভাবে আমার আপনার করিয়া পাইয়াছি, তাহাকে তাহা হইলে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? বুঝিতে হইবে—

অসংখ্য তপোরি ফলে,
কপট-তনয়াছলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে মেনকারাণি!

'তনয়াকে' 'ব্রহ্মময়ী' করিয়া—বৃহতের প্রতিমূর্তি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাইত কন্যা যখন বৎসরান্তে ঘরে ফিরিল তখন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মা বলিলেন—

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো?
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো![৩]

কৈলাস-শিখরে•আসীনা ভব-অঙ্গে লীনা যে দেবী তাঁহাকে খড়-মাটির ভবনেই 'ভবানী' করিয়া পাইতে হইবে এবং তখন ঘরের সকল দ্বার মুক্ত করিয়া বলিতে হইবে—

জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
ভুলেছে সে আমার মায়ায়,
একবার কোলে মা আয়, মা আয়,
মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ।

বাঙলাদেশে উমার আবির্ভাব কখন? শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন বাঙলার দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কমলে কুমুদে শেফালীতে বর্ণে গন্ধে যখন হৃদয়মন আপনা হইতেই অনন্ত সুন্দরের আভাস পায়, যখন সোনার শস্যে পূর্ণ বাঙলাদেশের জলে স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হইয়া ওঠে, সেই সময়ই বাঙলার মেয়েরা মা-বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে গণেশজননী উমা-রূপ লইয়া।

৩ অজ্ঞাত, শা. প. (ক. বি.)।

বাঙলার প্রকৃতিতেই তখন এমন গৌরবরণী কমলাননা উমা-রূপ। তাই সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছেন,—

শরৎকমলমুখে আধ আধ বাণী মায়ের।[৬]

গিরিপুরে যেদিন কৈলাস হইতে উমার আসিবার কথা ছিল তখনই এই শরৎ-শোভার মধ্যেই উমার অঙ্গশোভা দেখা গিয়াছিল,—

দেখে আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসে রে,
উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসে রে।
এ নহে অরুণ-আভা,
নহে শশধর-বিভা,
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর
গৌর-আভা ভাসে রে।[৭]

বাঙলাদেশেও ত শরতের আগমনে চারিদিকেই উমার উদ্দীপন। এই উদ্দীপনই যে অন্তরে-বাহিরে উমার আবির্ভাব অনিবার্য করিয়া তোলে। প্রকৃতির চারিদিকে উমার আভাস—উমার জন্য সব-কিছুই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, ইহার ভিতরে উমা অমূর্ত তত্ত্বমাত্ররূপে কৈলাসে শিব-অঙ্গে লীন হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? এমন সুন্দর সৃষ্টির মাঝখানে সেই উমাকে সৌন্দর্যের মাধুর্যের বাস্তব প্রতিমূর্তি করিয়া না পাইলে আমাদের চলিবে কেন?

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই!
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, কৈ আমার শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি',
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী?
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল?
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে
কেবল তারা নেই।

৬, শা. প. (ক. বি.)।
৭ নবীনচন্দ্র সেন, শা. প. (ক. বি.)।

শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়,
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই![৬]

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে শরৎকালেই যে দেবীর পূজার বিধান বলিয়া দেবী-পূজাকে শারদীয়া পূজা বলা হয় তাহা নয়, মূলে শরৎই ছিলেন দেবী—'শরদৈব অম্বিকা'; সেই শরৎ-রূপিণী দেবীর পূজাই শারদীয়া পূজা। প্রকৃতির মধ্যে যে দেবীর আবির্ভাব কন্যার মধ্যেও সহজেই সেই দেবীর বোধন, তাই শরতেই উমার আগমন।

বাঙলাদেশের এই উমা-সঙ্গীতগুলির প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেব-মহিমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্ত্যজীবনের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা করিয়াছি। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দুঃখিনী-জীবনের কানাকানি শুনিয়া রাত্রে তাঁহারই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন; বাঙালী-জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সহিত যুক্ত করিয়া দেব-মহিমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্ততঃ লঘু করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। সংসারের জ্বালা যে মেয়ের কপালে শ্মশানের জ্বালা রূপেই দেখা দিয়াছে তাহাকে স্মরণ করিয়াই হয়ত আমরা একদিন গাহিয়াছি—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।

* * *

আর শুন অসম্ভব—চারিদিকে শিবারব হে!
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর; কে আনিবে সমাচার হে?
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে![৭]

নিছক মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলেও আমি এই চিত্তবৃত্তিকে আত্ম-প্রতারণা বলিব না,—ইহাকে বলিব আত্ম-প্রসরণা। ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে একটি পরম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানুষের চিত্তধর্মের মধ্যে সকল বাস্তব-কলুষ-কালিমার মধ্যেও কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মহত্ত্বার বীজ, সে মানুষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দুঃখদৈন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে দিতে চাহিতেছে না। মর্ত্যজীবনের সকল দুঃখদৈন্যকেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে আনিয়া মহৎ এবং মহিমান্বিত করিয়া লইতে চায়। ইহার মধ্যে মনুষ্যের ভিতর সেই সুপ্ত দেবত্বের সন্ধানই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

[৬] গোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)।
[৭] কমলাকান্ত, শা. প.।

প্রথমেই বলিয়াছি, উমা-সঙ্গীতের কবিগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় আশ্চর্যরূপে একটি সহজভাবে করিতে পারিয়াছিলেন। একদিনের স্বপ্নকথা বলিতে গিয়া মাতা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি, এক দিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দারিদ্র্যে, ক্লেশে কালী হইয়া গিয়াছে, আবার মর্ত্যের সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মহিমা লাভ করিয়াছে বহুশোভমানা হৈমবতী উমারই আবার দিগম্বরী কালীমূর্তি ধারণ-তত্ত্বের আভাসে। ইহারই একটি চরম রূপ দেখি—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী;
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।[৮]

অমূর্ত তত্ত্বকে মানুষ বুদ্ধি দিয়া বোঝে, হৃদয় দিয়া আস্বাদ করিতে পারে না; অথচ তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে যে আবার সত্যের সহিত যোগ থাকে না। তাই তত্ত্ব চাই, কিন্তু তাহাকে মূর্তির ভিতর দিয়া, অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া রূপে-রসে নিবিড় করিয়া সমস্ত সত্তা দিয়া পাইতে চাই। শিব ও শক্তি কেহই পরস্পর-নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভয়েই এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দিক্ মাত্র,—উভয়ই তাই উভয়ের নিত্য পরিপূরকরূপে অবিনাভাবে বিরাজমান। শিব ব্যতীত যেমন শক্তি মিথ্যা, শক্তি ব্যতীত শিবও তেমনই শব। গার্হস্থ্য-জীবনে এই সত্যটিই বাঙলার সাধকগণ লৌকিক রূপরসের একটি সুকুমার মাধুর্যের ভিতর দিয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৎসরান্তে মা-বাপ ত মেয়েকে দেখিবার জন্য পাগল; কিন্তু জামাইও যেমন মেয়েকে আসিতে দিতে চায় না, মেয়েও নানা ঠেকা-বাধার অজুহাত দিতেছে; আসলে মেয়ের একা বাপের বাড়ি যাইবার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছা বরের সঙ্গে যায় এবং ইচ্ছা মা-বাপ শুধু তাহাকে আনাইবার চেষ্টা না করিয়া জামাই যাহাতে সঙ্গে যায় তাহার জন্য যথেষ্ট আদর-যত্ন এবং পীড়াপীড়ি করেন। স্বামী ছাড়া যাইতে মেয়ের মন সরে না, জামাতা বাবাজী আবার দেখিতেছেন, গৃহিণী চলিয়া গেলে সব ঘর-সংসারই যে তচনচ,—সে ত একেবারে নিরুপায়। আমাদের নিত্যদিনের ঘর-সংসারের মধ্যেই যে একটি উমা-শঙ্কর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালী কবিরা তাহারই একটু আস্বাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের গানে। তাই—

অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী,
দুর্গা বিনে দুর্গতি শুনেছি নিশ্চয়।

এই বিশ্ব-দুনিয়ার ঘর-সংসার যে কি করিয়া করিতে হয়, কি করিয়া চলিতেছে,

[৮] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শা. প. (ক. বি.)।

পাগলা ভোলা মহেশ্বর ত তাহার কিছুই খোঁজ-খবর রাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া সে খবর আর কে রাখিবে? তাহারই অসংখ্য অভিনয় ভরিয়া রহিয়াছে আমাদের ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ—ঘর-সংসার সব কিছু সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহীনের সংসারকেও সার্থক করিয়া তোলেন মা তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শক্তিতে। জীবন-সংগ্রামে সংসার মন্থিত হইয়া উঠিতেছে কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান করিতে হইতেছে পুরুষকে, কিন্তু তাহার জুড়াইবার ঠাঁই কোথায়? অন্তঃপুরবাসিনী গৌরীর শীতল স্পর্শে। তাইত—

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥

* * *

রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের-জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।[১]

আবার অন্য দিকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মেনকা গিরিরাজকে বলিয়া দিতেছেন,—

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।

শিবশক্তির তত্ত্বটিকে লইয়া লৌকিক সংসারকে সংসারের সকল স্নেহমায়া-প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। একটু মায়ার আবরণ চাই, একটু স্বরূপ-বিস্মৃতির ভান চাই, নতুবা লীলাস্বাদ হয় না। তাই নিজের মানবী কন্যাকে একেবারে স্পষ্ট দেবী করিয়া লইলে রূপরসকে আস্বাদ হয় না। বৈষ্ণবরা বলেন, লীলা-আস্বাদনের জন্য চাই যোগ-মায়া,—একের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তারপরে মায়ার বিস্তার। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মেনকা তাই তাঁহার ঘরে ঠিক দশভুজা ব্রহ্মময়ীকে বরণ করিয়া লইতে চান নাই—তিনি চান 'দ্বিভুজা বালিকা'। আগে 'দ্বিভুজা বালিকা' চাই, আমার 'প্রাণ-কুমারী' চাই—তাহার মধ্যেই খুঁজিয়া পাইতে চাই 'সর্বদেব-তেজ-দেহ, জটাজূট-শিরোরুহ'কে। শুধু 'ভুবনমোহিনী'কে 'প্রাণকুমারী' করিতে চাহি না, 'প্রাণকুমারী'কেই ভুবনমোহিনী করিয়া তুলিতে চাই; দেবীকে শুধু মানবী রূপে পাইতে চাই না, মানবীকেই সত্য সত্য দেবী করিয়া তুলিতে চাই। বৎসরান্তে কন্যা যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন ত শুধু মায়েরই আনন্দ হয় না, তখন যে পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই যে মায়ের পাগলিনী বেশ, এই যে পাড়ার মধ্যে এত আনন্দ-কোলাহল—যে আগমনীকে

[১] কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)।

অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপত্তি তাহাকে শুধুই মর্ত্যের একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলিয়া ছোট করিয়া রাখিব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি আমরা মায়াকে ছাড়িয়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে পেঁাছাইতে পারিব না? মা যখন তাঁহার অসিতবরণা কান্তি লইয়া গণেশজননী-রূপে ঘরে অধিষ্ঠিতা হইলেন তখন,

বসিলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে।

জীবনের ইহা একটি শুভমুহূর্ত; অপরিমিত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকিক কালিমাকে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে লীলাময়ী মহামায়ার কষিত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্ফুরণেই ত জাগিয়া ওঠে মঙ্গল-আরতি—চারিদিকে জাগিয়া ওঠে চণ্ডীপাঠ।

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে॥
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে॥[১০]

এই স্নেহ-সম্বোধনই ত বোধন, আদর করিয়া গৃহে তোলাই মঙ্গল-আরতি, রজনী-প্রভাতে ঘুম হইতে তুলিয়া যে কন্যার আদর-আপ্যায়ন তাহাও ত মায়ের আরতি।

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হ'লো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে॥
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা' 'মা' বল॥[১১]

আর মা যেই ঘরে আসিল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া মায়ের কত গুণকীর্তন করিতেছেন, কত মহিমা খ্যাপন করিতেছেন, কত জয়-বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেছেন—ইহাই ত চণ্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নির্জীব গৃহ সহসা প্রাণ পাইয়াছে, আনন্দে পল্লীর নির্জন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধাররাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসেছিল।

[১০] অজ্ঞাত, শা. প. (ক. বি.)। [১১] নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)।

কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো॥[১২]

বিজয়ায় আবার বাজিয়া উঠিল অতি করুণ সুর—বিদায়ের সুর। নিজের ভাঙাঘরে আয়োজন-আড়ম্বরহীন একটি একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে মাকে যেমন করিয়া রূপে রসে নিবিড় করিয়া পাইয়াছিলাম, ইচ্ছা হয়, সেইভাবে তেমন আপনার করিয়া, তেমন ধূলামাটির সংসারের নিকটতম স্নেহপ্রীতিপুত্তলী করিয়া মাকে চিরদিন পাই। কিন্তু কৈলাস হইতে শিবের আহ্বান যে ইতি-মধ্যেই দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ঘন ঘন ডমরুধ্বনি শোনা যাইতেছে। কিন্তু দুয়ারে আজ এই শিবের ডমরু কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না। সাধকের প্রাণ আগাইয়া গিয়া বলে,—

শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল॥

কৈলাসে পাঠাইবার এই আপত্তি কেন? কারণ, মা আমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিলে রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া শিব-অঙ্গে বিলীন হইলে আর যে মায়ের কোনও খবর-তত্ত্ব পাওয়া সহজ নয়। তখন শুধু লোকমুখে মায়ের উড়ো উড়ো খবর শুনিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যায়। সেখানকার খবর কোনও মুনি-ঋষি, কোনও শাস্ত্রই যে একেবারে ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, কেহ বলে এক, কেহ বলে আর; দিনরাত্রি কেবল সব গোলমেলে খবর শুনিয়া শুনিয়া মনপ্রাণ যে আরও ঝালাপালা হইয়া ওঠে। মেনকা বার বার কৈলাসে গিরিরাজকে —তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে পাঠাইয়া দিয়াও যে উমার তত্ত্ব করিতে পারে নাই। গিরিরাজ সেই শিবধামে স্বরূপধামে প্রবেশ করিয়া উমার কোনও তত্ত্ব লইতে যেমন অনিচ্ছুক, তেমনি অক্ষম; মেনকার সনির্বন্ধ অনুরোধ—সকরুণ আর্তিতে স্থির হইতে না পারিয়া উমার খোঁজে সে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বারবার ফিরিয়া আসিয়া নানা মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল—

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার,
তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।

বুদ্ধি দ্বারা, কৃচ্ছ্রতপস্যা দ্বারা, যোগ-সাধনা দ্বারা যাঁহার কোনও তত্ত্ব করা গেল না, চিত্তের ঐকান্তিক আকর্ষণে তিনি সমগ্র শিব-পরিবার বা শিবপরিচয় সঙ্গে বহন করিয়া আপনি রূপের জগতে নামিয়া আসিয়া সাধকচিত্তে ধরা দিয়াছেন

[১২] শ্রীধর কথক, শা. প. (ক. বি.)।

অপরূপ সৌন্দর্যে মাধুর্যে। মায়ের মনের মতন অবোধ হইল সত্যিকার সাধকের মন,—সে বিচারবুদ্ধি চাহে না, যোগ-তপস্যার সাধ্য নাই—আছে প্রেমের সর্বাকর্ষক ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা দ্বারা মাকে নিকটতম করিয়া রূপে রসে তাঁহাকে নিত্য আস্বাদন করিতে চায়।

আসলে সেই পূর্বের কথা,—অমূর্ত তত্ত্বে সাধকের মন ভরিয়া ওঠে না, অমূর্ত সত্যের সমস্ত সত্তা-চৈতন্য-আনন্দকে তাই তিনি মূর্তির মধ্যে নামাইয়া আনিয়া শূন্যকে আধার পূর্ণ করিয়া তাঁহার সাধনাকেও অখণ্ড পূর্ণতা দান করিতে চান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া রাখিলে মাকে যে কাছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় যে মনে হয়—

তাই বলি এই কায়া কিছু নয়, শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় কায়া ওঙ্কারে॥[১৩]

এই ওঙ্কারে বা প্রণবতনুতে শিবের সঙ্গে মা লয় হইলে আর যে তাঁহাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই ত একটু যোগমায়ার—অদ্বয় সত্যের সহিত যুক্ত থাকিয়াই আবার একটু লীলাত্মিকা মায়ার আবরণ চাই—একটু নিশির অন্ধকার—একটু ঘুমের ঘোর বা অচৈতন্যের আবেশ চাই। এই স্বেচ্ছাকৃত আবেশের মধ্য দিয়াই ত মা মানবী কন্যার বিগ্রহ ধারণ করিয়া রূপে রসে সাধকের কাছে সহজলভ্য হইয়া ওঠেন। সাধক তাই এই নবমী নিশির অবসান এবং হিরণ্ময় বুদ্ধি-সূর্যের উদয় চাহেন না।—

নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপরিবার-সনে।
তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ,
এই ভিক্ষে চরণে॥[১৪]

মহারাত্রিরূপে ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন মহামায়া, মহারাত্রির অন্ধকারের অন্তস্তলে নিজের অপরূপ হেমদ্যুতি বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া আছেন আপনি মহামায়া—অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাগিয়া সাধককে দেখিতে হইবে এই মহামায়াকে —আপনার কন্যারূপে আবির্ভূতা কদামাটির ভাঙা কুটিরে। নবমীর এই মহানিশা সাধকের মহাযোগক্ষণ—সাধক এই মহানিশার অবসান কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না।

[১৩] গোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)।
[১৪] দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)।

যেও না, যেও না, নবমীরজনি,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলি-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
ঊষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে॥[১]

শিবধামের স্বরূপের দেবীরূপ হইতে মা যেদিন কন্যাভাবে রূপের মধ্যে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই মায়ের অনন্তচৈতন্যের মধ্যে একটু ঘুমের ভান আসিয়াছিল। অনন্ত-চৈতন্যময়ী ঘুমাইতে ঘুমাইতেই ত বিজ্ঞানরূপে, মনরূপে, প্রাণরূপে,—অঘোর নিদ্রায় অন্ন বা জড়বস্তুরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন! বস্তুত স্থূল-সূক্ষ্মাদি স্তরভেদ ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢ়তারই স্তরভেদ। যে ঘুমের ভিতর দিয়া শিবগেহিনী উমা আবার মানবী কন্যারূপিণী হইয়া দেখা দিয়াছেন রসপিপাসু সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঙিয়া দিতে চাহেন না। ঘুম ভাঙিয়া দিলেই ত স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিতা হর-জায়া আবার কৈলাসে ফিরিয়া যাইবেন। তাই—

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি।
যাবে ব'লে সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥

সুতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, তাহাকে মর্তধাম হইতে অমর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না।

জয়া, বলগো পাঠান হবে না।
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে ব'লো না॥

সুতরাং এই মর্ত্যের মাটিতে—স্থূলতম তত্ত্বের মধ্যেই মাকে পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু এই পৃথিবীতত্ত্বে এই স্থূলতম মূলাধারতত্ত্বে মাকে চিরদিন কি করিয়া ধরিয়া রাখা যায়? মেনকা বলিলেন, উমাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নামিয়া আসিলে আমি শিবকে আর কৈলাসে ফিরিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আমি ঘর-জামাই করিয়া রাখিব। দেহের ঘরেই উমা-শঙ্কর উভয়কে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উমা-শঙ্কর কৈলাসধাম আজ্ঞাচক্রে (তাহার ঊর্ধ্বে ধামের বিলোপ) যেমন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে পৃথিবীতত্ত্বে মূলাধারে নামাইয়াও তেমনভাবেই বিরাজমান

[১] নবীনচন্দ্র সেন, শা. প. (ক. বি.)।

উপলব্ধি করিতে হইবে,—শুধু তখনই দেহমনের সকল স্তরে সমভাবে সাধনার ধন উমাকে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইবে।

(ঘ) শাক্ত সাধককবিগণের কালী-সাধনার তাৎপর্য

বর্তমান আলোচনায় আমরা বাঙলা সাহিত্যে উমাকে অবলম্বন করিয়া যে লীলাসঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেইগুলি বাদ দিয়া মুখ্যভাবে কালীকে অবলম্বন করিয়া যে সাধন-সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে বর্ণিত শক্তি-সাধনার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য মূলে এই উমাকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা এবং কালীকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা তাহা পৃথক্ নহে—মূলে সব সাধনাই এক, শুধু প্রক্রিয়া ও আস্বাদনের কিঞ্চিৎ পার্থক্য মাত্র।

সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর দিয়া শক্তি-সাধনাকে একটি নবরূপ দান করিয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্বজনীনরূপ। রামপ্রসাদ তাঁহার আবির্ভাব-কালে শাক্ত-সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছিলেন—একটি হইল গুহ্য-সাধনার ধারা, অপরটি হইল বহু অর্থব্যয়ে বহু জাঁকজমকে ষোড়শ বা ততোধিক উপচারে মৃন্ময়ী কালী-প্রতিমার পূজা। এই গুহ্য-সাধনার ধারাটি একটি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বাহিরের পূজার্চনাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যতদূর তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে দেখিতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায়-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল—বৈষ্ণবধর্ম-বিদ্বেষ এইসব শাক্ত-উপাসনার একটি লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা প্রথম চেষ্টা লক্ষ্য করি, কালী-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ঊর্ধ্বে তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে। বাঙলাদেশের শক্তি-সাধনায় রামপ্রসাদ এই প্রথম যে সুর তুলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী শ্যামার পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই সুরেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে পূর্ববর্তী তান্ত্রিক সাধকগণের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভৈরবীচক্র-সাধনা বা অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তিনি অবলম্বন করেন নাই। এমন কি তান্ত্রিকগণের কারণ-বারিরূপ সুরাপানাদিকেও তিনি বাহ্যবস্তুর দিক্ হইতে গ্রহণ না করিয়া ভাবরূপ মানসরসের দিক্ দিয়াই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সাধনায় সুরাপান-সম্বন্ধে তিনি গাহিয়াছেন,—

ওরে সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।

এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বস্তু। কালীকেও পরমতত্ত্ব-রূপে তিনি ভাবের বস্তু করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তান্ত্রিক সাধনাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না, আগে ভাব চাই—পরম সত্যের প্রতি পরমাসক্তি চাই এবং তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার জন্য চিত্তপ্রস্তুতি চাই। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।' সেই ভাবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

সে ভাব-লোভে পরমযোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে॥

পরম যোগীর যে যুগ-যুগান্তের সাধনা তাহাও এই 'ভাবে'র জন্য—অর্থাৎ এক-দিকে পরম সত্যের প্রতি অনন্যাসক্তির জন্য, অপর দিকে চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য। লোহাকে চুম্বকের নিকটে আপনার আর চেষ্টা করিয়া যাইতে হয় না—চুম্বকই নিজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টানিয়া লয়। কিন্তু ময়লা-ভরা লোহার উপরে চুম্বকের কোনও কাজ নাই; সুতরাং লোহার একমাত্র কাজ হইল সাধনার দ্বারা নিরন্তর ঘষিয়া-মাজিয়া নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলা; তাহার পরের কাজ চুম্বকের—সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশুদ্ধ লোহাকে নিকটে টানিয়া লইবেই। লোহা যত বিশুদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ তত বেশি হইবে; সাধকচিত্ত যত পবিত্র—যত কামনা-বাসনা-আসক্তি-বর্জিত—মায়ের টান তখন তত বেশি। সুতরাং 'ভাব'টা একবার ঠিক হইয়া গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নয়—সাধনা চলে তখন মায়ের—আস্তে আস্তে টানিয়া লইবার কাজে। সকল ভাবের আধার মা-ই হইলেন 'ভাবী'—এই মায়ের নিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব শিখিয়াছেন,—'এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।' যখন এই ভাবীর কাছ হইতে ভাব শেখা গেল তখনই চিরদিনের মত মোহঘুম ছুটিয়া গেল। ভাবের ভিতর দিয়া বোঝা গেল, ঘুমও ত মায়ের—সব মোহ-মায়া-রূপেও ত একই দেবী—'নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা'ও ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল—অর্থাৎ 'অহং' যখন সম্পূর্ণরূপে মায়ের মধ্যে সমর্পিত হইয়া গেল—তখন মায়ের ঘুম ত মায়ের মধ্যেই চলিয়া গেল—সাধকের মধ্যে রহিল শুধু মাতৃ-চৈতন্যে সদা জাগরণ!—

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।[১]
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

এই জাগরণে কাজ হইল শুধু ভিতরের 'মণি-মন্দির' মার্জনা—অন্তরের 'মণি-মন্দির' মার্জিত হইয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করিলে মা আপনি আসিয়া সেখানে

[১] 'যোগে যাগে জেগে আছি' পাঠান্তর।

চরণ স্থাপন করিবেন; সর্বপ্রকার আবরণ ভগ্ন হইয়া গেলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্য আপনিই চিত্তে প্রকাশ-লাভ করিবে।

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥

লক্ষ্য করিতে হইবে রামপ্রসাদও 'ব্রহ্মের'ই উপাসক। ব্রহ্ম বৃহৎ-বাচি—পরম সত্যই পরম বৃহৎ বা পরব্রহ্ম। শ্যামাকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদ সেই পরম-ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার, রামপ্রসাদও বলিয়াছেন—'তারা আমার নিরাকারা।' যখন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে 'হৃদি-পদ্ম' ফুটিয়া ওঠে—মনের অন্ধকার ছুটিয়া যায়—তখন আর ভেদজ্ঞান কোথায়? তখন যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় 'মা বিরাজেন সর্বঘটে।' তখন তাঁহার আবার আকার কি? অনন্ত আকারের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই—শুধু 'তিমিরে তিমিরহরা!'

হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥[২]

শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্ম-নিরূপণের রামপ্রসাদের সাধ্যও ছিল না, সাধও ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে যে ব্রহ্ম-নিরূপণের চেষ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 'দে'তোর হাসি' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; তাঁহার সত্য অনুভূতির সত্য, সেই অনুভূতির সত্যে তিনি সার বুঝিয়া লইয়াছেন—'আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে।' 'ব্রহ্মে'তে আর 'ব্রহ্মময়ী'তে মূলে তফাত কি? এক সত্যকেই একটু দেখিবার ভাবের তফাত মাত্র। রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।' সেই পরম এক মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভক্তের বাসনা অনুসারে সর্ব প্রকারের ইষ্টমূর্তিই গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং রামপ্রসাদের কাছে—

ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি॥

[২] শাক্ত পদাবলী (ক বি)।

আসলে রামপ্রসাদের নিকট কালীতত্ত্ব হইল যোগীর পরমতত্ত্ব। ভাগবতে যেমন কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্', শাক্ত-সাধকগণের কালীও তেমনিই 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্'।[৩] যোগিগণের মধ্যে পরম যোগী হইলেন স্বয়ং শিব—তিনি যোগীশ্বর। শক্তিতত্ত্ব তিনি যেমন করিয়া জানেন তেমন আর কেহই জানে নাই—শক্তি তাই সর্বদা এই যোগীশ্বরের হৃদিস্থিতা, এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে। এইজন্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'য়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥[৪]

অহং লইয়া বাঁচিয়া থাকিলে আর যোগী শক্তিতত্ত্বকে অনুভব করিতে পারে না; শিব তাই পরমযোগী হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন—তবেই তাঁহার হৃদয়ে শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছে। এই মৃত্যু আসলে যোগ-মৃত্যু। রামপ্রসাদ তাই অন্যত্র বলিয়াছেন—

মরে নাই শিব আছেন বেঁচে, যোগে আছেন মহাযোগী॥

সাধক যোগী রামপ্রসাদ যোগের দৃষ্টিতে শ্যামার পদতলে শিবের এই যে নূতন ব্যাখ্যা দিলেন পরবর্তী কালের সব কবিই এই ব্যাখ্যাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া গান রচনা করিয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় রামপ্রসাদের উক্তিরই পুনরুক্তি করিয়াছেন।[৫] কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে দেখি—

শৈলসুতা পরমাত্মা-রূপিণী ব্রহ্ম-সনাতনী মাগো
ব্যক্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর ঐ শ্রীপদে,
তাই জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখানি।[৬]

ইহার উপরে রঙ্ চড়াইয়াছেন কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

সদা চক্ষু মুদে রয়, ঐ পদদ্বয় ছাড়ে না;
হ'য়ে দিগম্বর যোগেশ্বর,
যোগ ছাড়া শিব থাকে না;
লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল,
কিন্তু বেটা কাজের পাগল
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল
কর্ম ভুলে না।[৭]

[৩] তুলনীয়—'যোগীর যোগে পরমতত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি।'—শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, শা. প. (ক. বি.)।

[৪] ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সংকলিত।

[৫] দ্যাখ শব-ছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি॥

[৬] সীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি.)।

[৭] শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য'। তুলনীয়—

পরম-যোগিরূপে রামপ্রসাদ যখন এই এক ব্রহ্মময়ীকে দেহাবস্থিত শক্তি-রূপে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাঁহাকে তিনি তন্ত্রের দেবীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে কালী যোগীর দেহস্থিত নিম্নতম চক্র মূলাধারে সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি; সেই শক্তিকে যোগী প্রথমে জাগরিতা করিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বগা করিয়া সহস্রার-পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম হইতে সহস্রার-পদ্মে গমন—সহস্রার-পদ্ম হইতে আবার আধারে আগমন। এই যে মূলাধার-পদ্ম হইতে সহস্রার-পদ্মে দেবীর আসা-যাওয়া ইহার মাঝখানের স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ পদ্মে মায়ের বিবিধ বিলাস; অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহ এই উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর এক পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে গমনে ও স্থিতিতে সাধকের নব নব অনুভূতি। বিবিধ পদ্মে শক্তির যে বিবিধ স্পন্দন তাহাই মায়ের লীলা-বিলাস। মা যেন ঠিক তাই একটি পদ্মবনের হংসী—বিবিধ পদ্মে লীলা-বিলাস করিয়া বেড়ান। কিন্তু 'হংসী'র পদ্মবনে বিলাস ঠিক একা একা জমে না - সঙ্গে 'হংস' চাই। সাধকদেহে শক্তির আরোহ-অবরোহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জপ-ক্রিয়া চাই—নতুবা অনুভূতির পূর্ণতা ঘটে না। এই জপ হইল অতি স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসে শ্বাসে জপ। শ্বাস-প্রক্রিয়ার দুইটি ভাগ—একটি প্রশ্বাস (বায়ু-গ্রহণ), অপরটি নিঃশ্বাস (বায়ু-ত্যাগ)। সাধকের নিকটে সত্যেরও দুইটি অংশ,—একটি সাধক নিজে—'অহং' অপরাংশ তাঁহার পরম-ইষ্ট—'সঃ'; প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'অহং'কে গ্রহণ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অহং'কে ত্যাগ করিয়া 'সঃ'-এর গ্রহণ। এই 'অহং' এবং 'সঃ' সাধকের জপের মধ্যে মিলিয়া গিয়া হয় 'হংস'। এই 'হংস'-মন্ত্র জপই হইল অজপা-জপ; সাধকের কায়ক্লেশে এই জপ করিতে হয় না, অনেকটা যেন শক্তির ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আপনা হইতেই এই জপ চলিতে থাকে। 'হংসী'-রূপিণী মায়ের পদ্মবনে বিহারের সহচর তাই হইল এই 'হংস'। ভিতরে ভিতরে শক্তির এই বিচিত্র অনুভূতিই সাধককে 'আত্মারাম' (আত্মাতেই আরাম যাঁহার; বা আত্মাতেই রমণ করেন যিনি) করিয়া তোলে; কিন্তু এই আত্মারামের অবলম্বন বা কারণ কালী নিজে—তিনিই তাই আত্মারামের আত্মা। এই পরম-আত্মার বাচক কে? আমরা জানি প্রণবই ব্রহ্মের বাচক; ব্রহ্মকে ব্রহ্মময়ী করিয়া লইলেও প্রণবই তাহার বাচক থাকিয়া যায়। সাধকের অন্তরস্থিত প্রণবরূপিণী আত্মারূপিণী যে ব্রহ্মময়ী তিনিই ত আবার বাহিরে অনন্তরূপে ঘটে ঘটে

পিতা আমার শিয়ান পাগল,
আপন চিন্তায় সদাই বিকল,
তাইতে তোমার চরণ কমল
রেখেছেন শিব হৃৎকমলে।
—সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (ক. বি.)।

বিরাজমানা। ছিন্নমস্তা-তত্ত্বে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ করিয়া দিয়া সেই বিশ্বকে মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া আছেন, তাই মা যে বিশ্বোদরী—'উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড'! বিরাট সেই বিশ্বোদরীর প্রকাশ-রহস্য—লীলা-রহস্য! অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই লীলার প্রকাশ ঘটিতেছে। এই মহাকালে প্রকাশিত মহাকালীর মর্ম কে জানিতে পারে? পারে একমাত্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল মায়ের পদাশ্রিত হইয়া দিনরাত্রি সেই মহাকালীর মর্ম অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে রামপ্রসাদের একটি গানে—

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥[৮]

কিন্তু পরমযোগী হইয়া কালীকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রামপ্রসাদের অন্য লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললীলা আস্বাদন করিতে হইলে যে কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হইবে এমন কথা নাই; কালীকে অবলম্বন করিয়াও বেশ দোললীলা আস্বাদন করা যাইতে পারে। সাধকের নিকটে দোললীলা ত শুধু আবির ছোড়া-ছুড়ি করিয়া মদন-মহোৎসব নয়, হৃদ্-মঞ্চে ইষ্টের দোলার—অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের স্পন্দনের—অনুভূতি। তান্ত্রিক যোগীর পক্ষে শ্যামের পরিবর্তে শ্যামা হইল দোললীলার ইষ্ট, হৃদ্‌কমল-মঞ্চ (অনাহত চক্র বা পদ্ম) হইল ইষ্টের দোলমঞ্চ; বামগা ইড়া এবং দক্ষিণগা পিঙ্গলা হইল মঞ্চের দুই পাশের দুই দড়ি, মধ্য দড়ি হইল সুষুম্না—ইহাতেই মায়ের প্রতিষ্ঠা।—

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥[৯]

আবার হৃদিস্থিতা দেবীকে লইয়া এই দোললীলাকে যে শুধু দোললীলা-

[৮] তুলনীয়—

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীরূপ দেখ না॥
—রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি)।

[৯] রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.)।

রূপেই আস্বাদ করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই—'দোললীলা'কে 'জেল-লীলা' রূপে আস্বাদ করিতেও কোন বাধা নাই—হৃদ্-গারদে মাকে মনবেড়ি দিয়া বন্দিনী করিয়া এই লীলা।—

তুই যা রে, কি করবি শমন, শ্যামা-মাকে কয়েদ করেছি।
মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥
হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥

রামপ্রসাদ কালীর প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রতিমাপূজার পূর্বে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা চাই। মাটির প্রতিমা যে ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ীর প্রতীক মাত্র এই বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইলেই মা-টি যে একেবারে মাটিই হইয়া যাইবেন। রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥

মূর্তি-পূজার বিরোধী না থাকিলেও রামপ্রসাদ মানস-পূজারই পক্ষপাতী ছিলেন। বাহিরের আড়ম্বর অনেক সময় অনুকূল ভাবসমূহের উদ্দীপনা না করিয়া সাধন-প্রতিকূল অহঙ্কারেরই সৃষ্টি করে, রামপ্রসাদের তাই মত 'তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে।' সে পূজাও মাটির প্রতিমা লইয়া নয়, 'তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে' এবং 'ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্তি কর আপন মনে'।

এই মানস-পূজা শুধু ভিতরের কতকগুলি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া নহে, মানস-পূজার আসল জিনিস হইল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শক্তির পায়ে 'অহং'কে একেবারে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দেওয়া। শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা—

মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে॥

শুধু মন নয়, দেহেরও প্রতিটি অণু-পরমাণুও যে প্রতিমুহূর্তে ঐ 'বাজি-করের মেয়ে শ্যামা' যেমনি নাচায় তেমনি নাচে, এই বোধটিকে নিশ্চল করিতে হইবে। এইরূপ নিশ্চলা মতি হইলে তখন ত আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিয়া কোনও সাধনা করিতে হয় না; সাধনা যে দিনরাত আপনা হইতেই হইতে থাকে। মাতৃ-চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধক যখন যাহা করেন তাহাই যে মাতৃ-সাধনা, তখন আর বাহিরের উপচার দিয়া কি হইবে? এই অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

শোনরে মন তোরে বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে॥[১০]

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, তান্ত্রিক সাধনা সবই দেহকে অবলম্বন করিয়া ভিতরের সাধনা; উপচার-নৈবেদ্য, পাদ্য-অর্ঘ্য, ধূপ-দীপ, তীর্থ-ত্রিবেণী সবই ভিতরের। সাধকের পক্ষে এই তন্ত্র-সাধনার উপরেই গ্রথিত তাঁহার মানস-পূজা। রামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে।
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥[১১]

শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অদ্বয়বাদী হইলেও রামপ্রসাদ ভক্তিবাদী। বাঙলাদেশের সব সাধনাই এই অদ্বয়বাদের ভিত্তিতে ভক্তি-সাধনা। পরম 'এক'-এর মধ্যে সব বিধৃত বলিয়া অদ্বয়বাদ, আবার এক হইতে জাত এবং একের মধ্যে বিধৃত থাকিয়াও একটা ভেদ, এবং সেই ভেদকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি। বৈষ্ণব সাধকগণের সাধন-দৃষ্টিও অনেকটা অনুরূপ। পরবর্তী কালের বাঙলাদেশের 'একোমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সাধনার ক্ষেত্রেও পাই এই ভক্তিভাবের আভাস, অদ্বয়ের মধ্যেই যেন একটা দ্বৈতের ভান। রামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেইজন্য নির্বাণের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রামপ্রসাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন—

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

[১০] তুলনীয়—
আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ
যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনা॥

[১১] তুলনীয়—
আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন উচাটন হ'য়ো নারে।
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥
—কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)।

এখানে দুইটি উপমা লক্ষ্য করিতে হইবে। নির্বাণমুক্তির যে আদর্শ তাহাতে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করিতে হইবে, তরঙ্গের জলকে সমুদ্রের জলে মিশাইয়া 'অহং'-এর অস্তিত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিতে হইবে 'তৎ'-এ। কিন্তু 'তৎ'-এর মধ্যে 'অহং' যদি এইরূপে একেবারেই হারাইয়া যায় তবে আর রসানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? এইজন্যই আসিল চিনির দৃষ্টান্ত। চিনির সহিত একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইবার মধ্যে ত চিনিকে আস্বাদ করিবার সম্ভাবনা নাই। চিনিকে আস্বাদ করিতে হইলে চিনিকে খাইতে হইবে, অর্থাৎ একটি মলসংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ 'অহং'-এর ভাব জীয়াইয়া রাখিতে হইবে; মা গ্রাহ্য, আমি গ্রাহক—খানিকটা এই ভাবের সাধনাই হইল চিনি খাইবার সাধনা। খানিকটা 'লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্'-এর মত। এই দ্বৈতভান ব্যতীত ভক্তি হয় না—আর রামপ্রসাদের মতে—'সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।' ভক্তিতে যে যোগ তাহার মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা ত সব সময়েই—কিন্তু মুক্তিই সেখানে একমাত্র কাম্য নয়—ভক্তি-আশ্রিত-রস-আস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্তি ত দাসী-স্থানীয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ-স্থলে ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে চিৎ-কণ-রূপে জীবের নিত্য পৃথক্-স্থিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যেরূপেই হোক, এই-জাতীয় একটি পৃথক্-স্থিতি চাই—একটা মা ও ছেলের ভাব চাই। ছেলে মায়ের মধ্যে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেলে তখন আর চিনি খাইবে কে?

পরব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং কালী-তত্ত্ব যে মূলে একই তত্ত্ব রামপ্রসাদের এই ভাবদৃষ্টি তৎপরবর্তী সকল শাক্তসঙ্গীতকারের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কালী বা দুর্গা মূলে যে শুধু প্রণবরূপিণী—সেই এক প্রণব-স্বরূপ হইতেই যে কালী দুর্গা লক্ষ্মী সীতা রাধা সকল ইষ্টমূর্তি প্রসূতা হন, পরবর্তী কালের গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গানটির আরম্ভেই তিনি বলিয়াছেন,—'ওঁকার মূরতি রে মন জান না কি উহারে?' শেষের দিকে বলিয়াছেন,—

> আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে,
> কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে!
> তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
> ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় আবার ওঙ্কারে॥[২২]

এখানে দেখা যাইতেছে, সাধক বিভিন্ন ইষ্টমূর্তিকে অনেকখানি মায়ামূর্তি বলিয়া মনে করেন। এক জ্যোতির্ময়ী প্রণবরূপিণীই সাধকের বাসনানুসারে স্বেচ্ছায় এই-সব মায়ামূর্তি গ্রহণ করেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে আবার কোথাও কোনও

[২২] শা. প. (ক. বি.)।

মূর্তি দেখা যায় না—সব গিয়া আবার এক অনন্ত জ্যোতির্ময় ওঁকারে বিলীন হয়।[১৩]

গোবিন্দ চৌধুরীর অন্য গানে দেখি—

রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়ে,
মিছে পৃথক্ ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে॥[১৪]

আমরা পূর্বেই কমলাকান্তের একটি পদে লক্ষ্য করিয়াছি, শ্যামাকে তিনি কোনও নারী-তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন, শ্যামা একাধারে নারী-পুরুষ সবই—শ্যামা হইলেন 'পরম কারণ' (জান নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়)। এই পরম-কারণ-রূপেই 'আদরিণী শ্যামা মা' শুধু যোগি-ভক্তগণের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবার বস্তু।[১৫] এই 'আদরিণী শ্যামা মা'-রূপে যোগি-ভক্তগণের হৃদয়ে যে সত্যের স্থিতি, দেশে দেশে কালে কালে সেই সত্যেরই প্রকাশ দেখিতে পাই বিভিন্ন ইষ্টমূর্তিতে। অতি জনপ্রিয়ভাবে এই সত্যেরই প্রকাশ দেখি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর গানে। তিনি বলেন,—'এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাঁজি।' তাঁহার মতে—

মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি॥[১৬]

এই-সকল গানই যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আগমন সূচনা করে তাহা বুঝিতে কিছুই কষ্ট হয় না।

[১৩] তুলনীয়—

তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ মহামায়া, মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে॥—দেওয়ান রঘুনাথ।

[১৪] শা. প. (ক. বি.)।

[১৫] আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে॥
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, 'শা. প. (ক. বি.)।

[১৬] শা. প. (ক. বি.)।

তুলনীয়—

হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,
তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্মাধর্ম,
তারা কি মর্ম জানে তার,
হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।
—কবিওয়ালা নীল ঠাকুর, 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (ক. বি.)।

রামপ্রসাদ তাঁহার গানে যে মানস-পূজার প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন পরবর্তী কালে সর্বত্র তাহারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি। দেওয়ান রামদুলাল নন্দী বাহিরের উপচারে পূজা করিতে গিয়া নিজেই যে একেবারে বোকা বনিয়া গিয়াছেন। মা যে ব্রহ্মময়ী—মা-ই যে সব; মাকে পূজা করিতে মা ছাড়া আর পৃথক্ উপচার মিলিবে কোথায়?

বল মা তোমায় কি দিয়ে পূজি গো ব্রহ্মময়ী?
আমি দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই॥
ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু, সকলি তোমার তনু,
মাগো অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ॥[১৭]

তান্ত্রিক সাধকগণের আবার মানসোপচারে মাকে পূজা করিবার বিধি রহিয়াছে। সহস্রার-পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য-আচমন-স্নানাদির জল; ষট্চক্রের মধ্যে প্রথম পঞ্চচক্রে অবস্থিত পঞ্চভূত-তত্ত্বের মধ্যে ক্ষিতি-তত্ত্বই গন্ধ, তেজ দীপ, মরুৎ ধূপ, এইরূপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই ঘণ্টা, বায়ু-তত্ত্বই চামর।[১৮]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কালীর কালো রূপের বর্ণনা করিতে সাধক কবিগণ কেহই মাকে কালো বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সবাই বলিয়াছেন 'আলো'। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—'শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো।' অন্যত্র দেখি—

কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে হৃদি-পদ্ম করে আলো॥

সাধক কমলাকান্তেরও প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে—

শ্যামা মা কি আমার কালো রে
ওরে শ্যামা মা কি আমার কালো।

[১৭] শা. প. (ক. বি)।

[১৮] হৃৎ-কমল-মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে,
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে॥
সহস্রার-চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে,
পূজ যথাবিধি মতে, অর্ঘ্য দিয়া মনেরে।
তদামৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান,
আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন;
চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ,
ক'রে নৈবেদ্যস্বরূপ দেও অমৃত অম্বুধিরে॥
অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর,
সহস্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর;—ইত্যাদি—রামকুমার পত্রনবীশ,
শা. প. (ক. বি.)।

লোকে বলে কালী কালো—
আমার মন তো মানে না কালো—
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো॥[১৯]

সাধক-কবিগণের কালীকে এইরূপ 'কালো' না বলিয়া 'আলো' বলিবার তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু কবি-কল্পনা? না, নিজেদের ইষ্টের রূপ-মহিমা খ্যাপনের চেষ্টা মাত্র? আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্ত্বের ও কালী-সাধনার যে আভাস দিয়াছি তাহা সম্যক্ অনুধাবন করিলেই এই 'হৃদিপদ্ম আলো করিবার' তাৎপর্য বোঝা যাইবে। মূলে প্রণবাত্মিকা ব্রহ্মময়ী মা যে বিশুদ্ধ চিদ্ঘন—আনন্দঘন—জ্যোতির্ঘন। সাধক তাঁহার হৃৎপদ্মে অনুভব করিতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও জ্যোতির; ইষ্টমূর্তি ত তাহারই অবলম্বন মাত্র। এই ইষ্ট-অবলম্বনের পার্থক্যের দ্বারা সাধকের নিকট চিত্তানুভূতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ইষ্ট-অবলম্বন চিত্তে একটি স্বচ্ছ উপাধির ন্যায় হইয়া সাধকের আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় পরম-অনুভূতিকে অনুকূলভাবে ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া তোলে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কাব্যের রসানুভূতির ক্ষেত্রে রস যেমন নিত্য একবস্তু, কিন্তু বিভাবাদির তাৎকালিক উপাধিদ্বারা চিত্ত কিঞ্চিৎ উপাধিগ্রস্ত হইলে একই রস বিভিন্ন রসরূপে প্রতীত হয়, তেমনই সাধকগণের পরম-অনুভূতির মূলে একই, শুধু ইষ্টাশ্রয়ের পার্থক্যে এবং সাধন-প্রণালীর পার্থক্যে চিত্ত-পরিমণ্ডলে একটি উপাধির সৃষ্টি হয়; সেই উপাধি পরম আনন্দ ও পরম-জ্যোতির অনুভূতিকে বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত না করিয়া কিঞ্চিৎ অনুকূল রঙে রঞ্জিত করিয়া তোলে মাত্র।

চরম অনুভূতিক্ষণে সাধক-চিত্তে ইষ্টাশ্রয়ের এই-জাতীয় একটি প্রভাব ব্যতীত ইষ্টমূর্তির বিশদ বৈচিত্র্য থাকে না। এই যে বিশদ বৈচিত্র্য ইহা অনেক সময়ই সাধকচিত্তে সাধনার অনুকূল কতকগুলি ভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দিবার জন্য। সাধক রামপ্রসাদ 'ত্রিনয়নী কালিকা' রূপের মধ্য দিয়া দেবীর সেই বিশ্বমূর্তিরই ধ্যান করিতে চাহিয়াছেন চন্দ্র-সূর্য-হুতাশন যাঁহার মধ্যেই অঙ্গরূপে বিধৃত—যাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত—যাঁহার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত;[২০] তাই তিনি গাহিলেন,—

[১৯] তুলনীয়— মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলে বল!
কালোরূপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল॥
... ...
কালো নয়, পূর্ণিমার শশী, হৃদয়-মাঝে করে আলো॥
—শম্ভুচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.)।

[২০] তুলনীয়— ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা
নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

'মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন।' আবার কৃষ্ণবর্ণা অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত এক সাধক আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই রহস্য—

অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্বাণ-হিল্লোলে
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে গো তুমি একা বসি।[২১]

কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ বলিয়াছেন—

বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী,
পালন করি' বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরী,
অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে,
তাই তে নাম ধরেছে ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী॥[২২]

অপর সাধক বলিয়াছেন—

অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী।
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ॥
যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ!
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্বনিদান॥
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব,
পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন॥[২৩]

অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণী শ্যামার ধ্যানের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র অহং হইতে অসীমতার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।—

চাই মা আমি বড় হ'তে।
আমি আর পারি না থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে।
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে;—
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশি-সূর্য ল'য়ে হাতে॥[২৪]

[২১] শা. প. (ক. বি.)।
[২২] ঐ।
[২৩] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক), ঐ।
[২৪] ঐ।

নবম অধ্যায়

পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের সাধনা

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সাধনা

সাধক রামপ্রসাদের এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের সাধন-সঙ্গীতে বাঙলার শাক্ত-ধর্মের সাম্প্রদায়িক-গণ্ডী-বিরোধী যে একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ দেখিতে পাই, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহারই পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাম-প্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বৎসর পূর্বে ধরা যাইতে পারে। এই একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলার শক্তিসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই সত্যই লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা দেখি সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা-পূজাকে যে একটি সার্বজনীন ধর্ম-সাধনার রূপ দিয়াছেন পরবর্তী কালের সাধকগণ তাহার আরও বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য হইতে উত্থিত কবিওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছোট-বড় বহু কবির সঙ্গীতের মধ্যেও আমরা রামপ্রসাদের সাধন-সুরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাহাতে বোঝা যায়, শুধু সাধক-বিশেষের মনে নহে, অষ্টাদশ শতকের মধ্য সময় হইতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ষকালে বাঙলার জনমানসের মধ্যেই শাক্তধর্ম একটি সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ করিতেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিব, এই ধারারই পরিণতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একদিকে রহিলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ—আর একদিকে রহিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী মহারাজগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যে ভারতীয় ধর্মের প্রচার করিলেন তাহা হইল মুখ্যতঃ বেদান্তধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত 'মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ 'বেদান্ত-মঠ'। ইতিহাসের দিক্ হইতে জিনিসটি আপাতবিরোধী মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, বাঙলাদেশের ধর্ম-ইতিহাসের

যে এই পরিণতি ইহার মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই—আছে একটি স্বাভাবিক পরিণতিরই ক্রম। মাতৃপূজা যে মৃন্ময়ী মূর্তি বা অন্য কোনও ধাতুনির্মিত মূর্তির পূজা নয়—মা যে এক অদ্বিতীয় সত্য—মা যে ব্রহ্মময়ী—মায়ের আসল পূজা যে মানস-পূজা এবং সেই মানস-পূজা এবং ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ যে কোনও ভেদ নাই, ইহা রামপ্রসাদ এবং তৎপ্রভাবিত বাঙলার সাধকগণ ও কবিগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যকে তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙলার ঊনবিংশ শতকের ধর্ম-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বোধি', তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল ঊনবিংশ শতকের বিদেশী শাস্ত্রদর্শনে পরিশীলিত 'বুদ্ধি'—তাহারই প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। 'বুদ্ধি' 'বোধি'কে আশ্রয় করিল—গ্রহণ করিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বোধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন বেদান্তের রূপে,—কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদান্তই মহামানবের মিলন-কেন্দ্র। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-মত যে খাঁটি শাক্ত-মত, ইহাও যেমন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, তেমনিই আবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে এই খাঁটি শাক্ত-মত ও খাঁটি বেদান্ত-মতের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই: একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃষ্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রহিয়াছে। প্রথমেই আমরা হয়ত লক্ষ্য করিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-উপাসক ছিলেন—তিনি কালীমূর্তির পূজারী। কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রূপে অস্বীকার বা বিকৃত না করিয়াও আমরা বলিতে পারি, এই পরিচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধক-জীবনের ইতিহাসে দেখি, তিনি কেনারাম ভট্টের নিকটে প্রথমে শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারীরূপে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন।[১] স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনাকাল। ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫ এই চারি বৎসরকাল তিনি ভবতারিণীর পূজারীরূপে সাধনা করেন; ১২৬৬-৬৯ এই চারি বৎসরকাল তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে এবং নির্দেশে তন্ত্র-সাধনা করেন; ১২৭০-৭৩ এই তিন বৎসর কালের মধ্যে তিনি অন্য বহুরূপে সাধনা করেন। তিনি জটাধারী নামক জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন এবং শ্রীরামলীলা-বিগ্রহ লাভ করেন; তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নায়িকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। এই সময়ে তিনি কিছু দিন আবার আচার্য তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্বিকল্প সমাধির সাধন করেন। ইস্‌লাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট

[১] অবশ্য সাধক-জীবনের আরম্ভ তাঁহার বাল্য হইতেই।

হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইস্‌লামের সাধন গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নৈষ্ঠিক পন্থায় সাধন করেন। তিনি খ্রীষ্টান সাধনার মূল কথা জানিয়া সেই পন্থায়ও সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও একটি সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন নিষ্ঠার সঙ্গে লাগিয়া থাকিতে না পারিয়াই এইরূপ বার বার নানা সাধন-পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কথা মনে আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হইবে। আসলে তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই হইতে পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের বিভিন্ন পন্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই লাভ করিয়াছেন—উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া সত্যের যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের মধ্যে পরিমাণগত এবং প্রকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে; সে পার্থক্য সাধকের সত্যোপলব্ধিকে বিচিত্র রসে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। এক সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় রসবৈচিত্র্যে উপলব্ধি করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিভিন্ন পন্থায় সাধনা। তিনি বার বার বলিয়াছেন, 'আমি একঘেয়ে কেন হব?' পূজা, অনুষ্ঠান, কীর্তন সবই চাই। 'শুটকো বৈরাগী' না হইয়া তিনি 'রসে বশে' থাকিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার বিচিত্র সাধনা। এই বিচিত্র সাধনার অপর একটি বড় দিক্‌ও ছিল। সব নদীর জলই যে গিয়া এক সাগরে মেশে—সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক সত্যকেই নানাভাবে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে, একথাটা তিনি নিজে সাধনা-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন।

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেই যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ তাহা নয়, এক দেশ এক জাতির মধ্যেই ত ধর্মের কত বিভিন্ন রূপ। এক হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ত মত ও পথের অন্ত নাই। এই মত ও পথের বৈচিত্র্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিতেন অধিকারিভেদের দ্বারা। যে যেরূপ অধিকারী—সত্যকে অবলম্বন করিয়াও তাহার আদর্শ ও বাসনা যেরূপ—তাহার ধ্যান-মনন যেরূপ সেইরূপ মত-পথই গড়িয়া উঠে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন।"...

"কি জান? দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় ক'ল্লে, তাঁর কাছে পোঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন।"[২]

[২] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ. ১৪৫-৪৬; ৩য় ভাগ, পৃ. ৯৭

কথাটাকে অন্যভাবেও তিনি বলিয়াছেন,—"সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।"[৩]

নিজে তিনি সর্ব মতে-পথে সর্বভাবে সেই সচ্চিদানন্দঘন ছককে আস্বাদন করিয়াছেন। তখনকার দিনে ব্রহ্ম-উপাসনা-উৎসবে তিনি খুব যোগ দিতেন, আবার কালী-মন্দিরে বসিয়া মহানন্দে কালী-পূজাও করিতেন। তাঁহার নিকটে এই ব্রহ্মোপাসনা এবং কালী-পূজার মধ্যে কোনই তফাৎ ছিল না, কারণ "আমার মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়!—কোশাকুশী চিন্ময়!—চৌকাঠ চিন্ময়!—মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়!"

"ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে,—সচ্চিদানন্দ-রসে।"[৪]

এই সচ্চিদানন্দ-রসই হইল আসল কথা। ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াও এই সচ্চিদানন্দ-রস, কালীকে অবলম্বন করিয়াও এই সচ্চিদানন্দ-রস—আবার উমা-মহেশ্বর, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়াও সেই একই রস। এই কারণেই শ্যামা-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবস্থ হইয়া যাইতেন, ঠিক একই সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কীর্তন শুনিতে শুনিতেও তিনি ঠিক একই রূপে ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন। ভবতারিণীর মন্দিরে যিনি বালকের ন্যায় মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল তিনিই আবার যমুনার কূলে কৃষ্ণ-ভাবনায় উন্মাদ,[৫] পেনেটির বৈষ্ণব-মহোৎসবে যোগ দিয়া রাধা-কৃষ্ণের আঙ্গিনায় উদ্দাম নৃত্যেও তাঁহার কোনও বাধা নাই; আবার গৌরাঙ্গের গান শুনিয়া তাঁহার গৌরভাবে প্রবল কৃষ্ণ-উদ্দীপনা। ইহার কোথাও কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই—ইহাই ত তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও 'মা বিরাজেন সর্ব ঘটে' জানিয়াও ইষ্টমূর্তি উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈতের, জ্ঞানের মধ্যেই ভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কারণও ঐ একই, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' একটু 'খাওয়া' চাই—লীলার আস্বাদন চাই। এই লীলার আস্বাদনের জন্যই চাই খানিকটা একটু দ্বৈতকে; সে দ্বৈত অদ্বৈতকে অস্বীকার করিয়া নয়, সে দ্বৈত অদ্বৈতে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া। এই দ্বৈত হইল 'লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতং'—তাই যে ইহা 'অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্'। মন্দিরে গিয়া প্রতিমার কাছে বসিয়া 'কালী কালী' বলিলে কি হইবে, ভিতরে যে একেবারে ঠিক হইয়া আছে 'কালী ব্রহ্মময়ী'। 'ব্রহ্মময়ী'-তে খানিকটা একটু রূপের বিকার

[৩] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৬। [৪] ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৪২।
[৫] ঐ. ৩য় ভাগ, পৃ. ৩৩।

রহিয়াছে, 'ময়ী'ত্বেই বিকার—বিকার ছাড়া যে রূপ হয় না। কিন্তু এ বিকার লীলার বিকার। এই যে রূপ,—এই যে ইষ্টমূর্তি,—ইহা ত অবলম্বন—অবলম্বন করিয়া রূপের মধ্যে একবার ডুবিয়া গেলে তখন আর রূপ কোথায়? তখন 'রূপ-সাগরে' ডুবিয়াই যে লাভ হয় 'অরূপ-রতন'। যখন অরূপ রতন তখন আর ব্রহ্মময়ী নয়—তখন শুদ্ধ ব্রহ্ম। তখন আর শ্যামা স্ত্রী নয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য সাধকগণও এই কথাই বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন, "সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ? আমি ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে দিয়েছে! একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মা'র গলায় পৈতে কেন?' যার বাড়ীর ঠাকুর, তাকে সে বললে, 'ভাই তুই মাকে ঠিক চিনেছিস।' কিন্তু আমি কিছু জানি না, মা পুরুষ কি মেয়ে!"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল।"[৭] অখণ্ডে হইল একেবারে লীন অবস্থা—একেবারে বেহুঁশ অবস্থা—সূফীদের ভাষায় 'বেখবরী হাল'। এই ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে একেবারে লীন বা বেহুঁশ হইয়া থাকিতে শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন না। তাইত তিনি বার বার বলিতেন, 'ওমা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ ক'রে রাখিস্ নে!' তিনি যে লীলার আনন্দ চান, রসের আস্বাদন চান, তাই বলিয়াছেন,—"শুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান। হ্যাক্ থু!!! যতক্ষণ 'আমি' রেখেছ, ততক্ষণ তুমি! পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না?"[৮]

সাকার-সাধকগণের মধ্যে দুই প্রকারের সাধক আছেন,—একদল হইলেন নিরাকারে অনধিকারী, নিরাকারকে তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। অনেক সময় যাঁহারা নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়েন। "পাখী উপরে খুব উঠে, যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সকার।"[৯] কিন্তু আর এক রকমের সাকার আছে, তাহাকে বলা যায় উচ্চাধিকারীর সাকার। এখানে নিরাকারের পর সাকার; অর্থাৎ নিরাকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর লীলানন্দ-বিলাসের জন্য সাকার। গোপীরা ছিলেন এই উচ্চাধিকারী সাধকের দলে; তাই "গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা চাইত না।"[১০] এই বিভিন্ন ইষ্টমূর্তিকে সাকারে বিচিত্র রস-আস্বাদন আর নিরাকারে একটানা স্থিতি—এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ-বাড়ীর নহবতের দুইটি সানাইয়ের সুরের পার্থক্যকে অবলম্বন করিয়া। "যেমন রসুন-চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়।"[১১]

[৬] কথামৃত, ৫ম, পৃ. ৭৬-৭৭। [৭] ঐ, ৪র্থ, পৃ. ১০০। [৮] ঐ, ৪র্থ, পৃ. ৫০।
[৯] ঐ, ৪র্থ, পৃ. ১১৬। [১০] ঐ, ৪র্থ, পৃ. ১। [১১] ঐ, ৫ম, পৃ. ৪০।

সত্যটিকে আবার অন্যভাবে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ব্রহ্ম এবং কালী একই পরম সত্যের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় রূপ। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, লীলা-সক্রিয়তায় কালীরূপ। কালীই ইষ্টমূর্তি; সেই ইষ্টমূর্তি সাধকের বাসনা অনুরূপে বহু হয়। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন, "সাধকের জন্য তিনি নানা ভাবে নানা রূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বল্লে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমনি সেই লোকটী গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলতো, 'এই লও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজনে হয়তো বল্লে, আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই। অমনি সেই লোকটী সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার হল্‌দে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই লও তোমার নীলরঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হ'তে ছোপান হ'ত।"[১২] এ-বিষয়ে তিনি বহুরূপী গিরগিটির দৃষ্টান্তটিও বার বার ব্যবহার করিয়াছেন; একই গিরগিটি, কখনও লাল, কখনও সবুজ,—কখনও হল্‌দে, কখনও নীল। পরমসত্য নির্গুণও বটে, সগুণও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে, সক্রিয়ও বটে, নিরাকারও বটে, সাকারও বটে। সাকারও আবার বহু-আকার; আসলে এ শুধু দেখিবার পার্থক্য, উপলব্ধির পার্থক্য—সাধক-মানসের পার্থক্য। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার দুইটি দিক্ দেখিয়াছেন,—একটি দিক্ হইল নিম্নাধিকারীর দিক্—অপরটি হইল উচ্চাধিকারীর দিক্। নিম্নাধিকারীর পক্ষে যে সাকার-উপাসনা উহা অনেকখানি হইল সাধনার একটা প্রাথমিক অবস্থা। "আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামীসহ বাস করে। বিবাহ হ'লে পুতুলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রতিমাপূজার কি দরকার?"[১৩] কিন্তু উচ্চাধিকারীর আর-এক রকম ইষ্ট অবলম্বন আছে—রূপ অবলম্বন আছে, উহাই হইল লীলা-রসাস্বাদের প্রয়োজনে। লীলাবিলাসী সাধকের ভক্তির আবেগেই নিরাকার আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তি লাভ করিয়া সাকার হইয়া ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠ্‌লে বরফ গ'লে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল।"[১৪]

[১২] কথামৃত, ১ম, পৃ. ৫১-৫২। [১৩] ঐ, ২য়, পৃ. ১০৫। [১৪] ঐ, ২য়, পৃ. ২৩

আসলে তাহা হইলে নিরাকার ও সাকার হইল একই সাধকের দুই ক্ষণে দুই রূপ উপলব্ধি। নির্বিকল্প সমাধিতে যেখানে 'অহং'-এর পরিপূর্ণ লোপ সেইখানেই নিরাকার। যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্ঞেয় নাই—সেখানে আকার বা রূপ আসিবে কোথা হইতে? সেই নির্বিকল্প ধাম হইতে চিত্ত যখন রূপের ধামে নামিয়া আসিয়া 'অহং'কে খানিকটা ফিরিয়া পায় তখনই সাকার। লীলাবিলাসী সাধক—যাঁহারা সর্বদা 'বেহুঁশ' হইয়া থাকিতে চাহেন না—যাঁহারা 'রসে বশে' থাকিতে চান তাঁহারা তাই নির্বিকল্প সমাধিতে বেশিক্ষণ নিঃসংজ্ঞ থাকিতে চাহেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন, আর তার একটী ফিনকি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন বিলাসের জন্য! আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়।"[১৫] অন্যত্র তিনি এ-বিষয়ে বলিয়াছেন,—"দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি।...তবে একটি রেখামাত্র আছে ('ভক্তের আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।"[১৬] "তিনি যতক্ষণ 'আমি' রাখেন ততক্ষণই ভক্তি।" এই 'আমি'র রেখামাত্র অবস্থানেই নির্গুণের সগুণ লীলার, নিরাকারের সাকার লীলার আস্বাদন হয়। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণই কালী-কৃষ্ণ—যখন 'আমি'র লোপ তখনই 'সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সেই ব্রহ্ম সেই যে কালীরূপে আস্বাদিতা ইহা ত সংবেদ্য সত্য, ইহাকে লইয়া কি বাহিরে হৈ চৈ করিতে হয়? রামপ্রসাদের মত 'ঠারে ঠোরে' বুঝিতে হয়—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে॥

"রামপ্রসাদ মনকে বল্‌ছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বল্‌ছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বল্‌ছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বলিয়াছেন, অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার টল আছে। অচল অটলই নিত্য—আর চলে টলে নিত্যের বুকে মধুর লীলা। যাঁহার নিত্য, তাঁহারই লীলা। অচলে অটলে ব্রহ্মজ্ঞান—চলে টলে ভক্তি। রামপ্রসাদের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণেরও ঝোঁক এই ভক্তির দিকে। অচলে বা অটলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, বড় উচ্চ পর্দা—অল্প একটু নামিয়া আসিয়া ভক্তিতে সরস হইয়া অবস্থান করিতে হয়। "ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি; —কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না;—আবার নীচের গামে নামতে হয়। আমি বলি, 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না'।"[১৮]

[১৫] কথামৃত, ৩য়, পৃ. ১০০। [১৬] ঐ, ৩য়, পৃ. ২৮৯। [১৭] ঐ, ৩য়, পৃ. ১৭।
[১৮] ঐ, ৩য়, পৃ. ৯০॥

এই অটল ও টলের তত্ত্বটি ভারী সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে শিবের দৃষ্টান্তে। যোগে যখন আত্মলোপ করিয়া সমাধিস্থ তখন তিনি অটল! মনকে খানিকটা যখন নীচে নামান হইল তখনই ভক্তিতে তিনি 'টল'—তখনই রাম রাম করিয়া নৃত্য। "শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা,—যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি' একটা আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম! ক'রে নৃত্য।"[১৯]

ভক্তির ক্ষেত্রে রূপের ক্ষেত্রে মন যে একটু নামিয়া আসে, একথার তাৎপর্য কি? যোগ-সাধনার দিক্ হইতে কথাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তন্ত্রে যে ষট্‌চক্র এবং তদূর্ধ্বে সপ্তম চক্র সহস্রারের কথা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অতি সহজ সরল একটি বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই সপ্তচক্রই মনের সাতটি ভূমি,—"এই সাতভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে! মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ-দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আনে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।"[২০]

শিরোদেশের সপ্তম ভূমিই হইল সপ্তম স্বর 'নি'-র ভূমি; এখানে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, থাকিলে দেহপাত হয়। লীলারস আস্বাদের জন্য দেহকে রক্ষা করিতে হইলে একটু নামিয়া আসিয়া কণ্ঠস্থ পঞ্চম ভূমি ও কপালস্থ ষষ্ঠভূমিতে অবস্থান করিতে হয়। সপ্তম ভূমিতে 'অহং'-এর লোপ সেখানে আর ভক্তির কথা নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিতে অহং পাকা সোনা হইয়া থাকে—দাস অহং, মায়ের সন্তান অহং—এই দুই ভূমিই হইল তাই ভক্তির ভূমি—সাকার-অবলম্বনে লীলা-বিলাসের ভূমি। 'আর চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার

[১৯] কথামৃত, ৪র্থ, পৃ. ২৬৮। [২০] ঐ, ১ম, পৃ. ৭২-৭৩।

এমন কখনও ইচ্ছা হয় না যে বলি, 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান্, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্ খেলান ভাল।"[২১]

সপ্তম ভূমিতে যে দর্শন তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে স্থিতি বেশী সময় সম্ভব নয়। তন্নিম্নের দুই ভূমিতে যে ভক্তির দর্শন তাহা খানিকটা যেন দূর হইতে দর্শন। একটু দূর হইতে দর্শন না হইলে রূপ আসে না, প্রত্যক্ষ দর্শনে কোনও রূপ নাই। কালী এইজন্য চৌদ্দ পোয়া। "কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।"[২২]

মোটের মাথায় দেখিতে পাইতেছি, লীলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভক্তিভাব হইতেই শাক্ত-সাধক-হিসাবে তাঁহার সন্তানভাব। শাক্ত-সাধনায় দুইটি ভাব,—এক বীরভাব—আর সন্তানভাব। বীরভাবে সাধক নিজেই শিব—তখন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সাধনা। বীরভাবের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের রুচি ছিল না। তিনি বার বার বলিয়াছেন, আমার সন্তান-ভাব, মা ও ছেলের মধুর সম্বন্ধ লইয়া রসাস্বাদন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা পরবর্তী কালে রূপান্তর লাভ করিল বেদান্তধর্মে। ইহার কারণ কি? শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রেরণা লাভ করিয়া এই রামকৃষ্ণ-সাধনাকে যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় সাধনারূপে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর, নিরাকারের ঘর।' আবার বলিয়াছেন,—'নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।' নরেন্দ্র তাই নিচু ভূমিতে নামিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে জগৎ-বিমুখী বা মানব-বিমুখী করিয়া তোলে না। তাঁহার বেদান্ত শুধু তত্ত্বের বেদান্ত নয়—ব্যবহারিক বেদান্ত (Practical Vedanta)। জগৎ ও জীব সবই ব্রহ্ম বলিয়া তিনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া জগৎ এবং জীবকে উড়াইয়া দিলেন না,—বরঞ্চ জীবই ব্রহ্ম বলিয়া নরকে তিনি নারায়ণ করিয়া তুলিলেন, জীব-প্রেমকেই ঈশ্বর-প্রেম, জীব-সেবাকেই ঈশ্বর-সেবা বলিয়া প্রচারিত করিলেন।

[২১] কথামৃত, ১ম, পৃ. ৯২। [২২] ঐ, ১ম, পৃ. ৭১-৭২।

উপনিষদের মন্ত্র—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥[২০]

ইহাকেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সর্বত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মানুভূতির ফলে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখা এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দেখা। তখন আর ধর্মোপদেশকের উচ্চস্থান হইতে মানুষকে কৃপা করিবার বৃত্তি নয়, তখন গভীর শ্রদ্ধা লইয়া কায়মনোবাক্যে শুধু নর-নারায়ণ সেবা। পরবর্তী কালে তাই রামকৃষ্ণ-ধর্ম এই সেবা-ধর্মকেই ভিত্তি করিয়া দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

(খ) শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-সাধনা

তান্ত্রিক-সাধনা ও শক্তি-সাধনার একটি সূক্ষ্ম বিকাশ দেখিতে পাই বিংশ শতকের পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। তিনি যে সামগ্রিক অখণ্ড যোগ-সাধনার কথা প্রচার করিয়াছেন তন্ত্র-সাধনাই তাহার ভিত্তিভূমি। তন্ত্র-সাধনাকে গ্রহণ করিতে গিয়া তিনি তন্ত্রের বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠান, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তন্ত্র-সাধনার সারবস্তু। তন্ত্র-সাধনা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কতকগুলি শিথিল ধারণা প্রচলিত আছে; আসলে তন্ত্র-সাধনার বৈশিষ্ট্য হইল কায়-সাধনা, আর কায়-সাধনার সঙ্গেই যুক্ত হইয়া আছে আর-একটি চরম আদর্শ—সেখানে ভব ও নির্বাণ, ভুক্তি ও মুক্তিকে একেবারে এক করিয়া লইতে হইবে। এই ভব-নির্বাণকে বা ভক্তি-মুক্তিকে এক করিয়া লইবার সাধনা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মধ্যে দেখা দিয়াছে সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ রূপান্তরের (transformation) সাধনায়। তিনি যে দিব্য-জীবনের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইল এই সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তনের বা রূপান্তরের সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে বারবার আমরা দিব্য সোমরস পানের কথা দেখিতে পাই। এই সোমরসকে শ্রীঅরবিন্দ একটি পরমগভীর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, একটি অখণ্ড সোমধারা শুধু ব্যক্তি-জীবন নহে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে—এই সোম-ধারা বা অমৃতধারা হইল দিব্যজ্যোতিঃ ও দিব্য-আনন্দের ধারা; এই দিব্যজ্যোতিঃ ও দিব্য-আনন্দকে লাভ করিতে হইবে এবং তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে জীবনের যাহা-কিছু সকলকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া অমর এবং দিব্য করিয়া তুলিতে। এই দিব্য-আনন্দই হইল সকল অস্তিত্বের মূল আনন্দ—অমৃতময় আনন্দময় পরমপুরুষ জীবরূপে মনন-শক্তিযুক্ত জীবন্ত বস্তুপিণ্ডের ঘটে এই

২০ ঈশ-উপনিষৎ।

আনন্দরস-সুরা ঢালিয়াই দিতেছেন; নিজে তিনি নিত্য এবং সুন্দর, জীবরূপ বস্তুকোষে আবার তিনি নিজেই প্রবিষ্ট হন—সে প্রবেশের উদ্দেশ্য হইল জীবের সত্তা ও প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া।[১]

সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনা কেবলই হইল নেতিমার্গে। সত্য কি তাহা আমরা কিভাবে বুঝি? সত্য ইহা নয়, সত্য উহা নয়—সত্য যাহা-কিছু জানি তাহার কিছুই নয়। বস্তুরূপে বহুভাবে প্রতিভাত বিচিত্র জীবের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের রক্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দ-বেদনার মধ্যে সত্য নাই; সত্য হইল একটি নিরপেক্ষ নিরালম্ব অন্বয় তত্ত্ব—যত-কিছু অস্তিত্ব সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এই যে শুধু নেতিপথে ধাবন—চরমনির্বাণোন্মুখিতা—শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার মতে অধ্যাত্ম-সাধনা হইল একটা বিরাটতর এবং পূর্ণতর অস্তিত্বের সাধনা। ঐ নেতিমার্গে নির্বাণোন্মুখিতা অধ্যাত্মসাধনার সম্পূর্ণ বৃত্তের একটি অর্ধ মাত্র; অপর অর্ধ হইল দিব্যসত্তার সাধনা—তবেই সাধনার পরিপূর্তি। ইহাই তো হইল তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তি এক করিবার সাধনা। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যে বলা হইয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই কথাটার উপরেই আমরা এতদিন অত্যন্ত বেশী জোর দিয়া আসিয়াছি। সর্বব্যাপী এককে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা রূপাশ্রিত বহুকে কেবলই অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কিন্তু উপনিষদের এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্রটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মন্ত্রটিকে আর-একটি ঔপনিষদিক মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া পড়িতে হইবে, তাহা হইল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। উপনিষদের এই দুইটি মহাবাক্যই হইল সাধনবৃত্তের দুইটি অর্ধ—ইহাই তন্ত্রের নির্বাণ ও ভব—মুক্তি ও ভক্তি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার *The Life Divine* (দিব্য-জীবন) গ্রন্থে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন—

"The passionate aspiration of man upward to the Divine has not been sufficiently related to the descending movement of the Divine leaning downward to embrace eternally its manifestation. Its meaning in matter has not been so well understood as its truth in the Spirit."

---

১ "From the divine bliss, the original Delight of existence, the Lord of Immortality comes pouring the wine of that Bliss, the mystic *soma*, into these jars of mentalised living matter; eternal and beautiful, he enters into these sheaths of substance for the integral transformation of the being and nature."—Sri Aurobinda, *The Life Divine*.

দিব্য-জীবন লাভের জন্য আমরা একটা ঊর্ধ্বায়নের কথাই জানি। কিন্তু বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বভূমি লাভ করিয়া কেবল ব্রহ্মে স্থিত থাকিলে সাধনা পূর্ণ হইল না; সেই ঊর্ধ্বভূমি হইতে সমস্ত দিব্যজ্যোতিঃ ও দিব্য-আনন্দকে আবার একটি নিম্নধারায় নামাইয়া আনিতে হইবে অমূর্তের মূর্তরূপের দিকে। সত্যের তাৎপর্য আমরা শুধু আত্মতত্ত্বের মধ্যেই বুঝিতে শিখিয়াছি—সমভাবে বস্তুতত্ত্বের মধ্যেও বুঝিতে শিখি নাই। সত্য শুধু বস্তু-নিরাকৃত আত্মা নহে, সত্যকে আত্মা ও জড় উভয়ের মধ্যে সমভাবে বুঝিতে ও অনুভব করিতে হইবে। সত্যকে ধরিতে গিয়া আমরা সত্যের মূর্তরূপকে কেবলই বাদ দিয়া গিয়াছি, কিন্তু মূর্ত ও অমূর্ত উভয় জুড়িয়া যে সত্যের অখণ্ডলীলা তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে সাধনায় পূর্ণতা আসিবে না।

বাস্তব-জীবনকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না; পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয় ভগবত্তাকে বাস্তব-জীবনের মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া। মানুষের জীবনের আরম্ভ জৈবিক প্রাণশক্তিতে—তাহার পূর্ণপরিণতি দিব্য-অস্তিত্বে। এই জৈবিক প্রাণস্পন্দন হইতে দিব্য-সত্তায় অবস্থানের মধ্যে জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-ঊর্ধ্বগতিতে বিভিন্ন স্তরে আমরা ক্রম-উচ্চতর সত্তা লাভ করি; কিন্তু কোনও উচ্চতর সত্তাকেই আমরা নিম্নতর সত্তাকে বর্জন করিয়া লাভ করি না—নিম্নতর সত্তার ক্রম-পরিবর্তন ও পরিণতির ভিতর দিয়াই উচ্চতর সত্তাকে লাভ করি। অন্নময় সত্তা হইতে আমাদের যে প্রাণে উত্তরণ তাহা অন্নময়-অস্তিত্বকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া নয়—অন্নেরই প্রাণে উত্তরণ; প্রাণেরই মনে উত্তরণ, মনের আনন্দে, আনন্দের বিজ্ঞানে উত্তরণ। এই আরোহপথে যেমন ক্রম-উচ্চতর সত্তার সকল তত্ত্বের অনুভূতি—আবার অবরোহ গতিতে উচ্চতম সত্তার সকল ঐশ্বর্যকে লইয়া নিম্নে অবতরণ—ঊর্ধ্বের দিব্যানন্দ ও দিব্য-জ্যোতির দ্বারা সকল নিম্নতত্ত্বকে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের উচ্চভূমিতে অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমিকেও যদি রূপান্তরিত করিয়া না লইতে পারি তবে আমাদের ঊর্ধ্বভূমি যে কোনও অধিষ্ঠানই লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুভিত্তিকে পর্যন্ত যদি দিব্য-সত্তায় রূপান্তরিত না করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর জীবনে অখণ্ড ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা হইল কোথায়? দিব্য-জীবন অখণ্ড জীবন, অখণ্ড ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠা। যত উপরেই আমরা উঠি না কেন—উপরে উঠিয়া আমরা যদি আমাদের নিম্নভিত্তির কথা ভুলিয়া যাই—তবেই মস্ত ভুল হইয়া গেল,—তবেই অখণ্ড দিব্য-জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া গেল।[২]

[২] "Life in its self-unfolding must also rise to ever-new provinces of its own being. But if in passing from one domain to another we renounce what has already been given us from eagerness for our

শ্রীঅরবিন্দ বার বার বহুভাবে একটা কথা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-জীবনকে আমরা শুধুমাত্র একটা উপরে উঠিবার প্রক্রিয়া বলিয়া ভুল করিয়াছি। তিনি বলেন, এই যে অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায় উত্তরণ ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার অর্ধ-সাধনা মাত্র; অপর অর্ধ হইল আত্মার চৈতন্যে অবতরণ, আত্ম-চৈতন্যের প্রাণে অবতরণ—সকলের আবার অন্নে বা বস্তুতে অবতরণ। এই আত্মা আর জড়বস্তু ইহারা অখণ্ড সত্যের দুইটি মেরু—মূলাধারে একেবারে ক্ষিতিতত্ত্ব, সহস্রারে রূপহীন জ্যোতির্ময় আনন্দময় আত্মতত্ত্ব; এই আত্মা ও জড়—মূলাধার ও সহস্রার ইহার মধ্যেই সকল বিবর্তন (evolution) ও উদ্ঘাতন (involution)। আমরা দিব্য-জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে পারি না যদি শুধু ভগবত্তার চরমস্তরে উঠিয়া স্থিতি লাভ করিতে চাই; এই ভগবত্তাকে আমাদের নিম্নতম তত্ত্বের মধ্যে একেবারে আমাদের পার্থিব জীবনের স্থূল ভিত্তিভূমিতে নামাইয়া আনিতে হইবে। দেহের প্রত্যেকটি জীব-কোষে যে পর্যন্ত ভগবত্তার আধান না হয় সে পর্যন্ত অধ্যাত্ম-জীবন লাভ হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের তন্ত্র-সাধনা হইল তাই একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের সাধনা। আত্মধর্মের আনন্দ ও জ্যোতিঃ দ্বারা দেহের অণু-পরমাণুকে অধ্যাহিত (surcharged) করিয়া লইতে হইবে; এই আধানের ফলেই ধীরে ধীরে দেহ-ধর্মের ঘটে আত্মধর্মে রূপান্তর। এইজন্য এই রূপান্তরের সাধনায় নিম্নের তত্ত্বগুলিকে নিরন্তর অতিমানসের জ্যোতিঃ ও শক্তিদ্বারা অধ্যাহিত করিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে। অতিমানস হইতে ব্যক্তিচৈতন্য, চৈতন্য হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে অন্ন এই জ্যোতিঃ ও শক্তি লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নতম তত্ত্বই রূপান্তরিত হইয়া গিয়া উচ্চতম তত্ত্বের সহধর্মিতা লাভ করে। তখন জড় অণুই অধ্যাত্ম অণুতে পর্যবসিত হয় এই জড় অণুর অধ্যাত্ম-অণুত্ব লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জড় এবং আত্মা যদিও সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে দুইটি প্রান্তকোটি, তথাপি এই উভয়ের ভিতরেই মধ্যবর্তী সকল উচ্চ ও নীচ তত্ত্বসমূহের বিবর্তন (evolution) ও উদ্ঘাতনের (involution) সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আমরা যখন বলি যে জড়বস্তু

new attainment, if in reaching the mental life we cast away or belittle the physical life which is our basis, or if we reject the mental and physical in our attraction to the spiritual, we do not fulfil God integrally nor satisfy the conditions of His self-manifestation. We do not become perfect, but only shift the field of our imperfection or at most attain a limited attitude. However high we may climb, even though it be to the Non-Being itself, we climb ill if we forget our base. Not to abandon the lower to itself, but to transfigure it in the light of the higher to which we have attained, is true divinity of nature."—*The Life Divine.*

হইতে প্রাণ বিবর্তিত হয়, অথবা প্রাণ হইতে মন বিবর্তিত হয় তখনই আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লই যে, জড়বস্তুর মধ্যেই প্রাণ নিহিত আছে, জড় যদি একান্ত অ-প্রাণ হইত, প্রাণ যদি একান্তই চৈতন্যধর্ম-বিবর্জিত হইত তাহা হইলে জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। প্রাণ যদি 'ক' হয়, আর জড় যদি 'অ-ক' হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্রের অতি সাধারণ নিয়মেই বোঝা যায়, 'অ-ক' হইতে কখনও কোন ভাবেই 'ক'-এর উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই এই বেদান্ত-মতকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে যে জড়ের মধ্যেই প্রাণ, প্রাণের মধ্যেই মনের সম্ভাবনা নিহিত আছে; অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, জড় হইল প্রাণেরই আবরণযুক্ত রূপ, প্রাণ হইল মনেরই আবরণযুক্ত রূপ। ঊর্ধ্বতত্ত্বের ভর্গ ও শক্তি আস্তে আস্তে যখন এই আবরণ নষ্ট করিয়া দিতে থাকে তখন নিম্নতত্ত্বগুলিও ক্রমান্বয় রূপান্তর লাভ করিতে থাকে। নিম্নতত্ত্বকে ঊর্ধ্বতত্ত্বে রূপান্তরিত করা শব্দের অর্থই হইল নিম্নতত্ত্বের ভিতরকার যে আবরণ ঊর্ধ্বতত্ত্বের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল সেই বাধাকে অপসারিত করিয়া দেওয়া। আমাদের মধ্যে ভগবত্তার আধান না হইবার কারণ হইল আমাদের সত্তার ভিতরকার কোষগুলির ভিতরের আবরণ; এই আবরণগুলিই আমাদের মধ্যে ভগবত্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধা-সৃষ্টিকারী আবরণগুলি যতই একটি একটি করিয়া দূরীভূত হইতে থাকে ততই দিব্য জ্যোতিঃ ও শক্তি আমাদের সমগ্র সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধাপে ধাপে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, শেষ পর্যন্ত জীবসত্তার স্থূলতম স্তরও ভাগবতী সত্তা লাভ করে। সমস্ত সত্তাই যখন এইরূপে ভাগবতী সত্তায় রূপান্তরিত হইয়া যায় তখন মানুষই ভগবত্তা লাভ করিয়া অতিমানব বা দিব্য-মানব রূপ ধারণ করে।

এই যে সামগ্রিক পরিবর্তন ইহার জন্য প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাই হইল তন্ত্রের আধারশুদ্ধি। আধারশুদ্ধির অর্থই দেহস্থ ভূতশুদ্ধি এবং চিত্ত-শুদ্ধি। সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য এই আধারের মধ্যে যে দিব্যজ্যোতিঃ ও শক্তিকে নামাইয়া আনিতে হইবে তাহার অতি প্রখর তেজ, অতি প্রবল্ বেগ। কাঁচামাটির পাত্র কখনও যজ্ঞীয় সোমকে ধারণ করিতে পারে না, ফাটিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, দিব্যজ্যোতিঃ ও দিব্যশক্তিই হইল শ্রীঅরবিন্দের তান্ত্রিক সোম; ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি-দ্বারা প্রথমে আধারটি বিশুদ্ধভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করিয়া না রাখিয়া তাহার মধ্যে যদি অকালে দিব্যজ্যোতিঃ ও দিব্যশক্তিকে নামাইয়া আনা যায়, তবে সমগ্র সত্তা রূপান্তরিত হইবার পরিবর্তে অপক্ক পাত্রের ন্যায় ফাটিয়া গিয়া সর্বপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি করিবে।[০]

০ "If the psychic mutation has not taken place, if there has been a pre-mature pulling down of the higher Forces, their contact may

আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরে যে পর্যন্ত ভগবত্তার অবতরণ না হয় এবং আমাদের সমগ্র সত্তা যখন পর্যন্ত এইভাবে সামগ্রিক রূপান্তর লাভ না করে সেই পর্যন্তই আমরা অশুদ্ধ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করি এবং সেই পর্যন্তই আমরা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই বাধিত ও নিয়ন্ত্রিত হই। কিন্তু যেই মাত্র আমাদের সত্তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়া যায়, অশুদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম-বিধান আর আমাদের উপরে কাজ করিতে পারে না—তখন আমরা শুধু দিব্যবিধানের দ্বারাই পরিচালিত হই। এই দিব্যবিধানগুলিই হইল ভগবৎ-ইচ্ছা; সুতরাং ভাগবতী সত্তার অধিকারী অতিমানুষ ভগবানের হাতের একটি নিখুঁত যন্ত্র হইয়া ওঠে, সেই নিখুঁত যন্ত্রের ভিতর দিয়া ভগবান্ তখন তাঁহার দিব্য সুরকে অবাধিত-ভাবে বিস্তার করিয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় সাধক তাঁহার চৈতন্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে, তাঁহার প্রাণশক্তির প্রতিটি স্পন্দনে, তাঁহার দেহের প্রতিটি জীবকোষে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করেন। তাঁহার নিজের ভিতরকার প্রকৃতির প্রত্যেকটি শক্তির প্রত্যেকটি কাজে তিনি পরম জগজ্জননীর কাজের—পরা প্রকৃতির কাজের ধারা অনুভব করিতে পারেন। তখন তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার প্রাকৃত সত্তা আর কিছুই নয়, ইহা এক জগজ্জননীরই শক্তির বিকাশ এবং প্রকটিত অবস্থা মাত্র।.

"He would feel the presence of the Divine in every centre of his consciousness, in every vibration of his life-force, in every cell of his body. In all the workings of his force of Nature he would be aware of the workings of the supreme World-Mother, the Supernature ; he would see his natural being as the becoming and manifestation of the power of the World-Mother." "[৪]

এইখানেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের তন্ত্র-সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার শক্তি-সাধনার স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি-সাধনার মূলকথা যেমন এই উক্তিতে—"আমার আমার করিস্ না রে নরেন, ঐ আ-টাই হ'ল্ল উপসর্গ, আসল অর্থকে সব ঘুলিয়ে দেয়; ওটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু বল্—মা'র মা'র মা'র।"—শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-সাধনার মূলকথাও হইল ঠিক ইহাই, পরা প্রকৃতি জগজ্জননীর হাতের একটি নিখুঁত যন্ত্র বনিয়া যাওয়া—সমস্ত জীবনের

be too strong for the flawed and impure material of Nature and its immediate fate may be that of the unbaked jar of the Veda which could not hold the divine *Soma* wine ; or the descending influence may withdraw or be split up because the nature cannot contain or keep it."—*The Life Divine.*

[৪] *Ibid.*

সমস্ত কর্মের দ্বারা শুধু তাঁহার সুরে তাঁহার তালে বাজিয়া যাওয়া। শ্রীঅরবিন্দের এই শক্তি-সাধনার একটি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার *The Mother* নামক ইংরেজিতে লিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, সাধনা শুধু মানুষ একা করে না, সাধনা সর্বত্রই হইল যৌথ-সাধনা, এক দিকে মানুষ—অপর দিকে জগজ্জননী শক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই দুইটি দিক্ই হইল শক্তিরই দুইটি রূপ, মানুষের ভিতর দিয়া শক্তির প্রকাশ ঊর্ধ্বায়নের অফুরন্ত কামনায়; এই ঊর্ধ্বায়নের কামনা ও প্রচেষ্টাই তাই হইল শক্তির নীচের দিক্ হইতে সাধনা। ঊর্ধ্বকোটিতে শক্তির প্রকাশ হইল পরম কৃপায়। নিম্ন হইতে মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিবার যে ডাক ঊর্ধ্ব হইতে তাহাতে সাড়া দেখা দেয় পরম কৃপাবর্ষণে। নিম্ন হইতে এই ঊর্ধ্বায়নের আকৃতি, ঊর্ধ্ব হইতে কৃপাবর্ষণ—এই উভয়ই হইল এক অখণ্ড সাধনার দুই দিক্; এই দুই দিক্ যুক্ত হইলে তবেই তো সাধনার পরিপূর্ণতা।[৫] রক্ত-মাংসের স্থূল মানুষের সকল জৈবিক প্রবাহ এবং অজস্র ক্লিন্ন বাসনার মধ্যেও যে সব কিছু ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠিবার আকৃতি, ইহার ভিতর দিয়াই বোঝা যায় কোনও অবস্থাতেই মানুষ মাতৃহীন নহে, মানুষের সকল স্থূলতার মধ্যেও শক্তিরূপিণী মা মানুষকে জড়াইয়া আছেন। মানুষের ভিতর দিয়া—তাহার অস্তিত্বের নিম্নতম পর্যায়ের ভিতর দিয়াও শক্তি মানুষকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই জাগরণের সাধনা ঠিক ঠিক ভাবে হইলে তখন দেখা দেয় উপর হইতে কৃপাবর্ষণের দ্বারা—আনন্দ ও জ্যোতিঃ-বর্ষণের দ্বারা মানুষকে টানিয়া তুলিবার সাধনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধনা তো ঠিক মানুষ করে না, মানুষের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছেন মা নিজে। মানুষের তাহা হইলে মুখ্য কাজ হইল, এই শক্তি যাহাতে তাঁহার এই উভয় রূপেই মানুষের মধ্যে বসিয়া অবাধিতভাবে কাজ করিতে পারেন তাহার জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা। মা সর্বদা ভিতরে বসিয়া কাজ করিতে যাহাতে কোনও রূপে বাধাপ্রাপ্ত না হন সাধকের করণীয় হইল শুধু সেইটুকু।

শক্তির এই যে দ্বিধা রূপ এবং দুই মুখে সক্রিয়তা ইহা শ্রীঅরবিন্দ শুধু মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করেন নাই, বিশ্বজগতের বিবর্তনের মধ্যেই তিনি শক্তির এই দ্বৈতলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও যে বিবর্তনের কথা বলিতেছি, এই বিবর্তনের মূল সত্য হইল কি?

৫ "There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a Supreme Grace from above that answers."—*The Mother,* p. 1.

সর্ববিধ বিবর্তনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি দুইটি জিনিস। প্রথমতঃ, একটা পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই পরিবর্তন-জনিত একটা পরিণতি। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই পরিবর্ত্তন এবং পরিণতির পিছনে রহিয়াছেন শক্তি-রূপিণী মা। তিনি নিম্নসত্তায় থাকেন ঊর্ধ্বসত্তায় পরিবর্তিত এবং পরিণত হইবার একটা সহজ প্রবণতারূপে। নিম্নসত্তার মধ্যে এই ঊর্ধ্বায়নের প্রবণতা যদি আদৌ না থাকিত তবে তো নিম্নসত্তার কোনও পরিবর্তন ও পরিণতি সম্ভবই হইত না। অন্নের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে পরিবর্তিত হইয়া প্রাণে পরিণত হইবার একটা স্বাভাবিক আবেগ; স্থূলের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াই তো মা স্থূলের মধ্যে এই ঊর্ধ্ব-পরিণতির আবেগরূপে ছড়াইয়া আছেন। নীচ হইতে এই আবেগ সবকিছুকে ঠেলিয়া দিতেছে মহত্তর পরিণতির পরিবর্তনের পথে—এই হইল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মায়ের এক রকমের সাধনা। কিন্তু ভিতর হইতে এই তাগিদেই বস্তু সবটা পরিবর্তিত হইয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না—খানিকটা আবার তাহাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিতে হয়। তখন আনন্দ ও জ্যোতিরূপে নামিয়া আসিতে থাকে মায়ের অজস্র কৃপা; এই অন্তর্নিহিত আবেগ এবং ঊর্ধ্বকোটি হইতে আকর্ষণ—এই আবেগ ও আকর্ষণ মিলিয়াই হইল সব পরিবর্তন ও পরিণতি। ইহাই হইল বিশ্ব-বিবর্তনের মূল রহস্য।

শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-সাধনার মূল কথা হইল, মাকে ভিতরে বসিয়া নিজের ইচ্ছায় কাজ করিতে দিতে হইবে। নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের কাছে খুলিয়া ধরিতে হইবে—যাহাতে তাঁহার কৃপা সত্তার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। মায়ের কাছে নিজেকে আংশিকভাবে মেলিয়া ধরিলে চলিবে না; একটা অংশকে মায়ের কাছে মেলিয়া ধরিলাম, আর অপর অংশকে মেলিয়া ধরিলাম কামনা-বাসনা, সংস্কার-আসক্তি প্রভৃতি বিরুদ্ধ শক্তিগুলির দিকে—সে ক্ষেত্রে মাতৃ-কৃপালাভের কোনও আশা নাই। নিজেকে পুরাপুরিভাবে যদি মায়ের কাছে মেলিয়া দিতে পারি তবেই তো মায়ের কৃপা আমার মধ্যে অজস্ররূপে বর্ষিত হইয়া অজস্ররূপে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র না হইলে কি দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়? জীবনের মধ্যে মায়ের উপস্থিতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে দেহ-মন-আত্মা সহ সমগ্র সত্তার মন্দিরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করিয়া তুলিতে হইবে।* আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ সাধনাদ্বারা মানুষের যে রূপান্তরের কথা বলিয়াছেন, তিনি সর্বদাই বলিয়াছেন যে এই রূপান্তর হইবে

---

* "If you open yourself on one side or in one part to the truth and on another side are constantly opening the gates to hostile forces, it is vain to expect that the divine Grace will abide with you. You must keep the temple clean if you wish to instal there the living presence."—*The Mother,* p. 5.

অখণ্ড বা সামগ্রিক, গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'কৃৎস্নং'। এই রূপান্তরকে যদি সামগ্রিক করিয়া তুলিতে হয় তবে এই রূপান্তরের পথে বাধা দেয় যাহা-কিছু তাহার সবটুকুকেই ত্যাগ করিতে হইবে সমগ্রভাবে।[৭]

এই যে সবকিছু ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকটে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ধরা ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন মায়ের ইচ্ছার নিকটে সম্পূর্ণ এবং শর্তহীন আত্মসমর্পণ (complete and unconditional surrender to the will of the Mother)। এই আত্মসমর্পণ এবং আত্মশোধনের কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকিবে সাধক ততই নিজের ভিতরে শক্তির সাধনাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন; অনুভব করিতে পারিবেন—তিনি যত বেশী নিজেকে শুদ্ধ করিয়া মায়ের কাছে নিজেকে নিবেদন করিতে পারিতেছেন, মা ততই বেশী করিয়া নিজেকে সাধকের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন; এইভাবেই সাধকের ভিতরে দিব্য-প্রকৃতির (Divine Nature) স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।[৮]

কর্মের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম রহিয়াছে,—এক সাধারণ কর্ম, আর দিব্যকর্ম। সাধারণ কর্মের কর্তা হইল অহং। এই 'অহং'-এর বিনাশের পরে অথবা এই 'অহং'কে সম্পূর্ণ ন্যাসের পরে যে কর্ম তাহাই হইল দিব্যকর্ম। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, মানুষ এই দিব্যকর্ম করে না, দিব্যকর্ম মানুষের ভিতর দিয়া কারিত হয়; ভগবৎ-ইচ্ছা-রূপিণী মা-ই হইলেন সেই কর্মের কারয়িত্রী। সুতরাং দিব্য-কর্মের সাধনের জন্য সাধক নিজেকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিবেন একটি নিখুঁত যন্ত্ররূপে—ভগবৎ-ইচ্ছারূপ মায়ের সুর ও তাল কোনরূপেই যেন বাধা না পায়। ভগবৎ-চৈতন্যের ভিতরে ব্যক্তি-চৈতন্যকে আস্তে আস্তে এমন করিয়া মিলাইয়া দিতে হয় যাহাতে ব্যক্তি-চৈতন্য ক্রমে ভগবৎ-চৈতন্যে লীন হইয়া গিয়া উভয় চৈতন্য মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন ব্যক্তির ভিতর দিয়াও ভগবৎ-চৈতন্যের লীলা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।[৯] যে পর্যন্ত এই তাদাত্ম্য না আসে সে পর্যন্ত দিব্যকর্মের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তি-কেন্দ্রে ভগবৎ-চৈতন্য যে পর্যন্ত পূর্ণরূপে লীলা-বিস্তারের সুযোগ না পায় সে পর্যন্ত সাধক দিব্যকর্মের

৭ "The transformation must be integral, and integral, therefore the rejection of all that withstands it."—*The Mother*, p. 7.

৮ "In proportion as the surrender and self consecration progress the Sadhaka becomes conscious of the Divine Shakti doing the Sadhana, pouring into him more and more of herself, founding in him the freedom and perfection of the Divine Nature."—*Ibid.*, p. 13.

৯ "You must grow in the divine consciousness till there is no difference between your will and hers, no motive except her impulsion in you, no action that is not her conscious action in you and through you."—*Ibid.*, pp. 17-28.

অধিকারী নন বটে; কিন্তু তখন পর্যন্ত সব কাজের সময় মায়ের কাজই করিতেছি এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়। ইহাতে 'অহং'-এর উদগ্রতা কমিয়া যাইয়া আত্মসমর্পণের ভাবটা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাব বর্ধিত হইতে হইতেই ক্রমে নিজের মধ্যে ঐ যন্ত্রভাবের স্ফুরণ হয়। আত্মসমর্পণটা পাকা হইয়া গেলেই যন্ত্রভাবটাও পাকা হইয়া যায়। এই যন্ত্রভাবটা পাকা হইয়া গেলে সাধকের অনুভবে আসে—ভগবৎ-শক্তি কেবল কর্মের প্রেরক এবং নিয়ন্ত্রক নহেন, তিনি নিজেই যে ভিতরে বসিয়া সকল কর্মের আরম্ভ করেন—নিজেই সকল কর্ম সমাধান করেন; সাধকের সকল সঞ্চরণ তাঁহাদ্বারাই (শক্তিদ্বারাই) উদ্বোধিত সাধকের সকল শক্তিই এক শক্তিরূপিণী মায়ের শক্তি; মন, প্রাণ এবং দেহ তাঁহারই কর্মসমূহের (শক্তিরূপিণী মায়েরই) চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যন্ত্রসমূহ, তাঁহারই লীলার 'করণ'মাত্র, বাস্তবজগতে তাঁহারই অভিব্যক্তির জন্য কতকগুলি ছাঁচ মাত্র।[১০] শ্রীঅরবিন্দের মতে এই যন্ত্রভাবই পরমভাব নয়; কারণ যন্ত্রভাবের মধ্যেও যন্ত্ররূপে 'আমার' একটা পৃথক্ অস্তিত্বের সংস্কার থাকে; খানিকটা একটু তুমি-আমির ভাব; তুমি যন্ত্র—আমি যন্ত্রী! কিন্তু শেষ অবস্থায় আর এই যন্ত্র-যন্ত্রীর ভাবও থাকে না, তখন সব রকমের দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়।

"The last stage of this perfection will come when you are completely identified with the Divine Mother and feel yourself to be no longer another and separate being, instrument, servant or worker but truly a child and eternal portion of her consciousness and force. Always she will be in you and you in her ; it will be your constant simple and natural experience that all your thought and seeing and action, your very breathing or moving come from her and are hers. You will know and see and feel that you are a person and power formed by her out of herself, put out from her for play and yet always safe in her, being of her being, consciousness of her consciousness, force of her force, ananda of her Ananda."[১১]

শ্রীঅরবিন্দ-বর্ণিত এই 'মা' কে? তিনি বহু স্থলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন

[১০] "And afterwards you will realise that the divine Shakti not only inspires and guides, but initiates and carries out your works ; all your movements are originated by her, all your powers are hers, mind, life and body are conscious and joyful instruments of her action, means for her play, moulds for her manifestation in the physical universe."—*The Mother,* p. 30.

[১১] *Ibid.,* pp. 32-33.

তাঁহার বর্ণিত 'মা' হইলেন ভগবৎ-চৈতন্য বা ভগবৎ-ইচ্ছা—সমস্ত মূর্ত-অমূর্তের মধ্য দিয়া যে ইচ্ছা নিত্যকালে অনন্তরূপে তরঙ্গিত। শ্রীঅরবিন্দ এই মায়ের তিনটি রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম রূপে তিনি হইলেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অসম্পৃক্তা পরা শক্তি। সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকিয়া তিনি ব্রহ্ম-চৈতন্যকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে সৃষ্টির সহিত এই ব্রহ্ম-চৈতন্যেরও একটা যোগ রক্ষা করিতেছেন। শক্তির দ্বিতীয় রূপ হইল ব্রহ্মাণ্ড-বিধাত্রী মহাশক্তিরূপ। তাঁহার তৃতীয় রূপ হইল একটা ব্যক্তিরূপ (individual)—যেরূপে তিনি অপর দুই রূপের সকল ঐশ্বর্য ধারণ করিয়াও মানুষের নিকটতর হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং ভগবৎ-প্রকৃতি ইহার ভিতরে সর্বদা একটা মিলন সঙ্ঘটন করাইবার চেষ্টা করেন। এই মিলন তিনি কিভাবে ঘটাইয়া তোলেন? তিনি নিজে জীবের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসেন, তিনি অন্ধকারে নামিয়া আসেন অন্ধকারকেও আলো করিয়া তুলিবার জন্য, মিথ্যার মধ্যে ভ্রান্তির মধ্যে তিনি নামিয়া আসেন মিথ্যা ও ভ্রান্তিকে সত্যে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবার জন্য, মৃত্যুর মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হন মৃত্যুকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবার জন্য, পার্থিব বেদনার ভিতরে তিনি নামিয়া আসেন সকল পার্থিব বেদনাকে মহৎ আনন্দের দিব্যানুভূতিতে রূপান্তরিত করিতে। তাঁহার সন্তানের প্রতি গভীর আকর্ষণে তিনি নিজেই স্বরূপ-আবরণকারী কতকগুলি পোশাক পরিতে রাজী হইয়াছেন, অন্ধকার ও মিথ্যার সকল যন্ত্রণা ও ক্লিন্নতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারের ভিতর দিয়া আসা-যাওয়ার কষ্টকে বরণ করিয়াছেন, চরম উদ্দেশ্য হইল সব-কিছুরই ভিতরে থাকিয়া সব-কিছুকেই আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া। ইহাই হইল মায়ের জীবরূপে জগৎ-রূপে আত্মাহুতির যজ্ঞ। এই যজ্ঞ অনেক সময় পুরুষমেধ-যজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত হয়; এই পুরুষমেধ-যজ্ঞ আসলে হইল শক্তিরূপিণী মায়ের নিজের যজ্ঞ। জীব এবং জগতের পরম কল্যাণের জন্য তিনি জীব-জগতের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া আহুতি দিয়াছেন।

(গ) শ্রীসত্যদেবের শক্তি-সাধনা

অমর সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বাঙলাদেশে শক্তি-সাধনার ক্রমবিকাশ ও শক্তি-সাধনার যথার্থ রূপের একটা আভাস পাই। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ কালে বা উপলক্ষে যে বিবিধ উপচারে পাঠা-মহিষ-বলি-সহকারে পূজার প্রচলন রহিয়াছে তাহাদ্দ্বারাই আমাদের শক্তি-সাধনার পরিচয় নয়; বিশেষ বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পঞ্চ-মকার'কে অবলম্বন করিয়া

যে-সকল গুহ্য সাধনার প্রচলন আছে—তাহার ভিতরেও আমাদের শক্তি-সাধনার পরিচয় নয়: সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও সাধনার ভিতর দিয়া শাক্ত-সাধনা একটি অতি গভীর এবং সর্বজনীন উদার ধর্মমতের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইঁহাদের ভাব ও সাধনা আমাদের সমাজ-মানসের উপরেই গভীর প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছে, জনসাধারণের ভাবদৃষ্টির ভিতরেই অনেকখানি পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। নিতান্ত নিম্নাধিকারী একজন সাধকও আজ শাক্ত-শাস্ত্র শ্রীচণ্ডীকে শুধুমাত্র দেবীর বিভিন্ন কালে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অসুরকে নিধন করিয়া দেবতাদের রক্ষা করার কাহিনী বলিয়া মনে করিবেন না। তিনিও দেহমন দিয়া এই জিনিসটি অনুভব করিতে চাহিবেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আপন অলঙ্ঘ্য মহিমা বিস্তার করিয়া এমন এক শক্তিরূপিণী দেবী বিরাজমানা যাঁহার নিকট মন খুলিয়া বলা যায়,—মা রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুকে হনন কর; যাঁহার নিকট বলা যায়, মা, ব্যাধিনাশ কর, সৌভাগ্য-আরোগ্য দাও, কল্যাণ বিধান কর, বিপুলা শ্রী দান কর; আমাকে বিদ্যাবন্ত, যশবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত করিয়া তোল; আমাকে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী মনোরমা ভার্যা দাও—দুর্গ-সংসার-সাগরে আমাকে ত্রাণ কর। জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম—সংগ্রাম বাহিরের শত্রুর সঙ্গে—সংগ্রাম রিপুর সঙ্গে; এই সংসারযুদ্ধে মানুষ ভগবৎ-শক্তিরূপিণী মাকেই চারিদিক্ হইতে কবচ বা বর্মরূপে পাইতে চান। তাই নিরন্তর রণোলিপ্ত মানুষ তাহার পূর্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, ঈশান-বায়ু-অগ্নি-নৈর্ঋতে, ঊর্ধ্বে-অধে বিভিন্ন রূপে শক্তিরূপিণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়। প্রাচ্য দিক্ রক্ষা করুন শক্তিরূপিণী মা ঐন্দ্রীরূপে, অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা-রূপে, দক্ষিণে বারাহী ও নৈর্ঋতে খড়্গধারিণী-রূপে। প্রতীচ্য দিক্ রক্ষা করুন বারুণী, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, উদীচীতে কৌবেরী ও ঈশানকোণে শূলধারিণী। ঊর্ধ্বে থাকুন শক্তি ব্রহ্মাণী-রূপে, অধঃদেশ রক্ষা করুন বৈষ্ণবী—আর শববাহনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে রক্ষা করুন। শুধু বাহিরের দশ দিকে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই ত চলিবে না, সমগ্র দেহের ভিতরে থাকিয়া আমাকে কে রক্ষা করিবেন? জয়া আমাকে সামনে রক্ষা করুন, বিজয়া রক্ষা করুন পৃষ্ঠে; অজিতা বামে পার্শ্বে, দক্ষিণে অপরাজিতা। আমার শিখা রক্ষা করুন দ্যোতিনী, উমা অবস্থিতা থাকুন মস্তকে, মালাধারী ললাটে, ভ্রূযুগল রক্ষা করুন যশস্বিনী। চিত্রনেত্রা রক্ষা করুন নেত্রদ্বয়, যমঘণ্টা পার্শ্বদ্বয়, ত্রিনেত্রা চণ্ডিকা ভ্রূমধ্যদেশ; শঙ্খিনী থাকুন চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে দ্বারবাসিনী; এইরূপ কপাল, কর্ণমূল, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, জিহ্বা, দন্ত, কণ্ঠ, তালু, চিবুক, বাক্য, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহুদ্বয় হস্ত প্রভৃতি রক্ষা করুন কালিকা, শঙ্করী, সুগন্ধা, চর্চিকা, অমৃতা, সরস্বতী, কৌমারী, চণ্ডিকা, মহামায়া, কামাক্ষী, সর্বমঙ্গলা, ভদ্রকালী, ধনুর্ধারী, খড়্গিণী, বজ্রধারিণী,

দণ্ডিনী প্রভৃতি দেবীগণ। শুধু প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, দেবীকে যে আমার গুহ্য রক্ষা করিতে হইবে গুহ্যেশ্বরী-রূপে, মেঢ্র রক্ষা করিতে হইবে দুর্গন্ধা-রূপে, পায়ু রক্ষা করিতে হইবে গুহ্যবাহিনী-রূপে। দেবীকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে আমার রক্ত, মজ্জা, চর্বি, মাংস, অস্থি, মেদ, অন্ত্রসমূহ—আমার বায়ু-পিত্ত-কফ, আমার মনোবুদ্ধি-অহংকার—আমার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ, আমার আয়ু ধর্ম যশঃ কীর্তি লক্ষ্মী —ইহার সর্বত্র। এইরূপে দেবী-কবচের মধ্য দিয়া মানুষ লাভ করে একটা দেবী-চৈতন্য বা শক্তি-চৈতন্য; সাধারণ জীবনযাপনের যে সংগ্রাম এই শক্তি-চৈতন্য সেই সংগ্রামেও মানুষকে দান করে বল উৎসাহ অভয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রার্থনা দেখিতে পাই,—

শূলেন পাহি নো দেবী পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥

শূলের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর হে দেবি, খড়্গদ্বারা রক্ষা কর হে অম্বিকে, ঘণ্টাস্বনের দ্বারা কর আমাদিগকে রক্ষা, চাপজ্যানিঃস্বনের দ্বারা কর রক্ষা। পূর্বে রক্ষা কর, পশ্চিমেও রক্ষা কর, দক্ষিণেও রক্ষা কর হে চণ্ডিকে; নিজের শূল সঞ্চালনের দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা কর হে ঈশ্বরি। তোমার সৌম্য যে-সকল রূপ ত্রিভুবনে বিচরণ করে, অত্যন্ত ঘোর যে-সকল রূপও বিচরণ করে —তাহার সকলের দ্বারা তুমি আমাদিগকে এবং ভুবনকে রক্ষা কর। খড়্গ শূল গদা প্রভৃতি যে-সকল অস্ত্র তোমার করপল্লবের সঙ্গী হইয়া আছে হে অম্বিকে —সেই-সকলের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর সর্বতোভাবে।

চণ্ডীপাঠ বিধিতে অনেক সময় দেখা যায়, এই শ্লোকগুলির ভিতরকার প্রথম শ্লোকটি—অর্থাৎ 'শূলেন পাহি নো দেবি' প্রভৃতি চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোক পড়িয়া একবার করিয়া আবৃত্তি করিয়া লইতে হয়। জগৎ-বিপর্যয় দৈব-দুর্বিপাকে রোগে-শোকে ভয়ার্ত সংসারী জীব ভয়ত্রাণের জন্য চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করে—সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কথার মধ্যেই সে ঐ একটি কথার অনুরণন শ্রবণ করিতে চায়—শূলের দ্বারা রক্ষা কর হে দেবি, খড়্গদ্বারা রক্ষা কর, অভয় দাও ঘণ্টাস্বনের দ্বারা, নিঃশঙ্ক কর ধনুষ্টঙ্কারের দ্বারা। যত স্থূলভাবেই হোক না কেন, একটা শক্তি যে জীবনের চারিদিক্ ফিরিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছে, এই

বোধটি জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা! চণ্ডীর মধ্যে দেখিতে পাই, এই শক্তিদেবীকে কেবল দুরবগাহ তত্ত্বরূপিণী করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। চণ্ডীর নমস্কারের মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া রূপে বিরাজমানা বটেন, তিনি চৈতন্যরূপিণী, বুদ্ধিরূপিণী, শক্তিরূপিণী, কান্তি-ক্ষান্তি-শান্তি-রূপিণী, শ্রদ্ধা-রূপিণী, লক্ষ্মীরূপিণী, তুষ্টিরূপিণী, মাতৃরূপিণী বটেন—আবার তিনিই ত সর্বভূতের মধ্যে তমোগুণের নিদ্রারূপে সংস্থিতা, তিনিই ক্ষুধা, তিনিই তৃষ্ণা, তিনিই সব জৈবিকবৃত্তি—তিনিই সর্বভূতে অজ্ঞানরূপে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা। আমার স্থূলে তিনি সূক্ষ্মে তিনি—ভালতে তিনি মন্দতে তিনি—বুদ্ধিতে তিনি ভ্রান্তিতে তিনি—এমনই করিয়াই ত একটি মাকে গোটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা! স্থূল চেষ্টাই গিয়া পর্যবসিত হয় আত্মসমর্পণে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই হইল শক্তি-সাধনার আসল কথা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার একটি অতি গভীর ও ব্যাপক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই শ্রীসত্যদেবের 'সাধন-সমরে'র[১] মধ্যে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে এক দিকে যেমন একটি অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিতে চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বসমূহেরই ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অন্য দিকে হিন্দু-সাধনার সকল রহস্যেরও মোটামুটি পরিচয় রহিয়াছে। এখানে প্রত্যেকটি শ্লোক এবং তাহার ভিতরকার প্রত্যেকটি শব্দের তত্ত্ব ও সাধনার দিক্ হইতে যেরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে সেই ব্যাখ্যার সহিত সকলের একমত হইবার কথা নহে, কিন্তু সব জুড়িয়া যে গভীর তত্ত্বদৃষ্টি এবং সাধনার দিব্য-অনুভূতি-সমূহের প্রকাশ রহিয়াছে তাহা সহজেই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত অসুরসমূহের সহিত দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধসমূহকে শ্রীসত্যদেব প্রথম হইতে 'সাধন-সমর'-রূপে গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সাধন-সমরে'র একটি ধারণা পূর্ববর্তী শাক্ত-সঙ্গীতকারগণের সঙ্গীতের মধ্যেই দেখিতে পাই। সাধক রসিকচন্দ্র রায়ের একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই,—

আয় মা সাধন-সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে!
আরোহণ করিয়ে কালী-সাধন-রথে,
তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তা'তে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম-বাণ
বসেছি ধ'রে॥[২]

শ্রীসত্যদেব এই 'সাধন-সমরে'র ভাবটিকে তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। এখানে অসুরগণ হইল ভাবী কর্মবীজ। বিবিধ

[১] তিন খণ্ড, কলিকাতা সাধন-সমর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। [২] শা. প., (ক. বি.)।

সংস্কার, অহন্তা-মমতা প্রভৃতি পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির পথে বিবিধরূপে বিবিধ প্রকারে বাধা দিতেছে। যাহা কিছু স্বরূপোপলব্ধির বাধা-দানকারী তাহা সমস্তই হইল অসুর পর্যায়ের। পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধিই হইল মায়ের অঙ্কে নিত্যানন্দো অবস্থান। নিজের ভিতরকার ইন্দ্রিয়াদিই হইল দেবতাগণ—কারণ এইগুলির অধিষ্ঠানেই পরমাত্মার দ্যোতনা বা প্রকাশ। সংস্কার-বাসনা, কর্মবীজ, অস্মিতা মমতা প্রভৃতি অসুরের দ্বারা এই দেবতাগণ—অর্থাৎ দিব্যশক্তিপ্রকাশের কেন্দ্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি (মায়োপহিত মনসহ) সাধনার বিভিন্ন স্তরে নির্জিত হইতেছে।° এই অসুর-নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? উপায় হইতেছে ভিতরে শক্তির জাগরণ, ব্যক্তি-চৈতন্যকে শক্তি-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা, শক্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরূপে গ্রহণ করা—অর্থাৎ শক্তিকে কেবলমাত্র একটা অন্ধ বল মাত্র নয়—শক্তি যে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিতা একাধারে খড়্গ-মুণ্ড-ধারিণী এবং বরাভয়দায়িনী এই বোধে প্রতিষ্ঠা; অন্তিমে ব্যক্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃ-অঙ্কে নিরন্তর নির্ভয়ে আনন্দাস্বাদন।

এই মাতৃ-চৈতন্যের উপরেই সাধন-সমরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। সমরে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া অগ্রসর হইতে হয় তেমনই সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমে নিজেকে 'দেবী-কবচে'র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবৃত করিয়া লইতে হয়। কিছু পূর্বেই আমরা এই দেবী-কবচের উল্লেখ করিয়াছি এবং সাধারণ অধিকারী সাধক এই কবচকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাহার আভাস দিয়াছি। কিন্তু উত্তম-অধিকারী সাধক এই কবচকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, দেবী-কবচে দশ দিকের উল্লেখ রহিয়াছে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে, আর এই দশ দিকে এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেবী কি মূর্তিতে সাধককে রক্ষা করিবেন সে সম্বন্ধে প্রার্থনা রহিয়াছে। যেমন, 'প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী', 'শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেৎ' ইত্যাদি। সত্যকার সাধক এ-সব প্রার্থনাকে সাধন-ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? শ্রীসত্যদেব বলিয়াছেন, দেবী-কবচের আসল রহস্য হইল বাহিরে এবং ভিতরে সর্বত্র এক মাতৃ-অনুভূতি। তিনি বলিয়াছেন, "ইহাতে যে-সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই-সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া কিছু-কালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই-সকল স্থানে বিশিষ্ট বোধশক্তি প্রকাশ

° এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর দেবাসুরের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "দেবা দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। শাস্ত্রীয়প্রকাশবৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিকা স্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেকজ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপাসুরাভি-ভবনায় প্রবৃত্তাঃ, ইত্যন্যোঽন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর-সংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥"—সাধন-সমর, ২য়, পৃ. ৫

পাইবে; কল্পনায় নহে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিবে। সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে হইবে। কবচে যে স্থানে যে নাম উচ্চারণের বিধি আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শক্তির প্রকাশ প্রতীতিগোচর হয়, সেই ধর্ম বা শক্তিটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ-সকল নামে বিশিষ্ট কোনও মূর্তির ধ্যান করিবার আবশ্যক নাই; মাত্র সেই ধর্মটি বোধে আসিলেই যথেষ্ট। যেমন 'খড়্গধারিণী'—এস্থলে খড়্গধারণকারিণী মূর্তির চিন্তা না করিয়া, দৃঢ়হস্তে খড়্গাদি অস্ত্র ধারণ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি-অংশমাত্র বোধ করিতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র।"[৪]

বেদের দেবী-সূক্তকেই শ্রীসত্যদেব চণ্ডীর মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেবী-সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার তাদাত্ম্য। শ্রীসত্যদেব বলেন,—"দেবীমাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়া-রূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে কিংবা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা যায় মাত্র, কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা জানেন—আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা—তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মাই দেবী-সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়া-রূপেই অভিবর্ণিত হইয়াছে।"[৫] শ্রীসত্যদেব এখানে পরমাত্মা ও মহামায়ার মধ্যে আসল অভেদত্ব এবং সেই আসল অভেদত্ব সত্ত্বেও যেটুকু ভেদ-লক্ষণের কথা বলিলেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে আমরা তৎকর্তৃক চণ্ডীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে বলিয়াছেন, 'অচলের চল' বা 'অটলের টল' তাহাই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরমাত্মা ও মহামায়া বলিয়া। এই মহামায়া সম্বন্ধে শ্রীসত্যদেব অন্যত্র বলিয়াছেন,—"এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে,—সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে—প্রকাশক—স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশই—শক্তি বা মায়া। আমরা জানি—মায়া সগুণব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহুত্বের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুণ নির্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত। যতক্ষণ জীব-জগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়া। যতক্ষণ মাতৃলাভ, ততক্ষণ

---

৪ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-কবচ', পৃ. ২৸০-৶০।
৫ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-সূক্ত', পৃ. ৶০।

মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশুচৈতন্যই জীব। ব্যোমপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত সন্তান মাত্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখি না, দেখি মা; ফলে ফল দেখি না, দেখি মা; জলে জল দেখি না, দেখি রসময়ী মা; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্য চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃচক্ষু বা মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; এই পরিদৃশ্যমান জগৎই মায়ের প্রকট মূর্তি!”[৬]

এই মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগৎ-মূর্তিতে, সাধক-হৃদয়ে, আর-এক প্রকাশ ইষ্টমূর্তিতে। যেখানেই মূর্তি সেখানেই মহামায়া। এই ‘মূর্তি’তে দেখিবার যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে এইটাই হইল সন্তানভাব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাল লাগিত এই সন্তানভাব—অন্যভাবে তাঁহার অধিকার থাকিলেও। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘টল’কে দেখা বা ‘চল’কে দেখা হইল ভক্তির মিশ্রণে একটু নীচু ঘর হইতে দেখা—অটল বা অচলকে দেখা হইল আরও উপরের ঘর হইতে দেখা। এই ‘টল’-রূপে বা ‘চল’-রূপেই মহামায়া ইচ্ছামতন মূর্তি ধারণ করেন। মহামায়ার এই মূর্তিই হইল ইষ্টমূর্তি। মহামায়া বলিলে তাই কালী-দুর্গা, রাধা-সীতাকেই বুঝিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই, মহামায়া শিব, রাম, কৃষ্ণ-রূপেই ইষ্টমূর্তি ধারণ করিতে পারেন। অটলে বা অচলে—অর্থাৎ পরমাত্মায় কোনও রূপ নাই। ব্রহ্মময়ী আর ব্রহ্ম এক হইলেও তাই এই টলাটলের ভেদ। দেবগণের দেহজাত তেজ যখন একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া নারীমূর্তি ধারণ করিল তখনকার সেই নারীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব বলিয়াছেন, —“এস্থলে নারী শব্দে—কৃষ্ণ-কালী-শিব প্রভৃতি যে কোনও মূর্তিই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মূর্তিই শক্তিবিশেষ। শক্তি যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই বিশিষ্ট মূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এখানে নারী শব্দের অর্থ মূর্তি। মূর্তিশব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই মন্ত্রে নারী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কি প্রকারে বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন হয়, এস্থলে “একস্থং তদভূন্নারী” শব্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সকল সাধকেরই এইভাবে ইষ্ট-দর্শন হয়। কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আবির্ভাবের ইহাই রহস্য—সর্বপ্রথমে একটি ঘন চিন্ময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশসত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। পরে উহা সাধকের ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুরূপ মূর্তিতে পরিণত হয়।”[৭]

‘সাধন-সমর’ কি, এ-বিষয়ে বলা হইয়াছে,—“জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান্ হয়, যখন জীবকর্তৃত্ব সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে. তখন সে দেখিতে পায়—“মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্তিতে স্বয়ং

[৬] সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২০। তুলনীয়, ঐ পৃ. ১২৮-২৯।
[৭] সাধন-সমর, ২য়, পৃ. ৪২।

আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপথের অন্তরায়-স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসুর-কুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন।" সেই মহা-মিলনের সময় যে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবী-মাহাত্ম্যে অসুরনিধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে।...

"সঞ্চিত প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজই মুক্তির অন্তরায়। সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণরূপে পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত। যতদিন এই গ্রন্থিভেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর উৎপীড়ন বিদূরিত হয় না। একমাত্র মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি তস্মিন্ দৃষ্টে।' মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর সাধক দেখিতে পায়,—তাহার এই হৃদয়গ্রন্থি সম্যক্ উচ্ছেদ করিবার জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডিকামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একটি গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের হৃদয়ে মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চণ্ডীর এক একটি রহস্য। প্রথম—মধুকৈটভবধ বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয়—মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয়—শুম্ভবধ বা রুদ্রগ্রন্থিভেদ।"[৮]

এই শক্তিকে বা মাকে চণ্ডিকা-মূর্তিতে উপস্থাপিত করিবার গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজরূপ অসুরগণও প্রবল পরাক্রম-শালী; তাহারা মরিয়াও মরে না, একরূপে মরিয়া অন্যরূপে দেখা দেয়—এক অসুরের একবিন্দু রক্ত হইতে নূতন করিয়া আর-একটি অসুরের সৃষ্টি হয়। সুতরাং শক্তির চণ্ডমূর্তি ব্যতীত ইহাদের সমূলে উৎখাত সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ সকল চণ্ডতার ভিতরেই যে ফুটিয়া ওঠে শক্তির মঙ্গলময়ী মাতৃরূপ ইহাও যে সাধককে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে হইবে।

সমগ্র চণ্ডীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব যে কিরূপ একটি উচ্চ অধ্যাত্ম ভাবদৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটির (সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ প্রভৃতি) প্রথম অংশটি 'সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ঃ' ব্যাখ্যাতেই তাহার একটি আভাস পাওয়া যাইবে। "যখন তুমি সাবর্ণি সূর্যতনয় হইতে পারিবে, অর্থাৎ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিষ্ঠিতা মহীয়সী জগদ্বিধাত্রী ঐশী-শক্তির অঙ্কে নিত্য সংস্থিত পরিপুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন তুমি 'নমো বিবস্বতে' বলিতে গিয়া সৌরশক্তি সবর্ণারূপিণী মায়ের স্নেহস্পর্শে মুগ্ধ হইবে, যখন তুমি 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' বলিয়া অমৃতস্রাবী অনন্ত জ্যোতিস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িবে, যখন তুমি 'তত্ত্বং পূষন্ন-পাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে' বলিয়া সূর্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যদর্শী ঋষির

[৮] সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২-৩।

ন্যায় মহাসত্যের আভাস-তরঙ্গে সম্বোদিত হইবে, যখন তুমি 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' বলিয়া বৈদিক যুগের ব্রহ্মর্ষিদিগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই তুমি মনুজত্ব পরিহারপূর্বক মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইবে।"[১]

শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীসত্যদেবের যাহা মত তাহা তিনি তাঁহার রচিত 'সাধন-সমর' তিনখণ্ডে অতি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার এখানে কোনও সার সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে শুধু তাঁহার ভাবদৃষ্টির সামান্য একটু আভাসমাত্র দিয়া শক্তি-সাধনাকে তিনি যে ব্যাপক এবং গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম।

[১] সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ১০।

দশম অধ্যায়

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শাক্ত সাহিত্য

(ক) মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শাক্ত সাহিত্য

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা ও শক্তি-সাধনার যে ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কার সাহিত্যে এই শাক্ত-সাধনা এবং সাধারণভাবে শক্তিবাদ কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার একটি পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে আমরা যে শাক্ত-সাহিত্য দেখিতে পাই তাহার ভিতরে দুইটি ধারাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহার একটি হইল সাধন-সঙ্গীতের ধারা, অপরটি হইল উমাকে অবলম্বন করিয়া আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের ধারা। পরবর্তী কালে ইহার কোনও ধারাকে অবলম্বন করিয়া উল্লেখযোগ্য কোনও কবির আবির্ভাব না হইলেও আজ পর্যন্তও বাঙলার এই উভয় ধারারই কবিতা রচনা হইতে দেখি। উনবিংশ শতকের তিন জন কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আগমনী-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রহিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ-বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রীক্‌প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পার্বতী-মহেশ্বরকে জুনো-জুপিটারের ভারতীয় সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছেন, শারদীয়া দেবী এবং দেবীপূজাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিমনের যে স্বাভাবিক আসক্তি তাহার একটি স্নিগ্ধরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতায়। প্রাচীন শাক্ত-সাহিত্যের কয়েকটি উপাখ্যানও তাঁহার কবিমানসে বিচিত্র রঙ-বুলাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার লিখিত 'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'শ্রীমন্তের টোপর' প্রভৃতি কবিতায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস' কবিতার মধ্যে শারদীয়া পূজা সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবস্মৃতির পূর্ব-স্মৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; আর তাঁহার 'বিজয়া দশমী' সম্বন্ধে যে কবিতাটি—

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি : কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

ইহা পূর্বালোচিত আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের সহিতই স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা পূর্বে শাক্ত-পদাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের দু'-একটি সুন্দর কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কবিতা আছে—

"যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
ঊষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।"[১]

নবীনচন্দ্র মূল চণ্ডীর বাঙলা পদ্যে একটি অনুবাদও করিয়াছিলেন।

এই তিনজন কবির রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা'-কাব্য। ঊনবিংশ শতক বুদ্ধিবাদের যুগ; ধর্ম এবং পৌরাণিক উপাখ্যানকে তাই তৎকালপ্রচারিত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার একটি ব্যাপক প্রবণতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবীনচন্দ্র সেন এই প্রবণতা লইয়াই তাঁহার রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যত্রয়ীর মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতারকে জীব-জগতের ক্রমবিকাশের দশটি স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যে আমরা পাই অনুরূপ একটি

[১] শা. প. (ক. বি.)।

বর্ণনা। কৈলাসপুরী হইল সতীধাম, সতী হইলেন সমস্ত শক্তির মূলশক্তি,—কৈলাসে শিব-বিহারিণী। কিন্তু এই মূলশক্তিই আবার বিভিন্ন শক্তিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড়াইয়া রহিয়াছেন।—

পরমা প্রকৃতি পরমাণুমূল
কারণ-কলাপ-মালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল-অঙ্কুর-রূপিণী॥
নিরখি আবার লীলা-বিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্যমধুতে॥[২]

সৃষ্টি-রহস্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরেই ভূতভাবন মহাদেব নারদকে শক্তি-জাত ও শক্তি-নির্মিত সৃষ্টির মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একটি স্বচ্ছ আবরণ সরিয়া গেলে নারদ সম্মুখে দেখিলেন মহাকাশ—এবং সেই মহাকাশে পর পর সজ্জিত দশটি পুরী। নারদ আরও দেখিলেন অসংখ্য প্রাণী—প্রাণিগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন বিবিধ রকমের মানুষ; সেই মানুষ—

প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে।

শৃঙ্খলিত মানবের বেদনায় নারদের মন আকুল হইয়া উঠিল; আবার তাঁহার জিজ্ঞাসা—কেন এই বন্ধন—কিসে আছে মুক্তি! উত্তরে শিব বলিলেন—

জ্ঞানময় যত জীব সদানন্দ কন।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা॥
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায়॥

ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? মুক্তির উপায় মানুষের হাতে নাই, মুক্তির উপায় মহামায়ার হাতে। মুক্তির উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পর গ্রথিত দশটি লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন—এবং এক একটি লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নিজেকে দশমহাবিদ্যারূপে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। মহাবিদ্যাই অবিদ্যা দূর করিয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া দেন ক্রমোন্নতির পথে। এক

[২] হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা।

একটি লোকে একটি মহাবিদ্যারূপে অবস্থান করিয়া শক্তিরূপিণী মহামায়াই এইভাবে জীবের ক্রমোন্নতির পথে সকল বন্ধনমুক্তি ও বেদনামুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে নারদ দর্শন করিলেন মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড।—

মহাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মূরতি॥
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে।
দুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে॥

এখানে সবই সংহারমূর্তি, সবই ভীষণমূর্তি। শক্তিও এখানে সংহাররূপিণী ভীষণা।—

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ-মন
কহেন তখন শঙ্করে।
"দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।
যিনি সতীরূপে সংসারপালিকা
সর্বজীবদুঃখহারিণী॥

তখন—

না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছে যে আপদে॥

এক লোকে যে দুঃখ-অপূর্ণতা পরের লোকে রহিয়াছে তাহা হইতে ত্রাণের উপায়, এবং এ উপায়ের বিধান করিতেছেন শক্তিরূপিণী মহামায়া নিজেই বিশেষ একটি মহাবিদ্যারূপে।

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী॥

নারদ তারার ব্রহ্মাণ্ডে তারামূর্তি দর্শন করিলেন—তিনি 'লোলরসনা বামা ঘোর হাসি বদনে' বটেন, কিন্তু আবার—

জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীব-হৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥

ইহার পরের ভুবনে ষোড়শী—

শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী।
প্রেম সঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শীরূপিণী॥

ভুবনেশ্বরীর ভুবনে—

সদা সুহাস্যযুতা এখানে বিরাজিতা—
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥

এইরূপে ভৈরবী হইলেন 'জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীবউদ্ধারকর্ত্রী' এবং 'ভক্তি-বিধায়িনী ভৈরবীরূপিণী'। ইহার পরে—

প্রীতি ভবতলে সর্বজীবদুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদতলে বসেছে॥

ইহার পরে ধূমাবতী—

লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে।
শ্রম-ক্লান্তি প্রাণি-ক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে॥

ইহার পরে 'দারিদ্র্যদলনরূপ বগলার শরীরে'; ছিন্নমস্তা হইলেন—

বিকট উৎকট স্ফূর্তি বিপরীত রতিমূর্তি
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।

দশমপুরীতে 'পরমাপ্রকৃতি সতী সর্বশেষ ভুবনে', এবং সেখানে 'দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব-দুঃখ হরিছে'।

নিজের চক্ষে মহাকাশে দশপুরীতে দেবীর দশলীলা দর্শন করিয়া নারদ সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলেন মহাকালে মহাকাশে মহাসৃষ্টির বিবর্তন শিব-মুখে—চরম মঙ্গলের লক্ষ্যে, আর এ লক্ষ্য-পথে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত করিতেছেন শক্তিরূপিণী মা নিজে তাঁহার দশমহাবিদ্যা-মূর্তিতে।

হেমচন্দ্রের এই 'দশমহাবিদ্যা' আলোচনা করিলে তাঁহার মূল আদর্শ-সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি মহাবিদ্যার যে স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনেকখানি মনগড়া, এক ভুবনের ভিতর দিয়া এক মহাবিদ্যা

কি করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অন্য ভুবনে আগাইয়া দেন এবং পরভুবনের মহাবিদ্যা কি করিয়া পরভুবনে আগাইয়া দেন—বিভিন্ন ভুবন ও বিভিন্ন মহাবিদ্যার ভিতর দিয়া ক্রমপরিণতির সূত্রটি কি তাহা তিনি স্পষ্টভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই; শুধু ঊনবিংশ শতকে 'বিবর্তন-বাদে'র যে প্রভাব আমাদের চিন্তায় দেখা দিয়াছিল তাহারই প্রভাবে তিনি দশমহাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া ক্রম-দশ-লোক-ভ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের ক্রমোন্নতির একটি আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য বলা যাইতে পারে, মূলেও দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ খুব স্পষ্ট নহে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মহাভারতে যেখানে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা রহিয়াছে সেখানে তাহার সহিত সতী-উপাখ্যানের কোনও আভাস নাই। প্রাচীন কয়েকখানি পুরাণে দক্ষযজ্ঞ-উপাখ্যানের সহিত যেখানে সতী-উপাখ্যান দেখা দিয়াছে সেখানেও সতীর দশমহাবিদ্যা-রূপ ধারণের কাহিনী নাই।\এ কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে অর্বাচীন কয়েকখানি পুরাণ-তন্ত্রে। পুরাণ-তন্ত্রে আমরা দশ-মহাবিদ্যার যে নাম পাই তাহার সর্বত্র ঐকমত্য লক্ষিত হয় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা বলিয়া আসিয়াছি, একান্নটি জনপদে বিভিন্ন কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে একান্নটি বিশেষ বিশেষ দেবী তাঁহাদিগকে একই মহা-শক্তিরূপিণী দেবীর অংশভূতা করিয়া লইবার জন্য যেমন সতীদেহকে একান্ন ভাগ করিয়া একান্ন পীঠের উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল দেবী গড়িয়া উঠিয়া পরবর্তী পুরাণ-তন্ত্রের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সবই যে একই দেবীর বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে বিভিন্ন মূর্তি, এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই পিতৃগৃহে গমনেচ্ছু বাধাপ্রাপ্তা ক্রুদ্ধা সতীর দশমূর্তি ধারণের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দশমহাবিদ্যার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইতিহাস যাহাই হোক, বাঙলায় পঞ্চদশ শতক হইতে যে তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার ধারা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে এই দশমহাবিদ্যার খুব প্রসিদ্ধি ও প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। নিম্নাধিকারী সাধারণ লোকের নিকট দশমহাবিদ্যা একই দেবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফলদায়িনী মূর্তি বলিয়া পরিগৃহীতা। একরূপ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাই একরূপ মহাবিদ্যার পূজাবিধি। তান্ত্রিক সাধকগণ মহাবিদ্যারই সাধক ছিলেন। এই সাধকগণের হৃদয়েই মহাবিদ্যার তত্ত্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই তত্ত্বরূপের ভিতরে একটি ব্যাখ্যা দেখিতে পাই অধিকারি-ভেদের ব্যাখ্যা; অধিকার-ভেদে দেবী দশরূপে ভক্তগণের ইষ্টরূপে পরিণতা। অন্য ব্যাখ্যায় দেখি, একই সাধকের বিভিন্ন সাধনস্তরে বা একই সাধনস্তরে বিভিন্ন ভাবের আস্বাদনে দেবী দশ রূপে পরিকল্পিতা। সাধক-সমাজে দশমহাবিদ্যার এই তত্ত্বরূপই বর্তমানে সমধিক

গৃহীত। এইরূপ ব্যাখ্যার নমুনা-রূপে এখানে আমরা মহাবিদ্যার পূজাবিধি শ্রীসত্যদেবের গুরু প্রসিদ্ধ মাতৃ-সাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণের 'দশমহাবিদ্যা' পুস্তিকা খানির উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার ব্যাখ্যা দশমহাবিদ্যা-সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যা। তিনি তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রথম মহাবিদ্যা কালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কাল-গ্রসনে স্বয়ং-জ্যোতিঃ, তাই বিম্বহীন ঘন কালো, মুক্তিবিলাসে মুক্তকেশ, বিগতরূপে বিরূপাক্ষী, বিগতদ্বিতীয়ে লজ্জাহীনা, বিগতবসনে নগ্না, লোলরসনা রসৈকঘন রসোল্লাসে, মরণদলনে দলিতকাল, 'নাস্তি'র লাস্যে আনন্দভুক্, অশব্দা তাই ঘোরারাবা, অবর্ণা তাই কর্ণকঙ্কালমালিনী, স্বয়ংযোনি তাই শবরসংঘাত কৃষ্ণকাণ্ডী, স্বয়ংসমা তাই শ্মশানালয়া, স্বয়ংকাম তাই অকামরতির মহোল্লাস—সর্বনাস্তির মহাস্মৃতি, তাই অস্তি-নাস্তির সমাবেশ—অমার আঁধারে গুপ্তকলা ব্রহ্মবোধেরও আদিপ্রকাশরূপা আদ্যা—চিন্মহিমার আদিশ্রী!" তাহার পরে তারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"এক'ই বহুর গর্ভগৃহ, তাই সে দেবী একজটা, সত্যসম্বোধে পূর্ণ—তাই নিত্য,—তাই চারিধারে তার মহাকালাগ্নির বিচ্ছুরণ! অনলের মাঝে সত্যসরোজে ব্রহ্মরূপিণী বধূবীজময়ী তিমিরহরা তারা!" তাহার পরে "দৃষ্টি হইল ঘনীভূত, জ্যোতিঃ হইল দ্রবীভূত, ষোড়শ-কলায় পূর্ণ হইয়া ষোড়শ বিকার প্রকাশ করিতে ষোড়শ স্বরশক্তি লইয়া প্রকাশ হইল ষোড়শী।......ছিল বাঙ্ময়ী, হইল প্রাণময়ী-ভাবময়ী, হইল ষোড়শ কলার অরুণরাগ।" এই ষোড়শীরূপের পরে "বিজ্ঞানের সে বিদ্রাবণ, প্রাণের সে লীলালহর প্রকাশ পাইল ভুবনরূপে—ফুটিল তাহাতে ব্যোম, বায়ু, বহ্নি, বারি, ধরণী,—মনোময়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা বিশ্বরূপা ধাত্রীমূর্তি—ভুবনেশ্বরী ভবানী।" ইহার পরে দেখা দিল ভৈরবীতত্ত্ব। "মনোময়ী এই মহাদেবীর দ্যুতি ছড়াইল চারিধারে ত্রিবৃতের সমাস রচনা করিয়া নাম ও রূপের বিকাশে। বিসর্পিত হইল ঘূর্ণচক্র খণ্ডে খণ্ডে, নামে নামে, রূপে রূপে, কুণ্ডলে। কুণ্ডলে কুণ্ডলে কুণ্ডলিত হইল জ্যোতির তড়িদ্দাম—কুণ্ডলে কুণ্ডলে রচিত হইল ত্রিবৃৎসমা সে বিশ্বরূপ—কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে খণ্ডে খণ্ডে অধিষ্ঠান।" ইহার পরে "আপনার শির আপনি কাটিয়া—আপনি হইলে ছিন্নমস্তা—আপন রক্তপান-লোলুপা একি বীভৎস ভীষণ বেশ! আত্মহননে আত্মতৃপ্তি—আত্মবিলাসে আত্মহনন......।" আবার "অসৎ পরিদর্শন অনৃত পরিবেদন, তাই উদ্বুদ্ধ হইল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সত্যের জন্য—অমৃতের জন্য দারুণ দুর্বহ ক্ষুধা! ক্ষুধা আছে কিন্তু অন্ন ক্‌ই? অমৃতকে—শিবকে—যে তুমি খণ্ড কবন্ধ জীবরূপে গ্রাস করিয়াছ করালিনি—মহাবিস্মৃতির মহাগ্রাসে!... শিবকে গ্রাস করিয়া তুমি মূর্তি ধরিয়াছ বিধবা।" ইনিই ধূমাবতী। ধূমাবতীর পরে "এক হস্তে মুদ্গর, অন্য হস্তে বৈরিজিহ্বা—বৈরিজিহ্বা-কর্ষণরতা মা। অরিদলনে বাঁচাইতে অরিদলনা মা ফুটিল অন্তরে।" ইনি বগলা। তাহার পরে

"সর্বরসের সমাবেশে অনির্বচনীয় রস—সুরাপানে ঢল ঢল আঁখি, মাতঙ্গিনীর মত্তগতি—আত্মপ্রকাশ-মদমত্তে মন্থরা দেবী মাতঙ্গিনী!" সর্বশেষে "মুক্ত-হৃদয়-শতদল—দলে দলে তাঁর আপ্তকামে তৃপ্তি-সুধার মুক্তাধারা! দহরে দহরে একই কমল—কমলে কমলে একই কমলা—হিরণ্য-হারিণী স্বয়ংশ্রী।" ইনিই দশম মহাবিদ্যা কমলা।

(খ) দেশ-মাতৃকা—স্বদেশী-সঙ্গীতে শক্তিবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রধান কবিগণের রচনায় উপরে যে-সমস্ত শাক্ত-উপাদানের কথা উল্লেখ করিলাম ইহা তৎকালীন বাঙালী কবি-মানসের উপরে শাক্ত-ঐতিহ্যের কোনও গভীর পরিচয় বহন করে না। গভীর প্রভাবের পরিচয় দেখিতে পাই আর-একটি বিষয়ে, তাহা হইল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম লইয়া 'দেশমাতা'র ধারণায়। এই 'দেশমাতা'র ধারণাটি কোনও কবিবিশেষ বা কবিগোষ্ঠী বিশেষের মধ্যেই লক্ষণীয় নয়, ইহা লক্ষণীয় সমগ্র জাতীয় মানসের মধ্যেই। সহস্র সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যের সূত্রে এই 'দেশমাতা'র পরিকল্পনাটি এমন একটি সহজাত বিশ্বাসরূপে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছিল যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি, তখনও আমরা আমাদের দেশকে অকাতরে এবং গর্বভরে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। আমাদের ছেলেবেলাকার একটি অতি-প্রচলিত শ্লেষ ছিল, আমাদের জন্মভূমির মাটি শুধু মাটি নয়, সে আমাদের 'মা-টি'। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া মাতাকে বন্দনা করিতে আহ্বান জানাইলেন, আমরা জানি সেই মা এক দিকে যেমন 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি, অন্য দিকে আবার তেমনি সেই বঙ্গভূমিই 'দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গা'—আমরা তাঁহারই 'প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। কিন্তু সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা একটি ভূখণ্ডই আবার মন্দিরের দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার সঙ্গে একেবারে এক হইয়া গেল কি করিয়া? আশ্চর্য এই, বিশেষ করিয়া খোঁচাইয়া না তুলিলে এ প্রশ্নটা সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; আমাদের নিকটে ইহা একটি সহজ সিদ্ধান্ত—সহজাত বিশ্বাস।

শুধু বাঙলা দেশ নয়, ভারতীয় মনেই এই দেশ-ই যে জননী এই চিত্ত-প্রবণতা কি করিয়া গড়িয়া উঠিল পূর্বে তাহা আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি[১] পৃথিবীই যে দেবী এই ধারণা হইতেই দেশমাতার পরিকল্পনা

[১] এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পৃথিবী দেবী' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৃথিবীকে কতভাবে দর্শনে, পুরাণে ও সাহিত্যে কতরূপে মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পৌরাণিক যুগে জীবধাত্রী বসুন্ধরাই কি করিয়া অস্ত্রশস্ত্রধারিণী দেবীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন তাহার ইতিহাসও আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। সেই-সব আলোচনা লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যাইবে, আমাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবী কি করিয়া প্রাণময়ী এবং চিন্ময়ী দেবীরূপে আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এই বুদ্ধি এবং বিশ্বাস আজ আর শুধু আমাদের মনে নয়, আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। ইহা আমাদের সমগ্র জাতির নিকটেই একটা সামাজিক উত্তরাধিকার; দেশকে তাই আমরা আজও, জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, মাতা বলিয়া বন্দনা করি—পৃথিবীকে জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী বলিয়া শ্রদ্ধাবনতচিত্তে জানাই প্রণতি।

ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত; ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন করিয়াই তাহার আরম্ভ।—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।
তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত
কেন মিছে মর ভার বয়ে॥

কিন্তু দেশের আসল মাতৃমূর্তি গভীর এবং স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে এবং গানে। 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয়-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণে আজ আমরা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদ—এই পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া 'বন্দে মাতরম্' গানই যে শুধু জাতীয়-সঙ্গীতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটিকে আমরা এই কালে যথার্থ মন্ত্রহিসাবেই ব্যবহার করিয়াছি, ইহা আমাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছে, উৎসাহিত করিয়াছে, নিষ্ঠা দিয়াছে, নির্ভয় দিয়াছে। 'বন্দে মাতরম্'-এর ভিতরেই এই যুগের জাতীয়তাবাদের পরিচয় নিহিত আছে, ইতিহাসের দিক্ হইতেও এই সত্যটিকে বড় করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদের বাঙালীর জাতীয়তাবোধের সহিত বাঙালীর ধর্মবোধের একটা নিগূঢ় যোগ ছিল. এই কথাটিই এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে তিনটি অংশ আছে, তিনটি অংশে আছে তিনটি উপাদান—সেই তিন উপাদানের মিশ্রণেই একটি সমগ্র রূপ। প্রথম অংশের আরম্ভ 'সুজলাং সুফলাং' হইতে, দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ 'সপ্ত-

কোটিকণ্ঠ' প্রভৃতি হইতে ও তৃতীয়াংশ 'ত্বং হি দুর্গা' প্রভৃতি হইতে। প্রথমাংশে দেখিতে পাই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে সাধারণভাবে ভৌম-প্রীতি। কিন্তু ভূমিই ত দেশ নয়, দেশ দেশবাসীকে লইয়া। দেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে জাতির ধারণা, জাতি গড়ে দেশের প্রত্যেকটি লোক। সমস্ত দেশবাসীকে লইয়া যে মানবসমাজের মধ্যে বিশেষ একটা 'একক' (unit)এর বোধ—তাহাই গড়িয়া তোলে জাতীয়তাবোধ। এই জিনিসটি আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল ঊনবিংশ শতকে। ইহার পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল; কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির সুদৃঢ় বন্ধনে বন্ধ একটি 'এককে'র বোধ ছিল না। 'সপ্তকোটিকণ্ঠ' প্রভৃতি স্তবকটির মধ্যে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধটি প্রথম প্রকাশ পাইল। সাধারণ ভৌম-প্রীতির পটভূমিতে জাগিয়া উঠিল এই সপ্তকোটি নরনারীর দেহমনের ঐক্যে গঠিত জাতীয়তাবোধ। কিন্তু এই ভৌম-প্রীতি ও জাতীয়তা-প্রীতিতে পরিকল্পিত দেশমাতাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' করিয়া তুলিলেন কেন? এইখানেই দেখিতে পাই, ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর জাতীয়-মানসে বিবর্তনে জাতীয়তাবোধের সহিত ধর্মবোধের যোগ। বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পিত স্বদেশপ্রেমিক 'সন্তানগণ' তাই সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায় এই যে জিনিসটি লক্ষ্য করি, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে আমাদের জাতীয়তা-আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেও এই সত্যই লক্ষ্য করিব, জাতীয়তাবোধ সেখানে অধ্যাত্মবোধের সহিত যুক্ত হইয়া কোথাও কোথাও আবার অধ্যাত্মবোধের একটা বিশেষ প্রকাশরূপেই দেখা দিয়াছে। আমাদের ধর্মবোধের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবী দৈবী বলিয়া গৃহীতা বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট স্বদেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মধ্যে কোথাও কোন তফাত নাই।

ভারতবর্ষ যে ভারতবাসীর নিকটে শুধুমাত্র একটি দেশ নয়, এই দেশের যে একটি দেবীরূপ রহিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন—"Mother India is not a piece of earth ; she is power, a Godhead, for all nations have such a Devi supporting their separate existence and keeping it in being."[২] এই কারণেই ভারতবর্ষের জন্য যে সংগ্রাম তাহা মায়েরই সংগ্রাম, মায়ের ইচ্ছায় নিযুক্ত হইয়াই ভারতবাসিগণের এই সংগ্রাম। তাই জননী দুর্গার নিকট শ্রীঅরবিন্দকে প্রার্থনা করিতে দেখি— "Mother Durga! Giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self

২ 'শুভবস্তু' হইতে প্রকাশিত Sri Aurobindo And The Mother পুস্তিকায় উদ্ধৃত।

of might, Mother beautiful and fierce. In the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee ; Mother, give to our heart and mind a titan's strength, a titan's energy, to our soul and intelligence a god's character and knowledge."°

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতীয়তাবোধের নানাভাবে উন্মেষ ঘটিতেছিল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যদি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া একান্ত স্পষ্ট কতকগুলি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'রাণা-প্রতাপ' নাটকে গান দিলেন—

চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।

'জয় মা ভারতে'র সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে 'জয় মা কালী' আসিয়া জুটিলেন কেন? এখানে ভারতমাতাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য রাজপুতগণ চিতোরেশ্বরী কালী মাতার নিকটেও প্রার্থনা করিতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সবটুকু কথা বলা হয় না: কবির মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালীমাতা কোথায় একেবারে এক হইয়া যুক্ত হইয়া রহিয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষ কবিতায় তিনি বলিলেন—

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ!
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

তখন ইহাকে শুধু কবি-কল্পনার আতিশয্য বা বাঙালী-জনোচিত উচ্ছ্বাস-প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না; এখানে দেশ কোনও 'দেবী' রূপে পরিকল্পিতা হইয়াছেন একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছি না; এখানে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সহিত ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ ধর্মসংস্কারের একটা অবোধপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সরলা দেবীর 'বন্দি তোমারে ভারতজননী, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি'—এই প্রসিদ্ধ গানটির ভিতরে দেখিতে পাই, বলা হইয়াছে,—'যুগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি'; শস্যশ্যামলা মা ভারতবর্ষের সহসা আবার 'কমল-বরণী' হইয়া উঠিবার তাৎপর্য কি? তাহার

° *Sri Aurobindo And The Mother.*

পরেই আবার দেখিতে পাই—

আবার তোমায় দেখিব জননি সুখে দশদিক্-পালিনি!
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালিনি!

এই 'খর্পর-করবালিনী' বিশেষণটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অবশ্য বিশুদ্ধ দেশের দিক হইতেও এই বিশেষণের আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা চলে, সেকথা অস্বীকার না করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দেশ-সম্বন্ধে এই 'খর্পর-করবালিনী' বিশেষণ প্রয়োগের সংস্কৃতিগত বা ঐতিহ্যগত একটা বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে।

আমাদের জাতীয়-সঙ্গীতের মধ্যে শ্যামা মাকে নানাভাবে জড়িত দেখিতে পাই। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় জাতীয়-সঙ্গীত রচনা করিলেন—

শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান
এ জগতে কোথায় পেলি?

এখানেও দেখিতে পাই জাতীয়-জাগরণকে ধর্ম-জাগরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবারই মনোবৃত্তি—যে ধর্ম-জাগরণের অবলম্বন শক্তিরূপিণী মা। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের অনুরাগী স্বদেশী-যুগের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক চারণ-কবি মুকুন্দদাসের একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, গানটি একটি প্রসিদ্ধ স্বদেশী-গান।

জাগো গো, জাগো জননি।
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেহ জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ তো সাড়া দিল না মা,
খুঁজে দেখলেম কত প্রাণ
কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না কাঁদালে প্রাণ
কাঁদিবে না কারো প্রাণ,
না কাঁদিলে সবার প্রাণ
পোহাবে কি রজনী?
দয়াময়ী নাম ধরিস্
দয়া কি মা আছে তোর,

দয়া থাকলে মরে কি আজ
ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই—
ভারতের ভাগ্যাকাশে
স্বাধীনতা-দিনমণি।

গানটিকে আমরা তৎকালীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একটি প্রতিচ্ছবি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। বহুদিনের ঐতিহ্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া আগত একটি সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাজিক মানস-উত্তরাধিকার-রূপে দেখা দিয়াছে। দেশ এবং শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা আলো-আঁধারি অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের সহিত একটি ধর্মপ্রেরণা যুক্ত হইয়াছে।

এই-জাতীয় গানের ক্ষেত্রেও স্বাদেশিকতার সহিত ব্যক্তি-বিশেষের ধর্ম-বিশ্বাসের একটা মিশ্রণের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-সঙ্গীত হইতেই আমরা কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য তথ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ঔপনিষদিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট; বাঙলাদেশের বা ভারতবর্ষের শাক্ত-ধর্ম বা শাক্ত-চিন্তাধারা কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের মনে কোন অনুকূল আবেদন জানায় নাই, বরঞ্চ কখনও কখনও প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় পৃথিবীর যে এই একটি দেবীরূপ এবং জননীরূপ তাহা রবীন্দ্রনাথের মনেও গভীর বিশ্বাসরূপে দেখা দিয়াছিল। এই বিশ্বাসের দুইটি রূপ আছে। একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' (মানসী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), 'মাটির ডাক' (পূরবী), 'পত্রপুট'-কবিতাগ্রন্থের পৃথিবী-সম্বন্ধে কবিতাটি—এই-জাতীয় অনেক কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও কোনও পৌরাণিক বোধ নাই, আছে বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত একটা গভীর কবি-অনুভূতি। তিনি সমস্ত দেহ-মন দিয়া অনুভব করিয়াছেন, মানুষের সহিত পৃথিবীর যে বন্ধন তাহা মাতার সহিত সন্তানের নাড়ীর বন্ধন। কিন্তু স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তখন ঊনবিংশ শতকে প্রচলিত দেশ ও দেবীর অভিন্নতার বিশ্বাসের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাতৃরূপ তাই শুধু আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে নয়, একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার-রূপেই দেখা দিয়াছে তাঁহার স্বদেশী-সঙ্গীতে। এই সময়কার তাঁহার গানে দেখি—

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে॥

... ...

তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য-কাহিনী;
এরা কি দিবে তোরে, কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে॥

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ গান—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক,

... ...

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক্ সুখে ভাসিবে॥

ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের—'সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে' প্রভৃতির প্রতিধ্বনি একেবারে অস্পষ্ট নয়; অন্ততঃ ইহা যে সম-ঐতিহ্যের প্রভাব হইতে জাত তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত গানটি সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের কথাও উপস্থিত করিতেছি। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে আমরা শারদীয়া দুর্গাপূজার পরে বিজয়ার পরদিন দেশে গ্রামবাসিগণ মিলিত হইয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করিতাম। শোভাযাত্রাটির প্রকৃতি মুখ্যতঃ ছিল স্বাদেশিক, অথচ সেই স্বাদেশিকতাকে অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুর্গাপূজার ভাবের সঙ্গেও যতখানি মিলাইয়া লওয়া যায় সেদিকেও আমাদের স্বাভাবিকই একটা ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির মধ্যে আমরা উভয়বিধ ভাবেরই একটা সহজ মিলন দেখিতে পাইতাম, এই কারণে এই শোভাযাত্রার জন্য প্রতিবৎসরই আমরা এই গানটিকে নির্বাচিত করিতাম।

রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেকগুলি গানও এই-জাতীয় চিত্ত-পটভূমির সাক্ষ্য বহন করে। আমরা নিম্নে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি।—

॥ ১॥ মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

... ...

ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে॥

॥ ২ ॥ বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন!
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর,
সে যে আমার জননী রে॥

॥ ৩ ॥ জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।

॥ ৪ ॥ অয়ি ভুবন মনোমোহিনী,......

॥ ৫ ॥ আমরা পথে যাবো সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরব দ্বারে দ্বারে।
বলবো, জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ॥
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে॥

॥ ৬ ॥ ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা॥

॥ ৭ ॥ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা॥

॥ ৮ ॥ মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?

উপরে উল্লিখিত গানের সবগুলিতেই দেখিতে পাই একটা বাঙালী-জনোচিত সাধারণভাবে স্বদেশে মাতৃবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলিয়াছেন, -

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী॥

সেখানে 'জয় মা'র লক্ষ্য 'মা' কে? তিনি 'দেশ-মা' ত বটেনই; কিন্তু বাঙলাদেশে 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক বিপদ্‌নাশিনীতে যে বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে তিনিও কবির চিত্তে খানিকটা অবোধপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে বলিয়াছেন,—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী?

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

সেখানে 'সোনার মন্দিরে'র 'জননী'কে বিশুদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনা রূপেই গ্রহণ করিতে পারিতাম যদি না পরেই দেখিতে পাইতাম—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কি মুরতি আজি দেখি রে।

ইহাও আলঙ্কারিক বর্ণনা বটে; কিন্তু এই খড়্গধারিণী, শঙ্কাহরণী এবং অগ্নিবর্ণের ত্রিনয়নী বাঙলা মায়ের পশ্চাৎ হইতে পৌরাণিক দুর্গাকে একেবারে মুছিয়া ফেলি কি করিয়া? অলঙ্করণের ভিতরে ঐতিহ্যপ্রভাব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে; সেই সত্যটাই এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

এই দেশমাতার সহিত আরাধ্যা দেবীর ধারণা বাঙালী-মনে যে কতখানি মিশিয়া গিয়াছিল তাহার অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৩৩২ সালের ৮ই আশ্বিন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে ৪৩|৩ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 'মাতৃচরণাশ্রিত সন্তান' গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (লিখিতও?) 'দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজা' নামে একখানি ছত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা দেখিতে পাই। এই পুস্তিকার প্রথমে দেশাত্মবোধ জিনিসটি কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পরে "শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজাপদ্ধতিঃ" বিস্তৃত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পূজাবিধির মধ্যে বিন্দুমাত্র আলঙ্কারিকতা নাই. ইহা বিশুদ্ধ দেবীপূজা-বিধি। প্রারম্ভেই দেখি—"ভূমিসত্য" ইত্যাদিনা ভূম্যাদিষু সত্যপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বাচমনাদিকসঙ্কল্পান্তং বিধায়াবহেৎ॥ (সঙ্কল্পে তু শ্রীশ্রীদেশ-মাতৃক-প্রীতিকাম ইতি বিশেষঃ) আবাহনঃ মন্ত্রঃ॥ দেবেশি ভক্তি-সুলভে মহাশক্তি-সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং বরদা ভব॥ ততো মহত্ত্ব-চিন্তনম্॥ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সীত্যনেন॥ অথ ধ্যানং।

বন্দে ভারত-মাতরং হিতরতাং ধর্মার্থদাং মোক্ষদা-
মারাধ্যামৃষিসেবিতামনুপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্।
ফুল্লাব্জাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সলিলাং শ্যামলাং রত্নভূষাং
ত্রৈলোক্যপ্রীতিগীতাং হিমগিরিমুকুটাং সাগরৈর্ধৌতপদাম্॥
মন্ত্রস্তু হ্রীং দেশমাতৃকায়ৈ নমঃ॥

ইহার পরে বিস্তারিতভাবে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, পানীয় তাম্বূল প্রভৃতি দান ও তাহার মন্ত্র দেখিতে পাই। দেশমাতৃকা-পূজার পরে আবার প্রদেশ-পূজার বিধি আছে। তৎপরে আবার গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন বর্ণনার খানিকটা অনুরূপ 'শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-রূপদর্শনং নাম স্তুতিঃ' রহিয়াছে। উল্লিখিত পুস্তিকাখানির আর কোনও মূল্য থাক বা না থাক, বাঙালী মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার অনেকখানি মূল্য রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

ভারতীয়গণের মধ্যে কেবলমাত্র বাঙালী কবিমানসেই যে দেশ দেবী বা 'শক্তির' সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কবিমানসেই বেশি করিয়া দেখা দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেই এই প্রবণতার কম-বেশি সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতী একজন আধুনিক যুগের জনপ্রিয় তামিল কবি। তাঁহার 'জননী ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে দুইটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমটিতে কবি ভারতবর্ষকে পরা শক্তি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেশমাতাও বটেন—আবার বেদমাতা শিবগৃহিণীও বটেন।

Our mother is a spirit wild,
A spirit mad and stark ;
Her lover, he hugs the swearing flame
And dances in the dark.
Waves of melody heave and eddy
In the fairy sea of song ;
She leaps and laves in the spin of the waves
And rides their crest along.
In the woodland bright of the poets light
Blow buds divinely sweet ;
She clasps them to her and with beauty drunk,
She reels on tripping feet.
She's covered the parts of a thousand arts
And showers them over the earth,
Behold, she sings, and the Veda rings
Her trident conquers death.
In the war of wars, she springs as the might
In the bend of Partha's bow ;
She leaps to kill and slakes her will
With the blood of the cloven foe.

অন্য কবিতাটিতে দেখি, কবি জননী ভারতবর্ষকে জাগিয়া উঠিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানে কবি জননী ভারতবর্ষকে পার্বতী উমার সহিত অভিন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।—

Dost thou not know we are all athirst
For the grace that wills in thy eye ?
Golden one, daughter of the spirit of
white Himachal,
How long oh, how long are we to wait ?
What more of penance are we still to do ?
Thou sleepest yet, is it fair ?
Life sweet, mother, awake.

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে যে স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরেও দেশ সর্বত্রই জননী; তবে এই জননী অনেকখানিই জীবধাত্রী রূপে সাধারণভাবে জননী, পৌরাণিক দেবীর পশ্চাৎপটটি এখানে লক্ষ্য করা যায় না। ওড়িয়া ভাষায় কবি মধুসূদন দাসের 'উৎকল বন্দনা' নামে একটি কবিতা আছে—

জয় মা জনমভূমি,
উদার উৎকলভূমি,
তোর স্নেহকোলে মাগো জন্ম আম্ভর।
কোটি সুত ঘেনি কোলে
পালুথান্তি স্নেহ ভোলে,
তুহ মা করুণাময়ী করি আদর।
তো বক্ষর অমৃত রস,
সুখী করিছি মা কোটি কোটি মানস।

তুহ মা শোভাসদন,
সিন্ধু ধুঅই চরণ,
কেতে নদী গিরি বন শোভে তো দেহে।
ধর্মর তু কামধেনু,
পুণ্যময় তোর রেণু,
কেতে মহাতীর্থ ধরি অছু মা স্নেহে।
কোটি কোটি পুরুষ-নারী
তোর পদতলে বসি মুক্তি-ভিকারী।[8]

[1] মধুসূদন গ্রন্থাবলী, কটক, ১৯১৫।

'উৎকল-জননী প্রতি'ও তাঁহার কবিতা রহিয়াছে—

বিশাল বিস্তার তব, মা উৎকলভূমি,
দেখি আসিল মু চারি আড়ে ঘুমি ঘুমি।
কোটিএ সন্তান মাগো, ধরছন্তি কোলে,
গোটিএ মনুষ্য কিন্তু ন দেখিল ডোলে।[৫]

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দি কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক স্তুতিগুলিতে দেবী ও জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটা যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। 'শারদীয়া পূজা' কবিতার শেষ স্তবকে দেখিতে পাই—

জয়তি সিংহবাহিনী জয়তি জয় ভারত মাতা।
জয় অসুরন দল দলনি জয়তি জয় ত্রিভুবন ত্রাতা॥[৬]

এখানে অবশ্য 'ভারত মাতা' কথাটিকে ভারতরূপিণী-মাতা-ভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া ভারতের মাতা (ভারতবাসি-বন্দিতা মাতা) বলিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে; কিন্তু বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক কবিতাগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে, বাঙলাদেশে এই সময়ে দেবী-ভক্তি ও দেশ-প্রীতি যেরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত ছিল, বালমুকুন্দ গুপ্তের কবিমনেও এইরূপ একটি মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আমরা বাঙলার অশ্বিনীকুমার দত্তের গানে যেমন দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষকে তিনি বিরাট্ শ্মশান বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাতেই শ্যামা মাকে জাগ্রত হইয়া নৃত্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন, বালমুকুন্দ গুপ্তও তেমনি বলিয়াছেন,—

ভারত ঘোর মসান হৈ, তু আপ মসানী।
ভারতবাসী প্রেত সে ডোলহিঁ কল্যানী॥[৭]

অথবা—

ভারত ভয়ো মসান বৈঠিকে তাহি জগাও।[৮]

কবির 'জয় দুর্গে' নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন, একটি দীনদুঃখী পুত্রের জন্যই মাতার কখনও ঘুম হয় না, আর ত্রিশ কোটি দীনহীন সন্তানের মা কি করিয়া ঘুমাইবেন? অতএব কবি মাতৃবোধনের জন্য স্তুতি করিতেছেন, জাগো জগদম্বা—জাগো!

জাগ জাগ জগদম্ব মাত যহ নীঁদ কহাঁকী।
কস দীন্হীঁ বিসরায় বান সুতবৎসল মাঁকী।
এক পুতকী মাত নীঁদ ভর কবহুঁ ন সোবত।
তীসকোটি তব দীনহীন সুত তব মুখ জোবত॥[৯]

---

[৫] মধুসূদন-গ্রন্থাবলী।
[৬] গুপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম ভাগ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
[৭] 'আবহু মায়,' গুপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। [৮] ঐ। [৯] ঐ।

কবি আবার বলিতেছেন, হে মা, জাগো, তোমার ত্রিশ কোটি সন্তান আসিয়া ষাট কোটি কর যুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—

উঠহু অম্ব! সঙ্কট হরো
নিদ্রা দূর বহায় কৈ।
কর সাঠ কোটি জোরেঁ খরে
দ্বারে তব সুত আয় কৈ॥[১০]

বাঙালী কবিগণের ন্যায় বালমুকুন্দ গুপ্তও মাতৃ-পূজাকে তৎকালীন জাতীয় জীবনের পটভূমিতেই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়ের আগমনী গাহিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—কি দিয়া তোমার পূজা করিব জননি, রাত্রে ক্ষুধা—দিনে হাহাকার; পেট ভরিবার যাহা কিছু ছিল ঘরে সব মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে দানবেরা; এখন আছে শুধু চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস!

কা দৈ জননী পূজা করেঁ তুম্‌হার।
পেটহুকৈ নিস দিন হৈ হাহাকার॥
উদর ভরনহিত অন্ন রহ্যো ঘরমাহঁ জো।
দানব-দল মা আয় কাঢ়, মুখতৈঁ লয়ো॥
ভেঁট ধরৈঁ জো মায় কহা, হম পাস হৈ।
কেবল আঁখিন জল অরু, লম্বী সাঁস হৈ॥[১১]

(গ) বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের শাক্ত-প্রভাব

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীতে দেবীকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষতঃ উমাকে অবলম্বন করিয়া সাধারণভাবে কিছু কিছু কবিতা-গান অনেকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-বিষয়ে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কবি বিহারীলালের। বিহারীলাল তাঁহার 'নারীবন্দনা'য় নারীকে শিব-আরাধিতা দেবী করিয়া তুলিয়াছেন।—

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা;
ধেয়ান তোমার কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

কিন্তু ইহাই বিহারীলালের কোনও বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ নারী-বন্দনায় এরূপ উক্তি আমরা এই সময়কার আরও কোন কোন কবির মধ্যে দেখিতে পাই। কবি

[১০] গুপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। [১১] 'আগমনী,' ঐ।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার নারী-বন্দনায় যেখানে তন্ত্রের শিব-শক্তি এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আরও গভীর বলিয়া মনে হয়। এ-বিষয়ে তাঁহার 'মহিলা' কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই—

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন,
বিপরীত দুইভাব মেলা;—
বাহ্যে দোহে আর, মনে মধুর মিলন,—
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা!
একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে কৃতী;
হর-গৌরীরূপ বিশ্বে পুরুষ-প্রকৃতি!
ধন্য সাংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সার নিরূপণ!—
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির,
পুলকে টলিল কায়, খুলিল লোচন
অবশ পুরুষ অকৃতীর;
প্রকৃতির ভোগ্য কায়,
জীব ভোক্তা ভুঞ্জে তায়,
কে ইহা করিবে অস্বীকার?
পতি-পত্নী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার!

শাক্ত-ভাবধারার প্রভাব বিহারীলালের উপরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁহার 'সারদা-মঙ্গল' এবং 'সাধের আসনে' বর্ণিত সারদার পরিকল্পনায়। সারদাকে কবি শুধুমাত্র কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বর্ণনা করেন নাই—তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী মূলশক্তিরূপিণী হইয়াই দেখা দিয়াছেন। রোম্যাণ্টিক কবি বিহারীলালের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাই একটা ভাব-বিহ্বলতা; এই-সমস্ত ভাব-বিহ্বলতার পশ্চাতে জীবনের এবং জগতের সর্বত্র কবি দেখিয়াছেন এক 'মধুর মাধুরী বালা'র অপরূপ খেলা। কিন্তু এই রোম্যাণ্টিকতার আবেশ ছাড়াইয়া কবি যখন আরও গভীরে চলিয়া গিয়া সমগ্র জীবন ও জগৎ জুড়িয়া একটি সত্যের প্রকাশ এবং লীলাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাঁহার একটি 'এক-প্রত্যয়' লাভ হইয়াছে যে সমগ্র সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক মহাশক্তি, সেই এক মহাশক্তি হইতেই সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারিত। কবিরা তাঁহাদের সমগ্র জীবনের ধ্যান-মনন-অনুভূতিতে সেই মূলশক্তিরই কান্তি-রূপটিকে সাক্ষাৎকার করেন। কবির ধ্যানে যিনি কান্তিরূপিণী হইয়া দেখা দেন, যোগীর ধ্যানেও তিনিই তাঁহার যোগেশ্বরী-মূর্তিতে ধরা দেন। মূলে কবির ও যোগীর আরাধিতা দেবী একই।

বিহারীলালের মতে সারদা এক এবং অম্বয়—সে কবি-হৃদয়ের গভীর অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু বিশ্বের সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম এবং জ্ঞানই সারদা হইতে উৎসারিত হয় না, সারদা বিশ্বের অন্তর্নিহিতা মূল মায়াশক্তি—সৃষ্ট্যাত্মক স্পন্দন। কবির নিকটে যিনি সারদা, ধার্মিক এবং দার্শনিকগণের নিকটে তিনি মহামায়া। সেই অনাদি মায়া-শক্তিই কান্তিময়ী, প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যই—

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে॥

এই সারদাকে সম্বোধন করিয়াই কবি বলিয়াছেন—

কে তুমি প্রাণেতে পশি,
ত্রিদিবের পূর্ণশশী;
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা?
করি অপরূপ আলো
কি বিচিত্র খেলা খেলো!
না জানি, কি মোহমন্ত্রে
এ অসার দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎ-বেগে বেজে উঠে বাজনা!
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা?
কে তুমি প্রাণীর বেশে
খেলা কর দেশে দেশে
যুগলে যুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহ্বল?
... ...
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ?
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ?
কোটি কোটি সূর্যতারা
জ্বলন্ত অনল-পারা
পূর্ণ-তৃণ-তরুপ্রাণী
মনোহর ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে!
কি যেন মহান্ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে।

চাহি এ সৌন্দর্য-পানে
কি যেন উদয় প্রাণে!
কে যেন কতই রূপে একা খেলা করে!
… … …
নিশান্তের লাল লাল
তরুণ কিরণজাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।
আহা সেই রক্তরবি
তোমারি পদাঙ্ক-ছবি!
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।
… … …
প্রত্যক্ষে বিরাজমান্,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ।
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।[১]

এই সারদা-রূপিণী বিশ্বশক্তি ত শুধু ষোড়শী-রূপিণী নন,—শুধু ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ নয়; যিনি ষোড়শী—তিনিই আবার ভৈরবী। বসন্তের কুসুমিত কাননে শ্যামল তরুলতায় মলয়-চরণক্ষেপে যাঁহার বিহার, তাহারই বিহার ভীষণ শ্মশানভূমিতে। তাই—

কভু বরাভয় করে,
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে—
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান,
কখন গেরুয়া পরা,
ভীষণ ত্রিশূলে ধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর:
দীপ্ত সূর্য হুতাশন
ধবক্ ধবক্ দু-নয়ন,
হুঙ্কারে বিদারে ব্যোম, লুকায় মিহির।

[১] সাধের আসন।

কভু আলুথালু কেশে
শ্মশানের প্রান্তদেশে
জ্যোৎস্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ-বদনে,
গঙ্গায় তরঙ্গমালা
সম্মুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস-নয়নে!

একথা অবশ্য ঠিক যে শুধু তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব দ্বারা যদি আমরা বিহারীলালের সারদার ব্যাখ্যা করিতে যাই তবে কবির প্রতি অবিচার করিব। বিহারীলাল কবি, সারদা তাঁহার কবি-অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা এক্ষেত্রে শুধু এই কথা বলিতে চাই, ভারতীয় শক্তিবাদ বিহারীলালের কবি-মানসের পরিমণ্ডলে ছড়াইয়া কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও বা পরোক্ষে কবি-মানসের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বাধীন কবি-অনুভূতি লইয়া সারদার কথা বলিতে বলিতে ক্ষণে ক্ষণে তিনি তন্ত্রের শক্তিবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন; এই ঝোঁক তাঁহাকে এতদূরে টানিয়া লইয়াছে যে 'সাধের আসনে'র শেষে গিয়া তিনি স্পষ্টতঃই

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বলিয়া সারদাকে প্রণাম করিয়াছেন।

'চণ্ডী-মঙ্গল', 'দুর্গা-মঙ্গল', 'অন্নদা-মঙ্গল', 'কালিকা-মঙ্গলে'র দেশের কবি বিহারীলালও যে তাঁহার নূতন কাব্যদৃষ্টি লইয়াও 'সারদা-মঙ্গল' রচনা করিলেন, এই জিনিসটিই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যে বিশ্ব-দেবীকে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি, শক্তি প্রভৃতি রূপে সংস্থিতা বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে, সেই দেবীর শুধু কান্তিরূপিণী মূর্তিকেই বিহারীলাল সারদা বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীর তন্ত্র-পুরাণোক্ত পরিপূর্ণ রূপ কবির মানস-পরিমণ্ডলেই ছড়ান ছিল। কবি বহু স্থলেই সারদাকে 'যোগেশ্বরী' আখ্যা দিয়াছেন। সারদা দুই কারণে যোগেশ্বরী: এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানে, প্রেমে, সৌন্দর্যে নিখিল চিত্তকে বহির্বিশ্বের সহিত নিরন্তর যুক্ত করিয়া দিতেছেন, অন্য দিকে তিনি বিশ্বসৃষ্টির মূল-শক্তিরূপে এক অখণ্ডযোগে সৃষ্টিকে বিধৃত করিয়া আছেন। এই আদ্যাশক্তি-রূপেই যোগেশ্বরী সারদা শিবের গৃহিণী, সারদা 'যোগানন্দময়ী-তনু যোগীন্দ্রের ধ্যানধন'। তিনি যেমন কবির ধ্যেয় মূর্তি তেমনই যোগীর আরাধ্যা। তিনি 'ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ',—তিনি কখনও 'বরাভয় করে', কখনও 'গেরুয়া-পরা ভীষণ ত্রিশূল-ধারী' এবং 'আলুথালু-বেশে শ্মশানের প্রান্তদেশে' নিষণ্ণা।

ধর্ম ও দর্শন-রূপে ভারতীয় শক্তিবাদ কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই; বরং তাঁহার কোন কোন লেখায় স্পষ্টভাবেই শক্তিপূজার প্রচলিত ধর্মীয় রূপটি সম্বন্ধে তাঁহার মনের অশ্রদ্ধা এবং বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ধর্মে ও সাহিত্যে শক্তিবাদের এতবড় একটা প্রভাব ঐতিহ্যসূত্রে তাঁহার মনের উপরেও কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; আমরা তাঁহার রচিত স্বদেশী-সঙ্গীতগুলির উপরে এই প্রভাব পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা ব্যতীতও দেখিতে পাই, সংস্কৃত সাহিত্যে উমা-মহেশ্বরের যে মাধুর্যমণ্ডিত বিচিত্র রূপায়ণ তাহা ভাব ও প্রকাশভঙ্গি উভয় দিক্ হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মুখ্যতঃ কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যখানিকে অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের উপরে উমা-মহেশ্বরের এই গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। শিব-শিবানীর ভিতর দিয়া অপূর্ব একটি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া যে মাধুর্য বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব-মাধুর্যকে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে চমৎকার রূপ দান করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে আমরা 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত হিমালয়-সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি। একটি কবিতায় দেখি, বিরাট হিমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে একটি পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া খুলিয়া একখানি 'সনাতন পুঁথি' পাঠে রত। সেই সনাতন পুঁথিখানিতে লেখা আছে,—

> আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
> ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা—
> নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
> কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
> বাহুর করুণ আকর্ষণে—..................।

অন্য কবিতাটিতে দেখিতে পাই, দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি শৈলে শৈলে—প্রতি শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন অভেদাঙ্গ হর-গৌরীর বিচিত্র মূর্তি বিস্তার-লাভ করিয়াছে।—

> ওই হেরি, ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
> দুর্গম দুঃসহ মৌন—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
> নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
> পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
> মহান্ দরিদ্র, রিক্ত আভরণহীন দিগম্বর।
> হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লীলা করেছে বেষ্টন—
> মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
> সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
> কোমল শ্যামলশোভা নিত্য নব পল্লবে কুসুমে

ছায়া রৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে, হিমগিরি।

রবীন্দ্র-কাব্যের বহুস্থানে সাধারণ অর্থালঙ্কার-রূপেও দেখা দিয়াছে হর-পার্বতীর এই দ্বন্দ্বময় মধুর চিত্র। যেমন—

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী।[২]

অথবা—

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।[৩]

উমা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে দেখা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কবিতায় উমা সলজ্জিত 'প্রাণবধূ'; জটাজুটধারী রুক্ষমূর্তি মৃত্যুই তাহার রুদ্রবর। এই ভাবটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ 'মরণ' কবিতাটিতে। বিভিন্ন যুগের আরও অনেক কবিতায় ইহার স্পষ্ট-অস্পষ্ট আভাস মেলে। এখানে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভাবে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনার সহিতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার ঐকমত্য লক্ষিত হয়। আমরা 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' ধৃত একটি কবিতায়[৪] পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি—সর্পমালা-সজ্জিত বিভূতিভূষণ হরকে বররূপে দেখিয়া আর সকলেই ভীত, ত্রস্ত এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—বিচলিত হয় নাই শুধু গৌরী—সে চিনিতে পারিয়াছিল তাহার দয়িতকে, হর্ষে উদ্বেল হইয়াছিল তাহার বক্ষ।

রবীন্দ্রনাথের আর-এক ধরনের কবিতায় উমা সৃষ্টির সৌন্দর্য-মাধুর্যময়ী মূর্তিতে স্মেরমুখা-রূপে দেখা দিয়াছেন। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ভাবটির চমৎকার রূপায়ণ। কবিতাটির একস্থলে দেখিতে পাই—

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।

---

[২] 'বরণ,' মহুয়া। [৩] 'সাগরিকা,' মহুয়া।
[৪] এই গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র যে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

রূপে রসে পরিপূর্ণ-যৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম-সমাহিত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্য ও নবত্বে নিত্য-নূতন করিয়া পাইতে চায় কবিচিত্ত।

ধরণীর শ্যামশোভায় সজ্জিতা মেঘকুলে কমনীয়া উমার একটি ব্যাপক এবং গভীর মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সম্বন্ধীয় গান ও কবিতা-গুলির ভিতর দিয়া। উমা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন্ কোন্ পর্যায়ে কি কি রূপে ও ভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার 'ত্রয়ী' গ্রন্থের 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথে'র আলোচনায়* বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর সেই-সব আলোচনার পুনরুল্লেখ করিলাম না, একটু-আধটু ইঙ্গিতমাত্র দিয়া রাখিলাম।

* ত্রয়ী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০১-২৯।

একাদশ অধ্যায়

ওড়িয়া শাক্ত সাহিত্য

শাক্ত ধর্ম, শাক্ত দর্শন ও শাক্ত উপাখ্যানাদি বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌতূহল জাগে, বাঙলার প্রতিবেশী সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া ওড়িয়া, মৈথিলী এবং অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্যে—এই শাক্ত প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এখানে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতেছি। ওড়িয়া সাহিত্যের আরম্ভ কিন্তু শাক্ত প্রভাব লইয়া, যদিও পরবর্তী কালের ওড়িয়া সাহিত্যে শাক্ত প্রভাব অতি ক্ষীণ,—কিছুসংখ্যক হরগৌরী-সম্বন্ধীয় লৌকিক উপাখ্যান ও গীতিতেই নিবন্ধ। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি পঞ্চদশ শতকের শূদ্রমুনি সারলা দাস। ইঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে, ইনি নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কবি, সারলা দেবীর প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ। তাঁহার 'চণ্ডী-পুরাণ' গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শুধু প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য বলিয়াই নয়, 'চণ্ডী-পুরাণে' বর্ণিত বিষয়ের অভিনবত্বের জন্যও কাব্যখানির কৌতূহলী পাঠকের নিকটে বিশেষ মূল্য আছে।

চণ্ডী-কাহিনীর ভিতরে কবিকল্পনা ও লৌকিক কাহিনীর মিশ্রণ যে কতখানি ঘটিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ওড়িয়া কবি সারলা দাসের রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' কাব্য। সারলা দাস হইলেন সারলা চণ্ডীর দাস। 'সারলা' 'সারদা' বা 'শারদা' শব্দ হইতে জাত; চণ্ডী-পুরাণে দেবীর নাম হিসাবে 'সারলা' বা 'শারলা' দুইটি বানানই পাওয়া যায়, কবির নামের বানানও 'সারলা দাস' এবং 'শারলা দাস' উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের কবিগণের ন্যায় এই কবিও স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার নির্দেশ পাইয়াছিলেন এবং 'নিশিরে প্রসন্ন তাই যাহা যে কহই। অরুণ প্রকাশে মুহ্ঁ তা সবু লেখইঁ॥' সারলা দাস নিজেকে বার বার শূদ্রমুনি বলিয়াছেন, এবং বার বার বলিয়াছেন, তিনি অপণ্ডিত নিরক্ষর। বস্তুতঃ তাঁহার রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' পড়িলে মনে হয়, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না; লোকমুখে তিনি দেবীকর্তৃক অসুর নিধনের যে-সব কাহিনী শুনিয়াছেন তাহাকে পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া একটা রূপ দান করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, সর্পভয়ে ভীত পরীক্ষিৎ রাজাই (পরীক্ষ রাজা) এই কাহিনীর বক্তা, ব্যাসসুত শুকদেব মুনিই এই সর্বাপদ-নাশিনী কাহিনীর বক্তা। এই কাহিনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি যে, যোগনিদ্রায় নিমগ্ন নারায়ণের শক্তি-স্বরূপা দেবী হইলেন 'বাক্যদেবী' বা সরস্বতী। নারায়ণ যোগবলে 'অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবীর কোলে' শুইয়াছিলেন; অত্যন্ত সুন্দর সেই ধবলাঙ্গী বাক্যদেবীকে দেখিয়া মধুকৈটভ দুই দৈত্য শৃঙ্গার আকাঙ্ক্ষায় দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। সরস্বতী দেবী বিষ্ণুর শরণ লইলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া অসুরদ্বয় নিধন করিলেন। মহিষাসুর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই শরণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রার্থনা করিয়াছিল—'প্রভুঙ্কর যোগনিদ্রা ভাঙ্গ আগে মাতা'। তখন দেবী তাঁহার বীণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেনঃ

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা।
সপতসুরেরে বীণা শুণিল অবলা॥

শেষে অবশ্য দেখি, ক্রুদ্ধ দেবতাগণের মুখজাত অনল বিগ্রহীভূত হইয়াই দেবী-রূপ ধারণ করিয়াছিল—তিনিই চণ্ডিকা। কিন্তু এই চণ্ডিকাও যখন রণোন্মত্তা হইয়া অসুরের প্রতি ধাবিতা হইলেন তখনও 'ধবল কামাক্ষী সে যে কর্পূরবরণা'।

উড়িষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও স্থানীয় প্রবাদ-কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া এই 'বাক্যদেবী'র কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতী দেবীও স্থানে স্থানে সিংহবাহনা। বাগ্-দেবীর সিংহরূপ ধারণের কাহিনী বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। বৈদিক কাহিনীর পরিণতিতেই পরবর্তী কালের মহাদেবী 'সিংহবাহনা' রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া একটি মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। পুরাণ-তন্ত্রাদিতে সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর ঐক্য বহুধা-বর্ণিত দেখা যায়।

সারলা দাসের 'চণ্ডী-পুরাণ'-বর্ণিত দেবীকর্তৃক অসুর-নিধনের কেন্দ্রে রহিয়াছে মহিষাসুর—শুম্ভ-নিশুম্ভ, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ (এখানে রক্তবীর্য) প্রভৃতি সব অসুরই মহিষাসুরের সহিত যুক্ত। মহিষাসুরই রত্নগিরিতে অবস্থিতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। এই মহিষাসুরের উৎপত্তির দীর্ঘ লৌকিক কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে। অসুররাজ কপিলসিংহের যুবতী স্ত্রী অসুররাজের শৃঙ্গারভয়ে পলাইয়া সিংহল দ্বীপে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সেখানে যমরাজের বাহন মহিষ তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া কামোন্মত্ত হইয়া তাহার সহিত 'শৃঙ্গার ভুঞ্জিল'। তখন মহিষবীর্যে অসুররাণী 'নিরখী'র গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার মানুষের দেহ এবং অসুরের মুণ্ড ('মহিষের মুণ্ড গোটি শরীর মনুষ্য')। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যে মহিষাসুরের প্রসিদ্ধি তাহার মহিষের দেহ—মানুষের মুণ্ড; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে প্রচলিত মহিষাসুরের মূর্তি হইল নর-

দেহে মহিষ-মূর্তি; মহাবলীপুরম্-এর এই-জাতীয় মহিষাসুর-মূর্তি প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে প্রচলিত গজানন, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, বারাহী প্রভৃতির মূর্তি-কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচলিত এই মহিষাসুর-মূর্তি-কল্পনারই পরিপোষক। মহিষমুখধারী একটি অসুরের প্রাথমিক কল্পনা হইতেই কি পরবর্তী কালে অসুরের মহিষ-মূর্তি ধারণের উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে?

যাহা হোক, অসুররাজ কপিলসিংহ ভার্যাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সিংহলদ্বীপে গিয়া এই মহিষাসুর পুত্রসহ ভার্যার সন্ধান পাইল। অসুররাজ পুত্রকে ত্যাগ করিলেন না, তাহাকে পালন করিয়া দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী করিয়া তুলিলেন। এই মহিষাসুর দীর্ঘকাল নিরাহারী হইয়া ব্রহ্মার বরলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ করিয়াছিল, কোনও পুরুষের হস্তে তাহার নিধন হইবে না। নারীর হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিত্তে তখন জাগেই নাই।

সারলা দাসের 'চণ্ডী-পুরাণে' সকল অসুরেরই দীর্ঘ বংশতালিকা পাওয়া যায়। তাহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, এমন কি বিবাহাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা (স্থান, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সব সহ) পাওয়া যায়। অসুরকন্যা কান্তি-মালার স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব যুদ্ধবর্ণনাই অত্যন্ত লৌকিক। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই, অসুরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া শুধু দেবগণই বার বার দেবীর শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থা পৃথিবীও বহুবার দীনা রূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। দেবী অসুরের নিকটে যে তাঁহার শক্তিরূপিণীত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক 'চণ্ডী' গ্রন্থের প্রতিধ্বনি বলিতে পারি না, অনেকটা লৌকিক। অসুরের প্রতি দেবী বলিতেছেন:

> আরে আহ্মে জাতকালে মাতা রূপ হেউঁ।
> যুবাকালে ভার্য্যা রূপে রতিরঙ্গ দেউঁ॥
> অন্তকালে হেউঁ পুণ কালিকা মুরতি।
> দহন করু সকল গেলই দহতি॥
> আদি অন্ত মধ্য আহ্মমানঙ্কর নাহিঁ।
> সমস্ত করু আহ্মকু কেহ ন জাণই॥
> জন্মকালে তুহ্মঙ্ক করীউঁ উতপন্ন।
> অন্তকালে সমস্তঙ্কু করিবু ভক্ষণ॥
> অজ্ঞান মূর্খপণে ন জাণ মন্দ বাই।
> আহ্মে যে পরম যোগিনী আদি মহামায়ী॥[১]

[১] চিন্তামণি গ্রহরাজ পাণিশর্মা দ্বারা প্রকাশিত, কটক।

যুদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারিণী রূপে বহু দেবী, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস উড়িষ্যা-অঞ্চলে তৎকালে প্রচলিত দেবী-উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দুর্গাদেবী নিজেই কেন কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কবি অত্যন্ত স্থূল লৌকিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাদেবী যখন কোন প্রকারেই মহিষাসুরকে বধ করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহার এক সহচারিণী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন :

এ বেশ ছাড়ি তু বিবসন্ রূপ ধর।
মহিমা বশ হেউ ভব দেখি তোহর॥

দেবী তাই 'বিবসনা হইলে কেশ বাস মুকুল'। বিবসনা দেবীকে দেখিতে পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল—দুর্বল মুহূর্তে দেবী তাহাকে হত্যা করিলেন।

সারলা দাসের এই 'চণ্ডী-পুরাণে'র প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত আর-একখানি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল 'বিলঙ্কা-রামায়ণ'। এই বিলঙ্কা-রামায়ণে কবি সীতাকেই রাক্ষসনাশিনী ভয়ঙ্করী দেবীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, লক্ষশিরা রাবণ তাঁহাকর্তৃকই বিনিহত হইয়াছিল।

সাহিত্য হিসাবে কবি সারলা দাসের সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল তাঁহার রচিত মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কবি বলিয়াছেন যে, সারলা দেবীর আজ্ঞায় এবং প্রসাদেই এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

শারলা চণ্ডী নাম অটই যেই দেবী।
তাহার দাস মুঁ যে সারলা দাস কবি॥
প্রসন্নে আজ্ঞা মোতে দেলে সে শাকম্ভরী।
লভ তু যশ মহাভারত গ্রন্থ করি॥
শুনিণ বুধজনে ন ধর আনমন।
নুহে পণ্ডিত মুঁহে স্বভাবে মূর্খজন॥[২]

কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে আর-কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্তকবি দেখিতে পাই না। তাহার ঐতিহাসিক কারণও রহিয়াছে। উড়িষ্যার 'জগন্নাথ'দেবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আস্তে আস্তে এমন জনপ্রিয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে শাক্তধর্ম আর কোনও জনস্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতক হইতে আবার উড়িষ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল প্রভাব পড়িল, ফলে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মই রাম-কৃষ্ণ-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহু বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। উড়িষ্যায় নাথধর্মের যে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দেখিতে দেখিতে

[২] ওড়িয়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈষ্ণবমতের মধ্যেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব সাহিত্য প্রধানভাবে গড়িয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহিত্য হইল মুখ্যভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য। ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি 'তুলাভিণা' নামে হর-পার্বতী সংবাদের একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

'তুলাভিণা' শব্দের অর্থ তুলা পেঁজা; তুলা যেমন পিঁজিয়া পিঁজিয়া ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই সৃষ্টিবিষয়ক সকল তত্ত্বকে তুলা-পেঁজার ন্যায় পিঁজিয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে (তুলনীয়—চর্যাপদ, তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু ইত্যাদি)। এখানে প্রশ্নকর্তা পার্বতী, উত্তরে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ঈশ্বর মহাদেব। ভঙ্গিটি হইল তন্ত্র ও যোগ-গ্রন্থাদির প্রসিদ্ধ ভঙ্গি, সে-সব স্থানেও পার্বতী জিজ্ঞাসু, মহাদেব তত্ত্বব্যাখ্যাকার। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও এই রীতি, ভগবতী প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা—ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের মীমাংসা। এখানে আরম্ভেই দেখি :

> পার্বতী বসি একদিনে। কহন্তি বসি শিব-সন্নিধানে॥
> হে প্রভু করুণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার॥
> তাহার তত্ত্ব মোহে কহ। যেণে খণ্ডিব ভব-মোহ॥[৩]

উত্তরে মহাদেব বলিলেন :

> কহিবা শুন গো পার্বতী। মহাশূন্যরু হেলা জ্যোতি॥
> জ্যোতিরু স্থূলরূপ হেলা। স্থূলরু বিন্দু প্রকাশিলা॥
> বিন্দুরু অর্ধমাত্রা জাত। তাতহুঁ ওঁকার সম্ভূত॥
> ওঁকার ব্রহ্মরু জগত। শুন পার্বতী দেই চিত্ত॥
> শুনি পার্বতী তোষ হেলে। ঈশ্বর-চরণে পড়িলে॥

মহাশূন্য হইতে হইল জ্যোতি, জ্যোতি হইতেই হইল স্থূলরূপ, স্থূল হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্ধমাত্রা, তাহার ওরে ওঁকার, ওঁকার-ব্রহ্ম হইতেই জগৎ।

ইহাতে আদিশক্তি পার্বতীর মনের সংশয় ঘুচিল না, ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন :

> শুন মোহর প্রিয়তমা। তোতে কহিবা তুলাভিণা॥
> আনুক ন কহন্তি মুহিঁ। তু মোর পঞ্চপ্রাণ সহি॥
> অণাকার যে জ্যোতিরূপ। সেটীরে নাহিঁ রেখরূপ॥

[৩] ওড়িয়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ধূম্রবর্ণর প্রায়ে দিশে। অন্ধকারটি সে প্রকাশে॥
ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতির্ূপরে সংহরই॥

সেখান হইতেই জন্মিল ওঁকার, ওঁকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশব্দব্রহ্ম হইতে ওঁকার-রূপ সিসৃক্ষা-স্পন্দনাত্মক শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি—তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি। পার্বতীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই ওঁকার উৎপত্তির আরও বর্ণনা দিলেন। এই ওঁকার হইতে আবার 'ক্লী' বীজ জাত হইল, 'ক্লী' হইতে 'শ্লী', 'শ্লী' হইতে 'হ্রী' জাত হইল। আবার ক্লী হইতে কৃষ্ণ, শ্লী হইতে রাম, হ্রী হইতে হর জাত হইল। ইহারাই সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ। স্ত্রী-পুরুষতত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে :

স্ত্রীরী পুরুষ এবে শুন। কহিবা তোতে বুঝাইন॥
ক্লীয়টি পুরুষ বোলাই। শ্লীয়বীজটি রাধা হোই॥
হ্রীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শুন॥
কৃ অক্ষর গোটি পুরুষ। ষ্ণটি যে স্ত্রীরীঙ্ক সদৃশ॥
রা অক্ষর স্ত্রীরী কহি। ম অক্ষর পুরুষ বোলাই॥
দুটি যে হোইলা অণ্ডির। রে অক্ষর যে স্ত্রীরী সার॥
ইত্যাদি।

কিন্তু এই তুলাভিণা ব্যতীত সমগ্র মধ্যযুগে বাঙলাদেশে যখন বহুসংখ্যক মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকা মঙ্গলাদি মংগলকাব্য রচিত হইয়াছে—তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন করিয়াই ওড়িয়া সাহিত্যে আর কোনও কাব্য-কবিতা গড়িয়া ওঠে নাই। তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য হইলেও মধ্যযুগের বাঙলা শাক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলির সহিত এক বিষয়ে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের একটা বিশেষ মিল দেখিতে পাই। বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং কালিকামঙ্গলে দেখিতে পাই নায়ক বা নায়িকা যখনই কোন মহাবিপদে পতিত হইয়াছে তখনই দেবীর একটি 'চৌতিশা' স্তব করিয়াছেন। ক-কারাদিক্রমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌত্রিশটি বলিয়া ধরা হয়; ক-কারাদিক্রমে শব্দমালার যোজনাতেই এই স্তুতি সাধিত হয় বলিয়া এই স্তুতিকে 'চৌতিশা' বলা হয়। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথমাবধিই এই 'চৌতিশা' কাব্যশৈলীর একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি। বাঙলা সাহিত্যের চৌতিশা প্রায় সবই শক্তি দেবীকে অবলম্বন করিয়া (বৈষ্ণবও সামান্য কিছু কিছু আছে); ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগের চৌতিশা দেবীকে অবলম্বন করিয়া নহে—বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার—বিশেষ করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যের এই চৌতিশার

মধ্যে আদি চৌতিশা নামে প্রসিদ্ধ 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস (?) রচিত 'কলসা চৌতিশা'; ইহা উদ্ভিন্নযৌবনা উমার সহিত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রচিত। এই 'বচ্ছাদাস' কে বা কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না; তবে 'কলসা'র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একটি পদে পাওয়া যায় বলিয়া আর্তবল্লভ মহান্তি এম. এ. মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 'কলসা চৌতিশা'কে চতুর্দশ শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'কলসা' রাগে গীত বলিয়া এই চৌতিশা 'কলসা চৌতিশা' নামে খ্যাত। প্রারম্ভেই দেখিতে পাইঃ

কহন্তি কামিনী শুন হেমন্ত দুলানি।
কাহুঁ বরে বরিলে তুম্ভর পিতামণি॥
কুল মূল গোত্রআদি নাহি জান তার।
কনক বেদীরে বুঢ়া বসিছি মধ্যর॥
খুং খুং খাস সাহাসেন পেলু অচ্ছি ধই।
খর নিশ্বাস বুঢ়ার মাথ লাগে ভুঁই॥
খণ্ডিআ যোগির সঙ্গে নাহি যান তার।
খণ্ডিআ বলদ বুঢ়া বান্ধিছি পাখর॥

অতি প্রগল্‌ভা কামিনীটি শিবের শুধু বৃদ্ধ রূপ নয়—এমন একটি জরাজীর্ণ জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা করিল যে, মহাদেবের এতখানি জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোক্‌লা দাঁত, কোটরাগত ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা, কানে খাটো গায়ে ছাইমাখা, সর্পের আভরণ,—এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গৌরীর কপালে! এ যে একেবারেঃ

ঝুলি হোই ঝিম্ভি হোই পড়ুছি ঢুলাই।
ঝিঅ কি নাতুনী প্রায়ে দিশিবু গো তুহি॥

যে রকম ঝুলিয়া ঝিমাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রাত্রিকালে এরূপ দেখিলে ত ভয়ে প্রাণই উড়িয়া যাইত! কোন্ ঠকের পাল্লায় পড়িয়াছেন হেমন্তরাজ (হিমালয়)—সেই হেতু সর্বনাশ হইল 'হেমন্ত দুলাণি'র। তপস্যা করিয়া লাভ হইল এই দিন-ভিখারী যোগী। আড়ালের ফাঁক হইতে বুড়া বর দেখিল মায়ে-ঝিয়ে; মূর্ছিত হইয়া পড়িল উমা; দাসীরা আসিয়া ধরিয়া তুলিল। থরহর বচনে উমার মা বলিল, 'মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যৌবনে কেন জীবন দিবে?' উত্তরে উমা স্পষ্ট বলিয়া দিলঃ

হুইনি করি কহুছি শুন মোর মায়ে।
দন্তে তিরিণ ধরিণ পলগই পায়ে॥

দরিদ্র হীন বুঢ়াকু যেবে মোতে দেবু।
দুই নয়নরে মোর মরণ দেখিবু॥

গোলমাল শুনিয়া গিরিরাজ নিজে আসিয়া বলিলেন, 'ধর্মপুণ্যকালে কিম্পা করুছ রোদন।' রুষিয়া গিরিরাণী বলিলেন, নিলাজ বুড়াকে করিয়াছ আমার সুন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মরিব। কথা শুনিয়া গিরিরাজ গেলেন চটিয়া, না জানিয়া-শুনিয়া যত গোলমাল। শিবের মহিমা কেহ জান?

বিচার ন কর মাএ ঝিএ দুহেঁ তুম্ভে।
বিকল মনরু ছাড় কহুঅছু আম্ভে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতাএ ছন্তি আঙ্কু বেঢ়ি।
বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পুণ্যে অছি বাঢ়ি॥
ভাল পটে লেখন যা করিছি বিধাতা।
ভল ভাগ্যবন্ত গৌরী আম্ভর দুহিতা॥

তখন লাগিয়া গেল বিবাহের যত হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি। একটি একটি করিয়া মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনুষ্ঠান। সজ্জিত করা হইল গৌরীকে বিবিধ রত্নে, বস্ত্রে, অনুলেপনে, তাহার পর 'বরকু সে দশজন তোলি বসাইলে'। কিন্তু হুড়োভিড়ে বুড়া বর একেবারে 'খাসু খাসু গলা মূর্ছা—কাশিতে কাশিতে মূর্ছাই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়া গেল, দেবতারা যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জুয়াখেলা আরম্ভ করিলেন, তাহার পরে মধুশয্যা। তখন কিন্তু 'শোভা পাউছন্তি দুহেঁ রতি কামদেব'।'

হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দেখি।
হাস্য করুছন্তি সহী সঙ্গাতুণী দেখি॥
সকলে চউটি সারি কাদখেলি গলে।
ছ সাত অষ্টমঙ্গলা উচ্ছব শারলে॥
ক্ষিতিপতি ঠাকুর সে কপিলা সে স্থিতি।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি বচ্ছাদাস কলসা পড়ন্তি॥[৪]

হর-গৌরীকে লইয়া এই-জাতীয় কিছু কিছু কবিতা ওড়িয়া লোক-সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডক্টর কুঞ্জবিহারী দাস-সম্পাদিত ওড়িষ্যার 'পল্লীগীতি সঞ্চয়ন' প্রথম ভাগে গ্রাম্য কৃষকরূপে হর-পার্বতীর একটি চিত্র দেখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ করিতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল অতি সকাল সকাল শিবের জন্য মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া। মাঠে খাবার লইয়া যাইতে

[৪] শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি-সম্পাদিত, গদ্য-পদ্যাদর্শ, প্রাচী গ্রন্থমালা।

পার্বতীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একটু মেজাজ চড়িয়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁটিঃ

রাত্র থাউ' থাউ' উঠিলে পার্বতী।
যমুনা নদীরে স্নাহান করন্তি॥
সিয়ালি পত্তর পঞ্চগোটি দনা।
আম্ব-নিম্ব করি বাঢ়িলে ঘোটনা॥
পাট পিন্ধি পাট উপুরণ ঢেলে।
চন্দ্রাবলী পাট চিমুলা বোঢ়িলে॥
ঘোটনা ধরি পার্বতী বউল মোলে ঠিয়া।
তা দেখি ঈশ্বর হল কলে ঠিয়া॥
"কিল ঘোটনা উছুর।"
"জান না কি প্রভু পিলাঙ্ক জঞ্জাল?"
পদে হেউ অধে ল্যাগিলা মহা গোল।
ঈশ্বর ধইলে পার্বতীঙ্ক বাল॥
ছিড়ি জিব নখে কি চউ'রী।
দুসুরি চিনা মাল যে॥

পার্বতী কাজে কিছু অবহেলা করেন নাই, রাত্র থাকিতে থাকিতেই উঠিয়া গিয়া যমুনা নদীতে স্নান করিয়া আসিয়াছেন। সিয়ালি-পাতা দিয়া পাঁচটি 'দনা' (ঠোঙা) তৈয়ারি করিয়া নিলেন—তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম, নিমের সব খাবার। একখানা শাড়ী পরিলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন—আর-একখানা দিয়া মাথার 'বিড়া' করিয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী একটি বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীকে দেখিয়া শিবঠাকুরও তাঁহার হাল থামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাড়ি করিলেও সব জোগাড়যন্ত্র করিয়া বাহির হইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, শিব চটিয়া গিয়া বলিলেন,—'কি গো খাবার আনিতে এত দেরী কেন?' সব মাতারাই এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে অছিলা দিয়া থাকেন মা পার্বতীও উপস্থিত-মতে তাহাই করিলেন, তিনি বলিলেন,—'জান না কি প্রভু বাচ্ছাদের জঞ্জাল?' কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধান্বিত শিব কি আর ঐ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাগিয়া গেল,—শিব খপ করিয়া ধরিলেন পার্বতীর চুল। খোঁপার ফিতা ছিঁড়িবার উপক্রম—'দুসরি (দু-ফেরতা) চিনা মালা'ও ছিঁড়িবার উপক্রম! কৃষক-কৃষাণীর একটি নিখুঁত বাস্তব ছবি!

ডাঃ কুঞ্জবিহারী দাস-সঙ্কলিত 'পল্লীগীতি সঞ্চয়নে'র দ্বিতীয় ভাগে আর-একটি হর-গৌরী উপাখ্যান দেখিতে পাই ওড়িষ্যাবাসীদের আর-একটি সাধারণ সমস্যা লইয়া। সমুদ্রের কূলেই অনেক পল্লী, সমুদ্রের তীরের বালি বাতাসে

উড়িয়া আসে—কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির ঘরগুলি 'বালু'তে 'পোতা' হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যদি এ বিষয়ে সর্বদাই অবহিত হইয়া বালি সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই উপায়, নতুবা বিষম বিপদ। শিব ত ভোলানাথ পুরুষ—বাড়িঘরের কোনও খোঁজখবরও রাখেন না, এদিকে বালু পড়িয়া পড়িয়া ঘরের ত 'পোতা' হইবার অবস্থা।

দিনকু দিন বালি অগোচর।
দিনকু দিন বড়ই অপার॥
পাচেরী ডেঁই পাট অগনারে।
পাদ পাদ করি ফুরে গম্ভীরারে॥
খরাবেলে বালি পিটই ঝাঞ্চি।
চালুথিলে গোড় পড়ই ভাজি॥

দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য! বাড়ির লোকজনও সব পার্বতীর নিকট অভিযোগ জানাইতে লাগিল, নিজেরও দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খেপিয়া গেলেন, মুখ নীচু করিয়া রুষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, আর দাসীদের বলিয়া দিলেন—'আজ আর আমার ঘরে খাবার হইবে না।'

এতেক বিচারি দেবী পার্বতী।
রুষি বসিথান্তি বদন পোতি॥
দাসীঙ্ক বোইলে হর-ঘরণী।
আজি মো পুরে নোহিব ঘটনি॥

ইতিমধ্যে শিব বাড়ি আসিয়া উপস্থিত—কাষায় কৌপীন, বিভূতি ভূষণ, হাতে অমৃতের হাঁড়ি, বৃষভে চড়িয়া দেব ত্রিলোচন ধীরে সুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত করিলেনই না, বরঞ্চ অন্যদিকে কোপ করিয়া ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

কোপে গউরা বসিছন্তি হটি।
লোকনাথঙ্কু ন অইলে পাছোটি॥

ত্রিলোচন বুঝিলেন, কিছু একটা ঘটিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় কি শিবের তাহা জানা আছে, তিনি নানাপ্রকার চাটুবাক্যে গৌরীর ক্রোধবহ্নিতে শীতল জল ঢালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিব বলিলেনঃ

কি লো গউরি তোর বিরস মন।
কি অবা ন দেলি ধন বসন॥
জগত্রতারিণী সৃষ্টি করতা।
মৈষমরদিনী গিরি-দুহিতা॥

অসুর সংঘারি রখিছু সৃষ্টি।
সবু দেবতা কলে পুষ্যবৃষ্টি॥
সবু দেবতাই চরণে তোর।
বর দেইগলে অমরপুর॥
সুরতি রজাঙ্কু সুদয়া করু।
সকল সঙ্কটু উদ্ধরি ধরু॥
অন্ধ মাগিলে দেউ চক্ষুদান।
অপুত্রি লোককু দেউ নন্দন॥
দরিদ্র লোককু কুবের করু।
রখিলে দুব গছ করু দারু॥
কাহিঁকি বসিছু মউন হোই।
তোর বুদ্ধি কি ত উপায় নাহিঁ॥

এইরূপে ত্রিলোচন যখন বহুত চাটুবাক্য বলিলেন তখন গৌরী প্রসন্না হইলেন; ঘনশ্বাস ছাড়িয়া বামচক্ষু ডলিয়া মুখ তুলিয়া অভিমানের সুরে অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন শিবের কাছে,—মনের কথা সবই তোমার গোচর, তবু কেন এত ছাঁদ? দূরের লোকে কত বেদনা জানায়—তাহাদের নিস্তার কর, কিন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু রঙ্গ-রস করিয়া দিন কাটাইতেছ। ঘরের কথায় কিছুই লাগ না, বালি পড়িয়া পুরী এখন 'পোতা' হইবার উপক্রম তাহার খোঁজ রাখ কি? পার্বতী অভিমানে বলিলেনঃ

সবু চঢ়েইর দেখ বরত।
বসা খোজুথান্তি অনবরত॥
বসা ন থাউ সে কেউঁ বেবস্থা।
তুমু সিনা কিছি ন লগে চিন্তা॥

বনের যত পাখী—তাহাদেরও দিনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে। বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা? এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা।

পার্বতী এইখানেই থামিলেন না, আরও ঘা দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন, ধিক্কার দিতে লাগিলেন নিজের নারীভাগ্যকে; বলিলেন, এমন বর কেন জুটিল আমার কপালে—চিরদিন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পরিয়া ফলমূলাহারে অরণ্যে বসিয়া রাত্রিদিন বরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহার ফলই এই ফলিয়াছে!

এতটা আবার শিবের সহ্য হইল না, বলিলেন—আমার ঘরে পড়িয়া তোমার এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবেঃ

কটাল হেলা গো শ্যাম নৃপতি।
তাহারি কিম্পা নোহিলু যুবতী॥

সর্বাঙ্গে হুঅন্তু রত্নভূষণ।
মোঠারে দেবী পাইলু কষণ॥
কহিবু যেবে হাতপত্র দেবা।
অন্য বর বাছি হুঅ লো বিভা॥

কোটাল হইয়াছে শ্যাম-নৃপতি, কেন তাহার যুবতী হইলে না? সর্বাঙ্গে রত্নভূষণ থাকিত, আমার কাছে শুধু কষ্ট পাইলে। যদি বল ত হাতপত্র (বিবাহ-বিচ্ছেদের পত্র) দিব, তখন অন্য বর বাছিয়া বিবাহ করিও।

শুনিয়া দেবী লজ্জিতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বলিলেন, বালি বালি করিয়া চিন্তা করিতেছ, বালির ব্যবস্থা আমি কালই করিব। সকল সেবককে শিব ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন,—দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ করিয়াছেন, বালির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা—

টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা।
বালি বোহিবাকু যেহু শকতা॥
সিংহ দুয়ারু পোখরী সরি কি।
বালি বোহি যিবা দিন চারি কি॥

"টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা"—যাহাতে যাহাতে করিয়া বালি বহন করা যায় সব লইয়া আসিয়া সিংহদুয়ার হইতে পুকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারির মধ্যে সব বালি সরাইতে যাইব। শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে স্নান সারিয়া এবং যাহার যাহা কিছু নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি করিয়া জড় হইল। কড়া লাগিল না কড়ি লাগিল না—দেখিতে দেখিতে সব বালি পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগিলঃ

ভোগ পাঅন্তি ঈশ্বর-পার্বতী।
ভোগ সারি করি কলে ভোজন॥
ভোজন সারি কলে আঞ্চমন।
তহুঁ চঢ়াইলে বিড়িয়াপান॥
বিড়িয়াপানকু খট সুপাতী।
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী॥
হর-পার্বতীঙ্ক পদে শরণ।
দোষ ক্ষমা কর সৃষ্টি কারণ॥
গাইলা লোকঙ্কু বৈকুণ্ঠ বাস।
শুনিলা লোক পাপ যিব নাশ॥

হর-পার্বতীর এই লীলা-শ্রবণে আমাদেরও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ বর্ধিত হোক।

দ্বাদশ অধ্যায়

মৈথিলী শাক্ত সাহিত্য

বাঙলার অন্যতর প্রতিবেশী সাহিত্য মৈথিলীতে শক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া অনেক রকম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ ধর্ম-সংস্কৃতিতে একটি ঐক্যবন্ধ জনপদ ছিল এবং এই অঞ্চলটি তন্ত্র-সাধনা ও শক্তি-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। বাঙলা-সাহিত্যের পরে শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মৈথিলীতেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আমরা মিথিলায় শাক্ত-প্রভাবের প্রমাণ পাই। পুরাণতত্ত্ববিদ্ ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পুরাণোক্ত নরকাসুরের উৎপত্তি মিথিলায়। কালিকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, নরকাসুরকে বিষ্ণু কামরূপে (কিরাত দেশে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কামাখ্যা দেবীর সেবক হইয়া থাকিতে বলিলেন খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক—এই কালে কামরূপ এবং মিথিলা উভয় দেশেই শাক্ত-ধর্মের প্রচার হইয়াছিল মনে হয়। বিহারের সর্বশ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শাক্ত-ধর্মের প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কলিকাতাস্থিত কালীঘাটের কালী (কালী কলকত্তেওয়ালী) এবং কামরূপের কামাখ্যা ইঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রিগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিহারবাসিগণের।

শিব, শক্তি ও বিষ্ণু—এই তিন দেবতাই হইলেন মিথিলার জনপ্রিয় দেবতা। উচ্চবর্ণের মৈথিলী হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন দিয়া থাকেন তাহাও এই শিব, বিষ্ণু ও শক্তিরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে-বাঁয়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালম্বি তিনটি শ্বেত চন্দনের রেখা বিষ্ণুর দ্যোতক এবং রক্ত-চন্দন বা সিন্দুরের বিন্দুটি হইল শক্তির দ্যোতক।[১] মিথিলার বহু পরিবারেই 'গোসাউনিক ঘর'[২] দেখিতে পাওয়া

[১] "The simultaneous threefold marks on the forehead of the Brahmanas represent this characteristic of the Maithilis: the three horizontal lines of the sacred ashes represent their devotion to Shiva, the vertical white sandal paste represents their faith in Vishnu, and the dot of red sandal paste or of vermillion represents their veneration for Shakti."—Dr. Jayakanta Mishra, *History of Maithili Literature*, Part I, p. 19.

[২] গোসাউনী = গোস্বামিনী = দেবী; শিব হইলেন গোস্বামী = গোসাঁই।

যায়। এখানকার প্রতিষ্ঠিতা দেবী হয় ভদ্রকালী, না হয় তারা বা দুর্গা, অথবা দেবীর অন্য কোনও মূর্তি। বহু গৃহী উপাসক শক্তিমন্ত্রে পারিবারিক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিথিলায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ শক্তিতীর্থও রহিয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুণ্ডাস্থান এবং জনকপুর অতি প্রসিদ্ধ। বর্ণপরিচয়ের পরে মৈথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকটি মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইল—

সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥

বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মৃন্ময়ী দেবীপূজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক সমপরিমাণে না হইলেও মিথিলাতেও এই সময় মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। এই সকল ব্রাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহ ও পরিবারের কল্যাণ-কামনায় চণ্ডীপাঠ করেন। দশহরা মিথিলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘ মাসে মিথিলায় 'পাতড়ি' উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারীগণকে ক্ষীর (পায়স) খাওয়ান হয়। ব্রজ-অঞ্চলে আশ্বিন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা'; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একটি অঙ্গ। মিথিলায় যে-সকল আলপনা অতি জনপ্রিয় সেই-সব আলপনা তন্ত্রের 'যন্ত্র' হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে আমরা নানা দিক হইতে মিথিলায় একটা ব্যাপক শাক্ত-প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

কবি বিদ্যাপতির সময় হইতে আমরা হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া একরূপ মঙ্গলগীতির জনপ্রিয়তা দেখিতে পাই। সঙ্গীতগুলি মুখ্যতঃ লোক-সঙ্গীত। কবি বিদ্যাপতির নামে যে সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত আছে তাহারও অধিকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত। গানগুলি মুখ্যতঃ হর-গৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গার্হস্থ্য-জীবন সম্পর্কিত। এইগুলি বিবাহকালে মঙ্গল-সঙ্গীত রূপে এখনও মিথিলায় গীত হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির হর-পার্বতী-বিষয়ক কিছু কিছু গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এখানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার-কর্তৃক সংকলিত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এই-জাতীয় আরও কিছু কিছু গান লইয়া আলোচনা করিতেছি। একটি পদে গৌরী-অভিলাষী যতিবেশধারী শিবকে দেখিয়া মাতা মেনকা বলিতেছেন—

এতএ কতএ অএল জতি গৌরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি ডরব দেখি সাপে॥
তোড়ব মোয়' জটাজূট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান জতি হোএত অপমানে॥

তীনি নঅন হর বীসম জর দহনু।
উমা মোরি নবনি হেরহ জনু॥
ভনই ৱিদ্যাপতি সুন জগমাতা।
ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা॥—৭৭৬ সং

'এখানে কোথা হইতে আসিল যতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডরিবে। আমি ছিঁড়িয়া দিব জটাজুট, ফুড়িয়া দিব ঝুলি; হটাইলে যদি না মানে যতি, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! তিন-নয়ন হর, (তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি জ্বলে; উমা আমার নবনী-কোমল—যেন না দেখে। বিদ্যাপতি বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত—ত্রিভুবনের দাতা।'

কিন্তু মেনকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যতি নিজে উমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভাব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা বিস্মিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

এ মা কহএ মোয় পুছোঁ তোহী।
ওহি তপোৱন তাপসি ভেটল
কুসুম তোরএ দেল মোহী॥
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জাঁহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
বইসলি রহলি জাঁহা॥
গরা গরল নয়ন অনল
সির সোভইহি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজএ
এহে আএল তপসী॥
সির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
ৱিভূতি কএল ফোটা॥
ন ৱিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা॥—৭৭৭ সং

'এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ওই তপোবনে এক তপস্বী দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে। অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে যত ছিল যাহা; আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে

দেখিল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া এখানে আসিল তপস্বী। শিবের সুরসরিৎ (গঙ্গা) কপালে ভ্রমিতেছে, হাতে একটি কমণ্ডলু, বৃষভে চড়িল, আসিল দিগম্বর, বিভূতি (ভস্ম) দিয়া করিল ফোঁটা। না (কহে) বিদ্যাপতি, স্বামীর নিন্দা করিও না গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর—ভুক্তি-মুক্তি-দাতা।'

বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী-বিষয়ক এই গানগুলি করিবার একটি বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে। গানগুলির ভিতর দিয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা। সে আদর্শটি হইল এই, স্বামী বয়সে একটু বেশি হোক, দরিদ্র হোক, দেখিতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পরিচ্ছদে আভরণে সজ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোত্রহীন হোক—তথাপি স্ত্রীর লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আন্তর ঐশ্বর্য; সেই ঐশ্বর্য যদি তাহার থাকে তবে সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমা-মহেশ্বরের সকল কাহিনীর বিবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কবিকল্পনাকে নাড়া দিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা যখন দেখিল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর দিয়া এই ভারতীয় আদর্শটি স্পষ্ট মূর্তিলাভ করিয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ক গানই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর-এক প্রকাশ রাম-সীতার মধ্যে, এইজন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরী না হয় রাম-সীতাকে লইয়া। বিদ্যাপতির এই পদগুলির মধ্যে দেখি, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় পাইলেন, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একটু দ্বিধাগ্রস্তা হইলেন; কিন্তু একটু পরেই দেখি—

> জোগিয়া মন ভাৱই হে মনাইনি।
> আএল বসহা চঢ়ি বিভূতি লগাএ হে।
> মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে॥
> সুন্দর গীত অজর পতি সে নাহে।
> চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে॥—৭৭৮ সং

'হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বৃষভে চড়িয়া—বিভূতি লাগাইয়া, মন আমার হরিয়া লইল ডমরু বাজাইয়া। সুন্দর গাত্র, অজর (জরারহিত) পতি, সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না—কিছু 'টোনা' (মন্ত্রতন্ত্র) নিশ্চয়ই জানে!'

ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যেরূপ যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরূপ বিস্তার দেখিয়া আসিয়াছি—ঠিক সেই রূপই। সেই ডমরু-হস্তে ভস্ম-বিভূষিত রূপ! বর আসিলে সবাই ধাইয়া চলিল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যত্রও যাহা এখানেও

ঠিক তাহাই—

পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি।
নাগ কয়ল ফুফুকার দূরহ পড়াইলি॥
এহন উমত বর কেকর উর বিসধর।
গৌরি বরু রহথু কুমারি করব বর দোসর॥—৭৭৯ সং

'স্ত্রী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্ ফোঁস্—সকলে দূরে পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার?—বক্ষে বিষধর! গৌরী বরঞ্চ কুমারী থাকুক—অন্য বর করাইব।'

পরের পদেও দেখি মেনকা সখেদে বলিতেছেন—

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে॥
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউনী তোহ ন জোগ বর॥
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী॥
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী॥
ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটৱাসী॥—৭৮০ সং

'মঙ্গল সাজাইলাম সিন্দুর ও পিটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সঁপিলাম—তুমি সাজিয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে দিগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈশ্বরীর তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে কি করিবে? সসম্ভ্রমে তোমার নয়নে নেহারিবে, হিমগিরি দুহিতা কি করিয়া সহিবে অগ্নি? ভালে জ্বলিতেছে নয়নানল রাশি, ঝলসিয়া যাইবে গৌরীর মুকুট, জ্বলিয়া যাইবে পট্টবাস।'

পরের পদটিতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ। জটাজুট ঝুলাইয়া বলদে চড়িয়া আসিয়াছেন বর, কে বর—কে বরযাত্রী কিছুই বুঝিবার উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢৌকন! বিবাহের অন্য আচার-বিধি কিছুই মানেন না—শুধু পাশা খেলা—আর সাপ লইয়া হুটোপুটি। শুধু কি তাই?—

খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥—৭৮১ সং

'খিরি (পরমান্ন) খায় না হর—গাঁজাতেই অক্সান (গাঁজা পাইলেই হইল)। এমন উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল?'

ভোজপুরিয়া লোকসঙ্গীতেও আমরা বৃষবাহনে বৃদ্ধ বর শিবকে দেখিয়া মা মেনকার এইরূপ খেদোক্তি দেখিতে পাই। সেখানে দেখি মেনকা বলিতেছেন, এমন 'বাউরা' বরে তিনি কিছুতেই তাঁহার 'গউরা'র বিবাহ দিবেন না। শ্রীদুর্গাশঙ্করপ্রসাদের 'ভোজপুরী কে কবি ঔর কাব্য' বইখানিতে এই গানটি দেখিতে পাই—

বঁসহা চড়ল সিৰ কে অইলে বরিঅতিয়া রাম।
ডেরালা জিঅরা অংগৰা লপেটলে বাড়ে সাঁপ॥
এ ডেরালা জিঅরা॥
অংগৰা ভসূত সোভে গলে মুণ্ডমালা রাম
ডেরালা জিঅরা, নাগৰা ছোড়েলে ফুফুকার॥ এ...॥
মন মেং ৰিচারে মৈনা গউরা অতি সুন্দর রাম।
ডেরালা জিঅরা, বরৰা মিলেলে বউরাহ॥ এ...॥
নারদ বাবা হম কাহীরে বিগরলী রাম।
ডেরালা জিঅরা করৰা খোজেলে বউরাহ॥ এ...॥
অইসন বউরহৰা সে হম 'গউরা' না বিঅহবো রাম।
ডেরালা জিঅরা, বলু 'গউরা' রাইহৈং কুআঁরি॥ এ...॥

ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল রসিকতার আমদানি দেখিয়া আসিয়াছি মৈথিলী বিদ্যাপতিও সেখানে কোনও ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেন নাই।—

জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সংপুন জনি সসধর উগল সময় সাঁঝ॥
চৌদহ ভুঅন সিৰ সোহাওন গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি আএল জনি জম্ভারি॥
হেমত সরির পুলকে পুরল সফল জনম গোরি।
হরি ৰিরঞ্চি দুহু জন বৈসল হরকে দেল মোয়ং গোরি।
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাৱথি আওর কতন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামিনি সবে সবে দেঅ গারি॥
ভন ৰিদ্যাপতি গৌরি পরীণয় কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি বসন ঠাম নড়াএ॥—৭৮২ সং

'যখন শঙ্কর গৌরীকে করে ধরিয়া আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের সম্পূর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভুবনের শোভাকারী শিব—গৌরী রাজকুমারী; দেখিয়া মন্দাকিনী হরষিত হইলেন—যেন জম্ভারি (ইন্দ্র) আসিলেন। হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর পুলকে পুরিল,—সফল আমার জন্ম; হরি বিরিঞ্চি দুইজনে বসিলেন, হরকে দিলাম আমি গৌরী। নারদ তম্বুরায় মঙ্গল

গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কামিনীরা কৌশলে সকলে সকলকে (পরস্পরে) গালি দেয়। বলিতেছে বিদ্যাপতি গৌরী-পরিণয়, কহা যায় না; সাপের ফোঁস্‌ফোঁসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফেলিয়া।'

বিবাহের পরে শিব শ্বশুরবাড়িতেই গৌরীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, সৃষ্টিছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের নৃত্যভূমি গেল ভিজিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া হর পড়িয়া যান পিছলাইয়া; তুলিয়া ধরিতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফোঁস করিয়া।

গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূমি। পিছরি খসল হর ঘুমি ঘুমি॥
অবলম্বনে গৌরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফণি উঠ ফাঁফএ॥—৭৮৩ সং

ইহার পরে সম্ভোগ-বর্ণনা। সংস্কৃত কবিগণও এ-ক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন নাই, বিদ্যাপতিও মানেন নাই। তবে হর-গৌরীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অনেক সংযত। 'অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে চলিলেন ভবানী। জাতি যূথী আর বেলপাতা তুলিলাম আমি,—উঠ হে মহাদেব, প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পার্বতীকে) দেখিলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে মদনে পীড়িতা হইলেন গৌরী। করতল কাঁপিতে লাগিল—ছড়াইয়া পড়িল কুসুম, বিপুলপুলক তনু—বসন দিয়া ঝাঁপিলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে!'

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী॥
জাহি জুহি তোড়ল মোয়ঁ আওর বেলপাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ় গেল পরাতে॥
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝাঁপউ॥
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে॥

কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি। গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া—গৌরী পথে বাহির হইলেন সন্ধানে। এই-জাতীয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।[০]

এত ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপতি পুত্র-বিবাহের একটি চমৎকার ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স

[০] এই গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা। আলোচনায় দেখি—

আনে বোলব কুল অথিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন॥
তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ িআহ উপাএ॥
ভল শিব ভল শিব ভল বেরহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার॥
হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেরি হোহ অগেয়ানী॥
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী।
হুহিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী॥
এত শুনি কার্তিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ॥
নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥

'অন্যে বলিবে কুল হীন ছিল, তাই (কার্তিক) এতদিন কুমার (অবিবাহিত) ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা করিতেছ না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা নাই, ছেলে রইল কুমার (অবিবাহিত)। হাসিয়া হর বলিলেন, শোন ওগো ভবানি,—জানিয়া শুনিয়াও কি করিয়া দেবি হও অজ্ঞানী? দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরি, খুঁজি কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার মিলিতেছে না। ইহা শুনিয়া কার্তিকের মনে হইল লাজ—হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব; তোমরা কোন্দল করিও না, আমার শপথ।'

পুত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্ততঃ তৎকালের জন্য থামিয়া গেল।

বিদ্যাপতি-রচিত এই হর-পার্বতী-সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্-ভাবে বিচার করিলে চলিবে না; পূর্বেই যে আমরা মিথিলায় শাক্তধর্ম ও সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছি। বিদ্যাপতির গানগুলিকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর-পার্বতী-সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয় গান মিথিলায় পরবর্তী কালে নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বিদ্যাপতি মিথিলার সিংহ-রাজবংশীয় ধীর সিংহের (ভৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামে সকল পুরাণ-তন্ত্রস্মৃতি অবলম্বন করিয়া একখানি দুর্গাপূজা-বিধি প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপতির পূর্ব হইতে মিথিলায় মৃন্ময়-দুর্গাপূজার একটা জনপ্রিয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সী

মহাশয় তাঁহার 'মিথিলাভাষাময় ইতিহাস' গ্রন্থে পণ্ডিত আঁখী ঝা নামক তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মিথিলার কর্ণাট রাজগণের গুরু শক্তি-উপাসক সিদ্ধ কামেশ্বরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে (?) তহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থের রচয়িতা লোচন শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

জয় জয় জয় নত সতত সিরঙ্করি পরিহিত নরসিরমালে।
লম্বিত রসনি দসন অতি ভীষন রসন মিলল বঘ ছালে॥
চৌদিস' মানুস মাঁসু মুদিত অতি ফেরু ফুকর কতরাসে।
মনিময় রিরিধ রিভূষনে মণ্ডিত রোদি রিদিত তুঅ রাসে॥...
রিমল বালররি মণ্ডল সন তুঅ তীন নয়ন পরগাসে।
অসুররুহির মদিরামদ মাতলি রদন অমিয় সম হাসে॥
তুঅ অনুরূপ সরূপ বুঝিঅ নহি তৈঅও তোহর গুন গাউ।
এেকহি তুঅ পদবন্ধ করিঅ দেখি নিএগনে 'লোচন' লাউ॥[৪]

এই গানে বর্ণিতা দেবী হইলেন কালী। আমরা বাঙলা শাক্ত পদাবলীতে কালীর যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি এই বর্ণনার সহিত তাহার বেশ মিল আছে।

নেপালে যাঁহারা মৈথিলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত মৈথিলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুস্তকাগারে রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রচিত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শক্তি সম্বন্ধে। তাঁহার মতে শক্তি স্বতন্ত্রা এবং পরমতত্ত্ব—অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মাত্র।—

জয় নগনন্দিনি, রাহনি মৃগরাজ।
অনুখন সেরয় রিধি-সুররাজ॥

তাঁহার একটি গানে প্রপত্তির ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

হে দেবি শরণ রাখ ভরানি।
মন রচ করম করও মান কিছু
সে সবে তু আপদ জানি॥
হমে অতি দিনখীন তুঅ সেরা
রাখ হরি যজন ঠানি।—

[৪] পণ্ডিত বলদেব মিশ্র-সম্পাদিত রাজতরঙ্গিণী, পৃঃ ৯৯-১০০।

অভি(বি)নয় মোর অপরাধ সম্ভব
মন জনু রাখহ আনি॥
অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে
গুণ রসমক সে বাণি।
তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস
জনমে জনম এহো ভানি॥[৩]

নেপালের রাজা জগৎপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্লও শাক্ত সংগীত রচনা করিয়াছেন।

হর-গৌরীকে অবলম্বন করিয়া নেপালে এবং মিথিলায় মৈথিলী ভাষায় অনেক নাটক রচিত হইয়াছে।[৪] নেপালের জগজ্জ্যোতির্মল্ল 'হর-গৌরী-বিবাহ' (১৬২৯ খৃীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের জিতামিত্র মল্ল 'ভারত-নাটকম্' রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তু হর-গৌরী। বংশমণি ঝা 'গীত-দিগম্বর' (১৬৫৫ খৃীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গৌরী কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই নাটকের পুঁথি নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কবি 'গৌরী-স্বয়ম্বর' নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাঙ্ক নাটকের ন্যায়। নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৈথিলী গান আছে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' তপস্যারত গৌরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বটুবেশধারী শিবের আগমন ও গৌরীর সহিত শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক—ইহাই এখানে মুখ্য বিষয়। শিবনিন্দা শুনিয়া গৌরী বটুব্রাহ্মণকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিলে শিব স্বমূর্তি ধারণ করিয়া গৌরীকে বলিলেন—

হে সখি সবহু সুনৈ ছিঅ গারি। ককরহু তহ নহি হোইছনে বারি॥
অসত রচন কহনে অনুতাপে। বড় জন নিন্দা সুননহু পাপে॥
হিনকা কহিঅনু জাথি ফিরি গামে। নহি তেঁ হমহি তেজই ছিঅ ঠামে॥
ঈ করি চরণ উঠাওল জানি। ধয়ল জটিল কর তরলি ভবানি॥
কহলহি শংকর হমরে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম॥
এতবা সুনি গৌরী হরসিত ভেলি। তহি খন তপ তেজি মন্দির গেলি॥
সুকবি লাল নে থির রহ কাল। সুদিন সদাশিব ভেলাহ দয়াল॥

'হে সখি, শুনিয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নিবারিত হইতেছে না। অসৎ বচন বলিলে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইঁহাকে বল গ্রামে ফিরিয়া যাইতে; না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিতেছি। এই কহিয়াই চরণ উঠাইলেন; জটাধারী চঞ্চলা ভবানীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, আমারই

[৩] অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম. এ.-র সংগ্রহ হইতে।
[৪] এ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া গৌরী হরষিত হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মন্দিরে গেলেন। সুকবি লাল বলিতেছেন, কাল স্থির থাকে না, সুদিনে সদাশিব দয়াল হইলেন।'

'গৌরী-পরিণয়' নামে শিবদত্ত-রচিত একখানি নাটক আছে। এখানেও দেখি, গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দেখিতে পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরীর প্রাণে প্রেম সঞ্চার হইল, গৌরীর আর ঘরে ফিরিয়া যাইবারও ইচ্ছা রহিল না—

আহে সখি বাঢ়ল শিৱক সিনেহ, গেহ নহি জাএব হে।

কুমারী নারীর প্রেমনিবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগুলি গান দেখা যায়। এই গানগুলি স্থানে স্থানে রাধার প্রেমনিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাহ্নারাম দাসের 'গৌরী-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগুলি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রীতিতে লিখিত। এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছ্রতা সাধন করিতেছেন। একস্থানে দেখি শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন বনে ফুলের অন্বেষণ করিতেছেন—

ভমি ভমি ৱিপিন তোড়ল দল ফুল। অনেক কুসুম দল ছোড়ি অড়হুল॥
বেলি চমেলি কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রীদল তাকি অংগার॥
ধূপ দীপ নৈৱেদ কর তূল। পূজিঅ সদাশিৱ হোথি অনুকূল॥
করব কঠিন ব্রত গৌরি ত্রিকাল বরিঅ আব হর দীন দয়াল॥

আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসম্ভবের বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশ্বরী-নাটক' রচনা করিয়াছেন। কবি হর্ষনাথ ঝার 'মাধবানন্দ নাটকম্'-এও প্রথম গীতিটি হইল দেবী সম্বন্ধে।—

জয় জগজননী জয় জগজননী দেহু সুমতি মৃগপতি গমনী।
সরসিরুহাসন ৱিপদৱিনাশনকারিণি মধুকৈটভদমনী॥
তুঅ গুণ নিগম অগম চতুরানন কহি ন সকত কত সহস্রফণী।
অমরনিশাচরদনুজমনুজশিরচিকুরকলিতজিতরকতমনী॥
তুঅপদযুগল সরোরুহ মধুকর হর্ষনাথ কৱি সরস ভনী॥[৭]

হর্ষনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে ক'টি গান আছে. তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ। যেমন—

নৱল জলদ মঞ্জু ভাস,
জৱলিত প্রেত ভূমিৱাস
মুণ্ডমাল অতি বিল্লাস ৱিপদহারিণী।

[৭] অমরনাথ ঝাঁ, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী।

তীন নয়ন অরুণ বরণ,
বিশ্ববর্য্যাপি সলিল সরন,
ললিত ধবল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইত্যাদি।[৮]

উপরি-উল্লিখিত নাটকগুলি ব্যতীত মৈথিলীতে হর-গৌরী বিষয়ে বা শুধু দেবী-বিষয় আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছে। লাল দাস 'সাঙ্গ-দুর্গা-প্রকাশিকা' নামে সংস্কৃত দুর্গা-সপ্তশতীর (চন্ডীর) একটি মৈথিলী অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 'শম্ভু-বিনোদ' ও 'গণেশ-খন্ড' নামেও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গুণবন্তলাল দাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে অনুসরণ করিয়া 'গৌরী-পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। ঋদ্ধিনাথ ঝা-রচিত 'সতী-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য। গণেশ্বর ঝা রচনা করিয়াছেন 'দেবী-গীতা'। আধুনিক মৈথিলী কবি চন্দা ঝার 'গীত-সপ্তশতী'তে ও 'সঙ্গীত-সুধা'তে[৯] হর-গৌরী-সম্বন্ধে অনেক গান আছে। চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও শিব-শক্তি লইয়া রচিত গীতসমষ্টি। তাঁহার 'চন্দ্র-পদ্যাবলী'তেও[১০] শিব-শক্তি-সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা-কর্তৃক সম্পাদিত 'গণনাথ-বিন্ধ্যনাথ-পদাবলী'তে[১১] শক্তি বিষয়ে বিবিধ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগুলি প্রার্থনার গান, কতকগুলি শক্তিতত্ত্বের গান। এগুলি নবরাত্র দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রচিত।

শক্তি-বিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু মৈথিলী কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শক্তি-বিষয়ক পদ দেখিতে পাওয়া যায়।[১২] অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পড়িলেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেই নায়িকাকে দেবীর নিকট স্তব করিতে দেখা যায়।[১৩]

গৌরী তপস্যাদ্বারা শিবের মত বর লাভ করিয়াছিলেন। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া সীতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে

৮ অমরনাথ ঝা, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী।
৯ ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা।
১০ রাজ লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা।
১১ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।
১২ যেমন রমাপতি উপাধ্যায়-রচিত 'রুক্মিণী-পরিণয়ে'—

প্রশান্ত রমাপতি তুঅ পদ কিঙ্কর সংকর সুনিয় বিনতি হমরা।
গিরিজা সহিত সকল অঘ দূরী কএ পরসন ভাএ দিঅ অভয়বরা॥

১৩ যেমন কবীন্দ্র দেবানন্দ-রচিত 'উষাহরণে' নায়ক অনিরুদ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—

জয় জয় দুর্গে জগত জননী। দূর কএ ভবভএ হোহ দুহিনী॥
খনে লীনা খনে সিত নিরমান। খন কুঙ্কুম পঙ্ক তনু অনুমান॥
রাকা বিধুমুখ নব্বিধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল॥
লোহিত রদন লোহিত কর পান। ভূকুটি কুটিল পুনু মোন ধেআন॥...
পুনি পুনি হই হো দেবি গোচর লেহ। নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দেহ॥
আনন্দে দেবানন্দ নাহি গার। হরি চঢ়ি রিপু হনি পুরহ ভার॥

সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র মধ্যেও আমরা সীতাকে রামচন্দ্রকে বররূপে পাইবার জন্য দেবী আরাধনা করিতে দেখি। মৈথিলী বিভিন্ন কাব্যে ও লোক-সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০) 'মিথিলা-ভাষা-রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নির্দেশে সখিগণসহ অরণ্যকুঞ্জে পৌঁছিয়া নানাবিধ বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবর্তী তড়াগে স্নান করিয়া বিবিধ স্তবস্তুতিতে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।—

জয় দেৱ মহেশ সুন্দরী। হমছী দেৱী অহাংক কিংকরী॥
শিৱদেহ নিৱাস কারিণী। গিরিজা ভক্ত সমস্ত তারিণী॥
হম গোড় লগৈত ছী শিৱে। জননী ভূধররাজ সম্ভৱে॥
জনতা মন তাপ নাশিনী। জয় কামেশ্বরী শম্ভু লাসিনী॥[১৪]

আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই—

অপনে কাঁ হম গৌরি কী কহু। অনুকূলা জনি মে সদা রহু॥
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূরব সৈহ প্রার্থনা॥

আধুনিক কবি শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চরিতে'ও[১৫] দেখিতে পাই জনৈকা হিতৈষিণী ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃহিণীকে বলিতেছে—

গৌরী পূজথু রাজকুমারী। কন্যা হেতুক ঈ ব্রত ভারী॥
সাৱিত্রী নিত গৌরী মনৌলনি। তহিসোঁ মন ৱাঞ্ছিত ফল পৌলনি॥
ইহো পূজি যদি গৌরি মনৌতী। তেঁ নিশ্চয় অভিমত ৱর পৌতী॥

শুনিয়া জনক-গৃহিণী রাণীও বলিলেন—

কহুনি দাই কৈঁ গৌরি অরাধথু। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধথু॥

সীতাও ঠিক করিলেন—

হমরি মায় জগ মেঁ ছথি প্রাজ্ঞা। পালব অৱস হুনক সব আজ্ঞা॥

তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরী আরাধনা করিতেছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সহিত মিলিয়া যায়।—

জয় জগ-উৎপতি-পালন-কারিনি, সকল চরাচর হৃদয় ৱিহারিনি।
জয় জয় ৱিৱিধ দিৱ্য-তনু-ধারিণি, সকল সাধুজন-সংকটটারিনি॥
অহী কালিকা শিৱা ভৱানী, লক্ষ্মী অহী অহী ব্রহ্মানী।
দুর্গা অহী অহী ইন্দ্রানী, অহী বুদ্ধি ৱিদ্যা ও ৱানী॥
স্বাহা সুরগন তুষ্টি হেতু ছী, স্বধা পিতরগন-পুষ্টি হেতু ছী।
সভক হৃদয় মেঁ ভক্তি রূপ ছী, সভ পদার্থ মেঁ শক্তি রূপ ছী॥ ইত্যাদি।

[১৪] বলদেব মিশ্র-সম্পাদিত, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়।
[১৫] সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩।

লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গৌরীপূজার কাহিনী নানাভাবে দেখিতে পাই। একটি 'গোসাউনিক গীতে' দেখি—

জনী মো পর হোহু সহায়।
ঋষি মুনীসুর কেঁ উবারল, মারল মহিষা কেঁ জায়॥
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্ধ মচায়।
জনকনন্দিনী অহাঁকেঁ পূজলনি, রামচন্দ্র-বর পায়॥
কবি ৱিমতী কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায়।
হমরা নহি অৱলম্বন আন অছি, অহীঁ ছী এক উপায়॥[১৬]

'গৌরীক-গীত'-এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বসিয়া গৌরী-পূজা করিতে দেখি। ফুল-ফল-বিল্বপত্র, ধূপ-আসন সিন্দুর প্রভৃতি লইয়া দেবীপূজার আয়োজন হইয়াছে।—

গৌরী পূজু জানকী জনক ভৱন মে
জনক ভৱন মে সিৱ সংকর জী কে সংগ মে।
ফুল লাও ঝট দৈ অছিনজল লাও ছন মে—গৌরী পূজু...।
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে—গৌরী পূজু...। ইত্যাদি[১৭]

শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে—স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেবররূপে পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপূজা করিয়াছেন।—

জানকী গৌরী অরাধল মন সাধল হে
চলহুঁ নিকুংজৱন জাই সুন্দর ফুল লোঢ়ব হে
ডালী ভরি ফুল লোঢ়ল কিছু তোরল হে
পড়ল লছন মুখ দৃষ্ট মনহি লজায়েল হে
জোহী ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে
চলহু জনকপুর ধাম ওহি ঠাম বিয়াহব হে
পান সিন্দুর গৌরী পূজল ৱর মাঁগল হে
ৱর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে।[১৮]

মৈথিলী কবিগণের গানে ও কবিতায় দেবীর বিবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই-জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া

[১৬] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।
[১৭] ঐ। তুলনীয়—
গৌরী পূজয় চললী সখিয়া জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া হে সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে
ফুল বেলপত্র লয় গংগজল নীর লয়—গৌরী পূজয়...।
অক্ষত চন্দন লে চললী জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে—গৌরী পূজয়...॥ ঐ॥
[১৮] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

আসিয়াছি। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে 'গোসাউনিক গীত', 'ভগবতীক গীত', 'গৌরীক গীত' প্রভৃতি যে-সকল গীত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও বিবিধ এবং বিচিত্র। কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মূর্তিতে বা কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মূর্তিতে বর্ণিত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ বর্ণনায়—

তোঁহী ঘরনী তোঁহী করনী, তোঁহী জগতক মাত॥ হে মা॥
দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়াব॥ হে মা॥
নিরংকার নিরংজনি লক্ষ্মীম্বরি, ভবঘরনি তোঁ কহাব॥ হে মা॥...
গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসলি, সুস্বর গীত সুহাব॥ হে মা॥
'মংগনীরাম' চরণ পর লোটথি, ভক্তি মুক্তি বর পাব॥ হে মা॥[১৯]

কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা। যেমন—

শংকরি শরণ ধয়ল হম তোর।
কুকরম দেখি পরম যদি কোপিত, যমহু করত কী মোর॥
সুরতরু অরতর শিবউ' উপর, বাস আস অতি ঘোর।
সহস দিবস মনি চান কোটি জনি, তনু দ্যুতি করত ইজোর॥...
বামা হাথ কুবলয় ধরু, দহিন খংগবর কাতী।
পাঁচ কপাল ভাল অতি শোভিত, শিব ইন্দবর পাঁতী॥
শিব শব আসন পাস যোগিনীগণ, পহিরন বঘছালা।...
বিকট বদন রসনা লহ লহ কর নব যৌবন মুণ্ডমালা॥
চহু দিশি ফেরব মুণ্ডাবলি, চিতা অগ্নি থিক গেহ।
তীনি নয়ন মণিময় সব ভূষণ, নব জলধর সম দেহ॥ ইত্যাদি।[২০]

আর-একটি বর্ণনা পাই সিংহারূঢ়া কালিকার।[২১] এই সিংহারূঢ়া কালিকামূর্তি কালিকা-পুরাণোক্ত কালিকার আদিদেবীত্বেরই প্রভাব সূচিত করে; অর্থাৎ সিংহারূঢ়া কালিকাই আদি দুর্গারূপ, গৌরীরূপ পরে লব্ধ।

জগত্র জননী নাম কালিকা সিংহ পীঠ অসবার হে
জার জংগল বাঘ ঘেরত তাহাঁ পহুঁচত ভগবতী। ইত্যাদি।[২২]

[১৯] অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়—
জগ জননী পূজৈ ঐলোঁ দুআর
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল ছৈ বিকরাট—জগ জননী...।
হাথ মে কংগন খপ্পর সোভৈ সিন্দূর ছৈ বিকরাট—জগ জননী...।
মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজৈ তিরসুল ছৈ বিকরাট—জগ জননী...।
তু ত্য ভবানী ত্রিলোচন কে রানী, মহিমা ছৈ অগম অপার—জগ জননী...।
—শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

[২০] কৃষ্ণকবি রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

[২১] ও, [২২] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও সিংহারূঢ়া বাঘছাল-পরিহিতা যোগিনীবেশ-ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই।—

সিংহ চঢ়লি দেৱি লেল পরৱেশ।
বঘছল পরিহন যোগিনি ৱেশ॥...
ভনই বিদ্যাপতি কালী কেলি।
সদা রহু মৈয়া দাহিনি ভেলি॥[২৩]

একটি গানে দেখিতে পাই ছিন্নমস্তার বর্ণনা।—

জয় জগজ্যোতি জগতি গতি দাইনি চিকুর চারু রুচি ভালে।
পরম অসম্ভৱ সম্ভৱ তুঅ রস পীন পয়োধর বালে॥
কমল কোপ রৱি মণ্ডলতা বিচ ত্রিৱিধ ত্রিকোণক রেখা।
তা বিচ রতি ৱিপরীত মনোভব সুষমা সরিত ৱিশেষা॥
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শশিরেহা। ইত্যাদি।[২৪]

'আদিনাথে'র ভনিতায় প্রাপ্ত একটি পদ বিদ্যাপতির বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ অস্পষ্টভাবে স্মরণ করায়।—

হম অতি ৱিকল ৱিষয় রস মাতল ভগৱতি তোহর ভরোশে।
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারিদ তুঅ পদ পংকজ কোশে॥
ৱিধি হরি শিৱ শনকাদিক সুরমুনি পাৱি মনোরথ দানে।
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অনুছন ৱেদ পুরাণ বখানে॥ ইত্যাদি।[২৫]

এই লোক-সংগীতগুলির মধ্যে কতকগুলি গানে দেখিতে পাই অত্যন্ত লৌকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সুখ-সুবিধা, ধন-জন, আপদ্‌মুক্তি, ব্যাধিনাশ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসিবেন, কোথায় বসিবেন, কি অর্ঘ্য কি উপচার? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট সিংহাসন,—সোনার ঝারি, গঙ্গার বারি—সোনার থালা, কর্পূরের আরতি—সোনার থালায় পায়স—ইত্যাদি ইত্যাদি।[২৬] আবার অন্যত্র দেখি—তিন বস্তুতে মায়ের পূজা হইবে—সিন্দূর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগিবে—কলা নারিকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরতি—অগর গুগ্‌গুল আর দীপ; বর-

[২৩] গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকলিত।
[২৪] অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
[২৫] অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
[২৬] কথী কৈ আসন কথী সিংহাসন— ভগৱতী মা কে আনি বৈসাবু দেৱী ললিতা
সোনে কে আসন পাট সিংহাসন— ভগৱতী মা কে আনি বৈসাবু দেৱী ললিতা।
সোনে কে ঝারি গঙ্গাজল পানী— ভগৱতী মা কে চরন পখারু দেৱী ললিতা।
সোনে কে থারী কপূরক আরতী— ভগৱতী মা কে আরতী উতারু দেৱী ললিতা॥
ইত্যাদি।—শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

দানও চাওয়া হইবে তিনটি—নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য।[২৭] কোথাও দেখি মায়ের নিকট শুধু 'হমর মন পুরা করু'—এই প্রার্থনা,[২৮] কোথাও দেখি বন্ধ্যা অবলার পুত্র-প্রার্থনা,[২৯] অন্যত্র প্রার্থনা দেখি—অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া—তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে ধন দাও, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও—এই সকল প্রার্থনা।[৩০] কিন্তু গানগুলির সর্বত্রই যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারীর ন্যায় কেবল 'দেহি দেহি' প্রার্থনা তাহা নহে—কতকগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দেখি—

জননী আব কিছু করিয় উপায়—
কী হম করব কতয় হম জায়ব
কে হোয়ত দোসর সহায়॥
জন বিনু অবলম্বন ধার মে পড়লোঁ
চিন্তা সঁ অতি অগুতায়।
আব কৃপা কএ হেরহুঁ জননী
কর ধএ লেহুঁ উঠায়॥
পূজা ধ্যান একো নহি কয়লহুঁ
তদপি ন ত্যাগব মায়।
পুত্র বিকল দেখি জগ-জননী
কোর কৈঁ লেল উঠায়॥
কর চুচকার দুলারতি জননী
চিন্তা দেল হটায়।

[২৭] তীন বস্তু লৈ গৌরী পূজব — সিন্দুর ফুল বেলপত্র যো
তীন বস্তু লৈ ভোগ লগৈবহি — কেরা নরিয়ল অনার যো
তীন বস্তু লৈ ধূপ দেখৈবহি — অগর গুগুল অরু দীপ যো
তীন বস্তু বরদান মাঁগব — নৌতি ধর্ম অহিবাতি যো॥—ঐ

[২৮] অম্বে অম্বে কৈ হরদম জপব হম বরু,
আস মাতা হমর মন পুরা করু।
পুত্র হমহুঁ অহাঁ কে পরল ছী গরু— আস মাতা…।
পাঠ পূজা ন জানী ধ্যান কোনা ধরু— আস মাতা…॥—ঐ

[২৯] এক বিনয় হম গায়ব জননী — হম অবলা ছী পুত্র বিনা ছী।
বাঁঝিক পদ ছুড়াও হে জননী — গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ
মথুরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী—
সোনাক থার কপূরক বাতী — আরতিক ভেস দেখাও হে জননী॥—ঐ

[৩০] আহে মা কে দুআরি পর অন্ধা খড়ী—মা হে অন্ধাকে নয়না দিঔ ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর কোঢ়িয়া খড়ী—মা হে কোঢ়িয়াকে কায়া দিঔ ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর নির্ধন খড়ী— মা হে নির্ধনকে ধন দিঔ ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর বাঁঝি খড়ী— মা হে বাঁঝিকে পুত্রফল দিঔ ন কনী।—ঐ

সৃষ্টি কারণ অহাঁ জগতারিণি
মাতা সত্য কহায়।
হম সন পুত্র অহাঁক মতিআয়ল
রাখিয়হু সংগ লগায়॥[০১]

একটি গীতে এই আকুতি এবং জগত্তারিণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

জগতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব
ভবতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব।
ভবসাগর মে নৈয়া ডুবল অছি হমর
নহি হেরব পলক হম ডুববে করব,
মা অপনে সে করুআরি জা ঠৌ ধরব।
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব
মা সরনো মে আ কএ পরল ছী তুরত
মা নয়ন মুঁদি অহাঁ সুতল ছী কোনা॥[০২]

'জগতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে? ভবসাগরে নৌকা ডুবিয়া আছে আমার—আর পলকও দেরী করিও না—নতুবা ডুবিয়াই যাইব; মা তুমি নিজে আসিয়া যে পর্যন্ত না দাঁড় ধরিবে, সে পর্যন্ত নিস্তারের ভরসা করিব না। মা এইমাত্রই তোমার শরণে আসিয়া পড়িয়াছি—মা তুমি কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ!'

[০১] তুলনীয়—

সব কৈ সুধি অহাঁ লৈ ছী মাতা
হমরা কিয়ে বিসরৈ ছী হে
সগর রৈনি হম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে
ছিকহু পুত্র অহী কে অম্বা
ঈ ত' অহাঁ জনৈ ছী হে
সগর রৈনি হম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে॥—ঐ॥

[০২] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। তুলনীয়—

হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ
দৈ রহল ছী ক্লেশ ভারী বীচ বিস্ময় আনি কৈ।
আবি আসা হম পরল ছী কী কহু হম কানি কৈ
হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ॥
দেখি দুর্বল পুত্র কৈ' মা কী সুতল ছী তানি কৈ
দেখি আসা পুরে করু না ফুল তোড়ব হম কানি কৈ
জানি হে মা নিত্য পুজব নেমা ব্রত কৈ ঠানি কৈ॥—ঐ

কবি ঈশনাথ কর্তৃক রচিত এই-জাতীয় কতকগুলি প্রপত্তিমূলক সংগীত দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি—

জে জন গহল অহ'ক পদ-পঙ্কজ, পূরল তকর মনকামে।
এক হমহি' অতি দীন অভাগল, রহলহু ঠামক ঠামে॥ মাহে॥
জ' কিছু দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে।
আপন সুতক জ' লাজ ন রাখব, রাখত কে পুনি আনে॥ মাহে॥
অএলহু অহ'ক শরণ, হম পামর, অছি মন মে অভিমানে।
মাইক অপন কুরূপহু শিশুপর, রহইছ ভাব সমানে॥ মাহে॥[৩০]

গৌরী-সম্বন্ধে কতকগুলি লোক-সংগীত বাংলাদেশের আগমনী বিজয়া-সংগীতের সহিত তুলনা করার যোগ্য। কিছু কিছু বৈচিত্র্যেরও সন্ধান মেলে। যেমন গৌরী ও শিবের পূর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনার অনুরূপ। প্রেম-কৌশলটিও একজাতীয়। বিদ্যাপতির একটি পদে পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শিব ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন—উমার মন তাহাতেই মজিয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে, কৃষ্ণও গোরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একটি মৈথিলী লোক-গীতিতেও দেখি ভিখারীর বেশে শিবের উমা-দর্শনের চেষ্টা।—

হেমন্ত দুআরি পর চন্দনক গছিয়া
তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমাবল রে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে
সুতলী মে ছলি হে গৌরী উঠলি চেহায়—
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে--
থারি ভরি লেলনি গৌরী চংগেরী ভরি লেলনি
মাই হে উপর স' লেলনি দূবি ধান হে।

[৩০] গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকলিত। তুলনীয়—

জগত-জননী মিনতী সুনু মোর। শরণ জানি গহলহু পদ তোর॥
আপন সুতক লখি সঙ্কট ঘোর। কওন জননি নহি বহবএ লোর॥
কএল জনম ভরি পাপ--বটোর। সদিখন রহলহু মদহি' বিভোর॥...
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নহি রহএ কঠোর॥—ঐ

আরও—

আবহু তাকিঅ হে জননী॥
অধম উধারিণি, তারিণি, সুত দিসি হেরিঅ সদয় কনী॥
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জপি, সঙ্কট-হরণী॥
হমরাহি বিসরি দেল কিএ, অহ' নহি, এহন কঠোর বনী॥...
হো কুপূত, নহি মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সুনী॥
কী হমহী ছী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী॥
—কবি জীবানন্দ রচিত।—ঐ

তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহু ন বোলৈ
ঘুরি ঘুরি গৌরীকে নিরেখৈ হে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
হম নহি থিকহুঁ হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী
তোহরো সুরতিয়া দেখ ভুলেলেঁ হে।[৩৪]

হেমন্তের (গৌরী-পিতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ—তাহারই নীচে যোগী ধুনী রাখিল। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছিল গৌরী—চেঁচাইয়া উঠিল,—ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। থালি ভরিয়া আনিল গৌরী—চাঙ্গেরী ভরিয়া নিলেন গৌরী—মা গো, তাহার উপরে রাখিলেন ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী—মুখে না কথা বলে—শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। 'আমি ভিক্ষু-ভিখারী নহি হে গৌরী, তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি!'

একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়িতে দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা—ফুলের মত সুন্দরী গৌরী, কোন্ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী ভিখারি সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী। শ্বশুর-বাড়িতে পরে গৌরী ছেঁড়া পুরাণ কাপড়—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে খায় গৌরী পুরি ও জিলেপী—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভাঙ খাবার—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে শোয় গৌরী কোমল পালঙ্কে—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভূমি আশ্রয়—সেই বনে যাইবে গৌরী।[৩৫]

[৩৪] শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

[৩৫] পান সন পাতর গৌরী ফুল ঐসন সুন্দরি হে।
কোন বন জৈতী—
তপোবন তপসী ভিখারী হে ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে পিহ্তী গৌরী চির আভরন মা হে
কোন বন জৈতী—
বন বন লকরী চুনৈতী হে ওহি বন জৈতী।
সসুরা মে পিহ্তী গৌরী গুদরী পুরনমা হে
ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে খৈতী গৌরী পুরী ও জিলেবী
কোন বন জৈতী।
সসুরা মে ভাংগ আধার হে ওহি বন জৈতী।

অন্য একটি গীতে দেখিতেছি, এইরূপ ঘরে বরে গৌরীকে দিয়া মা মেনকার দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর—ভোজনে ধুতুরা ও আঁক; বসিয়া খাইবার ঘর-দুয়ারও নাই। ঋষিরাজ নারদ যে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার সাপের হার—অঙ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ হইয়াছে, গৌরী ভয়ে মরিয়া যাইবে। শ্মশানে বনে বাস—ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না জানি গৌরীর কি হইতেছে!

নহি জানী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতী
গজখোর ভাংগ পীৰা ভোলাক সংগ জৈতী॥
ভোজন ধতূর আকে ঘর ছৈ ন দুআর থাকে
ঋষিরাজ দেল তাকে বেটী হমর কী খৈতী।
নহি জানি আব গৌরী...
বৈদেহ হার কপক ৱিষ অংগ অংগ ৰ্যাপক
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোকি মরি জৈতী।
রহতী স্মসান বন মে নহি জানি কেনা হোইতী
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো ত্রিলোক সাসন
সির কে ত্রিয়া কহৌতী॥[৩৬]

আর-একটি পদে দেখি, একদিন স্বামী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া একা একা গৌরী মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভরা যমুনায় কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' গৌরী বলিল,—'মা, আমি শাড়ি ভিজাইয়া আসিয়াছি।' 'বৃষ ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, বৃষের দড়ি ধরিয়া আসিয়াছি।' 'গণপতিকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, গণপতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি।' 'মহাদেবকে

রংগকে রংগীলী গৌরী প্রেমকে সুন্দরী—
কোন বন জৈতী—
নহিরা মে সুততী গৌরী ললিয়া পলংগিয়া হে
কোন বন জৈতী
সসুরা মে ভূইয়া অধার— ওহি বন জৈতী॥—ঐ

[৩৬] তুলনীয়: ঈশনাথ রচিত একটি গীত—
গৌরা! কথিলএ করব বিআহ॥
এহন দিগম্বর বূঢ়বা বরস', কথিলএ করব বিআহ॥
নহি ভরি বীত খেত ছনি হিনকা, নহি হর ও হরবাহ॥
ভীখ মাঙিকে' পেট পোসৈ ছথি, অহ'ক কোনা নিরবাহ॥ ইত্যাদি।
—গীত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকলিত।

কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া আসিয়াছি মা।'[৩৭]

অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র। গানটি তুলসীদাসের নামে প্রচলিত।—

ভএ গেল ভাংগ কে বেরা
উঠ্ হে গৌরা।
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদেব
কার্তিক গনপতি মোরা কোরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ...
আসন খসায় দিঅ
কার্তিক সুতায় দীঅ
পীসি দিঅ ভাংগকে গোলা
উঠ্ হে গৌরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ...
নৈ ঘর সাসু ননদ জে ছথি
কে রাখত কার্তিক কোরা
উঠ্ হে গৌরা, ভএ গেল বেরা।
তুলসীদাস প্রভু তুম্হরে দরস কো
মহাদেব কে হৃদয় কঠোরা।
উঠ্ হে গৌরা॥

মহাদেব ডাকিতেছেন,—'হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন,—'আমি কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তিক-গণপতি যে আমার কোলে।' আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গৌরা। আসন খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তিককে শোওয়াইয়া দাও—ভাঙের গোলা পিষিয়া দাও, ওঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন,—'ঘরে নাই শাশুড়ী—নাই ননদ, কে রাখিবে কার্তিককে কোলে?' কিন্তু তবু হাক-ডাক,—'ওঠ হে গৌরা'। তুলসীদাস বলিতেছেন,—'তোমার দর্শনের জন্য আমি ব্যাকুল; কিন্তু হৃদয় কঠোর।'

[৩৭] গৌরী হে ভরল জমুনা কোনা এলোঁ।
আমা হে সঁরিয়া ভিজৈতে হম এলোঁ॥
গৌরী হে বসহা কে ছোড়ি কোনা এলোঁ।
আমা হে বসহা কে ডোরিয়া ধরি এলোঁ॥
গৌরী হে গণপতি কে ছোড়ি কোনা এলোঁ।
আমা হে গণপতি কে ঠোকি সুতেলোঁ॥
গৌরী হে মহাদেব কে ছোড়ি কোনা এলোঁ।
আমা হে মহাদেব কে পূজা পর বৈসায় এলোঁ॥—ঐ

একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলী সাহিত্যে আর-একটি প্রবণতা লক্ষ্য করিতে পারি। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব দেখা দিয়াছে—এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচার এবং শোষিতের আর্তরবে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই আবার রক্তপিপাসু হইয়া উঠিয়াছেন—নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা হইতে চাহিতেছেন। এই-জাতীয় একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শোণিত দে শোণিত মৈথিলার্য
প্যাসেঁ তবধল অছি খড়্গ হমর
বড়বানল ছুধা ধরাতল কৈঁ
সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠাঢ়
অছি খপ্পর ছুচ্ছে যুগ যুগ সঁ
খল খল কয় প্রাণিক প্রাণ বাঢ়
মারুত গতি বঢ় গেল দিগ দিগন্ত
ধুধুআএল ধূম কুহেস প্রখর
ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ
স্পন্দন প্রাণিক রুদ্ধ ভেল
শোষিত ক আহুতি দেখি দেখি
শোষক পর মন মোর ক্রুদ্ধ ভেল
আএল ছী উঠ দে মাংস একর
হম পেট ভরব পুনি করব সমর।[৩৮]

[৩৮] ক্রান্তি-গীত রাঘরাচার্য শাস্ত্রী-রচিত। কলিকাতা 'মৈথিল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরকে লইয়া রচিত এই কবিতাটি তুলনীয়—

ভূখ ভবানী জো দেতী হৈ
ভূখ ভবানী বংগদেশ কী
যা দেবী বঙ্গদেশেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ...
যা দুর্গা বঙ্গদেশেষু দৈন্যরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ...
যা কালী বঙ্গদেশেষু কালরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ...

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য

অসমীয়া সাহিত্যে শাক্ত-সাহিত্যের অনুসন্ধান করিলে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাহাকে ছিটে-ফোঁটা বলা যায়। কিন্তু একদিক হইতে বিচার করিলে ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শক্তিপীঠ-রূপে আসামের অন্তর্বর্তী কামরূপের অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। কালিকা-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, কুব্জিকা-তন্ত্র, যোগিনী-তন্ত্র, চূড়ামণি-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে কামরূপের কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ ও মহিমা কীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই পুরাণ-তন্ত্রগুলি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না; এগুলির কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত নয়। মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দশম শতক হইতে কামরূপের শক্তিপীঠ-রূপে খ্যাতি। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে দেখিতে পাই, দেহমধ্যস্থ চারিটি কায় বা চারিটি চক্রকে চারিটি পীঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা'র মতে এই চার পীঠ হইল— উড্ডীয়ান, পূর্ণগিরি, শ্রীহট্ট এবং কামরূপ। চর্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের—

দিবসই বহূড়ী কাকভয়ে রাএ।
রাতি ভইলে কামরু যাএ॥

ইহার ভিতরকার 'কামরু' শব্দের অর্থ অনেকেই কামরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন। চর্যাগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া গৃহীত—এই সময়ে তাহা হইলে কামরূপের তান্ত্রিক-সাধনার পীঠ রূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। কামরূপ দেবীর যোনি-পীঠ বলিয়া খ্যাত। যোনি-পীঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর একান্ন অঙ্গ-পতনের সহিত একান্ন পীঠের উদ্ভবের কাহিনীদ্বারাই করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই যোনি-পীঠের প্রসিদ্ধিদ্বারা বোঝা যায়, এই পীঠটি এক সময়ে তন্ত্র-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শাক্ত-সাধক এবং গৃহী-ভক্ত দলে দলে এই শক্তিপীঠে তীর্থ করিতে আসেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য করিয়া এখানে এখনও সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

যে আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কামরূপের এই শক্তিপীঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র পূর্বভারতে যে শক্তিপীঠ কামাখ্যার এত প্রসিদ্ধি সেই আসামের ধর্মে, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ স্পষ্টভাবে

কিছু বলা শক্ত; তবে কতকগুলি তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামরূপের কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাবধি গুহ্য তন্ত্রসাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গুহ্য তন্ত্র-সাধনা কোনও জনপ্রিয় ধর্ম নয়, ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যই কামাখ্যা-পীঠকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না। বাঙলাদেশের শাক্তধর্ম যেরূপ প্রসিদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে পারিয়াছিল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই পারে নাই।

আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে কিন্তু খুব প্রিয় তীর্থ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী মুখ্যতঃ বাঙালী,—কিছু কিছু বিহারের প্রত্যন্তবাসী, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খুব কম।

তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শক্তিবাদের প্রভাবের অনুপস্থিতির সর্বপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং 'নামঘোষা' সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। তিনি অসমীয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় যে সাহিত্যের দিক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজীবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার পরে রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সঙ্গীত ব্যতীত আর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্ত-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

অবশ্য জাতিগত উত্তরাধিকার-রূপে ভারতীয় শক্তিবাদের পরোক্ষ প্রভাব শঙ্করদেবের কিছু লেখাতেও আবিষ্কার করা যায়। আমরা পূর্বে[১] দেখিয়া আসিয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সর্বত্রই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে শক্তিবাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা শুধু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সব আঞ্চলিক সাহিত্যেই। ভারতীয় পুরাণাদির মধ্যেই এই বর্ণনার মূল নিহিত আছে, এই ঐতিহ্যই সকল আঞ্চলিক সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করদেব-রচিত 'অনাদি পাতনে'র মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই বর্ণনার সহিত বাঙলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার মোটামুটি ঐক্য রহিয়াছে।

[১] এই গ্রন্থের ১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই সৃষ্টিতত্ত্ব গাড়িয়া উঠিয়াছে। 'অনাদি পাতনে'ও দেখি, সৃষ্টির পূর্বে—

মহা প্রকৃতিয়ো পুরুষতে ভৈল লীন।
ন থাকিল আন একো পুরুষতো ভিন॥
নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ।
নাহি মহা বায়ু চন্দ্র সূর্যর প্রকাশ॥
নাহি শীত উষ্ণ ঋতু নাহি রাত্রি দিন।
সমস্তে সংসার গৈল ঈশ্বরত লীন॥[২]

জ্ঞানময় আনন্দমূর্তি নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নকমল মুদ্রিত করিয়া যোগনিদ্রায় 'আপোনাকে চিন্তি মাত্র আছন্ত কেবল'। অনেক সহস্র যুগ এইভাবে চলিয়া গেলে 'দুনাই ঈশ্বরর' সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তিনি ভাবিলেন, 'মায়ার হাতত করাও জগত প্রকাশ'। তখন—

এহি বুলি মেলি পদ্ম নয়ন অনন্তে।
মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগৱন্তে॥
জবর প্রকৃতিত করিলন্ত জীৱ দান।
অষ্ট গুণে তেজ ষোল গুণে ভৈল প্রাণ॥
সৃষ্টি করিবাক ঈশ্বরর ইচ্ছা কাজ।
পুরুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ॥
অনাদি রূপিণী ঈশ্বরর অর্ধকায়।
ব্যক্ত ভৈলা মহামায়া সৃষ্টিক ইচ্ছায়॥
পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ।
কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ॥

... ...

চাহিবাক নপারি দেবীর মহা জ্যোতি।
কোটি এক সূর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি॥

পুরুষকে প্রণাম করিয়া মহামায়া তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে বলিলেন,— 'কোন কর্ম করো আৱে করিয়ো আদেশ'। এ-কথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ ঋষিকেশ হাসিয়া বলিলেন,—

শুনিয়ো প্রকৃতি একগুণে নোহা হীন।
তোমারে আমারে কিঞ্চিতেকো নাহি ভিন॥
মোর নিজ শকতি সম্যকে দেখো প্রাণ।
সত্বরে করিয়ো মায়া জগত নির্মাণ॥

[২] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব।

তোমাক চেতাইলো আমি এই অভিপ্রায়।
জানিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায়॥
তোমারে আমারে একো নাহি ভিন্নাভিন্ন।
মোতে যাতে লীন যাহা এহি খানি হীন॥
সত্বরে করিয়ো মায়া জগত প্রকাশ।
করো সৃষ্টি লীলা তাতে বিনোদ বিলাস॥

এই যুগে হর-গৌরীকে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতী-রচিত 'ভীম চরিত'। রাম-সরস্বতী শঙ্করদেবের সমসাময়িক বলিয়া গৃহীত। কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, ভারত-ভূষণ এবং রামসরস্বতী সবই তাঁহার পরবর্তী কালের পাওয়া নাম বা উপাধি। এই কবি-রচিত 'ভীম চরিত' নানা দিক্ হইতে কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে কৃষক শিবের উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া শিব-গৃহিণী গৌরীর যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।[৩] দরিদ্র কৃষক শিবের ঘরণী-রূপে দেবীর চিত্রকে আবার খানিকটা একটু নূতন রূপে পাইতেছি রামসরস্বতীর কাব্যের মধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কবিগণ এবং অসমীয়া কবি এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের কবি তাহাতে বিভিন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, বাঙলা 'শূন্য পুরাণে' এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগুলিতে শিবের বিশ্বস্ত অনুচর হইলেন জনৈক 'ভীম'। কবি রামসরস্বতী শিবের বশংবদ ভৃত্য এই ভীমকে মহাভারতের পান্ডুপুত্র ভীমের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছেন। পান্ডুপুত্র ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ স্বরূপ কাব্যখানির প্রথমেই দেখিতেছি, অন্নের দুঃখে ভীমের শরীর একেবারে শীর্ণ!—

একদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত।
শুকাই গৈলেক দেহা অন্নর দুঃখত॥
মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাশক যাওঁ।
মহাদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাওঁ॥[৪]

খাইতে না পাইয়া ভীম যুধিষ্ঠির রাজার নিকট বলিলেন,—'অন্নের দুঃখে তো দেহ শুকাইয়া গেল! বিদায় দাও দাদা, একবার কৈলাসে যাই; সেখানে মহাদেবের গোরু চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই।' যুধিষ্ঠিরাদিও উপায়ন্তর তেমন কিছু না দেখিতে পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন। ভীম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দণ্ডবৎ করিয়া 'গরু চারি থাকিবোহোঁ তোমার আলয়'—এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শিব বলিলেন, —'বেশ ভালই হইল; কার্তিক-গণেশ দুই ছেলেমানুষ বৃষ চরায়—তুমি তাহাদের

[৩] এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
[৪] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড।

লইয়া বৃষ চরাও। মা পার্বতী আসিয়া এ-কথা শুনিয়া খুশীই হইলেন। তিনি ভীমকে বলিলেন,—

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক।
যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক॥
এগুটি বলদ জানা মোহোর ঘরত।
কার্তি গণপতি দুয়ো চারিবে লগত॥

ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাখিবে—ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিও—'পাছে জানো বোলা ইটো বহু ভাত খাই'! কিন্তু—

হেন শুনি পার্বতীয়ে তুলিলেক হাস।
টিপচি গোটে নো তই কত ভাত খাস॥
চৌষষ্ঠি যোগিনী খায় আরু ভূতগণ।
তোক লাগি আমাসার নুজুরিবে অন্ন॥

ভীম বলিল,—'আই, তোমাকে কথাটা ভাঙিয়াই বলিতেছি, খাইবার পরিমাণটা আমার একটু বেশি, নিত্য আমার ভাত লাগে 'সাত সাঙিগ', আর ব্যঞ্জন লাগে 'নাও সাত কুন্দা'। তোমার ত দেখিতেছি ভাঙ্গা ঘর, ফাটা ঝুলি—আর 'ঘর মাঝে নাই দেখোঁ গোটা চারি ধান'। শিবের যা অবস্থা দেখিলাম—বস্ত্র নাই, ধন নাই—মুণ্ডমালা আর সর্পভূষণ। মাথায় তেল নাই—চুল জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, গায়ে গন্ধ—'ভিক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর গোসাঁই'! ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া—

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি।
পরশুর কথা কহ কালির ছৱালী॥
জগতের ধন ধান্য সকল আমার।
আমা করি কোন আর দের আছে চার॥

ভীম বলিল,—আই, অতশত কথা বুঝি না, আমার এক কথা—'পাছকালে খেদাইবাক নপারিবা মোক'। যাক, ভীম শিবের বৃষরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বৃষ লইয়া কার্তিক-গণেশসহ কৈলাসশিখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাসের মধ্যে বৃষ বাঁধিয়া রাখিয়া কার্তিক-গণেশসহ ভীম গেল গাছের ভাল ভাল ফল খাইতে। ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া গিয়া বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িল বিশ্বামিত্র ঋষির 'মধুবনে'—এবং বন ভাঙ্গিয়া তচ্ নচ্ করিয়া দিল। ভীম কার্তিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া ঋষির রুদ্রমূর্তি দেখিয়া যত দোষ বৃষের ঘাড়ে চাপাইল—এবং বৃষের লেজ ধরিয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আধমরা করিয়া ফেলিল। বৃষটি মৃত মনে করিয়া ভীম বৃষবধের দোষ প্রথমে কার্তিক-গণেশের ঘাড়ে চাপাইল—পরে বিশ্বামিত্র ঋষির ঘাড়েই চাপাইল। ভীমকে দেখিয়া সকলেরই মনে হইল, 'নজানো কোথের ইটো পরম দুর্জন'! যাহা হোক, ভীম শেষ পর্যন্ত বৃষ লইয়া বাড়ি ফিরিল—বাড়ি ফিরিয়া পূর্বচুক্তি অনুসারে খাইতে

বসিল। ভীমকে থালা ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু 'এক গ্রাসে ভীমে তাক পেলাইলেক খাই'। ভীমকে ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনিতে গেলে দেবী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ভাত নাই—ব্যঞ্জন দিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই—

ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই।
আরু ভাত আনা মোর ভোক নপলাই॥

কিন্তু এদিকে ভাঁড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনিতে ঘরে ঢুকিয়া আর ফিরিলেন না—

ভাত নাই দেখি দেবী ওলাই নাসিলা।
অসন্তোষে ভীম যাই আচান্ত করিলা॥

কিন্তু ভীমের ক্ষুধা যায় না,—দেবীকে বলিল, 'ঝুলিতে চাউল খুদ কিছু আছে?' কিন্তু

হেন শুনি পার্বতীয়ে বুলিলা বচন।
আজি বাপু মোর ঘরে নাই খুদকণ॥

ভীম তখন আস্ত ক্ষেপিয়া গেল, বলিল খালি পেটে সে আর গোরু চরাইতে পারিবে না। সে আরও বিদ্রূপ করিয়া বলিল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই—কেবল ভাঙ্ খাইয়া জীবনধারণ; এবং 'খাইবে নপাই শিবে ফুরে ডম্বরু বাজাই'! ভীমের বচনে দেবী পার্বতী বড় লজ্জা পাইলেন, তিনি গিয়া মহাদেবকে ধরিয়া বলিলেন,—

পার্বতী বদতি প্রভু শুনা ত্রিলোচন।
একবার কিরিষি করিবে দিয়া মন॥
ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নুপুরেয়।
খাইবে নাপাই গরখীয়া আরাৰ করয়॥

পার্বতীর বাক্য শুনিয়া শিব বলিলেন,—'গুরু কৃষিকর্ম আমি কিভাবে করিব?'—

দুষ্কর কৃষিক মই করিবো কিমত।
নাই কড়াকড়ি ধন মোহর ঘরত॥

ইহার উত্তরে পার্বতী শিবকে যে কথা বলিলেন তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে যে একটি সংস্কৃত শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি,[৩] এবং আমরা বাঙলা শিবায়ন কাব্যে এ-ক্ষেত্রে পার্বতীর যে উক্তি দেখিয়া আসিয়াছি তাহার সহিত আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যাইতেছে।

পার্বতী বদতি প্রভু ভয় এরা মনে।
মাটি খুঁজি লোৱা কিছু বাসবর স্থানে॥

[৩] রামাদ্ ঘাচয় মেদিনীং ধনপতেবীজং ইত্যাদি। এই গ্রন্থের ১২৬-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কঠিয়া আনাহা খুজি সখি কুবেরত।
নাঙ্গল আনাহা খুজি বলো যে ভদ্রত॥
যমর মহিষ গোট আনিয়োক যাই।
তোমার বৃষভ আছে করা এক ঠাই॥
ত্রিশূলফলক ফাল করি হালক জুরিয়ো।
এহি মতে কৃষিকার্য বিধান করিয়ো॥

পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জিনিস যোগাড় হইল, শিব হাল চষিলেন এবং 'বৈলা বিধে বিধে ধান সব কৃত্তিবাস'। দেখিতে দেখিতে মাঠ ভরিয়া ভাল ধান হইল। শিব একদিন পার্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানের মাঠে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু নিষেধ শুনিয়া পার্বতীর কৌতূহল বাড়িল, গোপনে একা একা একদিন মাঠে গেলেন। মাঠভরা পাকা ধান দেখিয়া শিবের কার্যে দেবী আশ্চর্য হইয়া গেলেন—এবং 'উশ্‌ আশ্‌ এই দুই উচ্চারিল বাণী'। কিন্তু কি কাণ্ড—এই দুই 'বাণী' হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান পুড়িয়া ফেলিল; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিন্তু শিব গিয়া একদিন সব দেখিলেন, সব পার্বতীর কার্য বুঝিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া 'বিস্তর টঙ্কিলা'। তখন—

পার্বতী বদতি প্রভু গৈলাহোঁ হঠাৎ।
পুরিলেক ধানখান দেখিলোঁ সাক্ষাত॥
চরণত ধরো প্রভু দোষ মরাষিয়ো।
আরু একবার প্রভু খেতিক করিয়ো॥

শঙ্কর আবারু ধান রুইলেন—আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া ধানকাটা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কিছু আহু কিছু ভৈলা শালী'।

আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পরে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই 'ভীম-চরিত' শুনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর 'উশ্‌ আশ্‌' এই দুই বাণী হইতে 'হাহা' ও 'হুহু' এই দুই দৈত্যের কল্পনা করা হয়; গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহারাই শিবের শস্য গ্রাস করিয়াছিল; শস্য যখন পুনরুজ্জীবিত করা হইল তখন ঠিক হইল, এই 'হাহা-হুহু' আর মাঠের শস্য না খাইয়া নব-বিবাহিত বরকন্যার রক্ত খাইবে। গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তিন দিন পরে বরবধূকে এই কাহিনী শুনাইয়া দিলে দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকার করিতে পারে না।

অসমীয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ কিছু কিছু মনসা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এ-যাবৎ তিন জন কবির মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কবি মনকর (১৫শ শতক?), কবি দুর্গাবর (১৬শ শতক) এবং 'সুকনানি'। এই তৃতীয় কবি 'সুকনানি' হইলেন সুকবি নারায়ণ দেব। ইনি মৈমনসিংহবাসী

বাঙালী কবি হইলেও তাঁহার মনসা-মঙ্গলের আসামের বহু স্থানে খুব প্রসিদ্ধি এবং তিনিও একজন অসমীয়া কবি বলিয়াই আসামে প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রুচিনাথ কবি এবং রঙ্গনাথ কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি রঙ্গনাথ দ্বিজ তাঁহার যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কবি কামাখ্যার ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ কামাখ্যা দেবীর পরমভক্ত শিবচন্দ্রের পরিচয়প্রসঙ্গে কবি নীলগিরি-পর্বত এবং কামাখ্যা দেবীরও বর্ণনা করিয়াছেন।—

গিরি মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিতো নীলগিরি বড়।
ফুলে ফুলে জাতিস্কার দেখিতে সুন্দর॥
অনেক মণ্ডপগণ যাহাত আছয়।
চন্দ্রর সদৃশ সবে প্রকাশ করয়॥
সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ বিমোচন।
কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ॥
সেহি পুণ্য ভূমি জানা জগতর সার।
পৃথিবী মণ্ডলে তার সম নাহি আর॥
দ্বিজগণ আছে তাত সবে শুদ্ধ মতি।
দুর্গার চরণে সদা করন্ত ভকতি॥
মহাসুখে থাকি বিপ্র সেহি পর্বতত।
করিলা ভকতি কামাখ্যার চরণত॥[১]

শিবচন্দ্রের ভক্তি এতই গাঢ় এবং বিশুদ্ধ ছিল যে দেবী ভগবতী কামাখ্যা মাই তাঁহার প্রতি অতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আসিয়া ভক্ত শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন। এই সংবাদ জানিয়া কামরূপ অধিপতি ধর্মপতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে হইবে। শিবচন্দ্র স্বীকার করিলেন। তাহার পরে—

বিধিরতে ব্রাহ্মণে পূজিলা নানা মত।
পূর্বরতে দেবী আসি ভৈলন্ত বেকত॥
সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দেখিলা।
রাজাই দেখিলা হেন দেবীয়ে জানিলা॥
ক্রোধদৃষ্টি চাহি পাছে ব্রাহ্মণক প্রতি।
তেতিক্ষণে অন্তর্ধ্যানে ভৈলা ভগবতী॥

'গোসানী'র ক্রোধদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইন্দুর-মস্তক হইলেন এবং এইজন্যই তাঁহার নাম হইল 'কেন্দুকালে'।

[১] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড।

দ্বিজ রঙ্গনাথ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বর্ণনা মূলের অনুরূপই। যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হইয়া যখন দেবীরূপ পরিগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরূপ—

সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান।
অতি উচ্ছ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান॥
দেখে দেবগণে তাতে সেহি তেজচয়:
জ্বলন্তে আছয় যেন কোটি সূর্যময়॥
জ্বালায়ে ব্যাপিছে সবে দিগ নিরন্তর।
নাহিকে তত্তুল্য অতিশয় ভয়ংকর॥
চাহিবে নোৱাৰি তেজ অতি ভয়ানক।
কান্তিয়ে ব্যাপিলা তার তিনিও লোকক॥
একঠাই হুয়া সবে দেবতেজ চয়।
ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময়॥

ইহা মূলের—

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

প্রভৃতিরই নিকট অনুসরণ। কিন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডিকার রূপের কথা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ লুব্ধ হইয়াছিল এবং চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডীতে দেখিতে পাই চণ্ডিকার মনোমোহিনী মূর্তি দেখিয়া মহিষাসুরই যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছিল। এস্থলে চণ্ডিকার রূপের রঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা বিবিধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মূর্তির যে বর্ণনা পাই[১] তাহার সহিত একসঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

গোসানীর দেখি অঙ্গ মহিষর ভৈলা রঙ্গ
হাসিয়া বোলয় শুন রামা।
তোহোর বদন শোভে তরুণের মন লোভে
নবীন (?) বিহিন হিম ধামা॥
নব পুতলি তনু ভ্রুর যুগ মদনর ধনু
নাসা তোর তিল ফুল জিনি।

[১] এই গ্রন্থের ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছারিয়া মুরতি বেশ কেনে যুদ্ধ অভিলাষ
আপুনাক আবে অভাগিনী॥
অধর বন্দুলি যেন প্রকাশয় বিতোপন
পক্ক ডারিম্বর বীজ দন্ত।
নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আতি কেশ চয়
দেখি চমরি দম্ভ অন্ত॥
মৃণাল বনিত ভুজে নারীগণ মন রুজে
কর অশোকর কিসলয়।
সুঠান আঙ্গুলী চয় চম্পার পাকরি নয়
দেখিতে সুন্দর মনোময়॥ ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি অনন্ত আচার্য 'আনন্দ-লহরী নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়া 'আনন্দ-লহরী' নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা অনুবাদ নয়, মূলে যে ৪১টি শ্লোক রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কও অতিক্ষীণ; —মূলের সামান্য কিছু তথ্য ও তত্ত্ব অবলম্বনে কবির প্রায় স্বাধীন রচনা। কবির আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসতিস্থান 'সৌমার পীঠে'র বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। 'আনন্দ-লহরী'তেও দেবীর বাহ্যরূপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা দ্বিজরঙ্গনাথের দেবীর বর্ণনারই অনুরূপ।—

অরুণ চরণযুগ নূপুরে রঞ্জিত।
দশ নখে চন্দ্র জিনি প্রকাশে তহিত॥
গুল্ফ দুইক দেখি মোহ হরে মুনিগণ।
রাম কদলীক নিন্দে উরু দুই জন॥
… … …
পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভন্ত তাতে মুখ।
যাক দেখি ভকতর মিলৈ মনে সুখ॥
ডারিমর বীজ নিন্দে দশনর পান্তি।
ঈষৎ হাস্যত তাতে করি আছে কান্তি॥
রাতুল অধর শোভে পক্কবিম্ব সম।
নাসা তিল পুষ্পতো অধিক নিরুপম॥
মৃগীর চক্ষুক নিন্দে নয়ন ত্রিতয়।
ভ্রূব যুগ অনঙ্গর ধনুক জিনয়॥[৮] ইত্যাদি।

[৮] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড।

কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থূল রূপ—বা প্রকট রূপ; মায়ের সূক্ষ্মরূপে মা কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মূলাধার-চক্রে প্রতি জীবদেহে অবস্থান করেন। ভ্রূ-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র হইল শিবধাম—

তাহার কর্ণিকা মাঝে আছে সদাশিব।
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব॥

... ...

তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে সুন্দরী।
হর আছে তযুপতি অনঙ্গর অরি॥
তুমি কামাকুল হৈয়া রহিতে না পারি।
ঘনে ঘনে চেগ চোৱা যেন বেশ্যানারী॥
দুর্গম স্থানত আছে মোর পতি শিব।
তান সঙ্গ নগৈল নরৈব মোর জীব॥
এক মুদ্রা শত ভাগ জিতো মূলাধার।
তার এভাগর সম করি কলেবর॥
সেহি রূপে সুসুমার মধ্যে প্রবেশিয়া।
ছয় পদ্ম সমে ছয় তনুক ভেদিয়া॥
শীঘ্র বেগে গৈয়া তুমি করি মহারঙ্গ।
রহস্য স্থলত পাইলে নিজ পতি সঙ্গ॥
বিরহ বহ্নিক নিবারিল তান সঙ্গে।
ক্রীড়া করি পতি সমে ভৈল মহারঙ্গে॥

কিন্তু মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্ধ্বগা হইয়া শিবসঙ্গে একবার মিলিত হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; 'মহারঙ্গ' আস্বাদ করিবার পরে তিনি আবার নিম্নগা হইয়া নিজাবাসে ফিরিয়া আসেন।—

সেহি পথে আসি পূর্ব স্থান পাইল আর।
মূলাধার বাহিরত ত্রিকোণ আকার॥
আপুনাক ভুজঙ্গর সমান করিয়া।
লজ্জা শ্রমে মের দিয়া থাকিল শুতিয়া॥

ইহা তন্ত্র-সাধনার গভীর রহস্য। কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি শুধু পুঁথিগত বিদ্যার উপরে নির্ভর করিয়া এ-সকল বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার নিজের এই সাধন-রহস্যে কিছু কিছু প্রবেশ ছিল। তন্ত্র-সাধনাকেই তিনি কলিযুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

মোক্ষর সাধন আছে যত । কোনো কোনো খানে নানা মত
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শম্ভুর মন।

কলিকালে যত লোকচয় বহু শাস্ত্র চাইতে করি ভয়,
অনর্থ করিব নাজানি কোনো সাধন॥
ইহেতু স্বতন্ত্র তন্ত্র নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
তাকে পৃথিবীক আনিলা তোমার পতি।
সেহি সে তোমার নিজ তন্ত্র তাতে আছে নানা যন্ত্রতন্ত্র,
তারে সে মন্ত্রক উন্ধারো তযু সম্প্রতি॥

অসমীয়া লোক-সাহিত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্যে দেবী 'আই' (সংস্কৃত আর্যিকা) নামেই প্রসিন্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন বহু স্থলে আদিদেবীর উল্লেখ পাই, অসমীয়া সাহিত্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই 'আদি-গোসানী'-রূপে। অসমীয়া 'বারমাহী গীতে' (বারমাসী গীত) স্থানে স্থানে আশ্বিন মাসে বলিদানসহ দেবীপূজার উল্লেখ পাই।[১] বিবাহ উপলক্ষ্যে যে গান হয় তাহার নাম 'বিয়া-নাম'। এই বিয়া-নামে হর-গৌরীর বিবাহের গান কিছু কিছু গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গৌরীকে অবলম্বন করিয়াই পল্লীর সমাজ-চিত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু গ্রাম্য স্থূল রসিকতাও দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই ভগিনী হরের নিকট হইতে গৌরীর জন্য অলঙ্কার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহিরে আসিয়া সাদরে সেই অলঙ্কার পরিতেছে। হরের ঘর হইতে অলঙ্কার আনিয়াছে পিতলের বড় থালায় ভরিয়া—ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গৌরী মাথা নত করিয়া সব গ্রহণ করিতেছে।

লক্ষ্মী সরচতী দুই ভনী আহিছে
হররে অলঙ্কার লৈ।
ওলাই আহা গৌরী পিন্ধাহি সাদরী
মেনকার আগতে কৈ॥
হররে ঘররে অয়ে অলঙ্কারে
আনিছে শরাই ভরাই।
ভিতররে পরা ওলাই আহা গৌরী
লোৱাহি মাথা দোৱাই॥[১০]

একটি 'গাৱ'লীয়া গীতে' (গ্রাম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর একটি চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম 'পগলা পার্বতীর গীত'; পার্বতী এখানে কৈলাসবাসিনী পার্বতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই,

[১] আহিনর মাহতে দেবীর অষ্টমী
হাঁহ কাটে পাঠা কাটে পার জাকে জাক।
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভাল্লে থাক॥
—অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, প্রথম ভাগ।

[১০] বিয়া নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম ভাগ।

পার্বতী এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে যুঝিবার একটি গ্রাম্য বধু,—আর 'পগলা' বা পাগলা শিবাই এখানে যে-কোনও একটি গোঁয়ার স্বামী। কোন্দলের ফলে পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, 'পগলা' শাসাইতেছে, পাইলেই কিলাইবে। সমস্ত গানে 'পগলা' ও 'পার্বতী'র উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। 'পগলা' বলিতেছে, 'মায়ের ঘরে তুই যদি যাবি পার্বতী তবে পথে খাপ দিয়া ধরিব।'

মারর ঘরলৈ যাবি তঁএ পার্বতী
বাটত খাপে দিয়ে ধরিম।

পার্বতী বলিতেছে—

বাটত খাপে দিয়ে ধর তঁএ পগলা
হাবিত লরে মারি পরিম॥

'বাটে খাপ দিয়া ধরিবে যদি পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢুকিব।' 'পগলা'ও ত ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল—

হাবিত লরে মারি সোমা তঁএ পার্বতী
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধরিম।

'জঙ্গলে দৌড়াইয়া যদি ঢুকিয়া পড়িস্ পার্বতী, তবে জঙ্গলে আগুন দিয়া তোকে ধরিব।' পার্বতীও অত সহজে ধরা পড়িবার মেয়ে নয়; সে বলিল—

হাবিত জুয়ে দিয়ে ধর তঁএ পগলা
ধোঁৱারে লগতে উড়িম॥

'জঙ্গলে আগুন দিয়া যদি ধরিস্ তুই পাগলা, আমি তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িব।' 'পগলা' বলিল—

ধোঁৱার লগতে উড় তঁএ পার্বতী
হাঁকুটি জোরায়ে ধরিম।

'ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িস্ যদি তুই পার্বতী তবে আঁকশি জোড়া দিয়া দিয়া ধরিব।' পার্বতী উত্তর করিল—

হাঁকুটি জোরায়ে ধর তঁএ পগলা
তোরে বড় বিলত পড়িম॥

'আঁকশি জোড়া দিয়া দিয়া যদি ধরিস্ তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পড়িব।' 'পগলা' বলিল, 'বড় বিলে পড়িলে জাল বাইয়া ধরিব'; পার্বতী বলিল, 'তবে শামুক হইব'। 'পগলা' বলিল, 'তবে তোকে পোড়াইয়া চুন করিয়া খাইব'। পার্বতী উত্তর করিল,—'তবে তোর দুই গাল পোড়াইব'। 'পগলা' বলে,—'গাল পোড়াইলে তোকে তেল ঘষিয়া ঘুচাইব।' পার্বতী বলে, 'তবে আমি সরিষা জন্ম ধরিব'। 'তোকে তবে তেলীর ঘানিতে ফেলিব'। 'তবে খইল জন্ম ধরিব'। 'তোকে তবে বাড়ির কোণে ফেলিব'। 'আমি তবে বাড়ির কোণে বাড়ির বড় গাছ হইব'।

তখন 'পগলা' বলিল,—'বাড়ির বড় গাছই যদি হবি তুই পার্বতী তবে তোকে কাটিয়া নাও করিয়া বাহিব'।

বাড়ির বড় গছ হবি তঞি পার্বতী
তোকে নাও কাটি বাম।

গ্রাম্য পার্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তর করিল—

মোকে নাও কাটি বাবি তঞি পগলা
মাঝতে বুরায়ে মারিম॥[১১]

'আমাকে নাও কাটিয়া বাইবি যদি তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুবাইয়া মারিব।'

এই 'গারলীয়া গীতে'র মধ্যে 'টোকারী নাম' নামে একটি গান দেখিতে পাই, সেখানে আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দেখিতে পাই; লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই আবার কিছু কিছু সাধনার কথা। টোকারী হইল কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে 'গুণা' বা তার বাঁধিয়া একরূপ বাদ্য যন্ত্র। কৈলাসের যে গাছটিতে মেলিতেছে দুইটি পাতা—নীচে ছড়াইয়া পড়িতেছে শিকড়, সেই গাছই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছেন মহাদেব—টোকারীর জন্য ভাল কাঠ কোথায় পাওয়া যায়। ভাল কাঠ বাছিয়া মহাদেব যখন টোকারী সাজাইলেন তখন পার্বতী পথের মধ্যে আনিয়া দিলেন, 'গুণা' বা তার; এ-গুণা চারিটি—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও সুষুম্নার মধ্যবর্তী চিত্রা—এই চারিটি নাড়ীই হইল চারিটি 'গুণা'।

মহাদেউ গোসাঞে টোকারী সাজিলে
বাটে পারেবতী গুণা।
ইঙলা পিঙলা চিত্রা সুষুম্না
এই চারিগাছি গুণা॥

কিন্তু ইহার পরই দেখিতেছি শিব পার্বতীকে ভাঙ দিতে বলিতেছেন, আঁটিয়া কলা খাইতে চাহিতেছেন—এই-সব খাইয়া টোকারী হাতে ভিক্ষায় যাইবেন। আর ভিক্ষায় যাইয়াই বা কি হইবে, বৃদ্ধ ভিখারিকে কুকুরে কামড়ায়—বালকে ঢিল ছোঁড়ে—ভিক্ষায় মেলে না খুদও।

ছাঙ্গর ভাঙ্গএ মুঠি নমাই আন পার্বতী
আঁটিয়া কলেরে খাওঁ।
কৈলাসর টোকারী নমাই আন পার্বতী
ভিখা মাগিবলৈ যাওঁ॥
দুখরে উপরি দুখ।
কুকুরে কামোরে ছরালে দলিয়াই
ভিখাতো নিমিলে খুদ॥

[১১] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম ভাগ।

অসমীয়া লোক-সংগীতের আর-একরূপ সংগীত হইল 'আইনাম' বা 'আইর নাম'। সাধারণভাবে দেবীই হইলেন 'আই', দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সংগীত তাহাই 'আই নাম'। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান করিয়া থাকেন। আসামের এই 'আই নামে'র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতলা দেবী; তিনিই ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, দুর্গা। গানগুলি গীত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার সম্মুখে। একদিক্ হইতে তথ্যটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'কালিকা-পুরাণে' যেভাবে কামরূপের মহিমা কীর্তিত হইতে দেখি তাহাতে মনে হয় গ্রন্থখানি ঐ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকার উদ্ভব না হইলেও প্রসিদ্ধি এই অঞ্চলেই ছিল; কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্বারা এই অনুমান মোটেই সমর্থিত হয় না। কালী বা কালিকার উল্লেখ একজন সাধারণ দেবীরূপে মন্ত্রে-তন্ত্রে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও,[১২] কালী বা কালিকার প্রসিদ্ধি আসামে—এমন কি কামরূপে অঞ্চলেও কিছুই নাই। কালিকা-পুরাণের মধ্যে দেবীরূপে কালিকার যে প্রাধান্য তাহাই বা ঐ অঞ্চলে এক সময়ে অমন করিয়া গড়িয়া উঠিল কেন এবং পরবর্তী কালে তাহা একেবারে উবিয়াই বা গেল কেন তাহার যথোপযুক্ত কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি না। কামরূপ-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছু কিছু কারণের উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। 'আই নামে' দেবীর সব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলারূপিণীত্বের পরিচয় আছে।

আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দর নাই।
অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এই রূপে ফুরা বেড়াই॥

কিন্তু ঠিক ইহার পরের পংক্তিতেই দেখি—

আই ভগবতী আই, বসন্তে বা বলাই।

সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নীলগিরি বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, কৈলাসের দেবী।

আই ভগবতী আই, তোমার নীলাচলে রতি।
দুখানি চরণত পার্থনা করিছো রক্ষা করা ভগবতি॥
আই ভগবতী আই, রাতিকো করিলা দিন।
এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাতে লৈলা বীণ॥[১৩]

ব্রজগোপীরা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন: সেই

[১২] তুলনীয় :—

বান্ধিলা সাগরে নেদিলা উত্তর। তেখনে গৈলা কালিকার ঘর॥
কালিকায়ে আছে দুই শাখা পিন্ধি। তেখনে কালিকাই পেলাইলেক বান্ধি॥
বান্ধ পাই কালিকাই আচন্ত চাই। কিমক বান্ধিলা আমাক পাই॥ ইত্যাদি।
—পক্ষীরাজ মন্ত্র, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম ভাগ।

[১৩] আইর নাম, ঐ।

উপাখ্যানের প্রভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভক্ত গোপীরা—আর আইয়ের সঙ্গে যুক্ত হরি-কথা।

আসন পারি দিয়া বহক মহামায়া
থাকক হরিকথা শুনি।
সকলো গোপীয়ে একান্ত চিতেরে
বোলা দুর্গতি নাশিনী॥[১৪]

অন্য একটি সুন্দর পদে দেখি—

আসনতে বহি আয়ে নমাই দিছে ভরি।
গোপিনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধরি॥
আসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর।
মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর॥
আসনরে চউপাশে ফুলিছে টগর।
আসনতে বহি আয়ে ভাঙিছে জগর॥
আসনরে চউপাশে ফুলিছে কেতেকী।
দাল ভাঙি ফুল পারে হররে পার্বতী॥[১৫]

আমরা জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বা হইতে সপ্তদেবীর পরিকল্পনা জাগিয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক-সঙ্গীতগুলিতে বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, 'আইরে সাত ভনী'—আইরা সাত বোন। গানগুলির মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আর্তিই অনেক স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত তাই প্রায় সর্বত্রই 'দুখীয়া' বলিয়া বর্ণিত। একটি পদে আছে—

দুখীয়ার পুতলা আয়ে তুলি দিলে,
আইর মান ধরমী নাই।
আইর নাম শীতলা দুখীয়ার পুতলা
দি যোঁৱা বুকু জুরাই॥

আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই 'আই' শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন করিয়া নামাইয়া আনিতে হইবে; একটি 'আই'-য়ের গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া সেখানে এক আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরে তাঁহার নিকটে আর্তি-নিবেদন। কিন্তু এই 'দুখীয়া'র 'পুতলা'র জন্যই যে সর্বত্র আর্তি ফুটিয়াছে তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভীর ভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

কি দিয়া পূজিম আই চরণ দুখানি।
তোমাক পূজিবর বস্তু নেদেখোঁ গোসানী॥

[১৪] আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম ভাগ। [১৫] ঐ।

ফুল দি পূজিলো হে'টেন ভোমোরাই চুমিলে।
দুগ্ধ দি পূজিলো হয় ডামুরীয়ে পিলে॥
ধন দি পূজিলো হয় আপোনাতে আছে।
জল দি পূজিলো হয় বিতালিলে মাছে॥
অন্ন দি পূজিলো হয় গরুৱে খছিলে।
বস্ত্র দি পূজিলো হয় মার দি সিজালে॥
দেহ দি পূজিলো হয় পাপে জর্জরিত।
মন দি পূজিলো হয় মনর নাই থিত॥
যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুৱা।
নাম দি পূজিম মাতৃ গোধূলি যে পুৱা॥[১৬]

ফুল দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে; দুধ দিয়া পূজিলে হয়, দুধ বাছুর পান করিয়াছে। ধন দিয়া পূজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। জল দিয়া পূজিলে হয়, জল নষ্ট করিয়াছে মাছে। অন্ন দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু অন্ন (ধান) ত গোরুদ্বারা মাড়ান হইয়াছে, বস্ত্র ত মাড় দিয়া অপবিত্র করা হইয়াছে; দেহ দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জর্জরিত। মন দিয়া পূজিলে হয়, মনের নাই স্থিতি। বাহিরের যে উপচারের কথাই ভাবা যায় সব উপচারই অপবিত্র—সুতরাং শুধু মায়ের নাম দিয়াই মাকে সন্ধ্যা-সকালে পূজা করিতে হইবে।

বাঙলা-আসাম অঞ্চলে একরূপ ঝাড়-ফুঁকের তুক্‌তাক্‌ মন্ত্র আছে, ইহার একটা বিশেষ ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ত্র-ছড়া আছে তাহা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার সহিত মিশ্রিত কতকগুলি আপাত-অর্থহীন মন্ত্র; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তন্ত্রোদ্ধৃত মন্ত্র—কোথাও কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলিতে দেখি শিবের দোহাই—কতকগুলিতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই—কতকগুলিতে শুধু দেবীর দোহাই। সাপের বিষ বা অন্য কিছুর বিষ অথবা বিষাক্ত ঘা প্রভৃতি সম্বন্ধে যত তুক্‌তাক্‌ মন্ত্র সেখানে মনসা বা পদ্মাবতী বা বিষহরীর নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী শিবানী, ভবানী, দুর্গা, চণ্ডিকা। এই তুক্‌তাকের ব্যাপারে কামরূপ-কামাখ্যার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি বলিয়া বাঙলাদেশের এই-জাতীয় অনেক মন্ত্রেও কামরূপ-কামাখ্যার দোহাই দেখিতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্ত্রে ত সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া বাঙলাদেশের মেয়েদের—বিশেষ করিয়া কুলবধূগণকে যে-সব ভূতে ধরে তাহারা সাধারণতঃ কামাখ্যারই কোনও যোগিনী। কামরূপ এই তুক্‌তাকের দেশ বলিয়াই

[১৬] আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম ভাগ।

বহুদিনের প্রসিদ্ধি। কামরূপের একখানি নিজস্ব তন্ত্র আছে, কাম-রত্ন-তন্ত্র,[১৭] ইহা মুখ্যতঃ তুকতাকেরই তন্ত্র। অসমীয়া ভাষায় রচিত এইরূপ বিবিধ রকমের তুক্‌তাক্‌ ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাধিক। গৃহকম্পন-মন্ত্রে দেখি—

রজত পিতল আরু তাম কাস।
খল খল দেবী তুলিলা হাস॥
যেবে সুনিবি মায়ের দোহাই।
হরণ বস্তুক পেলাই দিবি তাই॥[১৮]

'তাম্বূল ঝারা' মন্ত্রে—

ফল ধরি ডাক পারে গোসিনী।
ভুতুনী প্রেতনী পিসাচিনী বিড়ালি কিল কিল ধনি,
আই বিড়াক বন্দি করোঁ দেবীর আজ্ঞাক মানি। ইত্যাদি।

'কদলী-পত্র ঝারা' মন্ত্রে দেখি, 'দুর্গার তলপে ঝারিলোঁ পত্র।' 'চিকনি ঝারা' মন্ত্রেও দুর্গার তলপ এবং ভবানীর শপত। 'সূত্র ঝারা'য় দেখি 'মহামাই দেবী' নিজেই বাঁধিবার সূত্র কাটিয়া দেন এবং শেষে দেখি—

দেবীর চরণ চিন্তি বোহো একমনে।
এহি গাঠির উপরে যি করিব যায়।
খাণ্ডা ধরি কাটিব তাক কালিকা চণ্ডী মায়।

'সরিসা ঝারা' মন্ত্রে 'দেবীকার বর'। 'দিশ বন্দি' মন্ত্রে দেখি, 'ওঁ নাভিকুণ্ডলী দেবী ভবানীর সপত। মোর বচন নুহি দুর্গাদেবীর ডাক।' 'ধনুবার্টলি' মন্ত্রে 'মাটি দেবী আনিলা কাটি' এবং 'বাটলি হৈ গেল দেবীর পাকত্‌'। 'গড় মন্ত্রে' দেখি, 'মহাদেবী দুর্গাদেবী পাতি আছে খোড়।' 'বিড়া বন্ধ' মন্ত্রে 'মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্গার বর'।

---

[১৭] হেমচন্দ্র গোস্বামী-সম্পাদিত, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, প ৪৪-৪৫।
[১৮] অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ১ম খণ্ড।

চতুর্দশ অধ্যায়

হিন্দী শাক্ত সাহিত্য

হিন্দী সাহিত্যের প্রসার উত্তরভারত এবং মধ্যভারতেই বেশি। ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে শাক্ত-ধর্মের তেমন একটা প্রাধান্য কোন দিনই হয় নাই; তাই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাহিত্যে শাক্ত-সাহিত্যের পরিমাণ খুব বেশি নয়। হিন্দী সাহিত্যে শাক্ত-সাহিত্য যাহা পাওয়া যায় তাহার একটা বড় অংশ লোক-সাহিত্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ করিবার এবং আলোচনা করিবার যোগ্য। পুরাণের যুগ হইতে উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত বিন্ধ্যাচল একটি অতি প্রসিদ্ধ দেবী-ক্ষেত্র। পুরাণে আমরা বহু স্থলে দেবীকে বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের অতি-প্রসিদ্ধ একটি দেবী-তীর্থ। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কালেও দেবীর তিনটি রূপ দেখিতে পাই; গঙ্গাতীরের মন্দিরে দেবী বিন্ধ্যেশ্বরী নামে পূজিতা; আর পাহাড়ের উপরে গুহামধ্যে তিনি অষ্টভুজা দুর্গারূপে পূজিতা; পাহাড়ের উপরেই কিছু দূরে নির্জন বন-পরিবেশে তিনি কালীমূর্তিতে পূজিতা। পণ্ডিতগণ দেবীর এই তিন রূপে তিন ক্ষেত্রে অবস্থানকেই দেবীর ত্রিকোণ-তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবীর পান্ডা-পূজারী যথেষ্ট সংখ্যক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে তেমন কোনও জনপ্রিয় শাক্ত-সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই। অবশ্য হিন্দীতে 'দুর্গা-চালীসা' এবং 'বিন্ধ্যেশ্বরী-চালীসা'—অর্থাৎ চল্লিশটি করিয়া দেবী-বিষয়ে পদ প্রচলিত আছে[১] এবং কোনও কোনও গৃহী তাহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পাঠ করিয়া থাকেন। নমুনাস্বরূপ দেবীদাস-রচিত দেবীর 'দুর্গা-চালীসা'র উল্লেখ করিতে পারি।[২]

[১] উর্দুতে লিখিত চালীসাও পাওয়া যায়। একশত বৎসর পূর্বে লালা শঙ্করলাল্ কর্তৃক উর্দুতে রচিত একটি 'শক্তি-চালীসী' 'কল্যাণ' পত্রিকার 'শক্তি-অংক'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে।

[২] নমো নমো দুর্গে সুখ করনী। নমো নমো অম্বে দুঃখ হরণী॥
নিরংকার হৈ জ্যোতি তুম্হারী। তিহুঁ লোক ফৈলী উজিয়ারী॥
শশি লিলাট মুখ মহা বিশালা। নেত্র লাল ভৃকুটী বিকরালা॥
রূপ মাতু কো অধিক সুহারৈ। দরশ করত জন অতি সুখ পাবৈ॥
তুম সংসার শক্তি লৌ কীনা। পালন হেতু অন্ন ধন দীনা॥
অন্ন পূরনা হুই জগপালা। তুমহী আদি সুন্দরী বালা॥
প্রলয় কাল সব নাশন হারী। তুম গৌরী শিব শংকর প্যারী॥
শিব যোগী তুম্হরে গুণ গাবৈ। ব্রহ্মা বিষ্ণু তুম্হেঁ নিত ধ্যাবৈ॥ ইত্যাদি।
—হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কলিকাতা।

প্রায় ঠিক একই রকমের 'বিন্ধ্যেশ্বরী-চালীসা'রও প্রচলন আছে।[৩]

এই সব চালীসা ব্যতীত বিন্ধেশ্বরী সম্বন্ধে প্রকীর্ণ গীতও কিছু কিছু পাওয়া যায়। আহ্লাদ মিশ্র-কর্তৃক সংগৃহীত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

বজত সকারে হৈঁ নগারে অংবিকা কে দ্বারে
সুর নর মুনি আদি হাথ জোড় হৈঁ খড়ে।
পাৱত ন পার বিরুদাৱলী কো ৱেদ চার,
কহত অহীস আদি বিবুধ বড়ে বড়ে॥
'জন জগন্নাথ' সীস হাথ রখ অভয়দ,
তৱ গুন গানহী সোঁ কাম উস কো পড়ে।
কাম কোহ মদ মোহ লোভ আদি সুভটোঁ সে
সাহস কা অস্ত্র বাঁধে ৱহ সর্ৱথা লড়ে॥

'অম্বিকার দ্বারে সকালে নাগড়া বাজিতেছে, সুর নর মুনি আদি হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যশোগাথার সীমা পায় না চারি বেদ,—অহীশ (শেষ নাগ) আদি বড় বড় পণ্ডিতও বলিতে বলিতে শেষ পায় না। জগন্নাথের মাথায় অভয়প্রদ হাত রাখ, তোমার গুণগানেই উহার সব কাজ; কাম-ক্রোধ-মদ-মোহ লোভ আদি বড় বড় যোদ্ধাগণের সঙ্গে সাহস-অস্ত্র বাঁধিয়া লইয়া সর্বথা লড়িব।'[৪]

বিন্ধ্যাচলবাসিনী সম্বন্ধে একটি লোক-সঙ্গীতে দেখিতে পাই—

গয়ে পর্বত ভৱন তেরা মাঁ নীচে গংগ বহাই,
ৱিন্ধ্যাচল মাঈ ওহো ৱিন্ধ্যাচল মাঈ।

৩ যথা—

জয় জয় জয় ৱিন্ধ্যাচল রানী। আদি শক্তি জগ ৱিদিত ভৱানী॥
সিংহৱাহনী জৈ জগ-মাতা। জৈ জৈ জৈ ত্রিভুৱন সুখদাতা॥
কষ্ট নিৱারনি জৈ জগদেৱী। জৈ জৈ জৈ অসুরসুর সেৱী॥
মহিমা অমিত অপার তুম্হারী। শেষ সহসমুখ ৱর্ণত হারী॥
দীননকো দুখ হরত ভৱানী। নহিঁ দেখ্যোঁ তুম সম কোউ দানী॥
সব কর মনসা পুরৱত মাতা। মহিমা অমিত ভক্ত ৱিখ্যাতা॥ ইত্যাদি।
হিন্দী-প্রচারক পুস্তকালয়, কলিকাতা।

৪ জগন্নাথ মিশ্রের আর-একটি গান আছে—

দানৱ দলনি আগমন নভ মেঁ ৱিলোক
জোগিনী জমাত সাথ মৈরো অগৱানী হৈ।
খপ্পর খরগ অরু ৱিসিখ সরাসন লৈ
দনুজ দলনি সুর নর সুখদানী হৈ॥
বিধি হরি হর কর জোড়ে সানুৱাগ খড়ে
জয় জয় নাদ মেঁ নিমগ্ন সব ৱাণী হৈ।
ৱিংধ্য পর ৱাসী ৱিংধ্যৱাসিনি ৱিভা ভৱন,
জ্যোতি হৈ অখংড জহোঁ রাজী ভৱানী হৈ॥

নংদ গোপ ঘর জন্ম লিয়ৌ হৈ মথুরা মেঁ প্রগটাই।
কংস রাজ জব পটকন লাগা ছুট আকাশ সো জাঈ শব্দ সুনাঈ॥

... ...

হাথ জোড় কর করুঁ বীনতী বীনতী সুন সাঁবল মাঈ
সুমর চরণ ধ্যানু জস গাবে হম বালক তুম মাঈ কলাসংবাঈ॥[১]

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী সম্বন্ধে মৈথিলী কবি হর্ষনাথ ঝা-রচিত একটি গানও দেখিতে পাই।[২]

হিন্দী কবিগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হয়; সাধারণভাবে তাঁহার লিখিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' কাব্য চতুর্দশ শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হয়; যদিও এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই, কেহ কেহ 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'পৃথ্বীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে রক্তলোলুপা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা বা কালী বলিয়া বর্ণিত দেখি। একটি পদে দেখি দেবী চণ্ডিকা ইন্দ্রকে বলিতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই-সব যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি ক্ষুধিত আছি, আমাকে শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া দাও।

কহৈ চংডি সুরপতি সুনহি, রুধির অঘারহু মোহি।
রামাইন ভারথ ছুধি, রহী নিহারৈ তোহি॥

উত্তরে আবার দেখি, 'হে চণ্ডি, যদি কনৌজ এবং দিল্লী রাজ্যে লড়াই লাগিয়া যায়, তবে যোগিনীদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইবে, শিবের গলায় মুণ্ডমালা সুশোভিত হইবে, আর তোমার রক্ত-পাত্রও পূর্ণরূপে ভরিয়া যাইবে।

চংডী বরণ পুজ্জাই ত্রিখ, মংডি মুংড উরমাল।
জো কনবজ ঢিল্লিয় বয়র, ভরহিঁ পত্র রজবাল॥

অপর একটি পদে দেবীর স্তুতিতে বলা হইয়াছে—'যখন দেবতাদের অসুরগণের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তুমি দেবতাগণকে দিয়াছিলে অমৃত—আর অসুরগণকে করিয়াছিলে মোহিত; মহিমর্দিনী কালী তিন লোকে সমস্ত রণে জয়কারিণী, জালন্ধরকে ভস্মকারিণী, রামের মতনই দশস্কন্ধ রাবণের বধকারী; যখন যখনই দেবতাগণের উপরে বিপৎপাত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি

[১] ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ।

[২] জয় জয় বিন্ধ্যনিবাসিনি তনুরুচিনিন্দিতদামিনি॥
আনন শশধরমণ্ডল তীনি নয়ন শ্রুতিকুণ্ডল॥
কনককুশেশয় আসন বসয় নিকট পঞ্চানন॥
শঙ্খ চক্র নিরভয় বর কর ধরু শশধর শেখর॥
তুঅ পদ পঙ্কজ মধুকর হর্ষনাথ ভন কবিবর॥
—হর্ষনাথ কাব্যগ্রন্থাবলী, অমরনাথ ঝা প্রকাশিত।

উঁহাদিগকে অভয় দিয়াছ; হে বীরাধিবীর, দানবদহনী, আমাকে তোমার চরণের শরণে রাখ।'

মহন গহন জব সুরাণি, জুদ্ধ অসুরাং সুর জব্বহ।
অমরাণি অপ্পিয় অমিয়, মোহি অসুরাণি তুমি তব্বহ॥
কালী সুর-মহিখাস, তিপুর জিত্তিয় হর জংগহ।
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংবধ ভংগহ॥
জহঁকহঁ সুরংক দেৱন পরিয়, করিয় অভয় তুম দেৱ তব।
ৱীরাধিৱীর দানৱদহন, চরন সরন হম রক্খি অব॥

মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের মধ্যে একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাসের সমগ্র সাহিত্য-রচনার একটি শাক্ত পটভূমিকা লক্ষ্য করিতে পারি। 'রাম-চরিত-মানস'ই তুলসীদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভক্তরূপে তুলসীদাস সর্বজন-বিদিত। কিন্তু তুলসীদাস-রচিত এই 'রাম-চরিত-মানসে'র বক্তা হইলেন স্বয়ং শঙ্কর, এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উমা। ইঁহারা যে শুধু বক্তা ও শ্রোতাই ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চরিত-মানসে'র মধ্যেই এই জিনিসটি বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শঙ্কর-ভবানীই হইলেন শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় ভক্ত—মর্ত্যে তাঁহারাই রামভক্তির প্রচারক। তুলসী-দাস বলিয়াছেন,—এমন সুন্দর রাম-চরিত ইহা শিবই রচনা করিয়াছিলেন,—এবং রচনা করিয়া আবার কৃপা করিয়া উমাকে শুনাইয়াছিলেন।

সম্ভু কীন্‌হ যহ চরিত সোহাৱা।
বহুরি কৃপা করি উমহিঁ সুনাৱা॥ (বালকাণ্ড)

রাম-চরিত রচনা করিয়া মহেশ নিজের 'মানসে' ইহা রাখিয়া দিয়াছিলেন; সুসময় পাইয়া 'শিবা'কে বলিয়াছিলেন।

রচি মহেস নিজ মানস রাখা।
পাই সুসমউ সিৱা সন ভাখা॥ (ঐ)

ভবানীরও রাম-চরিত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার অন্ত ছিল না, নানা-ভাবে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই উত্তর দিয়াছেন।—

কীন্‌হ প্রশ্ন জেহি ভাঁতি ভৱানী।
তেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী॥ ইত্যাদি। (ঐ)

অন্য দিকে আবার দেখিতে পাই, শিব-পার্বতীর পরম-ভক্ত হইলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। আসলে মনে হয়, তুলসীদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন করিয়া রাম-ভক্তি প্রচার করিয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তিনি একটি প্রবল শৈব-শাক্ত মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সেই শিব-পার্বতীর ভক্ত-সমাজে রামভক্তিকে সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসীদাস উমা-

মহেশ্বরকেই রামভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উমা-মহেশ্বরকেই কেবল রামভক্ত করিয়া তুলিলে শৈব-শাক্তগণের মনে একটা ক্ষোভ দেখা দিতে পারে, এইজন্য তিনি সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ্বরের ভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তুলসীদাসের ধর্ম-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। কাশীধাম তুলসীদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শিব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অপর প্রসিদ্ধ দেবীক্ষেত্র বিন্ধ্যাচলও কাশী হইতে বেশী দূরবর্তী নয়, আশি মাইলের মত হইবে। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-মানসের বিভিন্ন স্তরে পার্বতী-মহেশ্বরের প্রভাব থাকিবারই কথা। সেই প্রভাবের পরিচয় তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানসে' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ।
বরনউঁ রামচরিত চিতাচাউ॥ (বালকাণ্ড)

'শিবাকে ও শিবকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাহিত চিত্তে আমি রামচরিত বর্ণনা করিতেছি।'

সপনেহু সাঁচেহু মোহি পর জো হর গৌরি পসাউ।
তৌ ফুর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভনিতি প্রভাউ॥ (ঐ)

'স্বপ্নেও যদি আমার উপরে হর-গৌরী সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাষার কবিতার বিষয় আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা সত্য হউক।'

অন্যত্রও দেখি, তুলসী রাম-মহিমা গান করিয়াছেন 'সুমিরি উমা-বৃষকেতু'। তখনকার দিনে সাধু-সন্তগণের মধ্যে গিরি-নন্দিনীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা যায় তুলসীর এই উক্তি হইতে—'রামনাম হইল সাধু ও বিবুধকুলের হিতের জন্য গিরি-নন্দিনীর ন্যায়'—'সাধু বিবুধ কুল হিত গিরি নংদিনি'। অন্যত্র তুলসী বলিয়াছেন, 'কলি দেখিয়া জগহিতের জন্য হর-গিরিজা শবর মন্ত্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'[৭] এই শবরমন্ত্র হইল অর্থহীন ছন্দোহীন মিলহীন তুক্‌তাক্ মন্ত্র। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য করিয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-গিরিজাকে অবলম্বন করিয়া অনেক শবরমন্ত্রের প্রচলন ছিল।

'রাম-চরিত-মানসে' দেখা যায়, হর প্রথমাবধিই রামভক্ত হইলেও দেবীর মনে রাম-বিষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি উপাখ্যানে দেখি, একদিন সীতাবিরহকাতর

কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা
সাবর মন্ত্র জাল জিন্‌হ সিরজা॥ (বালকাণ্ড)

রামচন্দ্রকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর 'জয় সচ্চিদানন্দ জগপাবন' বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিতেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন সতী।—

সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখী।
উর উপজা সন্দেহ বিসেখী॥

শিবকে তখন নানাভাবে রামচরিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল। মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভক্তিকে যত সহজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, শাক্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সতীকে অবলম্বন করিয়া তুলসীদাস দক্ষযজ্ঞ ও সতীদেহত্যাগের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পরে তিনি খানিকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহেশ্বরের পরিণয়-কাহিনী। এই কাহিনী মোটামুটিভাবে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনা অবলম্বনে রচিত। তুলসীদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুগামী যে, দেখিলেই বোঝা যায়, কালিদাসের কাব্যের সহিত তুলসীদাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তুলসীদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং শিবের সহিত তাঁহার পরিণয় লইয়া 'পার্বতী-মঙ্গল' নামে একখানি পৃথক্ কাব্যই রচনা করিয়াছিলেন। 'পার্বতী-মঙ্গলে' 'রাম-চরিত-মানস' হইতে কিছু বিস্তৃত বর্ণনা দেখি, বিষয়বস্তুরও সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই তুলসীদাস তাঁহার নিজের সমাজকে অনেকখানি আনিয়া ফেলিয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খানিকটা লৌকিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' আছে, 'একদা স্বেচ্ছাগতি নারদ পিতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন,—বিশুদ্ধ প্রেমপ্রযুক্ত এই কন্যা মহাদেবের অর্ধাঙ্গভাগিনী এক বধূ (সপত্নীশূন্যা ভার্যা) হইবে।' তুলসীদাসের 'রাম-চরিত-মানসে' দেখিতে পাই, দেবর্ষি নারদ একদিন বেড়াইতে আসিলে হিমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাকিয়া দেবর্ষিকে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অনেক ভালর কথা বলিয়া নারদ উমার হস্তরেখা বিচার করিয়া কিছু মন্দের কথাও বলিলেন,—

অগুন অমান মাতু পিতু হীনা।
উদাসীন সব সংসয় ছীনা॥
জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলিহি পরী হস্ত অসি রেখ॥

'গুণহীন মানহীন মাতা-পিতাহীন, উদাসীন, সব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এমন—জটিল যোগী অকাম-মন, নগ্ন এবং অমঙ্গলবেশধারী—এইরূপ স্বামী ইহার মিলিবে, হাতের রেখা সেইভাবেই পড়িয়াছে।' এই 'অবগুন' খণ্ডাইবার জন্য নারদ তপস্যার কথা বলিলেন; মা মেনকাকে বুঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায়

গেলেন। 'পার্ব্বতী-মঙ্গলে'র বর্ণনাও অনুরূপ। সেখানে নারদ বলিলেন. 'মোরেঁহু মন অস আব মিলিহি ৱর বাউর'—'আমার মনে এই হইতেছে যে ইহার "পাগল" বর জুটিবে'। এই কথা শুনিয়া মাতা-পিতাকে বুঝাইয়া উমা নিজেই তপস্যায় গেলেন।

হর-পার্বতীর বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া 'অল্পেয়ে' নারদকে একচোট গাল সকল বাঙালী কবিই মেনকা এবং প্রতিবেশিনীগণের মারফতে পাড়িয়াছেন, এ ব্যাপারে তুলসীদাসও কসুর করেন নাই। বর দেখিয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে করিয়া 'শ্যাম সরোজে'র চক্ষু দুইটি জলে ভারী করিয়া কন্যার কপালের দুঃখের কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদিলেন—এবং শেষ পর্যন্ত বলিলেন—

তুম্হ সহিত গিরি তে গিরউঁ পারক জরউঁ জলনিধি মহঁ পরউঁ।
ঘর জাউ অপজসু হোউ জগ জীৱত বিবাহ ন হেঁী করউঁ॥

'তোমার সহিত গিরি হইতে পড়িব, আগুনে জ্বলিব, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; ঘর যাউক, অপযশ হউক, জীবন থাকিতে তোমার বিবাহ দিব না।'

ইহার পরই নারদকে গাল পাড়িবার পালা—

নারদ কর মৈঁ কাহ বিগারা। ভৱন মোর জিন্হ বসত উজারা॥
অস উপদেসু উমহি জিন্হ দীন্হা। বৌরে ৱরহিঁ লাগি তপু কীন্হা॥
সাঁচেহু উন্হকে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ কি জান প্রসৱ কী পীরা॥

'নারদের আমি করিয়াছি কি অনিষ্ট—যিনি আমার ভরাবাড়ি উজাড় করিলেন! যিনি উমাকে দিলেন এই উপদেশ—পাগলা বরের জন্য করিল তপস্যা। সত্য সত্যই উঁহার মায়াও নাই—মোহও নাই; উদাসীন—না আছে ধন, না ঘর-বাড়ি, না স্ত্রী। পরের ঘর করে নষ্ট, না আছে লজ্জা—না ভয়; বাঁঝা কি জানে প্রসবের বেদনা?'

'পার্ব্বতী-মঙ্গলে' দেখি, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব 'বরাতী' (বরযাত্রী) দেখিয়া গ্রামের বাচ্চাগুলি ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল, এবং ঘরে গিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—

প্রেত বৈতাল বরাতী ভূত ভয়ানক।
বরদ চঢ়া ৱর বাউর সবই সুবানক॥

'প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত—এই হইল বরযাত্রী; আর বলদের উপরে চড়িয়া 'বাউরা' বর—সবই সুন্দর!'

বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েদের দ্বারা কিছু গালাগালির ব্যবস্থা তুলসীদাস না করিয়া পারেন নাই। হিমালয়ের বাড়িতে পাক-শাস্ত্র অনুসারে বহুবিধ রান্না হইবার পরে বরযাত্রিগণকে খাইতে ডাকা হইল; বরযাত্রী দেবতারা খুব আস্বাদ করিয়া খাইতেছেন, আর এদিকে 'নারিবৃন্দ সুর জেঁৱত জানী। লগীঁ দেন গারী মৃদুবানী॥' এবং 'গারী মধুর সুর দেহিঁ সুন্দরি ব্যঙ্গ ৱচন সুনাৱহীঁ।'

'পার্বতী-মঙ্গলে' দেখি বরযাত্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সুর করিয়া গালি দিয়াছেনই, জুয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গালি দিয়াছেন,—'জুআ খেলাৱত গারি দেহি' গিরিনারিহি'। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর শিবকে গালি দিয়া লাভ কি? তাঁহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই!—'অপনী ওর নিহারি প্রমোদ পুরারিহি।'

বিবাহের পরে মায়ের নিকট হইতে পার্বতীর বিদায় গ্রহণ করিবার দৃশ্য তুলসীদাসও বেশ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার মাকে জড়াইয়া ধরিতেছিল—বার বার পড়িতেছিল মায়ের চরণে। স্নেহ-প্রেমের সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার নয়। সব নারীরা আসিয়া দেখা করিলেন উমার সঙ্গে—উমা আবার গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরণা। পরম প্রেমু কছু জাই ন ৱরনা॥
সব নারিন্হ মিলি ভেঁটি ভৱানী। জাই জননি উর পুনি লপটানী॥

তাহার পরে চলিতেই হয়—আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া চলে উমা, সবাই দেয় আশীর্বাদ; চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকাইতে থাকে উমা;—সখীরা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে।

জননী বহুরি মিলি চলী উচিত অসীম সব কাহু দঈ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতুতন তব সখী লেই সির পহঁ গঈ॥

আমরা পূর্বে মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আসিয়াছি যে সীতা দেবী-আরাধনা করিয়াই রামচন্দ্রের ন্যায় বর পাইয়াছিলেন, তুলসীদাসেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই মিথিলায় গিয়া প্রভাতে উঠিয়া গুরুর আদেশে ফুল তুলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে নানাপ্রকার গাছ ও বিবিধ বর্ণের লতাবিতান শোভা পাইতেছিল। গাছে গাছে যেমন নূতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল, তোতা, চকোরের কাকলী ও ময়ূরের নৃত্যে উদ্যান মুখরিত। বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ সরোবর, মণিদ্বারা নির্মিত বিচিত্র সোপান। নির্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর জলপাখীদের খেলা। দুই ভাইয়ের মন মুগ্ধ, মালীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা কিছু ফুল তুলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আসিলেন সীতা, গৌরী পূজিবার জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।—

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী। গাৱহিঁ গীত মনোহর বানী॥
সর সমীপ গিরিজাগৃহ সোহা। ৱরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥
মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেতা। গঈ মুদিতমন গৌরি নিকেতা॥
পূজা কীন্হি অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সুভগ ৱর মাঁগা॥

'সঙ্গে ছিল সুন্দরী চতুরা সখীগণ, তাহারা মনোহর পদের গান গাহিতেছে। সরোবরের সমীপেই ছিল গৌরী-গৃহ; তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। সখীগণসহ সরোবরে স্নান করিয়া সীতা মুদিতমনে

গৌরী-ভবনে গেলেন; অধিক অনুরাগের সহিত করিলেন পূজা, নিজের অনুরূপ সুন্দর বর প্রার্থনা করিলেন।' এই গৌরী-পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া উঠিয়া সীতা উদ্যানে দেখিতে পাইলেন রাম-লক্ষ্মণ—তাঁহার দেহ হইল রোমাঞ্চিত—চোখ অশ্রুসিক্ত।

ব্রজ-অঞ্চলে যে-সব লৌকিক দেবীর গীত পাওয়া যায় তাহাতেও সীতার গৌরী দেবীর কাছে বর-প্রার্থনার প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি, মেয়েরা 'করৱা-চৌথি'র ব্রত করিতেছেন। 'করৱা-চৌথি' হইল কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্থী, এই তিথিতে মেয়েরা গৌরী-ব্রত করেন। এখানে দেখি, মেয়েরা দধির অর্ঘ্য দিয়া গৌরী-ব্রত করিতেছেন, আর বর প্রার্থনা করিতেছেন অযোধ্যার ন্যায় রাজ্য, রাজা দশরথের ন্যায় শ্বশুর, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় স্বামী, লক্ষ্মণের ন্যায় ছোট দেবর, ভরতের ন্যায় বড় দেবর—আর ছোট বোনটির মত একটি ননদ!

মৈং তৌ বরতু রহী উং করৱা-চৌথি, দহীন কে অরঘ দীএ॥
মৈং নেং মাঁগো ঐ অজুধ্যা কৌ রাজু; সুসর রাজা জসরথ-সে।
মৈং নেং মাঁগী কৌসল্যা-সী সাসু, সুসর রাজা জসরথ-সে॥
মৈং নেং ৱর মাঁগে ঐং সিরি রাঁম, দিৱর ছোটে লছিমংন-সে।
মেরে চরত ভরত দেৱর জেঠ, ননংদ ছোটী ভগিনী সী॥[৮]

তুলসীদাস যে তাঁহার সমাজ-জীবন হইতে একটি শাক্ত ঐতিহ্যও লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 'বিনয়-পত্রিকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দেখিতে পাই। প্রথমটি হইল—

দুসহ-দোষ-দুখ-দলনি করু দেৱি! দায়া।
ৱিশ্বমূলাসি, জন-সানুকূলাসি, শর-শূল-ধারিণি, মহামূল মায়া॥
তড়িতগর্ভাংগ সর্ৱাংগ সুন্দর লসত, দিৱ্য পট, ভৱ্য ভূষণ বিরাজে।
বালমৃগমংজু-খংজন-ৱিলোচনি, চংদ্রবদনি, লখি কোটি রতিমার লাজে॥
ইত্যাদি।

স্তবের শেষে কিন্তু প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'দেহি মা! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেম নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাপিয়া॥' ঘনশ্যাম রাম, তুলসী পাপিয়া, প্রেমলাভের জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ভাগবত-পুরাণে দেখি, ব্রজের গোপ-বালিকাগণ কৃষ্ণলাভের পূর্বে কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন। শক্তির উপাসনা করিয়াই যে পুরুষোত্তমে প্রেমলাভ করিতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। দুর্গার কোলে কৃষ্ণের যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পরিকল্পনা এইখান

[৮] ব্রজ কা লোক-সাহিত্য, ডক্টর সত্যেন্দ্র সম্পাদিত।

হইতেই আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মা শক্তিরূপিণী—শক্তির বুক হইতেই ত পুরুষোত্তমের উদ্ভাস।

'বিনয়-পত্রিকা'র দ্বিতীয় দেবীস্তুতিটি হইল এইরূপ—

জয় জয় জগজননি, দেৱি, সুর-নর-মুনি-অসুরসেৱি,
ভক্তি-মুক্তি-দায়িনি, ভয়হরনি, কালিকা।
মংগল-মুদ-সিদ্ধিসদনি, পর্ৱশর্ৱরীশ-বদনি
তাপ-তিমির-তরুনতরনি-কিরনমালিকা॥ ইত্যাদি।

এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই—

তুলসী তব তীর তীর সুমিরত রঘুৱংশ ৱীর,
ৱিচরত মতি দেহি মোহ-মহিষ-কালিকা॥

তুলসীদাস-রচিত 'কবিতাবলী'র মধ্যেও আমরা চারিটি দেবী-বিষয়ক কবিতা দেখিতে পাই। একটি কবিতায় দেখি, মা ভবানী অন্নপূর্ণার নিকটে করুণ আর্তি-প্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই—লালসায় লালসায় ফিরিতে হয় দ্বারে দ্বার দীনদুঃখীর মত—মলিন বদন—মন মেটে না—কেবল খেদ! শক্তি-সামর্থ্য-উৎসাহ শুদ্ধ শ্রাদ্ধে-বিবাহে—মন সতত চঞ্চল—বুঝিতে পারা যায় শুধু ঢোল-তূরীর শব্দ! পিয়াস আছে—বারি নাই, ক্ষুধা আছে—খাইবার 'চানা' নাই—এখন শরণ শুধু ভবানী অন্নপূর্ণা।[১]

উত্তরকাণ্ডের ১৬৮ সংখ্যক কবিতাটির লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী—'মেরে মায় বাপ গুরু সংকর ভবানিএ'। ১৭৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হইয়াছে—

রচত বিরংচি, হরি পালত, হরত হর,
তেরেহী প্রসাদ জগ অগজগপালিকে।
তোহি মেং ৱিকাস ৱিশ্ব, তোহি মেং ৱিলাস সব,
তোহি মেং সমাত মাতু ভূমিধরবালিকে॥
দীজৈ অৱলংব জগদংব ন বিলংব কীজৈ,
করুণা-তরংগিনী কৃপা-তরংগ-মালিকে।
রোষ মহামারী পরিতোষ, মহতারী! দুনী;
দেখিয়ে দুখারী মুনি-মানস-মরালিকে॥

'সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা, হরি পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন—সবই তোমারই প্রসাদ, ওগো চরাচরপালিকে! তোমার মধ্যেই বিশ্বের বিকাশ, সকলের বিলাস তোমারই মধ্যে—আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে, হে মা পার্বতী! অবলম্বন

[১] লালচী ললাত, বিললাত দ্বার দ্বার দীন, বদন মলিন, মন মিটৈ ন বিসূরনা।
তাকত সরাধ কৈ বিৱাহ কৈ উছাহ কছু, ডোলৈ লোল বূঝত সবদ ঢোল তূরনা॥
প্যাসে হূ ন পাৱৈ বারি, ভূখে ন চনক চারি, চাহত অহারন পহার দারি কূরনা।
সোক কো অগার দুখ-ভার-ভরো তৌলৌ জন জৌলৌ দেৱী দ্রৱৈ ন ভৱানী অন্নপূর্ণা॥
—উত্তরকাণ্ড, ১৪৮ সং।

দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব করিও না,—হে করুণা-তরঙ্গিণী—কৃপা-তরঙ্গ-মালিকে, রোষ-মহামারী ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রতি পরিতুষ্ট হও,—দেখ দুঃখার্ত—হে মুনি-মানস-মরালী!'

অপর একটি কবিতায় তুলসী বলিতেছেন,—'মহামারী মহেশানি মহিমা কী খনি, মোদ মংগলকী রাসি, দাস কাসী-বাসী তেরে হৈঁ॥ 'হে সংহাররূপিণী মহেশানি, মহিমার খনি, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসী) তোমরই দাস।' (১৭৪ সংখ্যক)।

নির্গুণপন্থী হিন্দী কবিগণের দোঁহা ও গীতে শাক্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছু থাকিবার কথা নহে। কবীরের দোহাবলী, পদাবলী ও রমৈনীগুলিতে কবীরের ধর্মমতের সকল উদারতা সত্ত্বেও শাক্তধর্ম-সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা দেখা যায়। বোধ হয় শাক্ত সাধনপদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান কবীরের ভাল লাগিত না বলিয়া তিনি বহু স্থানে স্পষ্টভাবে সাধকের পক্ষে শাক্তসঙ্গ নিষেধ করিয়াছেন। দুর্গা প্রভৃতি শক্তিদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন অতি সাধারণ দেবী বলিয়া মনে করিতেন। তাই কবীরকে একাধিক স্থানে বলিতে দেখি, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোটি দুর্গা পদসেবা করেন—'দুর্গা কোটি জাকৈ মর্দন করে'। কবীর অন্যত্র বলিয়াছেন,—'কোটি সকতি সিব সহজ প্রগাসো একৈ এক সমানা'।[১০] সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রহ্মে কোটি শক্তি এবং শিবের প্রকাশ—আমার একের মধ্যেই সব সমাহিত।

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবীরের উপরেও শাক্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নহে। কবীরের নামে একটি বাণী প্রচলিত আছে,—'নির্গুণ হৈ পিতা হমারা সগুণ মহতারী'[১১]—নির্গুণ হইলেন আমার পিতা, সগুণ হইলেন আমার মা। এই কথাটিই কিন্তু আসলে শক্তিবাদের মূল কথা। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শক্তিকে অচলের 'চল' বা অটলের 'টল' বলিয়াছেন। অচল অটলই হইল নির্গুণ, 'চল' বা 'টল'ই হইল সগুণ অবস্থা। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলা হইয়াছে, 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তঞ্চামূর্তং চ'; এই অমূর্তই নির্গুণ অবস্থা—মূর্তই সগুণ। সগুণরূপেই ত মায়ের মূর্তি। সগুণ রূপ হইতেই ত আমরা জাত—সগুণেই প্রতিপালিত—বিধৃত, তাই সগুণই মাতা। কবীরের এই বাণীটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ।

কবীর তাঁহার দোঁহা ও পদাবলীতে বহু স্থলে এক মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগৎপ্রপঞ্চে মোহ ও আসক্তি-উৎপাদক একটা ভ্রান্তিমাত্র। সাধারণভাবে কবীর এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাপিনী আদি-

[১০] কবীর গ্রন্থাবলী, শ্যামসুন্দর দাস-সম্পাদিত (নাগরী-প্রচারিণী-সভা), পরিশিষ্ট, ১৬২।
[১১] এই উক্তিটি কবীরের নামে বহু স্থানে উদ্ধৃত দেখি; কিন্তু কোনও কবীর-গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা এই পদটি খুঁজিয়া পাই নাই।

শক্তিরূপত্ব স্বীকার করেন নাই। মায়ার বিশ্বব্যাপিত্ব যেখানে বর্ণিত সেখানেও তাহার বিশ্বব্যাপিনী শক্তিরূপত্বের আভাস স্পষ্ট নহে। যেমন—

মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহী লোগ।
মায়া জল থলি মায়া আকাসি, মায়া ব্যাপি রহী চহুঁ পাসি।
মায়া মাতা মায়া পিতা, অতি মায়া অস্ততী সুতা।
মায়া মারি করৈ ব্যোহার। কহৈ কবীর মেরে রাঁম অধার।[১২]

অথবা—

মায়া মহাঠগিনী হম্ জানি।
তিরগুন পাশ লিয়ে কর ডোলে বোলত মধুরী বানী॥ ইত্যাদি।

কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার সাধারণ মোহময়ী ভ্রান্তিরূপিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবর্ণিত প্রকৃতি রূপ বা শক্তিশাস্ত্রবর্ণিত শক্তিরূপের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর রচিত বহুসংখ্যক হেঁয়ালী বা সন্ধাভাষা রচিত গূঢ়ার্থক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদগুলি 'উল্টাবাঁসী' নামে প্রসিদ্ধ। এই পদগুলির সাধারণতঃ বক্তব্য হইল এই যে দুনিয়ায় সর্বত্রই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সর্বত্রই দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। জীব তাঁহার 'সহজ' স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া পদে পদে কুহকিনী মায়ার অধীন হইতেছে এবং বন্ধনক্লেশ ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ—হয় মায়ার হস্তে পুত্তলিকা-প্রায়। এই মায়াকে কবীর বহু স্থানেই একটি মোহিনী চঞ্চলা নারীর রূপ দিয়াছেন—যে অসাবধান উদাসীন পুরুষকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বন্ধনগ্রস্ত করিতেছে। একটি পদে কবীর বলিয়াছেন—

কৈসৈং নগরি করোঁ কুটৱারী, চংচল পুরিষ বিচষন নারী।[২]

জীবকে এই 'চঞ্চল পুরুষ' এবং মায়াকে 'বিচক্ষণ নারী' বলিবার মধ্যে পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈংনী'তে বলিয়াছেন—

কহন সুনন কোঁ জিহি জগ কীন্হা, জগ ভুলাঁন সো কিনহুঁ ন চীন্হাঁ।
সত রজ তম থৈং কীন্হীং মায়া, আপণ মাঁঝৈ আপ ছিপায়া॥[১০]

'কহিবার শুনিবার জগৎ (অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগৎ) যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে কেহ চিনিল না। সত্ত্ব রজ তম দ্বারা করিলেন মায়া—আপনার মাঝে আপনাকে লুকাইলেন।' এখানে তাহা হইলে দেখিতেছি পরব্রহ্ম রাম নিজেই সত্ত্ব রজ তম দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ভুলাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা

[১২] পদাবলী, ৮৪; শ্যামসুন্দর দাস সম্পাদিত (নাগরী-প্রচারিণী-সভা)। ২ ঐ, ৮০।
[১০] ঐ।

করিলেন—তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জীব মায়াকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারে না। আবার দেখি,—

সূক বিরখ যহু জগত উপায়া, সমঝি ন পরৈ বিখম তেরী মায়া॥
সাখা তীনি পত্র যুগ চারী, ফল হোই পাপ পুংনি অধিকারী॥

... ...

কহন সুনন কোঁ কীহ্ন জগ, আপৈ আপ ভুলাঁন॥
জিনি নটবৈ নটসারী সাজী, জো খেলৈ সো দীসৈ বাজী॥

"শুষ্ক বৃক্ষ রূপ এই জগৎ উৎপন্ন করিলে—বুঝিতে পারে না কেহ বিষম তোমার মায়া। (এই মায়া-বৃক্ষের) তিনটি শাখা—চারি যুগ পত্র; পাপ-পুণ্যের অধিকার হইল ফল।...কহিবার শুনিবার (ব্যাবহারিক) এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন—আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান; জিনি নাটক করিতেছেন তিনিই সাজিলেন নাট্যশালা; যিনি খেলিতেছেন তিনিই বাজি দেখিতেছেন।" ত্রিগুণাত্মিকা এই মায়া—তাহাই হইল তিন শাখা—চারি যুগ ব্যাপ্ত হইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার জগৎ-প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ। এখানেও দেখিতেছি মায়া যে মূলতঃ ব্রহ্মের আত্মশক্তি এইরূপেই একটা আভাস। আবার দেখি—

এক বিনাঁনী রচ্যা বিনাঁন, সব অয়াঁন জো আপৈ জাঁন॥
সত রজ তম থৈঁ কীহ্নী মায়া, চারিখাঁনি বিস্তার উপায়া॥

'এক "বুনুনী" এক "বোনা" রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সব জানে তাহারা অজ্ঞান। সত্ত্ব রজ তম হইতে মায়া রচিয়াছেন, চারি যুগে বিস্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই যেন এক চতুর 'বুনুনী'র বোনা জাল; সত্ত্ব রজ তম দ্বারা মায়া সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মায়াই চারি যুগে এই 'বুনানি'কে বিস্তার করিয়া দিতেছে। কবীরের এই-জাতীয় পদগুলি আলোচনা করিলেই মনে হয়, পুরাণের যুগে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া ও তন্ত্রের শিব-শক্তির ভিতরে যে একটা জনপ্রিয় সমন্বয় দেখা দিয়াছিল সেই সমন্বয়জাত শক্তিতত্ত্ব একটা সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপে কবীরের নিকটেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; তাই মাঝে মাঝে 'মায়া'র বর্ণনায় তাঁহার কবি-মানসের পুট-ভূমিতে দেখা দিয়াছে মায়ার একটা আদিশক্তি-রূপিণীত্ব। একটি পদে কবীর স্পষ্টই বলিয়াছেন—

দুতিয়া দুহ করি জানৈ অংগ।
মায়া ব্রহ্ম রমৈ সব সংগ॥[১৪]

কবীর এবং মধ্যযুগীয় সগুণপন্থী নির্গুণপন্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের উপরেই তন্ত্রোক্ত নাদ-বিন্দু-তত্ত্বের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

[১৪] কবীর গ্রন্থাবলী (নাগরী-প্রচারিণী সভা), পৃ. ৩০৩।

যোগ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কবিতা-গানেই দেখিতে পাই। সকল ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া চিত্তে সমাহিত হইলে এবং শ্বাস-প্রবাহের সহিত চিত্তপ্রবাহও নিরুদ্ধ হইলে ভিতরে স্ফুরণ হয় এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন করিয়াই পৌঁছাইতে হয় ধ্রুব বিন্দুতে। গুরু নানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণের পদেও আমরা বহুভাবে এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তন্ত্রমতে এই নাদই শক্তি, বিন্দুই শব। এই নাদ-তত্ত্বই কবীর প্রভৃতির শব্দ-তত্ত্ব।

পূর্বেই বলিয়াছি, শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। কিন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি প্রকৃত মাতৃসাধকগণের মত ও সাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকৃত সাধকগণের ক্ষেত্রে শাক্ত কোনও সম্প্রদায় নহে, শাক্ত একটা ভাবমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিরাকার নির্গুণের ঘর বড় উঁচু ঘর, সেখানে মন বেশিক্ষণ রাখা যায় না; তাই তাঁহার সন্তানভাব। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, এই সন্তানভাব কবীরের মধ্যেও এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে। যেমন কবীরের সন্তানভাবের ভারী সুন্দর একটি পদ—

হরি জননী মৈ বালিক তেরা,
কাহে ন ঔগুণ বকসহু মেরা॥
সুত অপরাধ করৈ দিন কেতে, জননীকে চিত রহৈ ন তেতে॥
কর গহি কেস করৈ জো ঘাতা, তঊ ন হেত উতারৈ মাতা॥
কহৈ কবীর এক বুদ্ধি বিচারি, বালক দুখী দুখী মহতারী॥[১৩]

"হরি জননী, আমি তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান দিনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সেদিকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) কেশ হাতে আকর্ষণ করিয়া কত আঘাত করে, তথাপি মাতা স্নেহ ত্যাগ করে না। কহে কবীর এক বুদ্ধি বিচারিয়া, বালক দুঃখী হইলেই মাতাও হয় দুঃখী।"

কবীরের মধ্যে 'মায়া'-সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাই দাদূর ভিতরে মায়া-সম্বন্ধে অনুরূপ অনেক আলোচনা দেখি। বরঞ্চ মায়াই যে শক্তি এই কথাটা দাদূর দুই-একটি পদে কবীর হইতে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে দাদূর একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মায়া আগৈঁ জীব সব ঠাঢ় রহে কর জোড়ি।
জিন সিরজে জল বুদংসোঁ তাসোঁ বইঠে তোড়ি॥

[১৩] পদাবলী, ১১১ সং, (নাগরী প্রচারিণী)।

সুর নর মুনিয়র বসি কিয়ে ব্রহ্মা বিশন মহেস।
সকল লোককে সির খড়ী সাধুকে পগ দেস॥
মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার।
ঠকুরাণী সব জগত কী তীনউ' লোক ম'ঝার॥
মায়া দাসী সংত কী সাকত কী সিরতাজ।
সাকত সেতী' ভাঁডনী সংতো সেতী' লাজ॥
সকল ভুৱন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলাৱণহার।
দাদু সো সুঝৈ নহী' জিস কা বার ন পার॥
মায়া মৈলী গুণ মঈ ধরি ধরি উজ্জ্বল নাৱ'।
দাদু মোহে সবহি' কো সুর নর সবহী ঠাৱ'॥[১৬]

'মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যিনি সৃজিলেন (সমস্ত বিশ্ব) জলবিন্দু হইতে তাঁহার সঙ্গে বসিল (সব সম্বন্ধ) ছিন্ন করিয়া। সে বশ করিয়াছে সুর নর মুনিগণকে, বশ করিয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকে; সকল লোকের শিরে আছে দাঁড়াইয়া—শুধু সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী—তাঁহার দরবারে দাসী; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণী। মায়া দাসী সন্তের—শাক্তের মাথার মুকুট; শাক্তের কাছেই তাহার ভাঁড়িভুঁড়ি, সন্তের কাছে লজ্জা। সকল ভুবন ভাঙ্গে গড়ে—চালায় কত চাতুরী; দাদু, তাহা বোঝাই যায় না—যাহার নাই সীমা-পরিসীমা। মায়া মলিন—সে গুণময়ী—কিন্তু উজ্জ্বল নাম ধরিয়া ধরিয়া—হে দাদু, মোহিত করে সকলকেই—সুর নর সকল স্থানে।'

এই পদটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে, দাদুর ধারণা ছিল, শাক্তগণ আসল সৃষ্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই,—মায়াকেই শক্তিরূপে সারসত্য জানিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পরবর্তী কালের সন্ত কবি দরিয়া সাহেবের অনেক পদের মধ্যেও আমরা মায়ার সমজাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।[১৭] দাদুর কবিতায় আরও একটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দেখি—

অজ্ঞা অপরংপার কী বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফুলৈ ফলৈ পিরথি অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদু জয়জয়কার॥

'অম্বরে বসিয়া আছেন ভর্তা, আর অসীম অপারকে না জানিয়াও সবুজ পট্টাম্বর পরিধান করিয়া ধরিত্রী করিতেছে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। বসুধা সব ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিতেছে,—পৃথিবী অনন্ত অপার; গগন গরজিয়া জলস্থল ভরিতেছে—

[১৬] দাদু, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত।
[১৭] 'জ্ঞান-মূল' ও 'জ্ঞান-রত্ন' দ্রষ্টব্য; ডাঃ ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী লিখিত 'সংত-কবি দরিয়া' দ্রষ্টব্য।

হে দাদূ, জয়জয়কার।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদূর মনে একটি ঐতিহ্যের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করি। এখানে অসীম অনন্ত অজ্ঞাত ভর্তার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্ত্রের একটি জনপ্রিয় মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পরবর্তী কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একটি ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্ত্রমতেও শক্তি হইলেন শিবের সমস্ত কামনা-পূরণের জন্য কামেশ্বরী। এই সকল চিন্তা-ধারাই মিলিয়া মিশিয়া চমৎকার কবিত্বময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে এই সব পদে।

নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদূর অনেক পদ রহিয়াছে। কম্পনাত্মক নাদই সৃষ্ট্যাত্মক আদিস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্ত্রের শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। নাদ বা শব্দের এই সৃষ্ট্যাত্মক আদিস্পন্দন রূপ দাদূর অনেক কবিতায় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। দাদূর শব্দ-সম্বন্ধে একটি পদে আছে—

জ্ঞান লহরী জহঁ তৈঁ উঠে ৰাণী কা পরকাস।
অনভৱ জহঁ তৈঁ উপজৈ সবদ কিয়া নিৱাস॥
জহঁ তন মন কা মূল হৈ উপজৈ ওঁকার।
তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার॥[১৮]

'যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণীর প্রকাশ; যেখান হইতে অনুভব উৎপন্ন হয়—সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তনু মনের মূল—সেখান হইতে জাগে ওঁকার; সেইখানেই দাদূ নিধি পাইবে—নিরন্তর নিরাধার।'

জ্ঞানে চিদ্‌বৃত্তির সক্রিয়তা—সেখানে বাণী (শব্দের মধ্যমা-বৈখরী রূপ)। যেখানে জ্ঞান নাই—শুধু অনুভূতি—সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদি নাদ বা শব্দই হইল ওঁকার। দাদূ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

সবদৈঁ বন্ধা সব রহৈ সবদৈঁ হী সব জাই।
সবদৈঁ হী সব উপজৈ সবদৈঁ সবৈ সমাই॥[১৯]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ন্যায় মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যেরও একটি প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে বৈষ্ণব-কবিতা। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার ন্যায় হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতাও কৃষ্ণলীলা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এই কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে যেরূপ রাধার প্রাধান্য হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রূপ নয়। তবে বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় যেরূপ, ঠিক সেরূপ না হইলেও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই রাধাবাদ যে ভারতীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে আমি এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি,[২০] আমার 'শ্রীরাধার

[১৮] দাদূ, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত।
[১৯] ঐ, প্রশ্নোত্তরী।
[২০] এই গ্রন্থের ১৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে এ-বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঐ গ্রন্থেই আমি হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও প্রেমশক্তিরূপিণী রাধাকে কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ-যোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোসাঁই হিতহরিবংশজী সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভী মতবাদ প্রচার করেন; হিন্দীতে এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া বহু বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে। গোসাঁই হিতহরিবংশজী যুগল-লীলার সাধক ছিলেন; কিন্তু এই যুগল-লীলার প্রধান আশ্রয় ছিল শ্রীরাধা; কৃষ্ণের পরিচয় এই রাধার বল্লভরূপেই, এইজন্যই এই মতটির নাম রাধাবল্লভী মত। হিতহরিবংশজী বলিয়াছেন—

শ্রীহিতজু কী রতি কোউ লাখনি মেঁ এক জানে।
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে॥

রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণ-ধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে তত্ত্বের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙলাদেশের 'কিশোরীভজনে'র। এই কিশোরীভজন-তত্ত্ব ও রাধাবল্লভী-তত্ত্ব মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একটি বিশেষ শক্তিবাদেরই বিশেষ পরিণতি 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমি এ-বিষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছি। বিষয়গুলি গ্রন্থান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না।

হিন্দী রীতিকালের প্রসিদ্ধ কবিভূষণের রচিত হিন্দী আলঙ্কারিক গ্রন্থ 'শিবরাজভূষণে'র মঙ্গলাচরণ ভবানী-স্তুতি দ্বারাই কবি করিয়াছেন।—

জৈ জয়ংতি জৈ আদি সকতি জৈ কালি কপর্দিনি।
জৈ মধুকৈটভ-ছলনি দেবি জৈ মহিষ-বিমর্দিনি॥ ইত্যাদি।

রীতিকালের আরও অনেক কবি এইরূপে তাঁহাদের কাব্যে শক্তির স্তুতি বা উল্লেখ করিয়াছেন।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁহার 'নীলদেবী' নামক নাটকে চণ্ডীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় নারীজাতিকে সেই শক্তির আদর্শ গ্রহণ করিবার উৎসাহ দিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদের কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে 'দুর্গা-স্তুতি'[২১] নামক কবিতাটি তিনি শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রে'র ছায়া অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা হইল 'শারদীয় পূজা'। এই কবিতায় শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি শারদীয়া দেবীর আবির্ভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও

[২১] গুপ্ত নিবন্ধাবলী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কবিতায় এরূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না। শারদীয়া দেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে কবি শরৎ-প্রকৃতির যেমন উপযুক্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তেমনই শারদীয়া পূজাকে অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ দিয়াছেন। কবি 'আগৱানী' কবিতার মধ্যে মায়ের যে আগমনী গাহিয়াছেন তাহাতে দেখি দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে'—'ভাৱত-ভৱনহিঁ দরস দিখায়ে আয়।' মা যখন বৎসরান্তে একবার আসিলেন তখন—

ৱহ তেরী সন্তান দেখ, তোহি ধাৱতী।
'মা, মা' করতী মা তেরে, ঢিগ আৱতী॥

তবে পিতা হিমাচলের গিরিপুরে কন্যারূপিণী পার্বতীর আবির্ভাবের বর্ণনাও দেখিতে পাই অন্য কবিতায়—

আজ মধুর ধুন বজত সৈল-পতি ভৱন বধাঈ।
নাচত গাৱত বহু কিন্নরি সুর তাল মিলাঈ।
বহুবিধি ফুলে ফুল পৱন সৌরভ ফৈলাৱত।
বিকসে কমল তড়াগন মহঁ সোভা সরসাৱত।
গিরিপুরৱাসিনকো আনন্দ কহ্যো নহীঁ জাঈ।
আজ হিমাচলকে মহলন এক কন্যা আঈ॥[২২]

বাঙালী রামদুলাল দাস দত্তের 'শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি' গানটি একটি প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত। এই সঙ্গীতে যেমন দেখিতে পাই,—

আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ওমা, চিতা-ভস্ম চারিভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি॥

বালমুকুন্দ গুপ্তের 'আৱহু মায়' কবিতাটির মধ্যেও বার বার এই আকুল আহ্বান দেখিতে পাই, 'মেরে হিয়-মসান মহঁ মা, করহু নিৱাস', 'হিয়-মসান মহঁ রাখী মা, ঠাঁৱ বনায়', 'যহ হিয় মেরে নিসি দিন মা ঘোর মসান। বীতত হৈ যা মহঁ দিন রৈন এক সমান।'

বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভক্তির সহিত দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের মিশ্রণের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।[২৩] এ-বিষয়েও এই যুগের বাঙালী কবি-মনের সহিত তাঁহার কবি-মনের মিল লক্ষ্য করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু বাঙলা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি; এখানে কবিগণ কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও কোন কবিই মূলকে একেবারে

[২২] দুর্গা-স্তবন, ঐ।
[২৩] এই গ্রন্থের ৩২১-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঢালিয়া সাজেন নাই। আধুনিক যুগে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কিছু কিছু সচিত্র অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেও মূলকে এখানেও ঢালিয়া সাজান হয় নাই। অর্থাৎ মোটের উপরে অসুরনাশিনী চণ্ডিকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যে কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক কালে এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

এ-প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করিতে পারি আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মৈথিলীশরণ গুপ্তের 'শক্তি'[২৪] কাব্য। মূল চণ্ডী পড়িয়া কবির একটি জিনিস মনে গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল, তাহা হইল চণ্ডিকার মধ্যে 'সৌম্যাতিসৌম্য' আবার অতীব ভয়ঙ্করী রূপের অপূর্ব সমাবেশ। কবি একদিকে যেমন দেখিলেন 'হিমালয়-কৃতাশ্রয়া' দেবীকে 'পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্'—অপর দিকে দেখিলেন সেই দেবীই দর্পভরে বলিতেছেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥

কবিও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সৌম্য-ভীষণা রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

কৈসা সুন্দর কৈসা ভীষণ থা দেবী কা রূপ!
ইধর অমৃত কী চারু চন্দ্রিকা উধর প্রলয় কী ধূপ![২৫]

অন্যত্র দেখি—

মন মেং মৃদুতা কর মেং দৃঢ়তা তেরী রহে সদৈব;
রোষ সময় পর কিন্তু তোষ কী ধারা বহে সদৈব।[২৬]

কাব্যখানি ছোট কাব্য। ইহাতে স্বর্গলোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও দেবী-কর্তৃক অসুরনিধন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কবির সময়ে ভারতবর্ষে যে অনভিপ্রেত পর-রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার-অবিচার চলিতেছিল তাহারই বেদনা-বিক্ষোভ কবির মনোভূমিতে ঘনীভূত ছিল; দেবভূমিতে অসুরের অত্যাচার এবং দেবভূমির স্বাধীনতা-হরণ বর্ণনার ভিতরে আমরা তাহারই আভাস পাই। এ-ক্ষেত্রে শক্তির উদ্বোধনের মধ্যে যে সঙ্ঘ-শক্তির উদ্বোধনের কথা রহিয়াছে তাহার ব্যঞ্জনা স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের নিকটে তাঁহাদের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া বিষ্ণু বলিয়াছিলেন,—'সঙ্ঘ-শক্তি হী কলি-দৈত্যোঁ কা মেটেগী আতঙ্ক।' কাব্যের শেষেও দেখিতে পাই,—

পুরদেবী সে কহা ইন্দ্র নে, "ভদ্রে, অব ভয় ছোড়,
হম সব কী একত্র শক্তি নে দিয়া দৈত্য-বল তোড়।"

[২৪] সাহিত্য-সদন, চিরগাঁব (ঝাঁসী) হইতে ১৯৪৮ সংবতে প্রকাশিত।
[২৫] পৃ. ১৫। [২৬] পৃ. ২৮।

কবি কাব্যমধ্যে দেবীমহিমা বর্ণনা করিলেও বিংশ যুগে শক্তির যে নূতন ধারণা তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

বিশেষ স্থান ও কালের সহিত চণ্ডীর অসুরবধ-কাহিনীকে কতখানি মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই মেবারের ভৈঁসরোড়গড়স্থিত সাহিত্যরঞ্জন কুঁবর হিম্মতসিংহ-বিরচিত 'মহিষাসুর-বধ'[২৭] কাব্যে। কাব্যখানি পড়িলে বেশ বোঝা যায়, এখানে স্বর্গভূমি হইল ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া রাজস্থান, সময় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী, দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যবিমুখ শৌর্যবিমুখ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসিগণ, অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ যাঁহারা এ-দেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। একটি গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে অসুর-অত্যাচারের প্রচণ্ডতা। অসুরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়াছিল এবং সাহস করিয়াছিল আমাদের এই স্বর্গোপম দেশকে আক্রমণ এবং অধিকার করিতে? কবি বলিতেছেন—এ দৈত্য কুটিল-নীতিজ্ঞ; জাতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই সে আস্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বিস্তার করিয়াছে।—

জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নীতিজ্ঞ।
ফৈলী ফূট দেখকর হমমেঁ আয়ে হৈঁ বন ৰিজ্ঞ॥
পতন ৰহাঁ পর হোতা নিশ্চয় জহাঁ ঘোর হৈ দ্বেষ।
পড়া ফূট কে চক্র-জাল মেঁ হৈ যহ প্যারা দেশ॥[২৮]

কিন্তু এখন শুধু বসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাৎ-তাপ করিয়া কিছু লাভ হইবে না; সমর-অগ্নিতে শত্রুকে পুড়াইয়া ছারখার করিতে হইবে। বসুধাকে বীরগণ ভুজবিক্রমেই ভোগ করিয়া থাকেন; বসিয়া কাঁদিলে রাজ্য মেলে না, শুধু শত্রু হাসে—

পর অব যোঁ রোনা-পছতানা হৈ নিতান্ত নিস্সার।
সমর অগ্নি মেঁ করনা সত্বর শত্রুৰর্গ কো ক্ষার॥
করতে সদা ৰীর ৰসুধা কা ভুজ-ৰিক্রম সে ভোগ।
ৰাজ নহীঁ মিলতা রোনে সে, হঁসতে হৈঁ রিপু লোগ॥[২৯]

কিন্তু দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি করিতেছেন? রাজ্যের কথা তখন তাঁহার ভাবিবারও অবকাশ নাই, তিনি রাজকার্য ছাড়িয়া নন্দনবনে গিয়াছেন—সেখানে যে বড় জৌলস। গ্রীষ্মাতপ দূর করিবার জন্য মহানন্দে তিনি শচীসহ তখন জলযন্ত্র-বেষ্টিত ভবনে আরাম করিতেছেন। সেখানে নর্তকীদের নৃত্য-নিরীক্ষণ

[২৭] ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, প্রয়াগ, ১৯৩২।
[২৮] ১।২৪ [২৯] ১।২৫

করা ব্যতীত অন্য কাজের যে আর ফুরসৎ নাই! যে রাজ্যের রাজার এই অবস্থা সে রাজ্যের দিন দিন হ্রাস-পতন ত অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু করেঁ ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ।
নন্দনৱন কো শক্র সিধারে ৱহাঁ রহে হৈঁ ভ্রাজ॥
গ্রীষ্মাতপ হরনে কো সুরপতি শচী-সংগ আনংদ।
জল-যংত্রোঁ সে ঘিরে ভৱন মেঁ করতে হৈঁ আনন্দ॥
নর্তকিয়োঁ কে নৃত্য-নিরীক্ষণ সে উনকো অৱকাশ।
নহীঁ তনিক ভী মিলতা, ইসসে হুআ রাজ্য কা হ্রাস॥
যহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর বঢ়তা হৈ সৱিশেষ।
বনা দেশ কো দীন প্রমাদী করতা হৈ নিশ্শেষ॥[৩০]

ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও নর্তকী-গণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একটি নিখুঁত বর্ণনা। অবশ্য কিছু পরেই ইন্দ্রের চৈতন্য হইল—তিনি দেবতাদের দুর্দশাও ভাল করিয়া বুঝিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশার কারণও ভাল করিয়া বুঝিলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত অভাব; হৃদয়-সিন্ধুর প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া সেখানে জ্বলিতেছে শুধু ঈর্ষানল। ফলে দেবসমাজে কোথাও নাই ঐক্য, ঐক্য ব্যতীত কি করিয়া হইবে কার্যসিদ্ধি—কি করিয়া জগতে হইবে কীর্তিলাভ?

প্রেমৱারি সব হৃদয়-সিন্ধুকা হুয়া তিরোহিত।
ঈর্ষানল হো প্রবল কিয়া হৈ তুম কো ভস্মিত॥
ইস কারণ একত্ব নহীঁ ক্যা তুম করতে হো।
ফুট-ফংদ মেঁ ফঁসে ৱিৱশ হো কর মরতে হো॥
কার্য সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা।
ঐক্য-বিনা হৈ কৌন কীর্তি জগ মেঁ বো সকতা॥[৩১]

তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাই, শচী নিজে যথার্থ রাজপুত-বীরাঙ্গনার রূপ ধারণ করিলেন, দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

মম হৃদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ,
কর্তৱ্য কিন্তু যহ কহতা হৈ—
সংগ্রাম করো নৃপকর্ম যহী,
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহী।[৩২]

[৩০] মহিষাসুর-বধ, ১। ২৬-২৭ [৩১] ঐ, ২। ৪৫-৪৬ [৩২] ঐ, ৩। ১৪

মহিষাসুর পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল—সুরা-নারী লইয়া তাহার সকল প্রমত্ততার বর্ণনা দেখিতে পাই কাব্যের পঞ্চম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত সুরগণ ঐক্যবোধে জাগ্রত হইলেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন শক্তিরূপিণী দেবী—মহিষাসুরের বিনাশ হইল।

'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে বর্ণিত চণ্ড-মুণ্ড-বধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া একেবারে হালে রচিত (সং ২০১৪) 'চামুণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা 'চণ্ড-মুণ্ড-মথন' নামে ছোট একখানি কাব্য দেখিতে পাই।[৩৩] জয়পুরের নিকটবর্তী অম্বরে প্রতিষ্ঠিতা দেবী অম্বরেশ্বরী অম্বিকার মহিমা-খ্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যখানি লিখিত। কাব্যখানি চণ্ড-মুণ্ড-বিমথিনী চামুণ্ডাসম্বন্ধে একান্নটি গীতের সমষ্টি।

'ভারতীনন্দন' রামানন্দ তিৱারী শাস্ত্রী-রচিত হিন্দীতে একেবারে হালের আর-একখানি বড় কাব্য দেখিতে পাই 'পার্ৱতী' নামে।[৩৪] কাব্যখানি ২৩শ সর্গে সম্পূর্ণ। মূল বিষয়বস্তু 'কুমার-সম্ভব'-বর্ণিত পার্বতী কাহিনী; কিন্তু সেই কাহিনীর সূত্রসার অবলম্বন করিয়া কাব্যে যতটা সম্ভব তাঁহার স্বাধীন কবি-কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন। পৌরাণিক শক্তিকে কবি যতটা সম্ভব আধুনিক কবিদৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় যেখানে গ্রন্থারম্ভে 'মঙ্গলাচরণে'র পরে 'অর্চনা'য় কবি আদিশক্তি শৈলকুমারী সম্বন্ধে বলিতেছেন—

জিন কী মহিমা সে শিব বন কর জীবন কা শৱ জাগা।
জিন কী করুণা সে সত্তা শ্রেয় সৃজন কা মাঁগা;
জিন কী প্রীতি উদার চেতনা বন জীৱন মেং ছাঈ,
জিন কী কৃপা অপার প্রকৃতি মেং কৃতি-গৌরৱ বন আঈ;

যাঁহার মহিমায় জীবনের শব শিব হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার করুণায় সৃজনের সত্তা ও শ্রেয় মাগিতেছি; যাঁহার প্রীতি উদার চেতনা হইয়া জীবনে ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কৃতি-গৌরব হইয়া আসিয়াছে।'

কবি শক্তিকে এক দিকে যেমন বিশ্ব-সৃষ্টির সব-কিছুর ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রকাশ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন নারীর মধ্য দিয়া—নারীর সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-আকর্ষণের ভিতরে।

কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। এই বর্ণনায় যেমন 'কুমার সম্ভবে'র বর্ণনার বহু বিস্তারও রহিয়াছে—আবার কেদার-বদ্রি—তাহার বিস্তৃত পথের বর্ণন—নেপাল প্রভৃতির বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল-কুমারীর বর্ণনায় 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনার নানারূপ লৌকিক বিস্তারও যেমন

[৩৩] জয়পুর হইতে 'গোপালকরণ'-কর্তৃক প্রকাশিত।
[৩৪] নয়াপুর, কোটা (রাজস্থান), ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ।

দেখিতে পাই, তেমনই দেখি পার্বতী যখন রাজকন্যা তখন রাজসভায় গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রীতি ও শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত নীতিরূপে প্রসন্না ও অভীতা মূর্তিতে উপবিষ্টা।[৩৫] কাব্যের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা কবি-কল্পনা-বিস্তার সত্ত্বেও মোটামুটি 'কুমার-সম্ভব'কে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে'র পঞ্চম সর্গের শেষ দুইটি শ্লোককে কবি এইভাবে একটি পদে রূপ দিয়াছেন—

পথ মেং ৱিৱশ অচল বাধা সে আকুল শৈৱালিনী সী,
স্থিতি-গতি কে অসমংজস মেং রহ রহী সরিত-নলিনী সী
কহা শম্ভু নে স্নেহভাৱসে, "প্রিয়ে! আজ সে তেরা,
প্রেম ঔর তপ-ক্রীত দাস হৈং তন, মন, জীৱন মেরা।[৩৬]

পরিণয়ের পরে নব-দম্পতি মহাদেব-উমা কৈলাসে চলিয়া আসিলে এই নব-দম্পতীকে লইয়া কবি নর-নারী-জীবনাদর্শ—বিশেষ করিয়া স্বামি-স্ত্রী-জীবনাদর্শের অনেক কথা বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মদন দাহ করিবার পরে বিবাহের তাৎপর্যটি কবি নানাভাবে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কবি আদিশক্তি-রূপিণী উমার অলৌকিক মহিমা উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন—

বৈঠে থে শংকর কুটীরে মেং ধ্যান লগায়ে,
দেখ রহী থী উমা, পলক মেং সপনে ছায়ে;
চঞ্চল তকলী ঘূম রহী শ্বাসোঁ কী গতি সী,
ৱিরচ রহী থী সূত্র সৃষ্টি কা ৱিশ্ব নিয়তি-সী।[৩৭]

ধ্যান ধরিয়া কুটীরে শঙ্কর বসিয়া আছেন, দেখিতেছিলেন উমা—পলকে ভরা স্বপ্নের ছায়া; কুটীরবাসিনী উমা বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিলেন? তিনি তকলী কাটিতেছিলেন; কিন্তু সে তকলীতে কোন্ সূত্র কাটা হইতেছিল? বিশ্বনিয়তির মত কেবল সৃষ্টির সূত্র বিরচনা করা হইতেছিল।

কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদ্বোধন, তারক-বধ, জয়ন্ত-অভিষেক প্রভৃতি এবং আরও বহু সর্গ দেখিতে পাই। ইহা 'কুমার-সম্ভবে'র ঘটনার সহিত পুরাণাদি হইতে বিন্যস্ত। গ্রন্থশেষে 'আরতী'তে প্রার্থনা দেখি—

বনে উমা-সী পুণ্যৱতী প্রতি প্রকৃতি-কুমারী,
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারী,
শক্তি ঔর শিৱ কী গোদী মেং ৱীর কুমার পলেং।

[৩৫] রাজা সভা মেং বৈঠ পিতা কে দক্ষিণ পার্শ্ব পুনীতা।
প্রীতি ঔর শাসন সে সংযুত নীতি প্রসন্ন অভীতা।
[৩৬] সপ্তম সর্গ। [৩৭] ত্রয়োদশ সর্গ।

আধুনিক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের উপরেও শক্তিবাদের প্রভাব বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়নী'র মধ্যে বহু স্থানে দেখিতে পাই পরিপূর্ণ নারীত্বের ভিতরে তিনি 'ভগবতী' বা 'সর্বমঙ্গলা'র রূপ দর্শন করিতে চাহিয়াছেন।[৩৮] 'নিরালা' কবির (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী) উপরে শক্তির প্রভাব আরও স্পষ্ট। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও অন্যান্য শক্তি-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই সব অনুবাদে মূলের ভাব বেশ রক্ষিত হইয়াছে।—

দুঃখভার ইস ভব কে ঈশ্বর,
জিনকে মন্দির কা দৃঢ় দ্বার
জলতী হুঈ চিতাওঁ মেঁ হৈ
প্রেত-পিশাচোঁ কা আগার;
সদা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না
উনকী পূজা কে উপচার,
বীর! ডরায়ে কভী ন, আয়ে
অগর পরাজয় সৌ-সৌ বার।
চূর চূর হো স্বার্থ, সাধ সব
মান, হৃদয় হো মহাশ্মশান,
নাচে উস পর শ্যামা, ঘন রণ
মেঁ লে কর নিজ ভীম কৃপাণ।

'নিরালা'র 'আহ্বান' কবিতাটিও অনুরূপ—

এক বার বস ঔর নাচ তূ শ্যামা!
সামান সভী তৈয়ার,
কিতনে হী হৈঁ অসুর, চাহিএ কিতনে তুঝকো হার?
কর মেখলা মুংড-মালাওঁ সে বন মন-অভিরামা—
এক বার বস ঔর নাচ তূ শ্যামা।

নিরালা কবি একশত আটটি নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উপাখ্যানটিকে নিজের মতন করিয়া রূপ দিয়া 'রাম কী শক্তিপূজা' কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কৃত্তিবাস হইতেই বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও কবি ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সৃষ্টি করিয়াছেন। একশত আটটি

[৩৮] হে সর্বমঙ্গলে তুম মহতী।
সব কা দুঃখ অপনে পর সহতী॥
কল্যাণময়ী রাণী কহতী।
তুম ক্ষমা নিলয় মেঁ রহতী॥

পদ্ম দিয়া দুর্গাদেবীকে পূজা করিতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জলির সময়ে একটি ফুল কম দেখিতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরূপ—

বুদ্ধিকে দুর্গ পহুঁচা বিদ্যুৎ-গতি হতচেতন
রাম মেঁ জগী স্মৃতি হুএ সজগ পা ভাব প্রমন।
"যহ হৈ উপায়" কহ উঠে রাম জ্যোঁ মন্দ্রিত ঘন—
কহতী থী মাতা মুঝে সদা রাজীব নয়ন!
দো নীল কমল হৈঁ শেষ অভী, যহ পুরশ্চরণ
পূরা করতা. হূঁ দে কর মাতঃ এক নয়ন।"
কহ কর দেখা তূণীর ব্রহ্মশর রহা ঝলক,
লে লিয়া হস্ত লক লক করতা রহ মহাফলক;
লে অস্ত্র বাম কর, দক্ষিণ কর দক্ষিণ লোচন
লে অর্পিত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন
জিস ক্ষণ বঁধ গয়া বেধনে কা দৃগ দৃঢ় নিশ্চয়
কাঁপা ব্রহ্মাণ্ড, হুআ দেবী কা ত্বরিৎ উদয়ঃ—
"সাধু, সাধু, সাধক-ধীর, ধর্ম-ধন-ধন্য রাম!"
কহ লিয়া ভগবতী নে রাঘব কা হস্ত থাম।
দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদুর্গা, ভাস্বর
বামপদ অসুর-স্কন্ধ পর, রহা দক্ষিণ হরি পর॥[৩৯]

নিরালার অনেক গীতিতে মা, জননী, অরুণা প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।[৪০] নিরালা কবির জন্ম অবশ্য বাঙলাদেশে (মেদিনীপুরের মহিষাদলে), তাঁহার যৌবনের শিক্ষাও বাঙলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শাক্ত প্রভাব অতি স্বাভাবিক-ভাবেই থাকিবার কথা।

হিন্দী আধুনিক কাব্যের মধ্যে কবি 'অনূপ'-কৃত 'শর্বাণী' কাব্যখানি শক্তি-অবলম্বনে রচিত একখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য।[৪১] আটচরণযুক্ত ৭০১টি স্তবকে কাব্যখানি সমাপ্ত। হয়ত 'দেবী-সপ্তশতী'র কথাই কবির মনে ছিল। কাব্যখানির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ৭০১টি পদই এক 'ঘনাক্ষরী' ছন্দে লিখিত। কাব্যমধ্যে কবি দেবীর সাহিত্যে প্রচলিত মধুর মূর্তিরও নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবীর বিশ্বসৌন্দর্যময়ী রূপও বর্ণনা করিয়াছেন, আবার পৌরাণিক বিশ্বাত্মিকা, সর্বশক্তিরূপিণী অসুরনাশিনী রূপও

৩৯ 'অপরা' কবিতাগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

৪০ দয়িত জনে পর করো করুণা
দীনতা পর উতর আএ
প্রভু, তুম্‌হারী শক্তি অরুণা।

৪১ শ্রীবিশ্বনাথ মিশ্র, এম. এ., সাহিত্যাচার্যকর্তৃক সম্পাদিত।

বর্ণনা করিয়াছেন, তান্ত্রিক নাদরূপিণী, মাতৃকারূপিণী, ষট্‌চক্রবাসিনী রূপও বর্ণনা করিয়াছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্ত্বেও কবির মূল বিশ্বাস ছিল যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্ত্ব—তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, কর্মবাদিগণের কর্মরূপা, শাক্তের পরমেশ্বরী, ন্যায়বাদিগণের বিশ্বকারিণী, সাংখ্য-জ্ঞানীর দিব্য পুরুষ-স্বরূপ, শৈবের শিব, সৌরের সবিতা, কবির কবিতা।

তূ হী ব্রহ্ম-ৱাদিয়োঁ কী ব্রহ্ম-নাম ধারিণী হৈ
তূ হী কর্ম-ৱাদিয়োঁ কো কর্ম-রূপ ভাতী হৈ।
তূ হী শাক্ত জন কী প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরী হৈ
ন্যায়-ৱাদিয়োঁ কো ৱিশ্বকারিণী লখাতী হৈ।
সাংখ্য-জ্ঞানিয়োঁ কো দিৱ্য পুরুষ-স্বরূপ তূ হী
শৈৱ মানৱোঁ কো ৱিশ্ব-সদৃশ দিখাতী হৈ।
সৌর-প্রাণিয়োঁ কা সৱিতা তূ অতি পাৱন হৈ
তূ হী কৱিয়োঁ কো কৱিতা হো দৃষ্টি আতী হৈ॥[৪২]

কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবীর স্তুতি করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি আশিটি স্তবকে শুধু মায়ের চরণের বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দীতে এইরূপ দীর্ঘ চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখানি মাত্র গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে; পণ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'চরণ-চন্দ্রিকা'য়[৪৩] ২৫।২৬টি স্তবকে চরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এত দীর্ঘ বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তি ও প্রপত্তির সহিত অলঙ্কার-বাহুল্যও নজরে পড়ে। দেবীর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও কবি-প্রসিদ্ধির উপর অধিক নির্ভর এবং অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত তিনটি স্তবকে দেবীর 'দৃষ্টিপাতে'র বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে কবিত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিন্তু বর্ণনার অতিরেক মনকে খানিকটা শ্রান্ত করে। একশত স্তবকে কবি দেবীর চক্রের (অস্ত্র) বর্ণনা করিয়াছেন, একশত এক স্তবকে করিয়াছেন দেবীর কৃপাণের বর্ণনা। একশত ষোল স্তবকে কবি মহিষাসুর-বধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সর্গে কবি বীররসের স্ফুরণেই মন অধিক নিয়োগ করিয়াছেন, সামান্য শৃঙ্গার-রস ও হাস্য-রসের অবতারণা-দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক যুগের দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের কবি বচ্চন দেবীকে আবার সর্বভূতে প্রচণ্ড ক্ষুধারূপেই সংস্থিতা দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কবিতার সংকলন 'সোপান' কাব্যগ্রন্থে 'বংগাল কা কাল' নামক কবিতায় দেখি—

ভূখ নহীঁ দুর্বল, নির্বল হৈ,
ভূখ সবল হৈ

[৪২] শর্বাণী, স্তুতি, ৭১। [৪৩] ভারত-জীবন প্রেস, কাশী।

ভূখ প্রবল হৈ,
ভূখ অটল হৈ
ভূখ কালিকা হৈ, কালী হৈ,
যা কালী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ।
ভূখ প্রচংড শক্তিশালী হৈ,
যা চণ্ডী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ।

আমরা 'মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্যে'র আলোচনার একেবারে শেষ দিকে এইরূপ কিছু কিছু কবিতার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

হিন্দী লোক-সাহিত্যে নানা রূপে দেবীর গীত পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে অল্প কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও গানগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা মিল আছে। ব্রজ-অঞ্চল হইতে এই-জাতীয় কিছু গীত সংগ্রহ করিয়া ডক্টর সত্যেন্দ্র তাঁহার 'ব্রজ কা লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ব্রজ-অঞ্চলে আশ্বিন মাসে 'করৱা চৌথি' (আশ্বিনী চতুর্থী), 'ন্যোরতা' (নবরাত্র) প্রভৃতি দেবীকে লইয়া নানা ব্রত-আরাধনা মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আছে; আর মেয়েদের ব্রত-আরাধনা হইলে তাহার মধ্যে গীত অবশ্যই থাকিবে। আমরা 'করৱা চৌথি'র একটি গীত পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'ন্যোরতা' (নবরাত্রি) ব্রজ-অঞ্চলে এখনও প্রচলিত; অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত হইল 'ন্যোরতা'। দেয়াল দেওয়া একটি ছোট মাটির ঘর তোলা হয়; প্রতিদিন সকালবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গান গাহিতে গাহিতে ঐ ঘরে একটি মাটির গৌরী বসান হয়। 'ন্যোরতা'র গানের একটি নমুনা দিতেছি।—

গৌরি রী গৌরি খোলি কিবরিয়া, বাহির ঠাঢ়ী তেরী পূঁজনহারী।
গৌরি পূজংতরি বেটী আঈ সুভদ্রা॥
গৌরি পূজংতরি বেটী কহা ফলু মাঁগে।
মাতু পিতা কৌ রাজু জু মাঁগৈ, ভৈঅ'নু কী জোড়ী মাঁগৈ,
ভাভী-গোদ ভতীজো মাঁগৈ॥
গৌরি রী গৌরা বেটী, খোলি কিবরিয়া, বাহির ঠাঢ়ী তেরী পূঁজনহারী।
গৌরি পূজংতরি বহূ আঈ ঐং সীতা।
গৌরি পূজংতরি বহূ কহা ফলু মাঁগে।
সাসু-সুরর কৌ রাজু জো মাঁগৈ, হোরী-খিলন ছোটে দিবরা মাঁগৈ।
হরী-হরী চুরিয়াঁ, মুতিয়ন ভরি মাঁগ জু মাঁগৈ।
অমর বোলি কে বিছুআ মাঁগৈ, অপনী গোদ ঝড়ূলা মাঁগৈ॥

'গৌরি গো, গৌরি, খোল দুয়ার, বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পুজারিণী। গৌরী পুজিবার জন্য আসিয়াছে কন্যা সুভদ্রা; গৌরী পুজিয়া সে কি ফল মাগে? মাতা-পিতার জন্য রাজ্য মাগে, এক জোড়া ভাই মাগে, ভ্রাতৃবধূর কোলে ভাইর ছেলে মাগে। গৌরি, ওগো কন্যা গৌরি, খোল দুয়ার, বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পুজারিণী। গৌরী পুজিবার জন্য আসিয়াছে বধু সীতা; গৌরী পুজিয়া কি ফল মাগে? শাশুড়ী-শ্বশুরের জন্য রাজ্য মাগে, হোলি খেলিবার জন্য ছোট দেবর মাগে; সবুজ সবুজ চুড়ি মাগে, মোতি দিয়া ভরা সিঁথি মাগে; অমর বোলির (অর্থাৎ যে বোলি, বুলি বা শব্দ অমর) পায়ের মল-খাড়ুয়া মাগে —আর মাগে নিজের কোলে ছেলে।'

আশ্বিন মাসে এবং চৈত্র মাসে ব্রজ-অঞ্চলে দেবী-পুজা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক রকম 'যাত্রা' (যাত্রা-গান নহে, গমন) দেখিতে পাওয়া যায়; তখন ঘরে ঘরে নৌদুর্গা (নবদুর্গা), নৌদেবী বা নবরাত্রির ব্রত রাখা হয়। আশ্বিনী অষ্টমীতে কুমারী ভোজন করান হয়, ইহাকে বলে 'কন্যা-লাঁগুরা'। এই-সব ব্রত-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই নানাবিধ দেবীর গান প্রচলিত আছে। মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়াছি, দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও, রোগীর রোগ দূর কর, অন্ধকে আঁখি দাও, নির্ধনকে ধন দাও, ব্রজ-অঞ্চলের দেবী-গীতেও ঠিক তাহাই দেখি।

কন্যা-রূপ ভমানী মৈঁনে আজু দেখি।

বরু অগবারেঁ মৈয়া, বরু পিছবারেঁ, পীপরু ধরম দুআর, মৈঁনে আজু দেখী।
মৈয়া কে দ্বারেঁ এক বাঁঝ পুকারৈ, রোঢ়ী কী কায়া করি দেউ, মৈঁনে আজু দেখী॥
মৈয়া কে দ্বারেঁ এক কোঢ়ী পুকারৈ, রোঢ়ী কী কায়া করি দেউ, মৈঁনে...।
মৈয়া কে দ্বারেঁ এক অঁধরা পুকারৈ, অঁধরে কী আঁখে করি দেউ, মৈঁনে...॥
মৈয়া কে দ্বারেঁ এক নিরধঁন পুকারৈ, নিরধঁন কঁু অন্ন দেউ, মৈঁনে...।
তোই সুমিরঁু মৈয়া তেরী ছঁদু গাঁউ, অঁসনে মেঁ হোউ সহাঈ, মৈঁনে...॥[৪৪]

জালিপা দেবীকে দর্শনের জন্য যাত্রার একটি সুন্দর গান দেখিতে পাই। গানটি স্বামি-স্ত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি; স্ত্রী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে উদ্‌গ্রীব—স্বামী নানাবিধ ঠেকা-বাধা অছিলা-অজুহাত দেখাইয়া না যাইবার ফন্দিতে আছেন। স্ত্রী আবার একটি একটি করিয়া ঠেকা-বাধার কাটান দিতেছেন।—

মেরে পিছবারেঁ গৈল, গাড়ী-ঢরকঁন মৈঁ সুনীঁ হো মাই।
চলৌ পিয়া, দোউ মিলি জাঁই পরসেঁ দেবী ঝালিফা হো মাই॥

[৪৪] তুলনীয় :— মৈয়া রহীঁ ঐ নন্দন-বন ছাই, ফুলঁন কী লোভিনিয়াঁ॥
মাতা কে দ্বারেঁ এক আঁধরো পুকারৈ, মৈয়া দেউ নেঁন ঘর জাএঁ, ফুলঁন কী লোভিনিয়াঁ॥
ইত্যাদি।

ঘর ঘোড়ী, ঘর ভৈঁসি, বাউ ঐ ছোড়েঁ নাঁ বনে হো মাই।
ঘর দূধ, ঘর পূতু, বাউঐ, ছোঁড়ে নাঁ বনে হো মাই॥
দূধূ গূজরিয়া দেউ, লড়িকঁনি ধাই লগাইঐ হো মাই॥
ঘর বউঅরি, ঘর ধীঅ, বাউঐ ছোড়েঁ নাঁ বনে হো মাই।
ধিঅরি পঠই দেউ সসূরারি, বউঅরি ঘর-বরূ সোঁপিঐ হো মাই॥

স্ত্রী বলিতেছেন, জালিপা দেবীর মন্দিরে যাইবার রাস্তা ত আমার পিছেই, আর এমন ভাল রাস্তা যে গাড়ি ত একেবারে পিছলাইয়া চলে—সুতরাং চল প্রিয় দুইজনে মিলিয়া গিয়া জালিপা মাইকে দর্শন করি। স্বামী বলিতেছেন,—ঘরে ঘোড়া, ঘরে মহিষ, এ-সব ছাড়িয়া ত যাওয়া চলিবে না! তাহা ছাড়া ঘরে আছে দুধ, ঘরে আছে ছেলেপিলে, এ-সব ছাড়িয়াও ত যাওয়া চলে না! স্ত্রী বলিতেছেন,—দুধ গোয়ালার কাছে দাও, বাচ্চাকাচ্চার জন্য ধাই লাগাও। স্বামী আবার বলিতেছেন,—ঘরে বউয়ারী, ঘরে ঝিয়রী—এ-সব ছাড়িয়াও ত যাওয়া চলিবে না! স্ত্রী বলিতেছেন,—ঝিয়রীকে পাঠাইয়া দাও শ্বশুরবাড়ি, আর বউদের উপর ছাড়িয়া দিয়া চল ঘর-বার সব,—এইভাবে চল দেবীর মন্দিরে।[৪৫]

একটা জিনিস এই গানগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, দেবীর এই ব্রত-অনুষ্ঠানাদি মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত এবং দেবীর দর্শনে যাত্রার আগ্রহ-উৎসাহও মেয়েদেরই বেশি; পুরুষগণ সর্বদাই বাধা দেন। একটি গানে দেখি, পণ্ডিত আসিয়া পুঁথি দেখিয়া ভাল দিন বাছিয়া দিলেন—সাতই শনিবারই ভাল দিন। তখন মেয়েদের মধ্যে পড়িয়া যায় উৎসাহের সোরগোল—কিন্তু পুরুষেরা বসেন বাঁকিয়া।

তিরিয়াঁ বিন কী অগঁনূ লিপাবৈ, মাইল চৌকু পূরাবৈ,
ভৈঁনি সঁজাবৈ উনকী টীকো।
ঘরহী মেঁ বাবুল বরজঁন লাগে, কঠিন পংথূ দেবী কো,
দেবী কো মৈয়া, সিংঘ ঢ়হাই কজরী কো।[৪৬]

[৪৫] তুলনীয় :—
চলি পীয়া, দোউ মিলি জাঁই পরসেঁ দেবী জালিপা ঐ ও মাই।
ঘর ঘোড়ী, ঘর ভৈঁসি, দোউন চালেঁ নাঁ বনৈ ও মাই॥ ইত্যাদি।
দেবী কে গীত, ১২ সং।

আরও তুলনীয় :—
জাতী কৌন দিসা তে আসূন ভয়ো, কোঈ কৌন দিসন কঁূ জাই হে।
রাণী পূরব দিসা তে আসন ভয়ো, কোঈ পছিম দিসা কঁূ জাউঁ হে।
জাতী পচ্ছিম দিস মেঁ কো রহৈ, কোঈ ধ্বাই পরসন কঁূ জাই হে।
রাণী পছিম দিসা মেঁ দেবী জালিফা; কোঈ ধ্বাই পরসন কঁূ জাই হে।
জাতী ঐসো রী দেবতা কহা দেঁতিয়ৈ তূ ধ্বাই পরসন কঁূ জাই হে।
রাণী অংধেনূ নেওর দেংতি ঐ, বাঁঝন কঁূ পূরত্তর দেই হে॥ ইত্যাদি।
—ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগৃহীত।

[৪৬] দেবী কে গীত, ৭ সং।

'স্ত্রীগণ মায়ের অঙ্গন লিপিবে, কামলী মেয়েরা বসিবার স্থান ঠিক করিয়া দিবে, বোন সাজাইবে উঁহার (মায়ের) টীকা; কিন্তু ঘরে বাবা রুখিতে লাগিলেন—দেবীর পথ বড় কঠিন, আর দেবীর সিংহ কাজলী গোরুকে (কালো গোরু) ধ্বংস করিয়াছে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, এইরূপ যাত্রার গান আশ্বিনেও যেমন হয়, চৈত্রেও তেমনই হয়; দুই সময়েই দেবী-পূজার প্রসিদ্ধি ইহাও পূর্বেই দেখিয়াছি। একটি পদে দেখি সুন্দর এবং প্রিয় চৈত্র মাস আসিয়াছে, পণ্ডিত বলিয়া দিলেন শুভক্ষণের কথা, বাবা চলিলেন খরচ বাঁধিয়া, মা চলিলেন পথ শীতল করিয়া, ননদ চলিলেন কুম্কুম-তিলকে সাজিয়া, ভ্রাতৃবধূ চলিলেন সুন্দর সুন্দর দেবী ছন্দ গান করিয়া।

জাতী পংডিত বোলো রে আপুনে ঔরু নিরমল ঘড়ীএ বতাই
আয়ো লাড়ো চৈত সুহাঁমনো॥
জাতী বাবুল বোলো রে আপুনে, ঔরু পূরো সৌ খরচু বঁধাই।
জাতী মাইল বোলো রী আপনী, সিঅরো সৌ পংথু সিরাই, আয়ো লাড়ো॥[৪৭]

দেবীর মন্দিরে যাওয়া বিষয়ে আরও নানারূপ গান পাওয়া যায়। একটি গানে দেখি—

অগিম ভারী, সো মৈয়া তেরো পংথু কঠিন ভারী।
কো এাঁ আবৈ ডোলী-ডালী কো জা অসবার।
কো এাঁ আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥
রাঁনী আবৈ ডোলী-ডালী, রাজা অসবার।
রৈঅত আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥
কো এাঁ চঢ়াবৈ হীরা-মোতী, কো এাঁ নরিয়ার-ফুল-সুপারী।
কো এাঁ চঢ়াবৈ সোঁনে কৌ ছত্তরু, মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥
রাজা চঢ়াবৈ হীরা-মোতী (ঔ) রৈঅত নরিয়ার।
ঔরু রঁনিয়াঁ চঢ়াবৈঁ সোঁনে কৌ ছত্তরু মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥

'অগম ভারী হে মা তোমার সেই পথ, ভারী কঠিন। কে সেখানে আসিবে ডুলি-ডালি চড়িয়া, কে বা আসিবে বাহনে চড়িয়া (ঘোড়া প্রভৃতিতে), আর কে বা এখানে আসিবে খালি পায়ে এই মায়ের দরবারে? রাণী আসিবেন ডোলি-ডালিতে, রাজা আসিবেন ঘোড়ায় চড়িয়া (বাহনে চড়িয়া); রায়ত আসিবে নগ্ন পায়ে ঐ মায়ের দরবারে। কে এখানে চড়াইবে হীরা-মোতি,—কে এখানে চড়াইবে নারিকেল-ফুল-সুপারী, আর কে এখানে চড়াইবে সোনার ছত্র এই মায়ের

[৪৭] দেবী কে গীত, ১৩ সং।

দরবারে? রাজা চড়াইবে হীরা-মোতি, আর রায়ত চড়াইবে নারিকেল; আর রাণী চড়াইবেন সোনার ছাতা এই মায়ের দরবারে।[৪৮]

একটি পদে মায়ের সঙ্গে অসুরের বৈরভাবের একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাই—

এক হরো লোংগন্‌ কো বাগ্‌, মৈয়া লকড়িনি কোঁ নিকরীং।
এক এক লকড়ী বীনি মৈয়া, জূনে গঠরী বাঁধীং॥
উততে আয়ৌ অসুর, অসুর বাকী লকড়ী বখেরী।
সুনি রে লাঁগুরিয়া বীরু, অসুর মেরী লকড়ী বখেরী॥
নৌ-নৌ টোকো কীল, দরদু নেঁকো মতি করিও।
অসুর কী চতুরা নারি, অসুর সমঝাই দএ॥
মৈয়া জূ কেং চরননি জাউ, সুংদরি জূ কে চরন পলোটৌ।
এক এক লকড়ী বীনি, মৈয়া জূ কোঁ গঠরী বাঁধৌ॥
সুনি রে লাঁগুরিয়া বীরু, অসুর মেরে চরননু আয়ৌ।
নৌ-নৌ খেঁচৌ কীল, কসরি নেঁকৌ মতি রাখৌ॥

এক হরিত লবঙ্গের বাগ, মা গিয়াছেন লকড়ির খোঁজে; এক এক করিয়া লকড়ি সংগ্রহ করিয়া ঘাসের দড়ি দিয়া আঁটি বাঁধিলেন। ওদিক হইতে সহসা আসিল অসুর—সে আসিয়া মায়ের বাঁধা লকড়ি ছড়াইয়া ফেলিল। মা ডাক দিয়া বলিলেন সেবক বীর 'লাঁগুরিয়া'কে—অসুর আমার লকড়ি ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, উহার দেহে নয়-নয়খানা গোঁজ ঠুকাইয়া দাও—দরদ একটুও করিও না। অসুরের সঙ্গে ছিল তাহার চতুরা নারী- সে অসুরকে দিল সমঝাইয়া,—মায়ের চরণে যাও—সুন্দরীর চরণ টিপিয়া দাও—আর এক এক করিয়া আবার লকড়ি সংগ্রহ করিয়া মাঈজীর গাঁটরি আবার বাঁধিয়া দাও। তখন মা তাঁহার সেবক বীর 'লাঁগুরিয়া'কে ডাকিয়া বলিলেন,—অসুর আমার চরণে আসিয়াছে—নয় নয় গোঁজ তুলিয়া দাও—একটাও রাখিও না বাকি।

একটি গীতে সাধারণ গৃহিগণের সমাজ-জীবনে ভাল হইয়া থাকিবার জন্য মায়ের নিকট অতি সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই :—

দেখি পরাঈ সুংদরি নারি, মনু ন ডুলাইঐ হো মাই।
জো মনু ডুগলন হারু, ভৈংনা কহি কেং টেরিঐ হো মাই॥
দেখি, পরাএ সুংদর লালু, মনু ন ডুলাইঐ হো মাই।
জো মনু ডুগলন হারু, গোদ লৈ খিলাইঐ হো মাই॥

৪৮ তুলনীয় :—
লেউ মৈয়া বীরা মৈং কব কী ঠাড়ী॥
কোঁনেং চঢ়াএ মৈয়া ধ্বজা-নারিয়র, কোঁনেং চঢ়াএ লাল-হীরা, মৈং কব কী ঠাড়ী।
ইত্যাদি। ঐ, ৮ সং।

দেখি চন্নানি কো খেতু, মনু ন ডুলাইঐ হো মাই।
জো মনু ডুগলন হারু, মোল লৈ কে খাইঐ হো মাই॥

অতি সাধারণ সাধারণ প্রার্থনা। পরের সুন্দরী নারী দেখিয়া মন দোলাইও না মা, আর যদি মন দোলে—তাহাকে যেন বোন বলিয়া ডাকি। পরের সুন্দর ছেলে দেখিয়া যেন মন না দোলে—যদি মন দোলে, তাহাকে যেন কোলে বসাইয়া খাওয়াই। পরের চানার খেত দেখিয়া মন যেন দোলাইও না মা; যদি মন দোলে তবে দাম দিয়া যেন খাই এমন করিও মা।

আর-একটি গীতে দেখি প্রার্থনা করা হইতেছে, 'মৈয়া, ভুবন মে আউ, মেরী আস লাগী তেরে দরসন কী'—আমাদের ভুবনে নামিয়া আস মা, আমার আশা লাগিয়াছে তোমার দর্শনের জন্য। আমাদের ভুবনে আসিয়া দেবী জী কোথায় কোথায় থামিয়া রহিলেন?

এক বনু কহিয়তু ফুলনি কী, ফুল রহৈ মেহকাই,
দেবী জী বিরমি রহী বাঈ বন মে।
এক বনু কহিয়তু লোংগনি কো, লোংগে রহী মেহকাই, দেবী জী...।
এক বনু কহিয়তু সংতনি কো, সংত বোলে রাধেস্যাম, দেবী জী...।
এক বনু কহিয়তু ভক্তনি কো, ভগত বোলে জৈ-জৈকার, দেবী জী...।

একটি বন আছে ফুলের বন, ফুল সুগন্ধ ছড়াইয়া আছে; দেবী জী থামিয়া আছেন সেই বনে। একটি বন আছে লবঙ্গের, লবঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া আছে, দেবী জী...। এক বন আছে সন্তগণের, সন্তেরা বলে রাধে-শ্যাম; দেবী জী...। এক বন আছে ভক্তগণের, ভক্ত বলেন জয়-জয়কার, দেবী থামিয়া আছেন সেই বনে।

একটি গানে আবার ব্যাকুল অভিমান দেখা দিয়াছে, মা কেন জোর করিয়া করিয়া বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছেন না, প্রাণ যে তাঁহাতেই লাগিয়া রহিয়াছে,—'মৈয়া, লেজু কসনি কসি ডারি, জিঅরা মেরো তোঈ সোঁ লগো।' মায়ের কাছে যাইবার পথে বাপ বিলম্ব করাইয়া দেয় খরচা বাঁধিয়া দিতে গিয়া আর টাকা গোণাইতে; ঘোড়া সাজাইতে ভাই করাইয়া দেয় বিলম্ব; ঘরের কামলী মেয়েরা দেরী করইয়া দেয় পুরি সেঁকিতে; লাড্ডু বাঁধাইতে গিয়া কাকীমা দেরী করাইয়া দেন, বোনেরা দেরী করাইয়া দেয় দেবী-ছন্দ গাহিয়া গাহিয়া; পথ শীতল হইবার জন্য বধূ দেয় উহাকে দেরী করাইয়া দিয়া। কিন্তু এত দেরী আর ভাল লাগে না, প্রাণ লাগিয়াছে যে মায়ের সঙ্গে, তাই ইচ্ছা, মা নিজে কষিয়া বাঁধিয়া টানিয় লন।[৪১]

মথুর অঞ্চলে জগদেব (জগদেও) বলিয়া এক দেবী-ভক্তের কাহিনী চলিত

[৪১] দেবী কে গীত, ১১ সং।

আছে। 'জগদেব কা পংবাড়া' (একপ্রকার কাহিনী-সম্বলিত গীত) বলিয়া মথুরা অঞ্চলে যে গান প্রচলিত আছে তাহাতে বারটি 'মরাস' (বীরত্বপূর্ণ কাহিনী) আছে। জগদেবের 'মরাস'গুলি দেবীর জাগরণ-গীতে গাওয়া হয়। সমস্ত কাহিনীর আরম্ভ হইল এই লইয়া, রংধোর দেবীর যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা জগদেব নিমন্ত্রিত হইলেন। জগদেব তাঁহার মাতাকে লইয়া যজ্ঞে যোগদান করিলেন। কিন্তু রংধোর মাতার অপমান করিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া দেবীভক্ত জগদেব দেবীর শরণ লইয়া রংধোরের সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহাই জগদেবের প্রথম মরাসা—এইরূপ বারটি মরাসা লইয়া দীর্ঘ গীতটি পূর্ণ। জগদেব একবার 'বংগাল' দেশেও আসিয়াছিলেন। বংগালের তমোলীন যাদুবলে উঁহাকে তোতা বানাইয়া দিয়াছিল। খবর জানিয়া দেবী নিজে 'বংগাল' দেশে আসিয়া জগদেবকে উদ্ধার করেন। মোটামুটি দেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহ লইয়াই সব কাহিনী। হয়ত বাঙলাদেশে এরূপ কাহিনী প্রচলিত থাকিলে চণ্ডী-মঙ্গল বা কালিকা-মঙ্গলের আর একটি চমৎকার কাহিনী মিলিত। কিন্তু হিন্দীতে ইহা আর কাব্যাকার গ্রহণ করে নাই, গীত-আকারে রহিয়া গিয়াছে। গীতগুলির অধিকাংশেরই ধুয়া 'অরী মেরী আদি ভমানী'; এই ধুয়াটি অন্যান্য পল্লী-গীতিতেও জনপ্রিয়। কিছু কিছু গানের ধুয়া 'সীস দেবী রহই'। দেবী ভবানী (ভমানী) গানে জালিপা দেবী—কঙ্কালিনী কালিকা (অরে দেবী দেখী জলপা রে কংকালী); স্থানে স্থানে তিনি হিঙ্গলাজের ভবানী ('ভমানী হিংগুলাজকী') আবার অন্যত্র 'সিংঘ অসবারী জগদম্মা বৈঠী'। আবার দেখি—

ধরতী মাতা তু বড়ী ঔর তোতে বড়ো অগাসু।
দেবন মেঁ দুর্গা বড়ী, যাকে নগরকোট মেঁ রাজু॥

পূর্বেই বলিয়াছি, জগদেব যাহা কিছু করিয়াছেন সবই দেবীকে স্মরণ করিয়া, দেবীর ধ্যান করিয়া (দেবী মনায় কৈ, দেবী কো ধরি কৈ ধ্যান)। সমগ্র গীতের মধ্যে যে দেবী বন্দনা পাওয়া যায় তাহার একটি নমুনা দিতেছি।

বংদো বারংবার,
অরী মাত মৈঁ তেরী সরনা
ভমন মে তেরে পড়া, মাত মৈ তেরী সরনা।
ভমন তুম্‌হারা লাগত সুহারনা
মৈয়া লাগৈ তেরা ভরন সুহারনা
... ...
পররত তিহারো মোহি লগত সুহারনা
পররত তেরো রী অরে লগত।
অরে চোলে রালী জী;
অরে আদি ভমানী।

দেবী-জাগরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানমূলক অথবা একেবারে প্রকীর্ণ বহু পল্লী-সংগীত আছে। যুধিষ্ঠির-অর্জুন এবং দেবীকে অবলম্বন করিয়া 'মোরংগ দানে কো জুঝু' নামে যে সংগীতটি প্রচলিত আছে তাহার আরম্ভটি সুন্দর—

খোলে হির্দে জন কে খানি, মৈ'নে যাদি করীএ মাঈ
এক দিন ধাঁধু পীপা নে সৈরী আজু সৈরী মৈ'নে আঈ
খোলো হিরদে জনকে খানি। মৈ'নে...
তু নগরকোট তে আরৈ
ভূলে জ্ঞান বতারৈ।
মাতা মৈ' মূরখি অজ্ঞানী
দৈজা মোই বুদ্ধি ভমানী—খোলে...॥[৫০]

পাণ্ডবগণ-কর্তৃক দেবীপূজার কথা লোক-সংগীতে বহুভাবে দেখা যায়।

'দেবী কে সোহিলে' (সোহিলে, মঙ্গল-গীত, সাধারণতঃ সন্তান-জন্মে) বলিয়া যে গানগুলি পাওয়া যায় তাহাতে দেখি সন্তান-লাভ যে দেবীর দয়াতেই সম্ভব হয় ইহাই নানা ছোট ছোট কাহিনীদ্বারা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোক-সংগীতে মৈথিলী লোক-সঙ্গীতের মতন সাত-সুপারী, ধ্বজা, নারিকেল, খীর খণ্ড মেওয়া উপচারে, নহবতের বাজনায়, নাগড়ার বাজনায় বিবিধ মানসে দেবীপূজার কথা। দেবী বহু স্থলেই নগরকোটের দেবী এবং 'সাঁৱল মায়'—শ্যামলবর্ণা মা। বাজনার বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কোথাও সামান্য একটু একটু গভীরতা দেখা যায়, একটি গানে দেখি 'নাগড়া মাতাজী কো সংত প্যারা বোলে গা'; অপর একটি গানে দেখি, নাগড়া বাজে, বীণা বাজে, সানাই বাজে—আর তাহর সঙ্গে 'তেরে অনহদ বাজে বাজে'; তাতে মোহে ব্রহ্মা, মোহে মুরারি আর মোহে ত্রিশকোটি দেবতা, আর—

সংত প্রেমরস পায়ে
সুমর চরণ ধ্যানু জস গারে॥

লৌকিক বর্ণনার মধ্যেই একটি পদে দেখি,—

পুত্র কুপুত্র হোতে হৈ মায় কুমায় ন হোয়।
মেরে সির পর বৈঠী জালপা মারনবালা কোয়?

মায়ের নিকট সাংসারিক নানাপ্রকার আর্জি পেশ করার ভিতরে এক-আধটি গানে একান্ত সরলভাবে ইহাও বলিতে দেখি,—

হমারী সুন লীজিয়ে, হমারী সুন,
অরজ লগী দরবার সো তেরে মা, সো হমারী সুন লীজিয়ে।

[৫০] এই গানটি ও পরবর্তী সব গানগুলিই ডক্টর সত্যেন্দ্র-কর্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অর্জী হমারী জাগে মরজী তুম্‌হারী মাঁ, মন চাহে সোঈ কীজিয়ে,
হমারী সুন লীজিএ।
ভব সাগর সে পার লগাদো।
ইতনী অনুগ্রহ কী জিস, হমারী সুন।
ঔর কছু মৈঁ মাঁগত নহীঁ, ভক্ত দান মোয় দীজিএ, হমারী সুন।
কালিদাস দাস অপনে কী অংত সময় সুধ লীজিয়ে।

দেবী যে শুধু সর্বমানব-পূজ্যা নন, তিনি যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবেরও আরাধিতা কতকগুলি গীতে এই ভাবটি অত্যন্ত কৌতুকজনকভাবে ফোটান হইয়াছে। একটি গানে বলা হইয়াছে—

জাগো জাগো জাগো দেবী রাজা হরীচংদ হোম রচাইয়া
ব্রহ্মা জগাবে তেনু বেদ সুনাবেঁ বংসী বজাকে জগাবে নংদ জী কে লালা॥

আবার—

দেবরূপ বিসাল দেবন মন ধীরজ আয়া,
নারদ ধারে ধ্যান, ব্রহ্মা নে বেদ সুনায়া,
অস্তুতি লাগে করন ইন্দ্র তেরী আরতি লায়া।
অস্ত্রশস্ত্র দেবন হিয়ে জী, দীনা সিংঘম গায়,
বীস ভুজি শশি ধারিয়াঁ, তেরা রূপ ন বরনা জায়।

আর-একটি সুন্দর পদে দেখিতে পাই পর্বতে মায়ের রাজ্য বসিয়া গিয়াছে—

বনো বনো তেরা মোরী ঝমারে শব্দ করে।
সব পর্বতে পেঁ রাজ তুম্‌হারা বৈঠি হুকুম করে।
জরী চোলনা অংগ বিরাজৈ কেসর তিলক ধরে।
লংভর বীর ভবন তেরে আসে ভৈরোঁ চবঁর করে।
সিহ চঢ়ী মাঈ অংবিকা গাজে খাড়া হাথ ধরে।
সেবক দাস কহে হথ জোড়ী শরণী আন পড়ে॥

আর-একটি গানে মায়ের চারিদিক্ ঘিরিয়া বাদলের বর্ণনা অতি চমৎকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।—

রংগ রংগীলী বাদলিয়া নে লাঈ হৈ বহার, ভবন পর লাঈ হৈ বহার,
নিক্‌কী নিক্‌কী বুঁদা বরসে মাতা কে দরবার॥
মাতা কে ভবন পর ছাঈ ঘটা ঘনঘোর,
বাদলা নু দেখ দেখ নাচে দাদুর মোর,
দাদুর মোর পপীহা বোলে কোয়ল শব্দ উচার,
জৈ জগদীশ্বর, জৈ জগদম্বে, জৈ দেবী আদি কুমার॥ রংগরংগীলী...
লতা বেলকুংজ ফুলে বুটে রংগ রংগ,
মংদ মংদ পবন চলত লিয়ে সৈ সুগন্ধ;

চংপা, মরুআ কেৰড়া, মৌলা, মোতিয়া গুলনার,
মালিন দিয়া হার গুংদলাঈ, পহনো আদি কুমার॥ রংগরংগীলী...

রঙ্গ-রঙ্গিলী 'বাদলিয়া' (বাদল) কি বাহার লইয়া আসিয়াছে,—মায়ের ভবন ঘিরিয়া কি বাহার লইয়া আসিয়াছে! ছোট ছোট বিন্দু বর্ষণ করে মাতার দরবারে। মাতার ভবন ঘিরিয়া ঘনঘোর ঘটা ছাইয়া গিয়াছে; বাদল দেখিয়া দেখিয়া নাচে দাদুর ময়ুর; দাদুর ময়ুর পাপিয়া ডাকে—কোকিল করে শব্দ উচ্চারণ—জয় জগদীশ্বর, জয় জগদম্বে, জয় দেবী আদি-কুমারি! লতাকুঞ্জে ফুল ফুটিয়াছে রঙের রঙের, মন্দ মন্দ পবন চলে সুগন্ধ লইয়া। চাঁপা, বনতুলসী, কেয়া, বকুল, বেলি আর ঘন লালফুল দিয়া মালিনী দিয়াছে হার গাঁথিয়া—পরিয়াছেন আদি-কুমারী!

সাধক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থসূচী

[যেখানে লেখক ও গ্রন্থ উভয়ের একসঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে প্রথমে লেখকের নাম ও পরে কমা দিয়া গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে।]

* প = পাদটীকা

শব্দসূচী